DOI Prefix: 10.69655

ISSN :: 2454–1508

আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-১ সংখ্যা-৪ মার্চ ২০২৫

সহ-সম্পাদক

আজিজুল সেখ

সম্পাদক

ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

আত্মদীপ

আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা

পর্ব-১, সংখ্যা-৪, মার্চ ২০২৫

সম্পাদক:
ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য

সহ-সম্পাদক:
আজিজুল সেখ

প্রকাশক:
উত্তরসূরি, শ্রীভূমি, আসাম

ATMADEEP

An International Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454–1508

Volume-I, Issue-IV, March, 2025

Published by:
Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: https://www.atmadeep.in/
Email: editor@atmadeep.in

Editor-in-Chief
Dr. Bishwajit Bhattacharjee

Associate Editor
Azizul Sekh

Type Setting:
Amrika Das Purkayastha

Printed at:
Scholar Publications
Sribhumi, Assam, India, 788710

Cover Page:
Kajal Ganguli

Price: Rs. 600.00

© Uttarsuri

The views and contents of this Journal are solely of the authors. This Journal is being sold on the condition and understanding that its contents are merely for information and reference and that neither the author nor the publishers, Printers or Sellers of this Journal are engaged in rendering legal, accounting or other professional service.

The publishers believe that the contents of this Journal do not violate any existing copyright/intellectual property of others in any manner whatsoever. However, in the event the author has been unable to track any source and if any copyright has been inadvertently infringed, please notify the publisher in writing for corrective action.

Atmadeep, is a Bi-monthly electronic & Print journal of open Access Category. The Readers do not need to pay/register themselves to read and download the articles in the journal. However, it is only for scholarly/academic purpose that is non-commercial. Users while using excerpts from Atmadeep, must cite the author, content and the journal by including the link of the content. Individuals/ Companies/ Organizations intending to use contents from Atmadeep, for commercial purpose must contact the Editor-in-Chief.

Editorial Board

Advisor

Dr. Tapadhir Bhattacharjee
Former Vice-Chancellor, Assam University, Silchar, Assam
President, Uttarsuri, Karimganj, Assam
Mo: +919435566494

Dr. Nirmal Kumar Sarkar
Former Associate Professor, Karimganj College, Karimganj, Assam
Vice-President, Uttarsuri, Karimganj, Assam
Mo: +919435375599

Editor-in-Chief

Dr. Bishwajit Bhattacharjee
Asst. Professor, Karimganj College
Karimganj, Assam, 788710
Mo: +919435750458, +917002548380
Email: bishwajit@karimganjcollege.ac.in

Associate Editor

Azizul Sekh
Research Scholar, Dept. of Bengali, Tripura University, Tripura
Mo: +919126261414
Email: azizul.bengali@tripurauniv.ac.in

Editorial Board Member:

Dr. Debasish Bhattacharjee
Professor & Head, Dept. of Bengali
Assam University, Silchar
Email: debashish.bhattacharya@aus.ac.in

Dr. Rupasree Debnath
Assistant Professor, Department of Bengali
Gauhati University, Assam, India
Email: rupasree@gauhati.ac.in

Dr. Malay Deb
Assistant Professor, Dept. of Bengali
Tripura University, Tripura, India
Email: malaydeb@tripurauniv.ac.in

Dr. Madhumita Sengupta
Asst. Professor, Dept. of Bengali
Arya Vidyapeeth College, Guwahati, Assam, India
Email: madhumita.sengupta@avcollege.ac.in

Dr. Debjani Bhowmick (Chakraborty)
Associate Professor, Dept. of Bengali,
Sripat Singh College, Murshidabad, West Bengal, India
Email: dbhowmick@sripatsinghcollege.edu.in

Romana Papri
Lecturer, Department of Pali and Buddhist Studies
University of Dhaka, Bangladesh
Email: romanapapri@du.ac.bd

Dr. Rajarshi Chakrabarty
Assistant Professor, Dept. of History
University of Burdwan, West Bengal, India
Email: rchakrabarty@hist.buruniv.ac.in

Dr. Mumit Al Rashid
Associate Professor and chairman
Department of Persian Language and Literature
University of Dhaka, Bangladesh
Email: mumitarashid@du.ac.bd

Dr. Barnali Bhowmick Ghosh
Associate Professor and HOD
Department of Bengali
Bir Bikram Memorial College, Agartala, Tripura

প্রথম পর্ব, প্রথম সংখ্যায় যাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে

১। **সেলিম মুস্তাফার কবিতায় কবি সত্তার বাঁক বদল ও হাংরি প্রভাব**
শান্তনু ভট্টাচার্য, **৮-২০**

২। **বাংলা কবিতায় অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কবিভাবনার স্বতন্ত্রতা: বিষয়ে ও আঙ্গিকে**
দেবপ্রসাদ গোস্বামী, ২১-৩৬

৩। **হাইডেগারের দর্শনে Dasein: একটি সমীক্ষা**
আসলাম মল্লিক, ৩৭-৪৭

৪। **শোষণে এবং বৈষম্যে চা-বাগানের নারী: নির্বাচিত গল্পের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা**
আজিজুল সেখ, ৪৮-৫৮

৫। **অনুরূপা বিশ্বাসের 'নানা রঙের দিন': অব্যক্ত ইতিহাসের গ্রন্থিমালা**
ড. মধুমিতা সেনগুপ্ত, ৫৯-৭২

৬। **দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার দর্পণে ১৯৪২-৪৩ সালের কাঁথির দুর্ভিক্ষ**
মৌসুমী খাতুন, ৭৩-৮৪

৭। **ভাষাচার্য সুনীতিকুমার: একটি আলোকিত জীবন**
ড. দেবযানী ভৌমিক (চক্রবর্তী), ৮৫-৯৩

৮। **মল্লিকা সেনগুপ্তের সীতায়ন: নারী ভাবনার নবতর ভাষ্য**
ড. অরূপা চক্রবর্তী, ৯৪-১০১

৯। **কোশলরাজ প্রসেনজিত ও বৌদ্ধধর্ম**
রোমানা পাপড়ি ও শিরীন আক্তার, ১০২-১১৫

১০। **দেবেশ রায়ের 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' উপন্যাসের চ্যারকেটু চরিত্র: নিম্নবর্গীয় চরিত্রের আধারে একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন**
জানকী প্রসাদ দেবনাথ, ১১৬-১২৯

১১। **প্রকৃতি সচেতনতা ও পরিবেশ ভাবনা: আসামের ছোটগল্পে**
নয়ন দে, ১৩০-১৪৪

১২। **অমিতাভ দেব চৌধুরীর গল্পে দেশভাগোত্তর সাম্প্রদায়িকতা**
প্রিয়াংকা ধর ও ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য, ১৪৫-১৫৯

১৩। **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প ভুবন: প্রতিবাদ ও নির্বাসিতের প্রতিবেদন**
অমিত দেব, ১৬০-১৭২

১৪। **মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত ছোটগল্পের আলোকে নিম্নবর্গ তথা অন্ত্যজ আদিবাসীদের বয়ান**
অনুরাধা দাস, ১৭৩-১৮৮

প্রথম পর্ব, দ্বিতীয় সংখ্যা: সূচিপত্র

১। **ত্রিপুরার রাজাদের ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থের সত্যাসত্যতা অনুসন্ধান**
অঙ্কুর দেববর্মা, ১৮৯-২০২

২। **রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আদলে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা'**
ড. দেবযানী ভট্টাচার্য্য, ২০৩-২২১

৩। **'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' এর শকুন্তলা ও 'বীরাঙ্গনা'র শকুন্তলার তুলনাত্মক পর্যালোচনা**
জয়দেব পাল, ২২২-২৩৫

৪। **ভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলা ভাষা**
মো: রিপন মিয়া, ২৩৬-২৫৪

৫। **জহির রায়হানের গল্প: রাজনৈতিক চেতনার বিপ্রতীপে নিম্ন-মধ্যবিত্তের বিবর্ণ দিনলিপি**
ড. প্রতাপ ব্যাপারী, ২৫৫-২৭৫

৬। **বাণী বসুর অন্তর্ঘাত: 'ময়না তদন্তের হ্যাজাক আলোকে'**
ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী, ২৭৬-২৯৩

৭। **কাকদ্বীপের ভাষা**
রিক্তা সরদার, ২৯৪-৩০৫

৮। **সংখ্যার উদ্ভব ও সংখ্যা পদ্ধতির বিবর্তন**
মো. তাহমিদ রহমান, ৩০৬-৩২৮

৯। **কাজী নজরুল ইসলামের 'বাতায়ন-পাশে গুবাক তরুর সারি' : প্রেম ও প্রকৃতি চেতনার সমন্বয়**
তাপস মণ্ডল, ৩২৯-৩৩৯

১০। **হুমায়ূন আহমেদের 'মিসির আলি! আপনি কোথায়?' উপন্যাসের মনঃসমীক্ষণাত্মক সমালোচনা**
ড. প্রসেনজিৎ দাস, ৩৪০-৩৫১

১১। **কথাসাহিত্যিক আবুল বাশারের নির্বাচিত ছোটগল্পে রাজনীতি: একটি পর্যালোচনা**
মাসুদ আলী দেওয়ান, ৩৫২-৩৬৯

১২। **অশরীরী চিন্তা-চেতনায় শীর্ষেন্দুর কিশোর উপন্যাস: ভূত ও মানুষের পারস্পারিকতায় এক স্বতন্ত্র মাত্রা**
নমিতা হালদার, ৩৭০-৩৮১

১৩। **ঔপনিবেশিক আমলে মুর্শিদাবাদ জেলার জনস্বাস্থ্য বিষয়ক একটি পর্যালোচনা**
মেহেবুব হোসেন, ৩৮২-৩৯৯

১৪। **বেলা বসুর 'স্মৃতিপট': নারীশিক্ষা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি এবং সমকাল**
পর্ণা মণ্ডল, ৪০০-৪১২

১৫। **দিনাজপুরের গ্রামীণ সমাজে মনোহলী জমিদারির সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা**
সুরাট সরকার ও কামানুজ্জামান, ৪১৩-৪২৪

১৬। **বাউল মতাদর্শ: উৎস, বিকাশ ও সাধক-শিল্পীদের অবদান**
নিরঞ্জন মণ্ডল, ৪২৫-৪৩৬

১৭। **ভারতবর্ষের নাট্য-ঐতিহ্যে থার্ড থিয়েটার**
প্রশান্ত চক্রবর্ত্তী, ৪৩৭-৪৪৪

১৮। **মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে আখ্যানের বিনির্মাণ**
ড. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন, ৪৪৫-৪৫৫

প্রথম পর্ব, তৃতীয় সংখ্যা: সূচিপত্র

আমন্ত্রিত পাঠ

১। **তলস্তয়ের গল্প**
মানস মজুমদার, ৪৫৯-৪৬৬

২। **বহির্বঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ইতিহাসে-পার্বত্য ত্রিপুরা**
ড. খেলন দাস হালদার, ৪৬৭-৪৭৪

ভাষা ভাবনা

৩। **বাংলা ভাষার আলোকে কুড়মালি ভাষার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য: এক ভাষাবৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন**
মৌসুমী মাহাত, ৪৭৫-৪৮৭

৪। **বাংলা 'লোকভাষা'-র নানা প্রসঙ্গ: একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা**
অদিতি দাস, ৪৮৮-৪৯৭

কবি সমন্বয়

৫। **আধুনিক ভাষ্যে প্রাচীন ও মধ্য ভারতীয় সাহিত্য: কবি বিষ্ণু দে-র কাব্য সমগ্র**
ড. অসিত বিশ্বাস, ৪৯৮-৫০৮

৬। **'একা এবং কয়েকজন': তরুণ কবির নিজস্ব কণ্ঠস্বর**
ড. শেখ নজরুল ইসলাম, ৫০৯-৫২২

চেতনায় স্বামীজী

৭। **সাংগঠনিক ব্যবস্থাপনায় প্রেষণার ভূমিকা: স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে একটি পর্যালোচনা**
অনন্যা সরকার, ৫২৩-৫৩১

৮। **স্বামী বিবেকানন্দের সংগীত প্রজ্ঞা**
মো. আফতাব উদ্দিন ৫৩২-৫৩৮

লোকসংস্কৃতি

৯। **বাংলার পীরসংস্কৃতি ও পীরসাহিত্য: একটি নিরীক্ষা**
ড. সুদীপ্ত চৌধুরী, ৫৩৯-৫৪৭

নাট্যালোচনা

১০। **আধুনিক সংস্কৃত নাটকে অন্ত্যজ জীবন**
এস কে মইনুদ্দিন, ৫৪৮-৫৫৫

১১। **অভিনয় জীবনের উত্থান পতনের আলেখ্য 'নানা রঙের দিন'**
রাজেশ সরকার, ৫৫৬-৫৬২

১২। **বাস্তবের দর্পণে বীরভূমের গণনাট্য সংগঠন (১৯৬৯ - ২০২০): উত্থান ও পরিণতি**
ড. অঙ্কুশ দাস, ৫৬৩-৫৭৫

১৩। **বাংলার গণনাট্য আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক**
সুমনা বিশ্বাস, ৫৭৬-৫৮৩

কথাসাহিত্য

১৪। **মহাশ্বেতা দেবীর নির্বাচিত গল্পে ভাতের অভাব একটি বিশ্লেষণী পাঠ**
রাজু লায়েক, ৫৮৪-৫৯১

১৫। **যে স্মৃতি নহে হারাবার: বিভূতিভূষণের 'স্মৃতির রেখা'**
ড. অনুপম নস্কর, ৫৯২-৬০০

১৬। **বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের আলোকে তৎকালীন বাঙালি সমাজচিত্র**
বকুল সাহা, ৬০১-৬০৯

১৭। **বিশ শতকে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি: প্রসঙ্গ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচিত গল্প**
রাকেশ চন্দ্র সরকার, ৬১০-৬১৫

১৮। **জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্পে চিত্রভাবনা**
আদেশ লেট, ৬১৬-৬২৩

১৯। **সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের নির্বাচিত ছোটগল্প: আটপৌরে লৌকিক জীবনের ইতিবৃত্ত**
বাবলী বর্মন, ৬২৪-৬৩২

২০। **শচীন দাশের গল্প: সুন্দরবনের বাঘ-বিধবা মহিলাদের জীবন সংগ্রাম**
সমরেশ বাগ, ৬৩৩-৬৪০

২১। **অনিল ঘড়াইয়ের ছোটোগল্পে প্রান্তজনের জীবনচর্যা**
সীমা সূত্রধর, ৬৪১-৬৪৮

২২। **অমিয়ভূষণ মজুমদারের উপন্যাসে সংস্থান**
উর্বী মুখোপাধ্যায়, ৬৪৯-৬৫৯

২৩। **স্যাফো সই-কথা ও কয়েকটি বাংলা উপন্যাস**
ড. প্রীতম চক্রবর্ত্তী, ৬৬০-৬৬৯

২৪। **নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বীকারোক্তিমূলক উপন্যাস: বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তের আত্ম-সংকট ও আত্ম-অন্বীক্ষা**
শুভঙ্কর দাস, ৬৭০-৬৮২

২৫। **মহাশ্বেতা দেবীর সাহিত্য ধারায় অন্ত্যজ নারী ও আদিবাসী জীবন জিজ্ঞাসা**
বিকাশ মন্ডল, ৬৮৩-৬৯২

২৬। **রাভা জনগোষ্ঠীর পরিচয় এবং 'সোঁদাল' ও 'বিনদনি' উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে বাস্তব চিত্র**
ধনেশ্বর বর্মন, ৬৯৩-৬৯৯

২৭। **আধুনিক নর-নারীর দাম্পত্য জীবনের বহুমাত্রিক সংকট: প্রসঙ্গ 'বিষবৃক্ষ', 'ঘরে বাইরে' ও 'গৃহদাহ' উপন্যাস**
ড. বাপি চন্দ্র দাস, ৭০০-৭০৭

২৮। **লোকসংস্কৃতির আলোকে 'তিতাস একটি নদীর নাম' উপন্যাস: একটি বিশ্লেষণ**
ড. আনন্দ ঘোষ, ৭০৮-৭১৪

২৯। **বাংলা সাহিত্যে দলিত ও শরৎচন্দ্র**
কিরণ মন্ডল, ৭১৫-৭২৪

৩০। **সমরেশ বসুর 'বিবর': নৈতিক সংকট, পাপবোধ ও আত্মদ্বন্দ্বের গল্প**
মৌমিতা হালদার, ৭২৫-৭৩৬

৩১। **রহু চণ্ডালের (হার-না-মানা) হাড়: মানব-জমিনের সন্ধানে**
শ্রীচরণ দাস বিশ্বাস, ৭৩৭-৭৪৪

৩২। **হুমায়ূন আহমেদের ময়ূরাক্ষী: একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন**
ড. প্রসেনজিৎ দাস, ৭৪৫-৭৫২

৩৩। **নির্বাচিত বাংলা ছোটোগল্পে কর্ণ-কুন্তী কথার বিবর্তন**
সঞ্চারী হালদার, ৭৫৩-৭৬১

৩৪। **বাস্তুআধ্যাত্মিকতার প্রেক্ষাপটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'**
ড. শেখ ইমরান পারভেজ, ৭৬২-৭৭১

দার্শনিক আলোচনা

৩৫। **বোধিসত্ত্বভূমি গ্রন্থনিষ্ঠ দানের ধারণা: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা**
প্রিয়াঙ্কা দত্ত, ৭৭২-৭৭৮

৩৬। **অনুমানের প্রকার প্রসঙ্গে প্রাচীন ও নব্য নৈয়ায়িক মত: একটি আলোচনা**
সুফল দাস, ৭৭৯-৭৮৫

৩৭। **মহর্ষি পতঞ্জল ও শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টিতে 'যোগ': একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা**
রাজকুমার পণ্ডিত, ৭৮৬-৭৯৬

৩৮। **সাংখ্যমতে জগতের ক্রমাভিব্যক্তিবাদ বা উৎপত্তিবাদ: একটি সমীক্ষা**
রাজিবুল খান, ৭৯৭-৮০৪

৩৯। **বিবরণপ্রস্থানে শাব্দাপরোক্ষবাদ**
সন্তু ঘোষ, ৮০৫-৮১১

বিবিধ

৪০। **মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ ও তৎকালীন কোচবিহারের সাহিত্যচর্চা**
কালিপদ বসুনিয়া, ৮১২-৮১৮

৪১। **শিক্ষা সংস্কৃতি চর্চায় ঠাকুরবাড়ির অন্তঃপুরীকারা**
দেবরূপা সেন, ৮১৯-৮২৬

৪২। **সারদাসুন্দরী দেবীর আত্মকথায় কলুটোলা-সেনবাড়ির অন্তঃপুরচিত্র**
সৌমী বসু, ৮২৭-৮৪২

৪৩। **ভিটগেনস্টাইনের চিত্রতত্ত্ব: একটি পর্যালোচনা**
ইন্দ্রজ্যোতি কর্মকার, ৮৪৩-৮৫০

৪৪। **বাঙালির হিমালয়-প্রবজ্যা: ভারতাত্মার সন্ধান (নির্বাচিত ভ্রমণকাহিনি অবলম্বনে)**
সুস্মিতা দে, ৮৫১-৮৫৮

৪৫। **শ্রী শ্রী সারদা মায়ের ব্যবহারিক বেদান্ত: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা**
ড. অমিত কুমার বটব্যাল, ৮৫৯-৮৬৫

প্রথম পর্ব, চতুর্থ সংখ্যা
সূচিপত্র

কথাসাহিত্য

১। **রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ : একটি সমীক্ষা**
অঞ্জন পাল, ৮৬৭-৮৭৩

২। **কল্যাণী ভট্টাচার্যের উপন্যাসে নারী পরিসর: একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠ**
রুমি দেব, ৮৭৪-৮৮১

৩। **নারী-পুরুষের দাম্পত্য রসায়ন: কণা বসু মিশ্রের নির্বাচিত উপন্যাস**
ইপ্সিতা দেব, ৮৮২-৮৮৭

৪। **বনফলু: এক প্রেমানুভবী শিল্পী সত্ত্বা**
দেবশ্রী পাণ্ড রায়, ৮৮৮-৮৯৫

৫। **বিনতা রায়চৌধুরী-র গল্পে সামাজিক সংকট ও তার উত্তরণ**
অপূর্ব রায়, ৮৯৬-৯০২

৬। **সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর গল্প: সমাজ ও জীবন-ভাবনা**
মো: আবু বাকার সিদ্দীক, ৯০৩-৯১৫

৭। **তিরিশের দশক: জগদীশ গুপ্তের গল্পে স্বতন্ত্র নারী**
মানালী হালদার, ৯১৬-৯২২

৮। **জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' ও দেশভাগ: একটি পর্যালোচনা**
অরুনিমা রায় চৌধুরী, পার্থপ্রতিম সেন, ৯২৩-৯২৮

কাব্যালোচনা

৯। **হারাধন বৈরাগীর কাব্য ভাবনায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুসন্ধান**
অমর্ত্য দাস, ৯২৯-৯৩৬

১০। **নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা: কবির চোখে কবি**
সৌরভ মজুমদার, ৯৩৭-৯৪৩

লোকসাহিত্য

১১। **আশরাফ সিদ্দিকীর লোকসাহিত্যে প্রবাদ: দর্পণে সমাজ জীবন**
রাকেশ দেবনাথ, ৯৪৪-৯৫০

১২। **অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতিও লোকাচার**
বিশ্বজিত দেবনাথ, ৯৫১-৯৫৭

১৩। **গ্রন্থচিত্রে অনন্য: দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'ঠাকুরমার ঝুলি'**
ড. কাজল গাঙ্গুলী, ৯৫৮-৯৬৪

ভাষা

১৪। **প্রমিত বাংলার সংকট ও ঔপনিবেশিক ভাষানীতি: একটি পর্যালোচনা**
ইয়াসমিন প্রামানিক, ৯৬৫-৯৭২

দর্শন ভাবনা

১৫। **রবীন্দ্র দর্শনে মানুষের ধারণা: একটি সমীক্ষা**
রনজয় খাঁ, ৯৭৩-৯৭৮

১৬। **অদ্বৈতবেদান্তের আলোকে জগতের কারণতা উপপাদন: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা**
প্রশান্ত মাঝি, ৯৭৯-৯৮৪

১৭। **নব্য-ন্যায়ের দৃষ্টিতে পদশক্তি: একটি দার্শনিক সমীক্ষা**
সৌরভ মজুমদার, ৯৮৫-৯৯০

১৮। **প্রমাণ প্রসঙ্গে নাগার্জুন: একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা**
প্রিয়াঙ্কা মুখার্জ্জী, ৯৯১-৯৯৭

১৯। **কাল বিষয়ে জৈনমত ও কান্টের মত: একটি তুলনামূলক আলোচনা**
মনিরুল খাঁন, ৯৯৮-১০০৩

২০। **উপনিষদের আলোকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক: একবার ফিরে দেখা**
ড. ব্রততী চক্রবর্তী, ১০০৪-১০০৯

২১। **অদ্বৈত ও দ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে মহাবাক্যার্থ বিচার**
রত্না দালাল, ১০১০-১০১৫

২২। **বেদান্ত আধুনিক হতাশাগ্রস্ত জীবনের মহৌষধ**
ড. কৃষ্ণ ধীবর, ১০১৬-১০২৬

বিবিধ

২৩। **বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বের অনুসন্ধান: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ**
ড. মো. সিদ্দিক হোসেন, ১০২৭-১০৩২

২৪। **অষ্টম গর্ভ: পৌরাণিক উপমায় অলংকৃত সমাজ বাস্তবতার কাহিনি**
সৌরভ মুখার্জি, ১০৩৩-১০৩৯

২৫। **যাদুগোড়ার রঙ্কিনী দেবীর ইতিহাস: আদিবাসী দেবীর ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্মাণ**
রুনা শ্যামল, ১০৪০-১০৪৫

২৬। **ভারতীয় সাহিত্যে নদীমাতৃক পুরাণ ও আধুনিক বয়ান**
ড. সমরেশ মন্ডল, ১০৪৬-১০৫১

২৭। **উনিশ শতকের কলকাতার শহুরে বাবুদের গণিকাযাপন: যৌনতার নানা রূপ**
ড. দোয়েল দে, ১০৫২-১০৫৯

২৮। **টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পদক্ষেপ হিসাবে আদিবাসী মহিলা উন্নয়ন প্রচেষ্টা**
শুভেন্দু বোস, ১০৬০-১০৭০

২৯। **নাটোর জেলায় শিক্ষাক্ষেত্রে জমিদারদের ভূমিকা: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা**
মোঃ তৈয়বুর রহমান, ১০৭১-১০৭৯

৩০। **শামসুর রাহমান: বাতাসে বারুদ গন্ধ, বন্দি শিবির থেকে**
ড. পীযূষ পোদ্দার, ১০৮০-১০৮৫

Guidelines, Review Process & Publication Ethics, Page No: 1086
Publication Charge, Page No: 1087

সম্পাদকীয়

অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্য এবং উপস্থাপনায় ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের গবেষক, অধ্যাপক এবং প্রাবন্ধিকদের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে 'আত্মদীপ'। এটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত একটি আন্তর্জাতিক দ্বিমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা, যা উত্তরসূরি থেকে প্রকাশিত হয়। আত্মদীপের এই পর্বের নির্বাচিত লেখাগুলোকে ভাষা, লোকসংস্কৃতি, দর্শন, কাব্য, কথাসাহিত্য ইত্যাদি নানারকম ভাগে সাজিয়ে তোলার প্রয়াস করা হয়েছে। যারা বাংলা ভাষায় লিখছেন, গবেষণা করছেন তাদের ভাবনাগুলোকে প্রবন্ধের আকারে প্রকাশ করার একটি ক্ষেত্র তৈরি করে দেওয়াই এই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য।

আত্মদীপ পত্রিকায় শুধু সাহিত্যকেন্দ্রিক নয়, বাংলা ভাষায়, যে কোন বিষয় নিয়ে লেখা গবেষণামূলক প্রবন্ধ পাঠানো যেতে পারে। পত্রিকাটি অনলাইন এবং প্রিন্ট দুভাবেই প্রকাশিত হওয়ায় গবেষক এবং লেখকদের অনেকটা সাহায্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। প্রতিটি প্রবন্ধ DOI সহকারে প্রকাশিত হয়, যা প্রবন্ধটির স্থায়ী ওয়েব ঠিকানা হয়ে থাকবে।

ভারত এবং বাংলাদেশ থেকে যারা লেখা দিয়েছেন এবং পত্রিকার সম্পাদক মণ্ডলী, যারা আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন, সবার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরবর্তী সংখ্যাগুলিতেও আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা কামনা করছি। আত্মদীপের পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশিত হবে

বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য (সম্পাদক)
আজিজুল সেখ (সহ-সম্পাদক)

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 867-873
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.078

রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসে আদিবাসী সমাজ : একটি সমীক্ষা

অঞ্জন পাল, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, লামডিং কলেজ, লামডিং, আসাম, ভারত*

Received: 17.03.2025; Send for Revised: 18.03.2025; Revised Received: 20.03.2025; Accepted: 22.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Literature is the mirror of society. Therefore, different aspects of society are always highlighted by different writers in literature. Ramapada Chowdhury was one such a notable writer of Bengali literature who had highlighted various aspects of society such as human values, despair, crisis etc. in his works. He was basically personification of the middle class, yet he did not forget to describe to the so-called lower class such as indigenous people (Adivasi) of the society. Although he appeared in Bengali literature as a short story writer, he also gained considerable fame as novelist. In fact, he had thoroughly discussed the issues of lower class, middle class, position of women in society etc. in his fiction. Ramapada Chowdhury (28.12.1922 – 29.07.2018) was born in Kharagpur West Bengal. His father was Taraprasanna Chowdhury and mother Durgasundari Devi. His father worked in the railways and thus the family often moved from one place to another. That is why he had the opportunity to expose the life of several deferent parts of India. Moreover, during his childhood period Ramapada with his friends in the evening often moved to nearby villages to observe the lifestyle of Adivasi people. In the article I will try to discuss on three novels (Dwiper Nam Tia rang, Aranya Adim, Dubsantar) of Ramapada Chowdhury, where he has exposed the life of indigenous communities.

Keywords*: Indigenous community, Subaltern people, Lifestyle, Culture, Colonialism, Middle class, Fiction.*

বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম রূপকার রমাপদ চৌধুরী (২৮.১২.১৯২২-২৯.০৭.২০১৮)। মূলত: মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রূপকার হিসেবে বাংলা সাহিত্যে রমাপদ চৌধুরী পরিচিতি লাভ করলেও তাঁর ছোট গল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে আমরা অন্ত্যজ-আদিবাসী-কোলিয়ারিদের জীবনচিত্র খুঁজে পাই। শৈশবকালে খড়্গপুরে থাকাকালীন এবং পরবর্তীতে কোলিয়ারিতে কাজ করার সূত্রে তিনি আদিবাসী জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন। খড়্গপুরে থাকা কালীন লেখক ও তাঁর কয়েক বন্ধু মিলে প্রায়সময়ই শহর থেকে অনেক দূরে গ্রাম্য প্রকৃতি উপভোগ করতে সাইকেল চালিয়ে ছুটে যেতেন। কখনো কখনো চলে যেতেন দূরে ছোট্ট সাঁওতাল পল্লীতে সেখান কার আদিবাসীদের জীবন যাপন দেখতে। ‘লেখালেখি’ নামক স্মৃতিকথায় লেখক উল্লেখ করেছেন –

> “ট্যাংরার হাটের পাশেই তখন একটা ছোট্ট সাঁওতাল পল্লী ছিল। শাল কাঠির দেওয়ালে মাটি লেপা আর হোগলার ছাউনি দেওয়া। কিন্তু কী সুন্দর ছিমছাম। তকতকে উঠোন মাঝখানটায়, আর চারপাশে ঘরগুলো! উঠোনে মোরগ মুরগি চরত, মোরগগুলো যাত্রাদলের দাম্ভিক রাজার মতো

> ধীরে ধীরে পা ফেলে হাঁটতো আর মাঝে মাঝে ডাক ছাড়ত। সাঁওতাল মেয়েপুরুষ বাচ্চার দলকে বেশ লাগত আমার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কখনও সাইকেলটা গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে রেখে চবুতরার ঢেঁকিতে বসে বসে দেখতাম তাদের। কী নিটোল স্বাস্থ্য পুরুষগুলোর। ঝাকড়াঁ- ঝাকড়াঁ বাবরি চুল। মেয়েদের গাল আর কপাল থেকে যেন তেল গড়িয়ে পড়ছে, হাত-পা যেমন সুডোল তেমনি চকচকে। কিন্তু আমাদের বয়সী বাচ্চাগুলোকেই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগত। কেমন মোলায়েম চেহারা, টানা টানা ঠান্ডা চোখ, আর আমাদের দিকে তাকাত যেন ভয়ে ভয়ে। ছেলেগুলোর হাতে সবসময়ই হয় তীরধনুক, নয়তো বাঁশি।"[১]

বাবা তারা প্রসন্ন চৌধুরীর চাকরির সুবাদে রাঁচী, হাজারিবাগ, রায়পুর, বিলাসপুর বিশাখাপত্তনম, গোয়া, গোলকুন্ডা, উদয়পুর ইত্যাদি বহু জায়গার সঙ্গে রমাপদ চৌধুরীর অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটেছিল। এছাড়াও ভ্রমণ পিপাসু রমাপদ চৌধুরী দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন রাঁচী, পালামৌ, হাজারিবাগ ইত্যাদি আদিবাসী জনবসতিপূর্ণ অঞ্চলে। খুব কাছ থেকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মুন্ডা, ওরাং, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী জন জীবনকে। তাদের প্রাত্যহিক জীবন, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি রূপ পেয়েছে তাঁর আদিবাসী জীবননির্ভর গল্পগুলোতে। তাঁর প্রথম দিকের গল্পগুলোতে আদিবাসী অন্ত্যজ কোলিয়ারি জীবন ফিরে ফিরে এসেছে।

আদিম অধিবাসীদের অনাড়ম্বর জীবনধারাকে কেন্দ্র করে রচিত রমাপদ চৌধুরীর বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' (১৯৫৭)। উপন্যাসটির উৎস হিসেবে ঔপন্যাসিক একটি পুরনো ইংরেজি সংবাদপত্রে প্রকাশিত ঘটনার উল্লেখ করেছেন। উপন্যাসটিতে আদিম কৌমধারার সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দ্বন্দ্বের দিকটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে কর্মচ্যুত দ্বীপের মানুষের জীবনকে নতুন করে গড়ে তোলার কথা। জনজাতি অধ্যুষিত দ্বীপের মানুষের জন্য সাহেব কোম্পানি বাণিজ্যের হাত বাড়িয়ে দিল। এরপর শুরু হল অরণ্য ধ্বংস এবং বণিকের মুনাফা বৃদ্ধির ফলে দ্বীপের অরণ্যবাসী মানুষেরা পরিণত হল শোষিত শ্রমিকে।

টিয়ারঙের অধিবাসীদের জীবন যাপন সাধারণমানের। তারা প্রায় সকলেই স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে ডিঙ্গি নৌকায় মাছ ধরে, চাষবাস করে, নারকেল পাতার ছাউনি দিয়ে ঘরবাড়ি বানায়, মদ চোলাই করে। কেউ কেউ আবার ক্ষুদ্র ব্যবসা করে, নারকেলের ছোবড়া দিয়ে দড়ি তৈরি করে, ঝিনুক, শামুক, শঙ্খ পুড়িয়ে কলিচুন প্রস্তুত করে এবং তা গঞ্জে গিয়ে বিক্রি করে। টিয়ারঙের অধিবাসীদের জীবনেও একসময় আধুনিকতার স্পর্শ লাগে। কাঠের ব্যবসা করার জন্য স্টিফেন্স কোম্পানির স্টিমার এসে নোঙর ফেলে টিয়ারঙের দ্বীপে। স্টিমার থেকে একে একে নেমে আসেন গোড়াসাহেব চ্যাটার্জিবাবু এবং আরো অনেকে। সারাদিন ঘোরাঘুরি করে তাঁরা দেখে নেন টিয়ারঙ দ্বীপকে, দ্বীপের বড় বড় মূল্যবান গাছ কেটে ব্যবসা করার সংকল্প করেন। গভীর কৌতূহলবশত টিয়ারঙের অধিবাসীরা তাঁদের সামনে এসে জড়ো হয়। গোরাসাহেব দ্বীপের বাচ্চা ছেলে মেয়েদের লজেন্স-বিস্কুট খেতে দেন, মেয়েদের কাঁচের জলচুড়ি উপহার দেন, জোয়ান পুরুষ মরদদের দিকে মুঠো মুঠো পয়সা ছড়িয়ে দেন। গোরা সাহেবের এই আন্তরিকতায় টিয়ারঙের অধিবাসীরা সকলেই মুগ্ধ হয় এবং তাঁর দলবল আন্তরিকতা দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই টিয়ারঙের অধিবাসীদের মন জয় করে নেয়। কিছুদিনের মধ্যেই টিয়ারঙ একটি ক্ষুদ্র শহরে পরিণত হয়ে যায়। স্টিফেন্স কোম্পানির কাজকর্ম দেখাশোনার চাকরি নিয়ে উপস্থিত হন স্ত্রী ও শালিকা সহ চ্যাটার্জিবাবু, অমিয়বাবু এবং তাঁর বেকার ভাই সৌমেন। সৌমেন শিক্ষিত বেকার ছেলে, সে দাদার সঙ্গে এসেছে একটি চাকরির সন্ধানে। শহুরে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির আগমনের ফলে আদিবাসী জনজীবনে বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়।

স্টিফেন্স কোম্পানির আগমনের পর টিয়ারঙীদের আদিম গতানুগতিক নিস্তরঙ্গ জীবনে রোমাঞ্চ লাগে। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই স্টিফেন্স কোম্পানির অধীনে শ্রমিকের কাজ পেয়ে যায়। পরিবর্তনের ঢেউ খেলে যায় তাদের জীবনে, টিয়ারঙ দ্বীপের আর্থসামাজিক পরিস্থিতিও বদলে যেতে থাকে-

> "দিনে দিনে তৈরি হল স্টিমারঘাটা। ছোট ছোট কুঠরি তৈরি হল কয়েক সারি কুলিকামিন, মাল টানার যন্ত্রপাতি সব এসে পৌঁছাল। একটা ভাল দোকানও খুলে ফেলল ব্রিজলাল। একদিকে মদের দোকান, অন্য দিকে মনোহারী থেকে তৈজসপত্র সবকিছু।"[২]

স্বামীহারা ফিরুজার মনেও আনন্দের দোলা লাগে। ফিরুজা মদনাকে ভালোবাসে। সে চ্যাটার্জিবাবুর শ্যালিকা তামসীর কাছ থেকে চেয়ে তাই গায়ে আতর মাখে। শহুরে তামসীর মতোই সে সুন্দরী হয়ে ওঠার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে থাকে। প্রেমিক মদনার কাছে নিজেকে আরও সুন্দরী করে তোলার জন্য ফিরুজার চেষ্টার যেন বিরাম নেই। কোম্পানির কাজ করে সে যা মজুরি পায় তার থেকে পয়সা বাঁচিয়ে জলে ভাসা সাবান কেনে। একদিন লোভ সংবরণ করতে না পেরে তামসীর দামি সিল্কের শাড়ি চুরি করে বসে। পরে অবশ্য সে মদিনার আপত্তিতে স্টিফেন্স কোম্পানির এল.ডব্লিউ.ও সমীরণের কাছে গিয়ে ওই শাড়িটি ফেরত দিয়ে দেয়। টিয়ারঙের অধিবাসীদের সঙ্গে ডিফেন্স কোম্পানির প্রথম দ্বন্দ্ব বাঁধে আগুনিয়া পর্বকে কেন্দ্র করে।

> "'আগুনিয়া' টিয়ারঙ অধিবাসীদের বহুদিনের পরব, টিয়ারঙের ধর্ম। এ সময়টায় বনের একটা অংশ বেছে নিয়ে খরগোশ বলি দিয়ে পুজো হয় প্রতি বছর। নির্দিষ্ট এলাকার চারপাশে খুঁটি গেড়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় গাছে গাছে। দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে আগুন, লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে।"[৩]

টিয়ারঙীদের পর্বের ধরন দেখে বিস্মৃত, স্তম্বিত হয়ে যান চ্যাটার্জিবাবু, অমিয়বাবু থেকে শুরু করে স্টিফেন্স কোম্পানির সকল কর্মচারী –

> "একি করতে চলেছে এরা? দামী দামী গাছে এইভাবে আগুন লাগিয়ে নষ্ট করতে চায়? সমস্ত বন যে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। লক্ষ লক্ষ টাকা মুনাফার স্বপ্ন দেখে কোম্পানি-মহলের পত্তন করেছে স্টিফেন সাহেব, গ্যাংয়ের বানিয়েছে, বাংলো গড়েছে। যার লোভে ছুটে এসেছে তারা সেই বন পুড়িয়ে নষ্ট করতে চায় টিয়ারঙের অধিবাসীরা?"[৪]

এই দৃশ্য দেখে চ্যাটার্জিবাবু টিয়ারঙীদের এভাবে গাছে আগুন লাগাতে বারণ করেন। কিন্তু টিয়ারঙীদের সর্দার মাধো কোলাসো চ্যাটার্জিবাবুর এই নিষেধ মানতে নারাজ। মাধো সর্দার টিয়ারঙীদের আদেশ করেন বনের গাছে আগুন লাগিয়ে দিতে আর চ্যাটার্জিবাবু সঙ্গে সঙ্গে মাধো কোলাসোর বুকে গুলি চালিয়ে দিলেন। বুকে হাত দিয়ে আর্তনাদ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মাধো। এই ঘটনার পর সমস্ত টিয়ারঙীরা ভয় পেয়ে প্রাণ থাকতে থাকতে পালিয়ে গেল উৎসবের জায়গা থেকে। মাগো কোলাসোর হত্যার পর যেমন প্রতিক্রিয়া হওয়াটা উচিত ছিল, টিয়ারঙে তেমন কিছুই হল না। কোম্পানির কাজ পেয়ে টিয়ারঙীরা নতুন ধরনের জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কোম্পানির সাথে বিবাদ করলে রুজি-রুটিতে টান পড়বে। তাই তারা গত রাতের কথা ভুলে গিয়ে পরের দিন সকলেই কাজে হাজির হয়। শুধু মাধো কোলাসোর মেয়ে আকাশীর মনের মধ্যে একটা চাপা প্রতিশোধস্পৃহা চলতে থাকে। উপন্যাসের শেষে তাই আকাশীর হাতেই প্রাণ হারাতে হয়েছে চ্যাটার্জিকে।

'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' উপন্যাসটিতে বড় হয়ে উঠেছে আদিম এক বিশেষ শ্রেণির জনগোষ্ঠীর কৌম জীবনধারার সঙ্গে আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার দ্বন্দ্ব। ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদেরই অধীনে বেশ বড় মাপের চাকরি পেয়ে শিক্ষিত বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির একটা অংশ কেমন উন্নাসিক হয়ে উঠেছিল 'দ্বীপের নাম টিয়ারঙ' উপন্যাসের চ্যাটার্জিবাবু তারই আদর্শ দৃষ্টান্ত। পরবের নামে টিয়ারঙীদের বনজ সম্পদ ধ্বংস করা মোটেও সমর্থনযোগ্য নয়, কিন্তু তবুও এ কথা মেনে নিতে কোন অসুবিধা নেই যে মাধো কোলাসোকে গুলি করে মারার মধ্যে কোম্পানির চাকুরে চ্যাটার্জিরবাবুর কোম্পানির স্বার্থ রক্ষার ইচ্ছারই প্রকাশ ঘটেছে। চ্যাটার্জিবাবু, অমিয়বাবুর কাছে মাধো কোলাসো মারা যাওয়া একটি ছোট্ট ঘটনা মাত্র। তাই কোম্পানির ওভারসিয়ার পাঠকবাবু মাধো কোলাসোর হত্যার ঘটনাটি স্টিফেন্স কোম্পানির সাহেবকে জানানোর জন্য পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু অমিয়বাবু এই পরামর্শে কর্ণপাত না করে বলেন "না, না এসব ছোটখাটো খবর স্টিফেন্স সাহেবকে জানিয়ে কি হবে। ও সব ঠিক হয়ে যাবে দু-দিন গেলেই।"[৫] এখানে চ্যাটার্জিবাবু, অমিয়বাবু এঁরা মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতীভু। তাই কোম্পানির স্বার্থ দেখতে গিয়ে মাধো কোলাসোর মতো একটি আদিবাসী অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষকে হত্যা করার মধ্যে তাঁরা কোনো অন্যায় দেখতে পান না। মাধো কোলাসোর মতো মানুষ এঁদের কাছে পশুতুল্য। শহুরে তথাকথিত শিক্ষিত উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষরা আদিবাসী অন্ত্যজ সমাজের মানুষদের কী চোখে দেখে তা এই উপন্যাস পাঠে আমরা বুঝতে পারি।

আদিবাসী জীবনকে কেন্দ্র করে রচিত রামাপদ চৌধুরীর অপর উপন্যাস হচ্ছে 'অরণ্য আদিম'। প্রকাশকালের দিক থেকে না হলেও রচনাকালের দিক থেকে এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। ১৯৫৮ সালে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি রচনার পটভূমি হিসেবে লেখক উল্লেখ করেছেন–

> "সভ্য মানুষের পৃথিবীতে তখন ঊনবিংশ আর বিংশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যন্ত্রযুগের অভিনন্দন-শঙ্খ বেজে উঠেছে। ভারতবর্ষের আকাশে তখন নিষ্প্রভ হয়ে গেছে মোগল রাত্রির শেষ শুকতারা পাশ্চাত্যের যন্ত্রমূর্ছনার কাছে প্লান হয়ে গেছে হারেমের রূপকণ্ঠির সুরগুঞ্জন। শাসন শোষণ খরস্রোতের অন্তরালে দেখা দিয়েছে এক নতুন জাগরণ।"[৬]

সভ্যতার আলো দেখে নি এরা। এহেন সমাজের মানুষদের কাজ ছিল জঙ্গল পরিষ্কার করা, পাথুরে মাটিতে কায়িক শ্রমিকের দ্বারা ধান, জেনার ফলানো। তাদের সমাজরীতি স্বশাসিত ও স্বনির্বাচিত। তারা রাজার খাজনা না দিয়ে রাজার হাতে তুলে দিয়েছে কায়িক পরিশ্রমে গড়ে তোলা কয়েক টুকরো জমি। তারা জন মানবহীন জায়গায় শত্রুর হাত থেকে রক্ষা পেতে নিজেদের সভ্য জীবন থেকে সরিয়ে রাখত। অথচ আদিম অরণ্যচর লক্ষ লক্ষ মানুষ বন পুড়িয়ে জল ছিটিয়ে বীজ ঝরিয়ে ফসল ফলিয়েছে, গ্রাম বেধেছে সুখে। তারপর জমিদারের চোখ পড়েছে সে জমির উপর, চেয়েছে খাজনা। তারা খাজনা দেওয়া নাম শুনে গ্রাম থেকে পালিয়ে গেছে। অন্যত্র গিয়ে আবার গাসি মুন্ডার হুকুমে দীঘি পত্তন করেছে। নতুন ডিহির নাম হয়েছে গাসি মুন্ডার বউয়ের নামে।

> "গাসি মুন্ডার ঘর-গমকে অর্থাৎ গৃহিণী লাপ ডির নাম থেকে আস্তানাটার নাম হোক 'লাপরা'।"[৭]

গ্রাম্য দেবতা সেরমা চাঁদোর স্বপ্ন নিয়ে সর্দার গাসি মুন্ডার আদেশে বুড়ো বটগাছটার নিচে প্রতিষ্ঠা করেছে মুন্ডাদের ভগবানকে।

সারনায় ভগবান প্রতিষ্ঠা করার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠা করে। পঞ্চায়েত শাসনকে তারা কেউই উপেক্ষা করতে পারে না। তাদের অন্ধবিশ্বাস পঞ্চায়েত শাসন ও খাসি মুন্ডার নির্দেশ অমান্য করা পাপ- আদিম বনচর মানুষরা, তাই বিশ্বাস করে। তাই সমস্ত বিরুদ্ধ শক্তিকে তাদের বিষাক্ত তীরের জোরে প্রতিরোধ করে একজোট হয়ে। কিন্তু তাদের সমাজেও আছে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ক্ষমতার লোভ। তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায় কাঠিদার (গ্রামপ্রধান) নির্বাচনকে ঘিরে। পাঁচ গ্রামের নেতা পানা মানকির সঙ্গে দলের সর্দার পঞ্চায়েত প্রধান গাসি মুন্ডার মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। পানা মানকির নির্দেশ মত আকুমের নাম বাদ দিয়ে গাসি মুন্ডার মনোমতো উধম বুড়াকে কাঠিদার নির্বাচন করা হলে তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গ্রাম্য রাজনীতি। তাই জারার উৎসবে অংশ নেয়নি পানা মানকি। গাসি মুন্ডার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের আগুন ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে আকুম সুখনের মাধ্যমে। পঞ্চায়েত অপমানের জবাব দিতে চায় সুখেনকে উত্তেজিত করে। গাসি মুন্ডার সম্মান মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে তার মেয়ে রাঙ্গিনাকে প্রেম প্রস্তাবের জন্য মানকি প্ররোচিত করে সুখনকে। রাঙিনা সুখনের প্রেম-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলে মানকি সুখনকে বলেছে,

> "তুই একটা না মরদ জবাব দেবার পারলি নাই।"[৮]

সুখন বলে রাঙিনার কোমল মুখটার দিকে তাকালেই তার মনটা নরম হয়ে যায়। তাই সে রাঙিনাকে কিছু বলতে পারেনা। তখন পানা মানকি সুখনকে মেয়েদের বশ করার মন্ত্র বলে–

> "জবরদস্তি ধরম নষ্ট করতে হবে রাঙিনার। তারপর তার কাপড়টা কাড়ে এনে জ্বালায় এনে দিতে হবে সসানদিরির উপরে।"[৯]

পরিদের সত্য মিথ্যা গল্প শুনিয়ে সুখনকে দিয়ে গাসি মুন্ডার সামাজিক শাসনে কালি লাগাতে চেয়েছে মানকি। মানকি নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে গাসি মুন্ডার বিরুদ্ধে। আদিবাসী সমাজে এই গ্রাম্য দলাদলির পাশাপাশি তাদের জীবন নানা সংস্কার ও বিশ্বাসে পূর্ণ তাদের উৎসব ধর্মাচরণ বিশ্বাস সংস্কার এর খুঁটিনাটি নানান পরিচয় পাওয়া যায়। সেরমা চাঁদোর দেওয়া জমি জল তাদের জীবনের রসদ। মোরগ বলি দেয়, নতুন দিহিতে গাঁও দেহাতি সারানাকে প্রতিষ্ঠা করে বন পুড়িয়ে শুরু হয় জারার নৃত্য গান। জঙ্গল সাফ করে চাষাবাদই তাদের রীতি, ধর্ম। হিন্দুদের মত নাহাল অর্থাৎ লাঙ্গল চালিয়ে চাস তাদের ধর্মবিরুদ্ধ।

"এতদিন তারা শুধু ক্ষেতি বানিয়েছে বন পুড়িয়ে, তারপর বসে বসে হাতে মাটির ঢেলা ভেঙেছে, সার দিয়েছে। কিন্তু নাহাল চালায় নি।"[১০]

যুগ যুগ ধরে লালিত অনার্য সংস্কার বিশ্বাসে ভাঙ্গন ধারায় আধুনিক সভ্যতার যন্ত্রজাগরণ। এই বন্য পরিবেশেই মানকি প্রথম যন্ত্রের আগমন ঘটায়। পরিবর্তিত হয়ে যায় তাদের স্বনির্বাচিত গ্রামীণ জীবন। লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা যাদের কাছে একদিন সমাজবিরুদ্ধ ছিল এই মানকি অভিশপ্ত ক্ষেতে লাঙ্গল চালিয়ে সোনার ফসল ভরিয়ে দিয়েছে। মেনে নিয়েছে যন্ত্রের সুফল। যন্ত্রের পর যন্ত্র যখন লাপড়ার কিছু দূরে কয়লাখনির সন্ধানে ব্যস্ত তখন কিছুক্ষণের জন্য যন্ত্রকে অভিশাপ মনে হলেও পরমুহূর্তে তাদের আপন অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্যে জীবিকার উদ্দেশ্য সেই বিশ্বাস ভাঙতে থাকে।

"ধীরে ধীরে নতুন করে জেগে উঠলো লাপরার কোলিয়ারী।"[১১]

এই যন্ত্রসভ্যতা তাদেরকে যেমন দিয়েছে অর্থ তেমনি কেড়ে নিয়েছে তাদের সারল্য, তাদের বিশ্বাস, তাদের সংস্কার। তাই আদিম অধিবাসীদের কাছে যন্ত্রসভ্যতা হচ্ছে বিষাক্ত সভ্যতা। আদিবাসী সমাজের যে নিয়ম-নীতি, আচার-নিষ্ঠা একুশ শতকের প্রযুক্তিবিদ্যার যুগে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এ কথা মানতেই হবে তারাই বাঁচিয়ে রেখেছিল অরণ্যের আদিমতাকে।

১৩৯৯ বঙ্গাব্দে 'শারদীয় দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ডুবসাঁতার' উপন্যাসটিতে লেখক রমাপদ চৌধুরী মূলত দুই প্রজন্মের মূল্যবোধের পার্থক্যের বিষয়টির প্রতি আলোকপাত করেছেন। কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করা দুর্গাপ্রসাদ বাবুর সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের মানসিকতার পরিবর্তন এখানে ফুটে উঠেছে। এই মূল কাহিনির পাশাপাশি সুনির্মল-নন্দিতা-অনুপম, বকুল-অনিন্দিতা, অভিজিৎ-ঊর্মিলা-শান্তনু এবং সবশেষে অবহেলিত এক আদিবাসী বালকের উপকাহিনি স্থান পেয়েছে। সুনির্মল, বকুল, অভিজিৎ সবাই নিজের সন্তানদের নিয়ে ব্যস্ত। সন্তানদের বড় করার তাগিদে তারা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে প্রতিটি মা-বাবা চাইছে তাদের সন্তানই যেন প্রত্যেক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করে। এটা যেন একটা যুদ্ধ জয় করার মতো। এই আলোচনার পাশাপাশি ঔপন্যাসিক এক আদিবাসী অনাথ বালক জোশেফ সরেনের প্রসঙ্গ নিয়ে এলেন। সুনির্মল, বকুল, অভিজিৎ-এর সন্তানরা যে স্কুলে পড়ে জোশেফও সেই একই স্কুলের ছাত্র। তবে ক্লাসে জোশেফদের স্থান হয় একেবারে শেষ বেঞ্চে। ক্লাসের অন্যান্য ছাত্র ছাত্রীদের এদের প্রতি যেমন আগ্রহ নেই, তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকার কাছেও এরা উপেক্ষিত। উপন্যাসের কাহিনিসূত্রে জানা যায় জোশেফ এই স্কুলে পড়ার সুযোগ পেয়েছিল কেবল ছোটনাগপুরের জনৈক পাদ্রীর জন্য। স্কুলের যখন ভগ্নদশা তখন সেই পাদ্রী কিছু ডোনেশন জোগাড় করে স্কুলটিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এবং শর্ত রেখেছিলেন আদিবাসী ছেলেমেয়েদের জন্য প্রতি ক্লাসে একটি করে সিট রিজার্ভ রাখতে হবে। ওরা সেখানে বিনা পয়সায় পড়বে এবং স্কুল বোর্ডিং-এ থাকবে। জোশেফ সরেন সেরকম এক ছাত্র।

পুজোর সময় প্রায় একমাস স্কুল ছুটি। অভিজাত ঘরের ছেলেমেয়েরা এই সময় বাবা মা'র সাথে দূরে কোথাও বেড়াতে যায়। কিন্তু আদিবাসী এই ছেলেটিকে পুজোর ছুটিতেও স্কুলের বোর্ডিং হাউসেই থাকতে হয়। সেদিন ছিল বিজয়া দশমী। গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে জোশেফ প্রতিমা বিসর্জন দেখছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি নৌকা থেকে একটি বালক পড়ে যায়। ডুবন্ত এই বালকটিকে উদ্ধার করবার জন্য কাউকেই জলে ঝাপিয়ে পড়তে দেখা যায় না। একজন মাঝি জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেও সে খুঁজে পেল না বাচ্চাটিকে। শেষ অবধি জোশেফ কোনো কিছু না ভেবেই জলে ঝাপিয়ে পড়ে। বারবার ডুবসাঁতার দিয়ে খুঁজতে খুঁজতে সে ডুবে যাওয়া বাচ্চাটিকে খুঁজে পায় এবং টানতে টানতে তাকে নদীর কিনারায় নিয়ে আসে। একটি দশ বছরের ছেলেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো বারো বছর বয়সের কলোকুলো এক তুচ্ছ আদিবাসী বালক। পরের দিন জোশেফেরে সাহসিকতার খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পরল। যে জোশেফ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছেও উপেক্ষিত ছিল, সেই স্কুলের হেডমিস্ট্রেস এখন বলছেন –

"আমাদের স্কুলের গর্ব, 'এতদিনে সত্যি সত্যি গর্ব করার মত কিছু করেছে এই স্কুলেরই একজন'।"[১২]

জোশেফের এই দুঃসাহসিক কর্মের জন্য তাকে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হবে। দিল্লি নিয়ে গিয়ে জোশেফের মতো আরও দশ-বারোজন ছেলেকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। নন্দিতা-তনু-বকুল-উর্মিলা যখন নিজেদের সন্তানকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল সেই সময় জোশেফের এই সংবাদ তাদেরকেও আনন্দিত করে। সেই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতির

বক্তৃতার শেষ বাক্যটি ছিল "দ্য নোবলেস্ট ম্যান ইজ হি হু সেভস দ্য লাইফ অফ অ্যানাদার ম্যান।"[১৩] এতক্ষণ পর্যন্ত একের সন্তানের সাফল্য অন্যের ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক সাধারন আদিবাসী অবহেলিত বালক জোশেফের সাফল্য তাদের সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল সন্তানের উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের থেকে অনেক বড় গর্বের বিষয় মানবিক মূল্যবোধ।

সমাজে এই অবহেলিত আদিবাসী সমাজের প্রতি উচ্চবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানসিকতার ছবি যেমন এই উপন্যাসে ফুটে উঠেছে তেমনি সহজ-সরল এক আদিবাসী বালকের জীবনকে তুচ্ছ করে পরোপকার করার মনোবৃত্তিও পরিলক্ষিত হয়। তার উপকার করার মনোবৃত্তির জন্যই উপন্যাস শেষে সকলে জোশেফ সরেনের কৃতিত্বে গর্ববোধ করেছে। রাতারাতি সে হয়ে উঠেছে 'আমাদের জোশেফ সরেন'। তাই উপন্যাসের প্রসঙ্গ কথায় লেখক জানিয়েছেন-

> "চুনী কোটালের দেশে এ ঘটনাও ঘটে, যদি সে গর্ব এনে দেয়। স্কুলের কিংবা দেশের। তেনজিং যখন এভারেস্ট আরোহন করে তখন 'আমাদের তেনজিং'। তীরন্দাজ লিম্বারাম অলিম্পিকে যদি সোনা আনতে পারত তা হলে হয়ে উঠত 'আমাদের লিম্বারাম'।"[১৪]

উপসংহার: আদিবাসী সমাজকে কেন্দ্র করে রচিত রমাপদ চৌধুরীর উপন্যাসগুলোয় আদিবাসী মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং তাদের দুঃখ কষ্টের কাহিনি প্রতিফলিত হয়েছে। ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে উচ্চবিত্তের আগ্রাসনের ফলে প্রান্তিক মানুষদের ভূমি বেদখল, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শোষনের ছবিও ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন। অন্ত্যজ-আদিবাসীকেন্দ্রিক এই উপন্যাসগুলো বিশ্লেষণে তাদের সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার আদিবাসীন্দা যারা তারাই উচ্চবর্গীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রতিনিয়ত অবহেলিত হচ্ছে, যার ফলে সভ্যতার আলো তাদের কাছে দুর অস্ত, প্রকৃতির সঙ্গে নিহত সংগ্রাম করে অনাহারে, অর্ধাহারে তাদের জীবন কাটে। উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে প্রাচীন সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসে তাদের জীবন বাঁধা। উপন্যাসগুলো পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে আদিবাসী সমাজের ধর্মীয় বিশ্বাস, তাদের অনুষ্ঠান এবং সংস্কৃতির পাশাপাশি তাদের আর্থসামাজিক দিকটিও উদ্ঘাটনের প্রয়াস করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) চৌধুরী, রমাপদ, গদ্য সংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১১, পৃষ্ঠা- ১৩২-১৩৩।
২) চৌধুরী, রমাপদ, দ্বীপের নাম টিয়ারঙ, উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ- ১৩৯৫, পৃষ্ঠা- ৬৭।
৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৭০।
৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৭০।
৫) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৭০।
৬) চৌধুরী, রমাপদ, অরণ্য আদিম, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা- ০৬, প্রথম প্রকাশ- ১৩৬৪, পৃষ্ঠা- ০১।
৭) তদেব, পৃষ্ঠা- ০৭।
৮) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩০।
৯) তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১।
১০) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫৬।
১১) তদেব, পৃষ্ঠা- ৭০।
১২) চৌধুরী, রমাপদ, ডুবসাঁতার, উপন্যাস সমগ্র (পঞ্চম খণ্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ- ১৯৯৪, পৃষ্ঠা- ৫০৬।
১৩) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫০৭।
১৪) তদেব, পৃষ্ঠা- ৫১৮।

সহায়ক গ্রন্থ:

১) অধিকারী, নীহার শুভ্র, গল্পের ভুবন রমাপদ চৌধুরী, পুনশ্চ, কলকাতা- ১০, প্রথম প্রকাশ- ২০১৮।

২) ঘোষাল, শুক্লা (সম্পাদনা), বঙ্গে নারী নির্যাতন ও নারীর উত্থান, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ- ২০১১।
৩) চৌধুরী, রমাপদ, উপন্যাস সমগ্র (দ্বিতীয় খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ- ১৩৯৫।
৪) চৌধুরী, রমাপদ, উপন্যাস সমগ্র (পঞ্চম খন্ড), আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ- ১৯৯৪।
৫) চৌধুরী, রমাপদ, অরণ্য আদিম, ডি. এম.লাইব্রেরী, কলকাতা -০৬, প্রথম প্রকাশ- ১৩৬৪।
৬) চৌধুরী, রমাপদ, গদ্য সংগ্রহ, এবং মুশায়েরা, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১১ ।
৭) চৌধুরী, শম্পা , রমাপদ চৌধুরীর কথাশিল্প, এবং মুশায়েরা, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১০।
৮) দেব, দূর্বা, সাহিত্যে নারী নির্মাণ ও নৈপুণ্যে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ- ২০১৭।
৯) পাল, মৌসুমী, রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প: বিষয় ও রূপরীতি, অক্ষর পাবলিকেশানস্, ত্রিপুরা- ০১, প্রথম প্রকাশ- ২০১৫।
১০) পুরকাইত, উত্তম (সম্পাদনা), রমাপদ চৌধুরী বৈচিত্র ও অনুসন্ধান, উজাগর প্রকাশন, কলকাতা -০৯, প্রথম প্রকাশ- ২০১৯।
১১) বন্দোপাধ্যায়, রুমা, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের অবস্থান, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলকাতা- ০৯, প্রথম প্রকাশ - ২০২৩।
১২) ভট্টাচার্য, সুকুমারী, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা - ০৯, প্রথম সংস্করণ- ১৩৯৪।
১৩) ভদ্র গৌতম ও চট্টোপাধ্যায় পার্থ (সম্পাদনা), নিম্নবর্গের ইতিহাস, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা- ০৯, প্রথম সংস্করণ- ১৯৯৮।
১৪) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের প্রতিমা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ- ১৯৭৪।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 874-881
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.079

কল্যাণী ভট্টাচার্যের উপন্যাসে নারী পরিসর: একটি বিশ্লেষণাত্মক পাঠ

রুমি দেব, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 18.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

21st century is the age of technology- science- art- modernity- ultra modernity. Social civilization is rapidly advancing on the path of super ultra-modernity. The environment, people, people's thoughts, values, views and the entire society are changing with the civilization. The reflection and influence of this changing society is also observed in literature. The novel world of Bengali literature of Tripura is not so different from it. The novelists of Tripura acknowledge the influence of the contemporary era and bring out the civilization-society-time in their literary works. In their novels, sometimes the present is picturised, sometimes the images of the past are visualized through reminiscences. Sometime the story of happiness, sorrow and painful or happy journey of life of a particular gender is also symbolized in literature. In this article, an effort has been made to highlight how the position of women has changed in the ever-changing context of Tripura in the light of the novel 'Langtarai Queen' written by Kalyani Bhattacharya, one of Tripura's eminent novelists. In Kalyani Bhattacharya's work, the position of women in the contemporary social, political and economic context is well presented. The novel narrates the lives of three generations of Bengali women in Tripura after its accession to India as a state after independence. Besides, the suffering and helplessness of the women of the royal family of Tripura have been skilfully blossomed in the novel. No matter how modern we are, women are still trapped in the cage of patriarchy behind modernity. Novelist Kalyani Bhattacharya has presented the stories of these captives in her novel in her own style. Kalyani Bhattacharya, a modern-minded writer, left time behind and tried to paint a picture of the future in the novel. Various aspects of women's life have come up in the novel in a simple manner. All these issues are tried to explain and analyse in this article.

Keywords: *21st century, Society, Patriarchy, women, modernity, self-crisis, Tripura.*

একুশ শতক সর্বতোভাবেই প্রযুক্তি-বিজ্ঞান-শিল্প-আধুনিকতার যুগ। দ্রুতগতিতে সমাজ-সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে অত্যাধুনিকতার পথে। সভ্যতার সাথে তাল মিলিয়ে বদলে যাচ্ছে পরিবেশ, মানুষ, মানুষের ভাবনাচিন্তা, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি তথা সমগ্র সমাজ। এই পরিবর্তনশীল সমাজের প্রতিচ্ছবি ও প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে সাহিত্যে। বিশ শতকে সমস্ত বিশ্ব জুড়ে যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অস্থিরতা কাজ করছিল একুশ শতকে তা খানিকটা স্তিমিত। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বাধীন ভারতের নবরূপে প্রকাশ, বিশ্ব রাজনীতি ও অর্থনীতিতে বিশেষ অংশগ্রহণ, শিল্প ও প্রযুক্তিতে ক্রমগ্রসরতা, শিক্ষাক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তন এবং সামাজিক ক্ষেত্রে বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা অর্জন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য সমস্ত বিষয় প্রত্যেক ভারতবাসীর জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে। এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয় সাহিত্যক্ষেত্রও। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্য জীবনকে শৈল্পিকরূপে প্রকাশ করে বলে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বাস্তব জীবনকে ভিন্ন রূপে, মাত্রায়, আঙ্গিকে উপস্থাপিত হতে দেখা যায়। বাংলা সাহিত্যও এর ব্যতিক্রম নয়। ভারতের উত্তর-পূর্ব অংশে

অবস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যটি এক্ষেত্রে স্বাতন্ত্রের দাবি রাখে। বিভিন্ন জাতি-জনজাতির মিশ্রণে গঠিত এই রাজ্যে রয়েছে বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও জীবনশৈলী। আনুমানিক ৫০০ বছর ধরে স্বাধীন ত্রিপুরায় বাংলা ভাষা রাজভাষার সম্মান পেয়ে আসছে। রচিত হয়েছে বহু বাংলা কাব্যগ্রন্থ, ইতিহাস, গদ্য ইত্যাদি। স্বাধীন ভারতবর্ষের সাথে অঙ্গরাজ্য হিসেবে যুক্ত হবার পর ত্রিপুরার শাসনব্যবস্থাসহ সমস্ত ক্ষেত্রে এসেছে বিপুল পরিবর্তন। জনসাধারণের যাপনচর্চায় এসেছে নতুন মোড়। বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফলে হিন্দু বাঙালিদের অভিবাসন প্রক্রিয়া ত্রিপুরার সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি সমস্ত ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। আর এর প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়েছে সাহিত্য অঙ্গনেও। সেখানে উঠে এসেছে নতুন নতুন ভাবনা, ক্ষেত্র ও জীবনবোধ।

একুশ শতকে ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যে স্থান পেয়েছে ত্রিপুরার জনজীবন, ব্যক্তিমানুষের জীবনবোধ, ক্রমাগত পরিবর্তনশীল সমাজজীবনের সমস্যা ও সংকট, পরিবর্তিত মূল্যবোধ তথা জীবনকে দেখার এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। ত্রিপুরার বাংলা উপন্যাসজগৎও এর ব্যতিক্রম নয়। এখানকার ঔপন্যাসিকেরা সমকালীন যুগপ্রভাবকে স্বীকার করে একুশ শতকে দাঁড়িয়ে তাঁদের রচনায় তুলে আনছেন সভ্যতা-সমাজ-সময়কে। তাঁদের উপন্যাসে কখনো উঠে আসছে বর্তমান, কখনো স্মৃতিচারণার মাধ্যমে দৃশ্যায়িত হচ্ছে অতীতের ছবি, কখনো বা প্রতিকায়িত হচ্ছে কোন বিশেষ লিঙ্গের জীবনবোধ ও যন্ত্রণাময় যাপন। এক্ষেত্রে আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়বস্তু হল কালের গতিতে ক্রমাগত পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে নারীদের অবস্থান ও জীবনশৈলী ত্রিপুরার ঔপন্যাসিকদের লেখনীতে কতটা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, তা তুলে ধরা। আলোচনার সুবিধার্থে নির্বাচিত ঔপন্যাসিকের একটি উপন্যাসকে বেছে নেওয়া হয়েছে। যথা- কল্যাণী ভট্টাচার্যের 'লংতরাই কুইন'।

বিশ শতকে ভারতের স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বঙ্গসমাজে নারী জাগরণ ও নারী সমানাধিকারের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে আলোচিত হতে দেখা যায়। বিশ শতকের প্রথমার্ধে বিভিন্ন নারী আন্দোলন নারীবাদী ভাবনাকে জাগিয়ে তুলেছিল। ফলে নারীদের প্রান্তিকীকরণের পেছনে দায়ী পুরুষতন্ত্রকে সরাসরি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। বিভিন্ন নারী সংগঠন আইনিভাবে নারীদের অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলনে ব্রতী হয় । প্রবর্তিত ও সংশোধিত হয় বহু আইন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, বিনোদন – সমস্ত ক্ষেত্রে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়। একুশ শতকে এসে নারী ক্ষমতায়ন আরও বিস্তৃত পরিধি লাভ করে। শিক্ষা, সংস্কৃতি ,অর্থনীতি, রাজনীতি , বিজ্ঞান, ক্রীড়া সর্বত্রই নারীদের জয়জয়কার ঘোষিত হয়। নারীদের আত্মপ্রতিষ্ঠার এই লড়াই সাহিত্যের পাতায় অঙ্কিত হয়েছে বহুবার বহুভাবে। ত্রিপুরার সাহিত্যিকগণও ত্রিপুরার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে সমকালীন নারীজগতের উপর আলোকপাত করেছেন সযত্নে। আর এ ক্ষেত্রে উপন্যাস একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এ প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক তপোধীর ভট্টাচার্য 'ত্রিপুরার কথাসাহিত্য' গ্রন্থে বলেছেন,

> "'উপন্যাস' অভিধার অন্তরালে রয়েছে কল্পনায় গড়া প্রতিবেদন যার ভিত্তি বাস্তবতা হলেও শেষ পর্যন্ত তা সমান্তরাল আরেক বাস্তবের সুপরিকল্পিত অভিব্যক্তি। এই নির্মাণও সুক্ষ্মভাবে লেখকের যথাপ্রাপ্ত অবস্থান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। স্বভাবত ত্রিপুরায় রচিত ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনও সেখানকার স্বতন্ত্র বাস্তবের নিজস্ব আখ্যান।"[১]

এরই প্রতিফলন দেখতে পাই কল্যাণী ভট্টাচার্যের লেখা 'লংতরাই কুইন' উপন্যাসে।

ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম কল্যাণী ভট্টাচার্য (১৯৪১ খ্রি.-২০১৪ খ্রি.)। ত্রিপুরার বিশিষ্ট সাহিত্যপত্রিকা 'মানবী'র সম্পাদক কল্যাণী ছিলেন ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতা- সর্বক্ষেত্রেই সিদ্ধহস্ত। তাঁর পত্রিকাটি ছিল সম্পূর্ণ মহিলা পরিচালিত একটি পত্রিকা যেখানে মহিলাদের রচনাই প্রকাশিত হত। কল্যাণী ভট্টাচার্যের রচনায় সমকালীন সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে নারীদের অবস্থান সুচারুভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ২০০২ সালে 'মানবী' পত্রিকার শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত 'লংতরাই কুইন' উপন্যাসের পটভূমি বিশ শতকের একেবারে অন্তিম লগ্ন থেকে একুশ শতকের সূচনাকাল পর্যন্ত। ত্রিপুরায় তখন প্রবল অস্থিরতার সময় চলছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পালাবদল ত্রিপুরার জনজীবনকে করে রেখেছে বিপর্যস্ত। একদিকে কংগ্রেস- বামফ্রন্টের ক্ষমতা দখলের আগ্রাসী মনোভাব এবং অন্যদিকে জনজাতিদের একাংশের সরকারবিরোধী, বাঙালিবিরোধী মনোভাব নিয়ে উগ্রপন্থার পথ অনুসরণ- এই

টালমাটাল ঝঞ্ঝাময় পরিস্থিতি তৎকালীন সাহিত্যের ছত্রে ছত্রে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত। আলোচ্য উপন্যাসটিও এর ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসের মূল কেন্দ্র লংতরাই পাহাড়ের কোলে অবস্থিত একটি লজ যার নাম লংতরাই কুইন। ভলানটারী রিটায়ারমেন্ট নেওয়া কলেজ শিক্ষিকা অহনা বড়াল এই আখ্যানের কথক। বাহান্ন বছর বয়সি অহনার দৃষ্টিতে ত্রিপুরার তৎকালীন সামগ্রিক পরিস্থিতি ফুটে ওঠার পাশাপাশি উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়কাল থেকে কথকের বর্তমান সময়কাল অব্দি নারীদের সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অবস্থান তথা স্বাধিকার আদায়ের এক অনন্য ইতিহাস। এছাড়াও ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্যা কুমারী যাজ্ঞসেনী চরিত্রটির মাধ্যমে ত্রিপুরার রাজপরিবারে নারীদের অবস্থান সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। কিঙ্কিনি, অনন্যা, অদিতি, পিসিমা ইত্যাদি চরিত্রগুলো নারীদের চিরকালীন অস্তিত্বের প্রশ্ন, আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, সময়ের প্রতিঘাতে প্রতিনিয়ত রূপান্তরশীল অবস্থানকে স্ব-ক্ষেত্র থেকে তুলে ধরেছে।

বিশ শতকের ত্রিপুরার জনজীবন নানা উত্থান-পতনের সাক্ষী। নানা রাজনৈতিক ডামাডোলে ভেসে গেছে কতশত পরিবার। ১৯৮৮ সালে নানা ভাঙাগড়া ও দ্বন্দ্ব-বিরোধের পর গঠিত হয় জোট সরকার। ১৯৯৩ সালে জোট সরকার ভেঙে গঠিত হয় বামফ্রন্ট সরকার। এই প্রেক্ষিতে বাঙালিবিদ্বেষ ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে বাঙালি-জনজাতি সম্পর্ক ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ধলাই জেলা। উপন্যাসের পটভূমি লংতরাই পাহাড় এই ধলাই জেলার অন্তর্গত। আলোচ্য উপন্যাসের সময়কাল ১৯৯৫ সালের পরবর্তী সময় থেকে ২০০২ সাল অব্দি। উপন্যাসের কথক অহনা বড়াল অবসর সময় কাটাতে এসেছে লংতরাই পাহাড়ের কোলে অবস্থিত ছোট্ট লজে। সেখানে থাকার সময়ে বিভিন্ন চরিত্রের সাথে তার পরিচয় হয়। এই উপন্যাসে তিনটি ভিন্ন প্রজন্মের নারীদের অবস্থানের বিবর্তনের রূপরেখাটি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে রয়েছেন ত্রিপুরার রাজপরিবারের সদস্যা কুমারী যাজ্ঞসেনী যোশী দেববর্মণ এবং অহনার পিসিশাশুড়ি আরতি দেবী। ভারতের স্বাধীনতার পূর্বেকার সময়ের ত্রিপুরার নারীদের তথা ত্রিপুর রাজপরিবারের নারীদের কথা জানা যায় যাজ্ঞসেনী চরিত্রের মাধ্যমে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত পূর্ব বাংলার হিন্দু বাঙালি নারীর চরম দুর্দশাময় যাপনকথা বিবৃত হয়েছে পিসিমা আরতি চরিত্রের মাধ্যমে। কুমারী যাজ্ঞসেনী ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন নেপালের রাজপরিবারের সদস্য একজন মিলিটারি ব্যক্তিকে। কিন্তু ভালবাসা মানে যেন শুধু আঘাত, যন্ত্রণা আর বিশ্বাসের ভাঙন। রাজকুমারীও এই তিক্ত সত্যকে অতিক্রম করতে পারেননি। বিয়ের পর তিনি জানতে পেরেছেন তার স্বামী পূর্ব বিবাহিত। স্ত্রী সন্তান নিয়ে তার ভরন্ত সংসার রয়েছে নেপালে। ভালোবাসার মানুষের বিশ্বাসঘাতকতায় ভেঙে চুরমার হয়ে যান যাজ্ঞসেনী। কিন্তু চিরন্তন ভারতীয় নারীর আদর্শকে বজায় রেখে বিবাহের বাঁধন ছিন্ন না করে মেনে নিয়েছেন জীবনের অনভিপ্রেত সত্যকে, আপন করে নিয়েছেন সতীন ও তার সন্তান-সন্ততিদের। বৃদ্ধ বয়সে স্বামীর নাতনির মেয়ের অকাল মৃত্যু হলে মা হারা সন্তান সুইটিকে নিজের কাছে নিয়ে এসেছেন। তাঁর স্মৃতিচারণায় উঠে আসে ত্রিপুরার সেইসব নারীদের কথা যাদের কথা কেউ কখনো বলে না। পুরুষের 'স্টেটাস সিম্বল' হয়ে কেটে যায় যাদের জীবন। তারা হলেন মহারাজাদের অন্দরমহলে বাস করা 'কাছুয়া বা কেইচ্ছা' রানি। তারা কারা, কোথা থেকে আসতেন এর সঠিক তথ্য পাওয়া কঠিন। গ্রাম বা শহরের অভিজাত পরিবারের সুন্দরী অল্পবয়সী মেয়েদের রাজসৈন্য পাঠিয়ে আনা হত। এদের রাখা হত রাজকীয় ভাবেই,

> 'কালী পূজা, দুর্গা পূজাতে বলি দেবার জন্য যেমন পাঁঠা এনে যত্নে ঘাসটাস খাওয়ানো হতো, তাদেরও তেমনি যত্ন করা হতো'।[২]

নামমাত্র বিয়ে করা এসব রানিদের রাখা হতো রাজকীয় প্রতাপ প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য। রাজার অন্দরমহলে প্রবেশের পর তারা কখনো বাইরের পৃথিবীটাকে আর দেখতে পেত না। এসব রানিদের মৃত্যু হলে তাদের জন্য কান্নার মতও কেউ থাকতো না। তখন রাজকোষ থেকে কাঁদুনি ভাড়া করে আনা হতো বিলাপ করে কাঁদার জন্য। যুগ যুগ ধরে নারী এভাবে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে, কত না পাওয়ার বঞ্চনাকে মেনে নিয়ে, বিশেষ কোনো একটু-পাওয়ার কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছে। সাধারণ নারী থেকে রাজঅন্তঃপুরের নারী- সবাই এই গ্লানি আর অন্যায়ের সমান ভুক্তভোগী।

একই সময়কালের নারী চরিত্র পিসিমা একটি ভিন্ন দৃশ্যের কুশীলব । অম্বরের পিসিমা অর্থাৎ আরতি দেবী পূর্ব বাংলার পন্ডিতবাড়ির দুই ভাইয়ের আদরের বোন। ভারতের স্বাধীনতার ঠিক পর পর পূর্ব পাকিস্তানে জাতিগত দাঙ্গা

শুরু হলে কুখ্যাত 'ভৈরবের পুল হত্যাকাণ্ডে' নিহত হন অম্বরের বাবা যে কিনা বোনের বিয়ে ঠিক করে ফিরছিলেন নিজ বাড়িতে। ধর্মীয় গোঁড়ামি ও উন্মাদনা তখন মানুষের শুভবুদ্ধিকে মেরে ফেলেছিল, যার ফলে সারাদিন লক্ষ্মীপুজোর উপোস করা আরতিকে পুজোর সময়ে ঠাকুরঘর থেকে তুলে নিয়ে পৈশাচিক লালসা মেটাতে বাধেনি বিধর্মী অমানুষগুলোর। মানসম্মান, বিষয়-সম্পত্তি ইত্যাদি সর্বস্ব হারিয়ে শূন্য হাতে অম্বরের জ্যাঠামশাই স্ত্রী,সন্তান, বোন, ছোট ভাইয়ের স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে আগরতলায় পা রেখেছিলেন আশ্রয় ও নিরাপত্তার জন্য। কিন্তু নারী সর্বত্রই ভোগ্যপণ্য। সে হোক বিধর্মীর চোখে অথবা স্বধর্মী। তাই ক্ষোভে, রাগে, আক্ষেপে জ্যাঠামশাই বলে উঠেন,

> 'সব দেশের শকুনই মেয়েরার শরীর ঠুকরাতে চায়। এই ননীগোপালের চোখের দৃষ্টিটায় আমি তেমন একটা শকুনের চাহনিই দেখি। সে দেশে যা এখানেও তা। এ মাংসের বিকিকিনি সব দেশেই সমান'।[৩]

এক নিষ্ঠুর সত্য এখানে নগ্নরূপে প্রকাশিত। পুরুষের কুকর্মের ফল চিরকাল নারীকে ভোগ করতে হয়। পিসিমাও তাই চিরকাল রয়ে গেলেন অবিবাহিতা, সাধারণ সমাজ থেকে আত্মনির্বাসিতা, সংকুচিতা। অন্যান্য পাঁচটি সাধারণ মেয়ের মতো তিনিও স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি সুন্দর সংসারের । কিন্তু রাজনৈতিক অভিঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল তার সব স্বপ্ন। সমাজের লালসা আর নির্মমতা তাঁকে যে মানসিক আঘাত দিয়েছে, তার ভার বহন করে গেছেন সারাজীবন। বিনাদোষে কলংকের গ্লানি মাথায় নিয়ে জীবন্মৃত হয়ে শুধু প্রাণধারণ আর দিনযাপন- এটাকেই তিনি মেনে নিয়েছিলেন নীরবে। কিন্তু সব স্বপ্ন সে আঘাতের নিচে চাপা পড়ে গেলেও মরে যায়নি। অবদমিত সব আকাঙ্ক্ষা শেষ বয়সে পাগলামির মধ্য দিয়ে আগ্নেয়গিরির লাভার মতো বেরিয়ে এসেছে। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বে নিজেকে সাজিয়েছেন নববধূ রূপে, পরিবার-পরিজনদের কাল্পনিক শ্বশুরবাড়ির লোক ভেবে আচার-আচরণ করেছেন। কখনো বা প্রিয়জনকে সেই সম্মাননষ্টকারী ভেবে অপমানিত করেছেন। দুঃখে যন্ত্রণায় তখন অহনার মনে উচ্চারিত হয়েছে,

> 'আমি এখন মনে প্রাণে পিসিমার মৃত্যু কামনা করি। আমার উপাস্যর কাছে আবেদন করি- ঠাকুর ওকে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দাও।'[৪]

অহনার প্রার্থনা মেনে নিয়েই যেন পিসিমা দুদিন অনবরত লক্ষ্মীর পাঁচালী পড়তে পড়তে সকলের অলক্ষ্যে এই বিশ্বসংসার ত্যাগ করেন । সমাপ্তি ঘটে একটি কালো অধ্যায়ের। সমকালীন সামাজিক- রাজনৈতিক সংঘাতের পটে নারীজাতির আহুতি এই উপন্যাসে অসাধারণভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

কুমারী যাজ্ঞসেনী ও পিসিমার পরবর্তী প্রজন্ম কথক অহনা শিক্ষা-দীক্ষায়, স্বাধীনতায়, আত্মপ্রতিষ্ঠায় অনেকটাই এগিয়ে। বিশিষ্ট পরিবেশবিজ্ঞানী অম্বর বড়ালের স্ত্রী অহনা বড়াল একজন কলেজ শিক্ষিকা। তার পুত্র ও পুত্রবধূ আমেরিকায় বাস করে । সময়ের পূর্বেই রিটায়ারমেন্ট নেওয়া অহনা কখনো বাস করেন নিজ বাড়ি আগরতলায়, কখনো বা স্বামীর সঙ্গে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। কখনো ইচ্ছে হলে বাস করেন লংতরাই পাহাড়ের উপর গড়ে তোলা ছোট্ট লজ লংতরাই কুইনে। সেখানে বাস করার সময়েই উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের সঙ্গে তার পরিচয়। সমাজ-সময়ের বিভিন্ন রূপ, দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর দৃষ্টিতে উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে। আপাত দৃষ্টিতে তাঁকে একজন স্বাধীন, সুখী নারী বলে মনে হলেও তাঁর আত্মবিশ্লেষণে ধরা পড়ে সেই প্রজন্মের নারীজাতির আত্মকথা। তৎকালীন সময়ের একজন শিক্ষিতা, স্বনির্ভর, আত্মসচেতন নারীর যাপনযন্ত্রণা অহনা চরিত্রের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়। প্রকৃতপক্ষে আমরা মুখে যতই স্বাধীনতা আর শিক্ষার বুলি কপচাই না কেন, তখনও নারী পুরুষতন্ত্রের খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই সদ্য কলেজ পাস করা অহনাকে পাত্রকে না দেখেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। রোমান্টিক স্বপ্ন চোখে নিয়ে সংসার করতে আসা অহনার সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায় বিয়ের রাতেই। অম্বরের প্রথম প্রেম হল প্রকৃতি, এই সত্যটিকে মেনে নিতে বলে অম্বর। অহনা বুঝতে পারে অম্বর বড়াল একজন অত্যন্ত নরম মনের ভালো মানুষ হলেও সে কখনোই তার মনের মানুষ হতে পারবে না। দুজনের শিক্ষা, সংস্কার, রুচিবোধ, জীবনশৈলী সম্পূর্ণ পৃথক। কিন্তু তাই বলে এই সম্পর্ককে অস্বীকার করার আস্পর্ধা তখনকার কোন নারীর ছিল না। অহনাকেও মেনে নিতে হয় এই নীরস সম্পর্ক। একজন আদর্শ স্ত্রীর মত স্বামীর সংসারের দায়িত্ব নিয়ে কাটিয়ে দিতে হয় জীবন। কারণ মেনে নেওয়া আর মানিয়ে নেওয়াই মেয়েদের ধর্ম। যুগ যুগ ধরে নারীদের এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে। সংসারের সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্ত্রীর উপর দিয়ে

অম্বর পরিবেশবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণার কাজে বাড়ির বাইরে কাটিয়েছে অধিকাংশ সময়। অহনা ও অম্বরের সম্পর্কের এই দূরত্ব অহনাকে ঠেলে দিয়েছে একাকীত্ব ও অবসাদের অতল অন্ধকারে। সেখানে সে গড়ে নিয়েছে তার আলাদা একটি জগৎ।

নারীর সবচেয়ে প্রধান যে চাহিদা সেটি হল আত্মপরিচয়- আত্ম প্রতিষ্ঠার চাহিদা। অস্তিত্বের সংকট নারীর চিরকালীন সংকট। অহনা স্বাবলম্বী হলেও তাঁর যাপন-অভিজ্ঞতা তাকে এই সংকটের মুখোমুখি দাঁড় করায়। তাঁর আক্ষেপ,

'কৈশোর বা প্রথম যৌবনের যে সেলফ আইডেন্টিটি পাওয়ার স্বপ্ন, তা আর সফল হল কোথায়?'[৫]

এই প্রশ্ন, এই অন্বেষণ, এই আকাঙ্ক্ষা অহনার একার নয়। সমস্ত নারীজাতি এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছে বহুকাল ধরে। সেই খোঁজা হয়তো শেষ হয়নি আজও । অহনা তাই বারবার প্রশ্ন করেছে,

'রমণী মানে কি একটা শরীর? রমণী মানে কি একজন সংসার রক্ষণাবেক্ষণকারী?'[৬]

উত্তর পায় না সে। ঔপন্যাসিক বুঝিয়ে দেন 'সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে'- এই আপ্তবাক্যটি স্টিরিওটাইপ হয়ে গেঁথে গেছে সমাজের মননে, মাথায়। তাই সংসারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্ত্রীকেই নিজের সাধ- আহ্লাদ, স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে স্বামীর ছায়া হয়ে জীবন কাটাতে হয়। এরই উদাহরণ হিসেবে উপন্যাসে মধুমিতা, মিসেস পারেখ, অদিতি ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে দেখতে পাওয়া যায়। অহনার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণে তৎকালীন সময়ের নারীজাতির বাস্তব অবস্থানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঔপন্যাসিক কল্যাণী ভট্টাচার্য খুব সুন্দরভাবে উপন্যাসে বুঝিয়ে দিয়েছেন নারীর মানুষ হিসেবে স্বতন্ত্র সত্তার প্রতিষ্ঠা হতে তখনও অনেকটা পথ চলা বাকি।

পরবর্তী প্রজন্মের প্রতিনিধি হিসেবে পাওয়া যায় কিঙ্কিনি, বিজুলি, অনন্যা ইত্যাদি চরিত্রকে। সকলেই শিক্ষা দীক্ষায়, আধুনিকতায় অনেকটাই এগিয়ে। বর্তমান প্রযুক্তিনির্ভর আত্মকেন্দ্রিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে তারা ক্রমশই উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে এগিয়ে চলেছে ভবিষ্যতের দিকে। অহনার পুত্রবধূ বিজুলী স্বামীর সাথে আমেরিকায় বাস করে। সেখানে সে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে ব্যস্ত। তাই মা হওয়ার সময় তার নেই। বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব উন্নতির ফলে সে সন্তান লাভের জন্য স্যারোগেট মাদার বেছে নিয়েছে। কল্যাণী ভট্টাচার্য এখানে এসে যেন সময়কে অতিক্রম করেছেন। যে পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেছেন, সেই সময়ে স্যারোগেসি ধারণা ত্রিপুরার জনজীবনের কাছে প্রায় অজ্ঞাত। এই বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় ১৯৮৬ সালে আমেরিকায় প্রথম স্যারোগেট মাদারের সাহায্যে একটি শিশুর জন্ম হয়। ভারতে এই আবিষ্কারের প্রচলন সরকারিভাবে শুরু হয় ২০০২ সালে যা আলোচ্য উপন্যাসটির প্রকাশকাল। বিজ্ঞানের উন্নত ব্যবস্থাপনার তাৎক্ষণিক এই প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যে বিরল। এটাই ঔপন্যাসিকের বিশিষ্টতা। উপন্যাসে দেখা যায় বিজুলির এই সিদ্ধান্তে অসন্তোষ প্রকাশ করেনি তার পরিবারের লোকেরা। অহনা, অম্বর হাসিমুখে এই পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে। এখানে কল্যাণী ভট্টাচার্যের প্রকৃত আধুনিক মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। বিজুলীকে পুত্রবধূ হিসেবে পেয়ে অহনা খুব খুশি না হলেও বিজুলির মাধ্যমে অহনার সেল্ফ আইডেন্টিটি গড়ার সাধ পূরণ হয়। যেভাবে প্রত্যেক প্রজন্ম তার পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে সঞ্চারিত করে যায় অপূর্ণ সাধ- স্বপ্ন, উত্তরসূরির মাধ্যমে নিজের সব ইচ্ছে-আকাঙ্ক্ষার পরিপূর্ণতা ঘটায়, তেমনভাবেই বিজুলী অহনার স্বপ্নকে সত্যি করেছে। ভৌগোলিক সীমার পরিধি ছাড়িয়ে বহির্জগতে পা রাখার মধ্য দিয়ে নারী তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। এভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষায় এই প্রজন্মের নারী যেন সবকিছু ছাড়িয়ে, তুচ্ছ করে এগিয়ে যায় অজানা ভবিষ্যতের দিকে। উপন্যাসের একমাত্র বিজুলী চরিত্রটিই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের সংকীর্ণতাকে কাটিয়ে উঠতে পেরেছে।

লংতরাই পাহাড়ে ভ্রমণের সময় অহনার সাথে দেখা হয় উপন্যাসের অন্যতম আকর্ষণীয় চরিত্র কিঙ্কিনি চৌধুরীর। এই চরিত্রটি সম্পর্কে অধ্যাপক শিশির কুমার সিংহ বলেছেন,

"কিঙ্কিনি একটি অদ্ভুত চরিত্র যে উপন্যাসের কাহিনিকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।"[৭]

বড়লোক পিতা-মাতার আদুরে কন্যা কিঙ্কিনি। আত্মকেন্দ্রিকতার পরিণাম হিসেবে পৃথক বাস করা বাবা মায়ের অবসাদগ্রস্ত কন্যা সে। শিক্ষা, গান-বাজনা, খেলাধুলা, লেখালেখি- সবকিছুতেই অনন্যা এই সাহসী অপরূপ সুন্দরি

নারী ভালোবাসার কাঙাল । একাকীত্বের যন্ত্রণা ঘোচাতে তাই সে নিজেকে জড়িয়ে রাখে নানান সমাজ সেবামূলক কাজে, যা তার জীবনে ডেকে আনে চরম বিপর্যয়। বাইক নিয়ে লংতরাই পাহাড়ের জঙ্গলে ঘোরাঘুরির সময় বিকল হয়ে পড়ে তার বাইক। এই পরিস্থিতিতে অহনার সাথে তার পরিচয়। অহনার সাথে সে চলে আসে লংতরাই কুইন লজে। অহনার ঘরেই তার রাত্রি যাপন হয়। অল্প সময়েই এই প্রাণোচ্ছল মেয়েটিকে ভালোবেসে ফেলে অহনা। দুজনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কিঙ্কিনি চরিত্রের নানা বর্ণময় দিক উপন্যাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। কিঙ্কিনির জানার আগ্রহ ও জ্ঞানের পরিধি বহু শাখায় বিস্তৃত। কখনো সে ধলাই নদীকে নিয়ে কবিতা রচনা করে, কখনো পৃথিবীর পরাধীন দেশ বা গোষ্ঠী সমূহ অর্থাৎ ফোর্থ ওয়ার্ল্ড সম্পর্কে জানতে চায়। তার সহজ অমায়িক আচরণ এবং দুর্নিবার সাহস অহনার পাশাপাশি পাঠককেও মুগ্ধ করে । আধুনিক গতিশীল পৃথিবীর সার্থক প্রতিনিধি যেন কিঙ্কিনি।

কিন্তু এই ভ্রম উপন্যাসের পরবর্তী অংশে দূর হয়ে যায়। নারী যত স্বাধীনভাবে আকাশে ওড়ার চেষ্টা করে, পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তত বেশি তাকে খাঁচায় বন্দি করার সমস্ত কৌশল প্রয়োগ করে। কিঙ্কিনি বিশ্বাস করে তার ভেতরে দুটি সত্তার বাস। একটি সত্তা ভালোবাসা, আদর, সহানুভূতি পেতে ও দিতে আগ্রহী। অন্যটি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়সী'দের মতো স্বতঃস্ফূর্তভাবে যৌবনের জয়গান গেয়ে সব বাধা-বিপত্তি তুচ্ছ করে এগিয়ে যেতে চায়। অজানা অচেনাকে জানতে, কুড়েমি- আলস্যকে ভেঙে তোলপাড় করে সবকিছু চিনতে, বুঝতে চায়। এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার জীবনে নিয়ে আসে দুর্যোগের কালো মেঘ । বিবিধ বিষয়ে আগ্রহী ও বহু ভাষা জানার কারণে পুলিশের মনে তার প্রতি সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কিঙ্কিনির বাইকের বক্সে থাকা বই, ডাইরি এই সন্দেহকে আরো সুদৃঢ় করে। তৎকালীন সময়ে ত্রিপুরায় উগ্রপন্থার দৌরাত্ম প্রচন্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল, যার কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ সীমা ছাড়ায়। একদিকে উগ্রপন্থীদের ভয় অন্যদিকে পুলিশের অকারণ সন্দেহ সাধারণ মানুষকে অসহায় করে তুলেছিল। কিঙ্কিনি এই সন্দেহের শিকার। আমাদের সমাজে একজন পুরুষের বন্ধুবান্ধব নিয়ে ঘোরাফেরা, গভীর রাত অব্দি ঘরে আনন্দোল্লাস করা ইত্যাদি সাধারণ বিষয় হলেও সেখানে পুরুষের জায়গায় নারী হলেই সমস্যা বেঁধে যায়। কারণ তাদের সংজ্ঞা তারা মানুষ নয়, তারা পুরুষ ও নারী। আর নারীর এসব আচরণ সমাজের চোখে অত্যন্ত গর্হিত অপরাধ। প্রশাসনও সমাজেরই অংশ। তাই রাত এগারোটায় কিঙ্কিনি চৌধুরীকে ঘরে হইহুল্লোড় করার অপরাধে আইনবহির্ভূত কৌশলে পুলিশ এরেস্ট করে নিয়ে যায়। পরদিন সংবাদপত্রে তার নামের আগে যুক্ত হয় 'আন্ডারওয়ার্ল্ডের কুইন', 'মক্ষিরানি' ইত্যাদি অপমানজনক বিশেষণ। তাজা তারুণ্যে ভরপুর কিঙ্কিনির অপ্রতিরোধ্য মনোভাবের ফলে পুলিশে তদন্ত ও অত্যাচার ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। তদন্তে জানা যায়, কিঙ্কিনি বিভিন্ন অসামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত।

চিরকাল সমাজ নারীকে দুটি রূপে দেখতে চেয়েছে- লক্ষ্মী ও উর্বশী। নারীকে মানুষ হিসেবে মেনে নিতে নারাজ পুরুষতান্ত্রিক সমাজ। কেউ লক্ষ্মী বা উর্বশী - কোনরূপই গ্রহণ করতে না চাইলেও জোর করে তাকে যেকোনো একটি স্থানে বসানোর চেষ্টা করা হয়। আলোচ্য উপন্যাসের কিঙ্কিনি এই কৌশলেরই শিকার। মহিলা সম্মেলনের চাঁদা তুলতে গিয়ে এক কোম্পানির মালিকের ফাঁদে পড়ে যায় সে। বেশি টাকা চাঁদা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে তাকে ছিঁড়ে খুবলে খায় কিছু মাঝবয়সী তথাকথিত 'ভদ্রলোক'। এরপর বারবার তাকে ব্ল্যাকমেইল করে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। বিনিময়ে দেওয়া হয় বেশ কিছু টাকা। আত্মসচেতন কিঙ্কিনি তার সাথে হওয়া এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে চেয়েছে নিজের মত করে,

> 'আমার কিছু অস্ত্র কেনার প্ল্যান ছিল। প্ল্যান ছিল মেয়েদের শরীরটাকে নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলার পর টাকার বান্ডিল দিয়ে নিজেদের মহত্ত্ব দেখাতে বড় বড় কথা বলে, ওদের মুখোশ খুলে ফেলার'।[৮]

এই পরিকল্পনার বাস্তব রূপায়ণের জন্য সে স্বেচ্ছায় নানা অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয় যার স্বীকারোক্তি পুলিশি জেরায় উঠে আসে। একটি নারীর চরিত্র যতটা সম্ভব কালিমা লিপ্ত করা যায়, পুলিশ প্রশাসন ও মিডিয়া তা করতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্যবোধ করেনি। অথচ যেসব তথাকথিত 'শিক্ষিত ভদ্রলোক' টাকার বিনিময়ে তাকে ব্যবহার করেছে, তারা বুক ফুলিয়ে সমাজের মাথা হিসেবে বাস করছে। কেউ কেউ পুলিশী জেলায় অবলীলায় বলে দিয়েছে,

'পুরুষের কি প্রস্টিটিউটের কাছে যাওয়া বা কলগার্ল ডাকা বেআইনি? টাকা দেই, এনজয় করি'।[৯] যুগ যুগান্তর ধরে পুরুষ সমাজ এভাবে নিজেদের কাম চরিতার্থ করার জন্য নারীকে পাঁকে নামিয়েছে, নোংরা করেছে। আর নিজেরা থেকেছে শুভ্র, অকলঙ্কিত। সমাজআরোপিত এই অভিশপ্ত জীবন বহু নারীকে অন্ধকারে পচে মরতে বাধ্য করেছে। ঔপন্যাসিক কল্যাণী ভট্টাচার্য আধুনিকতার আড়ালে মানবসত্তার অবমাননার এই চিত্রটি নিখুঁতভাবে উপন্যাসে তুলে ধরেছেন । পাশাপাশি তিনি মূল্যবোধের উত্তরণও দেখিয়েছেন। উপন্যাসে অসমীয়া যুবক রূপান্তর সাঁইকিয়া ও কিঙ্কিনির বিবাহ প্রচলিত মধ্যযুগীয় ভাবনার বদল ঘটিয়েছে, যা তৎকালীন সময়ে প্রায় অভাবনীয় ছিল। একদা দেহ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত আসামি নারীকে সমাজ সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি, পারেনা। সেখানে দাঁড়িয়ে কিঙ্কিনি-রূপান্তরের বিবাহ এক সামাজিক অভ্যুত্থান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। শরীর নিয়ে প্রচলিত স্টিরিওটাইপ থেকে বেরিয়ে মানবতার জয়গান গেয়েছেন কল্যাণী। কিঙ্কিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আবার এটাও শপথ নিয়েছে, তার সাথে ঘটে যাওয়া যে অন্যায়গুলো আরো শত শত মেয়ের সাথেও ঘটছে, এগুলোর সে প্রতিকার করার চেষ্টা করবে। এই কাজে সে পাশে পেয়েছে রূপান্তরকে। নারীর অবস্থান সম্পর্কে কিঙ্কিনি চরিত্রের মাধ্যমে সবচেয়ে অমোঘ সত্যটি তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক,

> "মেয়ে মানে কি শুধু শরীর? ওদের বুদ্ধি তাদের মেধা বা বিচারবোধ এসব কিছুই নয়? তোমাদেরটা যদি ফোর্থ ওয়ার্ল্ড লড়াই হয় তবে আমার লড়াই মেয়েদের মানুষ বলে স্বীকৃতি পাওয়ার যুদ্ধটা ফিফথ ওয়ার্ল্ড এর লড়াই । মেয়েদের ইজ্জত নিয়ে মানুষ হওয়ার লড়াই"।[১০]

এই কয়েকটি কথার মধ্য দিয়েই যেন নারীসমাজের চিরকালীন সংগ্রামের মূল উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হয়ে যায়।

বর্তমান থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকা কল্যাণী ভট্টাচার্য উপন্যাসে আধুনিক জীবনের আরেকটি দিককে উপস্থাপিত করেছেন। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষকে এখনো সমাজ আন্তরিকভাবে আপন করে নিতে পারেনি। বিভিন্ন আইনি পদ্ধতিতে তাদের নিজেদের অধিকার আদায় করতে হয়েছে। ঔপন্যাসিক কল্যাণী তাঁর উপন্যাসে সেই অবহেলিত, বঞ্চিত মানবজাতিকে সস্নেহে গ্রহণ করেছেন। অরণ্য চরিত্রটির মাধ্যমে তাদের বঞ্চনার কথা, আক্ষেপের কথা, অস্তিত্বের সংকটের কথা বিবৃত করেছেন তিনি,

> 'পশুরও একটা সম্মান আছে মাসি। আমাদের মত মানুষের সে সম্মানও নেই। ভারতজুড়ে আজ সংখ্যালঘু, সংখ্যালঘু বলে যারা গলা ফাটাচ্ছে তারা কি একবারও বলেছে নপুংসকরা সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু?'[১১]

অথচ, এই অবহেলিত মানুষটাই একটি পথশিশুকে বাঁচাতে নিজের প্রাণ বিপন্ন করেছে। কল্যাণী ইতিবাচকতায় বিশ্বাসী। তাই তাঁর উপন্যাসে জীবনের ইতিবাচক পরিণামের কথাই তিনি বলেছেন বারবার। অরণ্যের মতো মানুষদেরও সবাই একদিন আপন করে নেবে এই বিশ্বাস তিনি রাখেন। উপন্যাসের ভাষা ও ভাবনা সম্পর্কে প্রাবন্ধিক বিমল চক্রবর্তীর মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য,

> 'তাঁর উপন্যাসের ভাষা ও আঙ্গিকে নীলিমার এক গহন পরাগ খুঁজে পাওয়া যায়। পাওয়া যায় শান্তি ও নৈঃশব্দ। সচিত্র অন্ধকার থেকে তিনি আলোর দিকে হাঁটেন। দিনের সীমান্তে আলো জ্বালেন। সংসারের মায়া -পুতুলের জন্য। মায়ার গহন গূঢ় বাড়ি তৈরি করে তিনি কমল বনের হাওয়া বয়ে আনেন। বয়ে আনেন নানা স্বপ্ন।'[১২]

কল্যাণী ভট্টাচার্য 'লংতরাই কুইন' উপন্যাসে তিনটি প্রজন্মের 'কুইন' বা রানিদের তুলে ধরেছেন। তারা বাস্তব জীবনে কুইন হতে না পারলেও স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিবাদের মাধ্যমে নিজেদের স্বাতন্ত্রের পরিচয় দিয়েছেন। কুমারী যাজ্ঞসেনীর সমাজসেবা, পিসিমার নীরব আত্মত্যাগ, অহনার নিজস্ব জগত সৃষ্টি, কিঙ্কিনির প্রতিবাদী সত্তা, বিজুলীর স্বাধীন চিন্তাভাবনা- এই সমস্ত দিকগুলির মাধ্যমে নারীর উত্তরণের রূপরেখাটি স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত করেছেন ঔপন্যাসিক। সামাজিক স্টিরিওটাইপ ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা কল্যাণীর প্রকৃত আধুনিক মনোভাবের পরিচায়ক। কল্যাণী ভট্টাচার্য পুরুষতান্ত্রিক সমাজের গড়া সামাজিক তত্ত্ব, ধারণা, বিধিনিষেধ ও মূল্যবোধের শিকল ভেঙে নারীর নিজস্ব বোধের নির্মাণ করেছেন। একুশ শতকে দাঁড়িয়েও নারীর অসহায়তাকে পরিস্ফুট করেছেন নিজস্ব ভঙ্গিতে। এভাবে একুশ শতকের নারীসমাজের এক ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে।

তথ্যসূত্র:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ত্রিপুরার কথাসাহিত্য, স্রোত প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০২১, পৃঃ ১৮।
২. ভট্টাচার্য, কল্যাণী, লংতরাই কুইন, মানবী শারদ সংখ্যা, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- ২০০২, পৃঃ ৩৯।
৩. তদেব, পৃঃ ৪৫।
৪. তদেব, পৃঃ ৭৪।
৫. তদেব, পৃঃ ৯৮।
৬. তদেব, পৃঃ ৬৪।
৭. সিংহ, ড. শিশির কুমার, ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৮, পৃঃ ৩৫১।
৮ তদেব, পৃঃ ৭১।
৯. তদেব, পৃঃ ৭২।
১০. তদেব, পৃঃ ৮৮।
১১. তদেব, পৃঃ ৩।
১২. চক্রবর্তী, বিমল, ত্রিপুরার উপন্যাস শিল্প: পাঠ প্রতিক্রিয়ার সূচনা পর্ব, ধর গোবিন্দ (সম্পাঃ), স্রোত- ত্রিপুরার উপন্যাস সংখ্যা, কুমারঘাট, প্রথম প্রকাশ- মে ২০১৯, পৃঃ ৩৭।

আকর গ্রন্থ-

ভট্টাচার্য, কল্যাণী, লংতরাই কুইন, মানবী শারদ সংখ্যা, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- ২০০২।

সহায়ক গ্রন্থ-

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, ত্রিপুরার কথাসাহিত্য, স্রোত প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০২১।
২. সিংহ, ড. শিশির কুমার, ত্রিপুরার বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস, অক্ষর পাবলিকেশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি ২০১৮।
৩. ধর, গোবিন্দ (সম্পাঃ), স্রোত- ত্রিপুরার উপন্যাস সংখ্যা, কুমারঘাট, প্রথম প্রকাশ- মে ২০১৯।
৪. দাশ নির্মল ড. পটভূমি ত্রিপুরা: দর্পণে দ্বাদশ উপন্যাস, সৈকত প্রকাশন, আগরতলা, প্রথম প্রকাশ- মার্চ, ২০১৮।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 882-887
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.080

নারী-পুরুষের দাম্পত্য রসায়ন: কণা বসু মিশ্রের নির্বাচিত উপন্যাস

ইপ্সিতা দেব, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়, শিলচর, অসম,* ***ভারত***

Received: 20.03.2025; Accepted: 22.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstarct

There are good and bad sides in every relationship in human life, but a woman's experience in marital relationship always brings out a little different story. It is normal not to ask questions about a happy marital relationship, but questions arise about marital discord, various neglect of women in marriage, humiliation, torture, torture or gender discrimination. People build houses with the hope of happiness, but in the absence of happiness, when unhappiness settles in that house, irony is created. Conflict between a husband and wife can be created for thousands of reasons, but if the level of conflict is prolonged, as a result, the woman has to endure unbearable torture. Even though the number of women in the society is low, it cannot be said that it is about to disappear. The lives of those minority women are almost endangered today. Women need to get rid of this danger, they need to find a way out. In the 21st century, if the patriarchal attitude of that mythical time settles in the minds of people who have advanced in the modern way of thinking, the marital relationship will not be relaxed even after a long time from today.

21st century writer Kana Basu Mishra's novel is an analysis of how and why a marital relationship can take a turn for breakdown and how women's lives are endangered as a result. Along with that, there will be glimpses of the description of how women will overcome these dangers and establish their self-respect.

Key words *- Marriage, Relationship, Suffer, Extra affair*

কণা বসু মিশ্রের জন্ম বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় এবং লেখালেখি শুরু করেন বিংশ শতকের প্রায় শেষের দিকে এসে বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। বাংলা কথাসাহিত্যের একজন দক্ষ লেখক কণা বসু মিশ্র জন্মসূত্রে পাহাড় ঘেরা রাজ্য অসমের বাসিন্দা। স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঠিক এক বছর পূর্বে অর্থাৎ ১৯৪৬ সালের ১০ মার্চ লেখক কণা বসু মিশ্র অসমের তেজপুর শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী মণীন্দ্রনাথ বসু। প্রকৃতিকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন লেখক শৈশবে তাই গাছপালা, পাহাড়, নদী ইত্যাদির মাঝে থাকার ফলে অতি অল্প বয়সেই তাঁর কালি কলমে ফুটে উঠেছে সাহিত্যের নানা অঙ্গ। এভাবেই ধীরে ধীরে বড়ো হয়ে ওঠা। বাড়িতেও ছিল বেশ মননশীল পরিবেশ, ভাই-বোন অনেকেই ছিলেন লেখালেখির সাথে যুক্ত। বিগত শতকের সাতের দশকের প্রথম থেকেই বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হয়। এখনো প্রথম শ্রেণীর পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখা পাওয়া যায়। নিজের এই লেখালেখির গুণের জন্য দেশে-বিদেশে বহু সাহিত্য সভায় তিনি ডাক পেয়েছেন। তাঁর সাথে সাথে লেখকের ঝুলিতে রয়েছে নানান সম্মান ও পুরস্কার।

দাম্পত্য সম্পর্কের ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখি যে সময়ের সাথে সাথে নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কগুলো পূর্বের তুলনায় অনেকটা সহজ হয়েছে তবে আধুনিকতার

অগ্রগতির সাথে সাথে সম্পর্কগুলোর ভেতরে নতুন নতুন সমস্যার জন্ম নিয়েছে। নারী স্বাধীনতার পূর্বে নারীকে আমরা দেখেছি অন্তেবাসিনী রূপে। বহির্জগত তাদের জন্য উন্মুক্ত ছিল না, অন্দরমহলের ঘানি টানতে টানতেই তাদের জীবনের বিদায় বেলা চলে আসত। সে জায়গা থেকে বিবর্তনের ফলে নারী শিক্ষার অধিকার পেল নারী কিন্তু এতেই কি সমস্যার সমাধান হয়েছে? একেবারেই নয় বরং নারীকে কিভাবে শিক্ষার আলো থেকে দূরে রাখা যায় সেই চেষ্টাই চালিয়েছে সমাজের কিছু বর্গ মানুষ। তার মধ্যে যে শুধুই পুরুষের ভূমিকা ছিল তা বলা ভুল হবে এক্ষেত্রে কিছু নারীও নারীর শত্রু হয়ে উঠেছিল। এর পরবর্তীতে আমরা দেখি যে সমাজ সভ্যতা এতটা আধুনিক হবার পরও আশাপূর্ণার সত্যবতীর জীবন খুব একটা সহজ ছিল না। এটা সমাজের আসল চিত্র কারণ এ সত্যবতী কোনো সাধারণ সাহিত্যের কাল্পনিক নায়িকা নয়। সত্যবতী সমাজের আসল সত্যের মুখোশ খোলার এক নাম। এভাবে নারীর জীবনে একের পর এক বিবর্তন হতে হতে বর্তমানের নারী ঘর এবং বাহির দুটোই সমানভাবে সামলাচ্ছে, কিন্তু এইসবের মধ্যেও বহু সমস্যার সম্মুখীন তাদের হতে হয়। সময়ের সাথে সাথে সমস্যাগুলোর আধুনিকীকরণ হয়েছে মাত্র, আর কিছুই নয়। এভাবেই নারীর দাম্পত্যের সাথে তালে তাল মিলিয়ে নারী যখন কর্মজগতে পা রাখে তখন তাকে মুখোমুখি হতে হয় নানা সমস্যার। সেইসব জটিলতার রসায়নের ফলে দাম্পত্যের এক বিচ্ছিন্ন রূপের বর্ণনা তুলে ধরেছেন কণা বসু মিশ্র তাঁর 'ছেঁড়া ঘুড়ি' এবং 'ঝড়ের পরে' নামক দুটি উপন্যাসে।

পেশাগতভাবে একজন শিক্ষক নারীর কর্মজগৎ এবং সাংসারিক জীবনকে ঘিরে রচিত উপন্যাসের শুরুতেই আমরা এক ভেঙে যাওয়া সংসারের সূচনার বার্তা পাই। মেয়েটির নাম দেবলীনা যে স্কুল শিক্ষক এবং তার স্বামী প্রদীপ্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাদের একটি কন্যা সন্তান রয়েছে যার নাম মৌরি। উপন্যাসের শুরুতেই আমরা দেখি এই মেয়েকে নিয়ে দেবলীনা স্বামী সংসার ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যাচ্ছে এবং এর কারণ অনুসন্ধানে যখন আমরা উপন্যাসের গভীরে যাই তখন দেখি যে দেবলীনার স্বামী অর্থাৎ প্রদীপ্ত তার ছাত্রীর সাথে পরকীয়ায় জড়িত। এরপরই যেন স্ত্রীর প্রতি তার অসভ্য আচরণ ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগল। প্রদীপ্ত স্ত্রীকে রাতে মাতাল হয়ে এতটাই মার-ধর করত যে দেবলীনা এবং মৌরি ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতো প্রদীপ্তকে দেখে। প্রদীপ্তের এই অবস্থার বর্ণনা দিতে ঔপন্যাসিক উপন্যাসে বলেন যে,' শ্রীলতার প্রেমে পড়ে কাটা পায়রার মত যন্ত্রণায় ছটফট করত প্রদীপ্ত । হয়ত সেই যন্ত্রণা ভোলার জন্যই রাত দশটার পর বাড়ি ফিরে প্রতিদিন বোতল নিয়ে বসত ও মধ্যপান করতে করতে খানিকটা নেশাগ্রস্থ হলে তার মাথায় রক্ত চন চন করে উঠত। ওর ভেতরের পশুত্ব জেগে উঠত। সেই পশুত্বকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করত ও দেবলীনার ওপর অকথ্য শারীরিক অত্যাচার চালিয়ে'।[১] শুধু যে শারীরিকভাবে দেবলীনা অশান্তির শিকার হচ্ছিল তা নয় মানসিকভাবেও সে ভেঙে পড়েছিল কারণ প্রদীপ্তের এই নষ্টামির জেরে আত্মীয়-স্বজন, তার কর্মক্ষেত্রে এমনকি তার ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে শুনতে হয়েছে নানা কথা। যা একজন নারীর কাছে অসহনীয় যন্ত্রণা বহন করে আনে। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে যখন দেবলীনা প্রদীপ্ত এবং শ্রীলতার প্রেমের গল্প শুনতে পেত তখন তার মধ্যে এক তীব্র অসহায়তা কাজ করত কারণ যে প্রদীপ্তকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছে সে প্রদীপ্ত প্রেমের বৈচিত্র খুঁজতে গিয়ে আজ এক বিকৃত রূপ ধারণ করেছে। নিজের পছন্দের পাত্রকে বিয়ে করার ফলে যদি কোনো সমস্যার সম্মুখীন নারী হয় তবে সে সেই কথা সহজে পরিবারদের সাথে ভাগ করে নিতে পারে না কারণ একজন নারীর মধ্যে এই প্রবণতা কাজ করে যে সেক্ষেত্রে পরিবার তাকেই দোষী বলে ঘোষণা করবে। এই একই প্রবণতার প্রকাশ দেবলীনার মধ্যেও ছিল যার ফলে সে সবটা যতদূর সম্ভব সহ্য করে গেছে। আর এই সহনশীলতার জেরে অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। দেবলীনার স্বামীর এই পরিবর্তনের পূর্বে তাদের দুজনের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ছিল। যে প্রদীপ্ত একটা সময় দেবলীনা ছাড়া কিছুই বুঝতো না পরে সেই প্রদীপ্তের মুখে আমরা শুনি, 'যতদিন প্রেম ছিল ঠিক ততদিনই। যতদিন স্বামী সুলভ দায়িত্ববোধ ছিল ঠিক ততদিনই। শ্রীলতা প্রদীপ্তের জীবনে আসায় স্ত্রীর প্রতি সব প্রেম নিঃশেষ হয়ে গেছে।'[২] এ যেন প্রদীপ্তের এক প্রকার ঘৃণা প্রকাশ পাচ্ছে দেবলীনার প্রতি। এটা যে প্রদীপ্তের জীবনের প্রথম পদস্খলন তা নয় এর পূর্বেও সে বিভিন্ন নারীর সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছে। তার মধ্যে কিছু কিছু তার ছাত্রী, কেউ কেউ আবার তারই বন্ধুর স্ত্রী। তাই এ স্বভাব যেন প্রদীপ্তের রক্তে মিশে গেছে। ছাত্রীদের বাড়িতে পড়ানোর সময় প্রদীপ্ত যে নোংরামিগুলো করতো তারও প্রমাণ পাই আমরা দেবলীনার বাড়ির পরিচারিকা পারুলের মুখ থেকে। এই পরিচারিকা পারুলই একদিন আবিষ্কার করেছিল যে

প্রদীপ্ত ছাত্রী পড়ানোর নাম করে দরজা বন্ধ করে এক প্রকার ব্যভিচার চালাচ্ছে দেবলীনার অলক্ষ্যে, এবং সেই পরিচারিকা পরবর্তী সময়ে দেবলীনাকে সেসব বিষয়ে অবগত করালে প্রদীপ্ত দেবলীনাকে ভুলভাল বুঝিয়ে সেসব বিষয় এড়িয়ে যায়। কিন্তু যদি আমরা শুরু থেকে দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে প্রদীপ্তের চরিত্রের মধ্যে এক প্রকার মিশে গেছে মুখ বদলের খেলা। একমুখ ওর বেশি দিন পছন্দ হয় না, তাই রুচি পাল্টাতে সে নারী পাল্টায় এবং ঘনঘন নারীর সঙ্গে লিপ্ত হয়ে পড়ে। যার ফলে শেষমেষ তাদের সংসার দু'টুকরো হতে বাধ্য হয়েছে। এখানে যে শুধুই প্রদীপ্ত দোষী তা একতরফা বলা যায় না কারণ যেসব নারীদের সঙ্গে প্রদীপ্ত ঘনিষ্ঠতায় লিপ্ত হয়েছিল সেসব নারীরাও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি কিংবা সাময়িক সুখ লাভের বাসনায় এ ধরনের অবৈধ সম্পর্কে সিলমোহর দিয়েছিল। তাই একদিক দিয়ে দেখতে গেলে এক নারীই অন্য নারীর সংসার ভাঙার জন্য দায়ী হয়ে পড়ছে এক্ষেত্রে।

যে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর এত অনীহা সেই স্ত্রী দেবলীনাকে একটা সময় ভালোবেসে অর্থাৎ দীর্ঘ প্রণয়ের পরিণতি স্বরূপ প্রদীপ্ত বিয়ে করেছিল। তখন দেবলীনা ছিল প্রদীপ্তের চোখের মনি। কিন্তু এই ভালোবাসা আজ আর নেই। দেবলীনা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ওর চোখের বালি। দেবলীনা এখন প্রদীপ্তের কাছে একরকম একঘেয়েমিতে পরিণত হয়েছে। কারণ দেবলীনার চাইতে প্রদীপ্তের ছাত্রী শ্রীলতা অনেকটা বেশি মন ভরাতে জানে প্রদীপ্তের। শ্রীলতার যৌবনের প্রতি প্রদীপ্তের এক প্রকার লোভ জন্ম নিয়েছে যে লোভ থেকে সে স্ত্রীকে অবহেলার পাত্র করে রেখেছে। এই অবহেলা যখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছে তখন তৈরি হয়েছে দুজনের মধ্যে নানা অশান্তি এবং এর বিনিময়ে দাম্পত্যে এসেছে ভাঙন। এই ভাঙন যে একা দেবলীনার দাম্পত্যের বর্ণনা দিচ্ছে তা নয়, দেবলীনার মতো হাজারো নারীর জীবন যন্ত্রণার গল্প লুকানো রয়েছে এই ভাঙনে।

দেবলীনা স্বাবলম্বী একজন নারী। সে প্রতিষ্ঠিত নিজের জীবনে। মাস গেলে তার আয়ের উৎস থেকে কম হোক বা বেশি মোটামুটি খেয়ে পড়ে কাটিয়ে দেবার যোগাড় হয়ে যায়। অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী এই মেয়েও সাংসারিক হেনস্তার প্রভাবে মানসিকভাবে এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছে যে সংসার চালাতে সেই হিমশিম খাচ্ছে। কারণ, যে প্রদীপ্তকে সে ভালোবেসে বিয়ে করেছিল সেই প্রদীপ্তের এই পরিবর্তনতার মানসিক অবস্থায় আঘাত এনেছিল। দেবলীনা কিছুতেই ভাবতে পারছিল না যে এ ও সম্ভব। কিন্তু প্রদীপ্তের ক্ষেত্রে এখন সবটাই সম্ভব। সে জীবনে বৈচিত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে, এবং সে বৈচিত্র্যময় জীবনে যখন দেবলীনা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন তার এক প্রকার রাগ হয় নিজের ওপর। সেই রাগ থেকে সে ভাবতে থাকে যে কেন সে মাত্র ২৫ বছর বয়সে ছাদনাতলায় বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিল একটি মেয়ের হাত ধরে? কেনই বা সে নিজের মনকে বিকিয়ে দিতে গেল দেবলীনার কাছে? দেবলীনার মধ্যে কি এমন স্বর্গের সুখের খোঁজ পেয়েছিল সে? অথবা দেবলীনাই বা কেন হঠাৎ করে তার কাছে অসাধারণ হতে গেল? সেই অনুশোচনাই যেন প্রদীপ্তকে ঘিরে ধরেছে। এই অনুশোচনার আগুনে সে রাত দিন জ্বলছে। এর ফলে তার মধ্যে প্রতিনিয়ত নানা পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছে।

জীবনটা আসলেই একটা নাটক। আজকের একরকম মানুষ কালই দুম করে অন্যরকম হয়ে যায়। কিন্তু একজন ব্যক্তির এই বিচিত্র স্বাদের চাহিদায় বদলে যাওয়ার কারণে নষ্ট হয়ে যায় বহু মানুষের জীবন, বহু সম্পর্ক। প্রদীপ্তের ক্ষেত্রেও তার অন্যথা হয়নি। তার এই পরিবর্তনকে ঘিরে তছনছ হয়ে গেছে তার স্ত্রী দেবলীনা এবং মেয়ে মৌরীর জীবন। যারা নিজেদের জীবনটা কল্পনা করেছিল এই প্রদীপ্তকে ঘিরে, তাদের সব চাওয়া পাওয়া একলহমায় মিটিয়ে দিয়ে প্রদীপ্ত চলে গেল নিজের রুচি বদলাতে। যে রুচি বদলের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে নিজের মেয়েকে তাচ্ছিল্য ভরে অবজ্ঞা করে সেই পিতার পিতৃত্ব নিয়ে এখানে পাঠক মনে প্রশ্ন জাগে। সে আদৌ কেমন পিতা? সংসার, সম্পর্ক এসব যেন তার কাছে কিছুই নয়। ঘর বাঁধা এবং ঘর ভাঙা যেন তার একটা নেশায় পরিণত হয়েছে। আর এই নেশার বশে প্রদীপ্ত সবটা তোয়াক্কা না করে শুধু নারীসঙ্গে ঘনিষ্ট হয়ে পড়েছে বারংবার।

একটা সময় আমরা দেখেছি সমাজ সংস্কারের ভয়ে দেবলীনা শারীরিক-মানসিক বিভিন্নভাবে নির্যাতন শিকার করেও সংসারকে টিকিয়ে রাখার দায়ে সবটা মানিয়ে নিয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে সে সব প্রতিবন্ধকতাকে তোয়াক্কা না করে বেরিয়ে এসেছিল মুক্তির খোঁজে। এখানে এই দেবলীনা চরিত্রটির মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে সমাজের দুই স্তরের নারীর মানসিকতার চিত্র একপ্রকার তারা যারা নানা অসহনীয় অত্যাচারকে স্বামীর অধিকার বলে মেনে নেয় এবং আরেক দল তারা যারা প্রথা ভেঙে প্রতিবাদের সরব হয়ে উঠে। দুই শ্রেণীর নারীর প্রতিনিধিত্ব করছে এখানে দেবলীনা।

এই দেবলীনা স্বাবলম্বী তবুও তার মধ্যে যেন সম্পর্কে একরকম হেরে যাওয়ার আর্তনাদ লুকিয়ে রয়েছে। দেবলীনা শিক্ষিত আধুনিক নারী কিন্তু তাকে তার স্বামীর জন্য নানারকম ভাবে নিজের কর্মজগতে গঞ্জনার শিকার হতে হয়েছে। প্রদীপ্তর কাছে যারা পড়তে আসতো তারা তাদের গুরুপত্নীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতো এবং বৌদি বলে ডাকত সেই ছাত্রগুলোই একটা সময় দেবলীনার অবস্থা দেখে অত্যন্ত আপ্লুত হয়ে পড়ে। আমরা দেখি উপন্যাসে সে ছাত্রগুলি প্রায়ই দেবলীনার সাথে দেখা করতে আসত এবং দেবলীনার প্রতি তাদের যে সম্মান সে সম্মান থেকে তারা দেবলীনার এরূপ হেনস্তা কিছুতেই সহ্য করতে পারত না আমরা তাদের বলতে শুনি, 'যদি বলেন তো ওদের পিটিয়ে দিই।

> 'দেবলীনা বলত, - কি হবে পিটিয়ে? ও নিজেই একদিন ওর ভুল বুঝতে পারবে ।
> ভুল কি বলছেন বউদি। এর আগেও স্যার দু'তিনটে মেয়ের সাথে নোংরামি করেছেন। তবে তাদের নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে লিভ টুগেদার করার সাহস অবশ্য করেননি। এই মেয়েটিও আসলে একেবারে বাজে। রুটলেস ফ্যামিলির মেয়ে। নইলে কি আর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আর একজনের সঙ্গে লিভ টুগেদার করে?'[৩]

তারা তাদের সমবেদনার জায়গা থেকে দেবলিনার প্রতি নিজেদের সমবেদনা দেখিয়েছে এবং দেবলীনা এর সাথে হওয়া নির্যাতনের প্রতিবাদ করতে চেয়েছে। যদিও দেবলীনা তাদের সায় দেয়নি কারণ তার মন মানসিকতা তখন এক প্রকার ভেঙে গেছে এবং সে মানসিকতা থেকে তার ধারণা যে প্রদীপ্তের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চাইতে মেয়েকে নিয়ে শক্ত হয়ে এ সমাজে টিকে থাকাটাই হবে তার আসল প্রতিশোধের বার্তা। এছাড়াও তাকে নানা জনের কাছে নানা তীর্যক কথায় অপমানিত হতে হয়েছে। এই যে প্রতিনিয়ত পরকীয়া কিংবা অবৈধ প্রেমের দায়ে একটা করে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়া তা বর্তমান দাম্পত্যের রসায়নকে দিন দিন নিম্ন মাত্রায় পৌঁছে দিচ্ছে। সমাজ-সভ্যতা যতটা আধুনিক হয়েছে তার সাথে সাথে সমস্যাগুলোরও নবীনীকরণ হয়েছে এবং এর পরবর্তীতে নারী-পুরুষের দাম্পত্য রসায়ন যেন কোথাও গিয়ে এক অনিশ্চয়তায় ঠেকেছে।

সেই দাম্পত্য বিলম্বনার জড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় তার উৎস সন্ধানে ঔপন্যাসিক 'ছেঁড়া ঘুড়ি' উপন্যাসটির সিরিজ স্বরূপ রচনা করেছেন 'ঝড়ের পরে' উপন্যাসটি। এই উপন্যাসের নামের মধ্যে দিয়েই বোঝা যাচ্ছে যে পূর্ববর্তী উপন্যাসের নায়িকা দেবলীনার বৈবাহিক জীবনে যে ঝড় এসেছিল সেই ঝড়ের পরে তার জীবনের অবস্থা কিরূপ ছিল তা নিয়ে ঔপন্যাসিক এই সিরিজটি রচনা করেছেন, যেখানে আমরা দেখি দুজন নারী-পুরুষের দাম্পত্য কলহের জেরে একজন সন্তান কতটা হেয় প্রতিপন্ন হয় এবং সেই বিচ্ছিন্নতার কারণে সন্তানের যে হেনস্তার পরিস্থিতি তৈরি হয় তার প্রমাণ এই মৌরী চরিত্রটি। যে মা-বাবার মাঝখানে অদৃশ্য সুতোর মতো ঝুলছে, সে না পাচ্ছে মায়ের সম্পূর্ণ আদর না পাচ্ছে বাবার ভালোবাসা, দুজনকে একসাথে নিয়ে থাকার তার যে বাসনা তা প্রায় অসম্ভব। মনে মনে মেয়েটা চায় বাবা-মা সবাই মিলেমিশে একই ঘরে থাকতে কিন্তু তা যখন হয় না তখন সে ধীরে ধীরে মনমরা হয়ে পড়ে। বাবার সঙ্গ ছাড়ার পর থেকে যেন মৌরীর জীবনের সব আনন্দগুলো চলে গেছে। এই উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে দাম্পত্য হেনস্তার ফলে সন্তানদের যে পেন্ডুলামের মতো ঝুলতে হয় তার প্রমাণ পাই উপন্যাসের আরও একটি খুদে চরিত্র দেবাপমের মধ্যে। সেও মা-বাবার সম্পর্কে টানাপুর এনের মধ্যে ঝুলছে। এই দেবাপম মৌরীর সাথে একই ক্লাসে পড়ে এবং দু-জনের মধ্যে এই মা-বাবার বিচ্ছেদের বিষয় নিয়েই আলোচনা চলতে থাকে। একজন সন্তানের মা-বাবার প্রতি এক প্রকার মায়া থাকে যে মায়া থেকে তারা একসাথে মা-বাবা দুজনকেই পেতে চায়, আর যখন তারা পায়না তখন তাদের মধ্যে একপ্রকার একাকীত্ব কাজ করে যে একাকীত্ব থেকে মৌরীকে বলতে শুনি,'মা, বাবা কবে আসবে? আবার আসবে তো? মা বলেছে, নিশ্চয় আসবে। এইতো সবে তিনদিন হল। না এসে পারবেই না ।

হ্যাঁ, সেই আশা নিয়েই মৌরী দিন গুনছে। আঙুল গুনে ও দেখল, পুরো তিনদিন তার মানে কাল-পরশুই বাবা আসবে। আজও তো আসতে পারে। বাবা যদি আসে, মৌরী আর কিছুতেই যেতে দেবে না। ও খুব কাঁদবে। বাবাকে জড়িয়ে ধরে আটকে রাখবে।'[৪] এই যে সন্তানের পিতার প্রতি স্নেহ তা যেন নিষ্পাপ এক মায়া যাকে এক পিতা

অবলীলায় উপেক্ষা করে অবৈধ প্রণয়ে ব্যস্ত। সাংসারিক দোলাচলতার প্রভাবে যে প্রতিটি সন্তান কতটা ভুক্তভোগী হয় তার প্রমাণস্বরূপ উপন্যাসে উঠে এসেছে এই মৌরী চরিত্রটি।

'ঝড়ের পরে' উপন্যাসের শেষে যখন দেখি প্রদীপ্ত মৌরীদের ভাড়া বাড়িতে আসে মৌরীর ভরণ পোষণের দায় সারতে তখন মৌরী বাবাকে নিয়ে মনে মনে অনেক স্বপ্ন বোনে কিন্তু সেই স্বপ্নে ভাঁটা পড়ে যখন মৌরী ঘর থেকে বাইরে এসে মাকে জিজ্ঞেস করে, 'মা, বাবা কোথায়?

- বাবা চলে গেছে ।

- মৌরী ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। বলল, আমাকে কেন ডাকলে না?

দেবলীনা বলল, তোমাকে তো তোমার বাবা ডাকেনি। তাই আমি আর ডাকিনি। মৌরী অভিমানহত গলায় বলল, আমি ছুটে গিয়ে বাবাকে ডেকে আনি?'[৫] এখানে দেখা যাচ্ছে মা-বাবার দাম্পত্য যুদ্ধের শিকার হচ্ছে ওই নিষ্পাপ শিশুটি। যে শিশুটি এই যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে অবগত নয়, সে শুধু তার বাবাকে মায়ের সাথে প্রতিনিয়ত দুর্ব্যবহার করতে দেখেছে এবং সে অত্যাচারের ফলে তার মা যে এক প্রকার ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তাও এই শিশুটি বুঝতে পারছে। কিন্তু বাবার প্রতি যে এক অমোঘ মায়া সেই মায়া থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারছে না কিছুতেই তাই বারে বারে বাবাকে অন্বেষণ করছে সে তার দৈনন্দিন জীবনে। একটা সময় যে জটিলতা গুলোর দায়ে মা এবং মেয়ে আলাদা হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে জটিলতা এই শিশুটির বোঝার কথা নয়। কিছু সময় পরে তার মাথা থেকে সেসব জটিলতা বেরিয়ে গেছে। সে বাবার সাথে কাটানো ভালো সময়গুলোকে বারংবার উপভোগ করতে চাইছে আবার ফিরে পেতে চাইছে সেই নন্দিত শৈশবকে। যে শৈশবে বাবা মায়ের ছাত্র ছায়ায় তার দিনগুলো স্মরণীয় দিন হয়ে উঠতো। স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের প্রতি বিরূপ মনোভাবের ফলে মৌরী বাবার স্নেহের পরশ পাওয়ার আগেই বাবার থেকে আলাদা হয়ে পড়ে। বর্তমান সমাজে দাম্পত্যে ভাঙ্গন প্রায়ই দেখা যায় কিন্তু এর ফলশ্রুতিতে যে সন্তানদের মন-মানসিকতায় কি প্রকার প্রভাব পড়ে তা কেউ গভীরে গিয়ে ভেবে দেখেনা।

বিশ্বায়নের এই যুগে নারী-পুরুষ উভয়েই এগিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন ভাবে। কিন্তু এই অগ্রসরের পথেও নারীর বহু বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পারিবারিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতার মোকাবেলা করতে হয় তাদের। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে নারী-পুরুষের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যেও আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূলতা। সেই প্রতিকূল সম্পর্কে প্রভাব তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক কণা বসু মিশ্র তাঁর এই দুটি উপন্যাসে। যেখানে প্রথম সিরিজে তিনি তুলে ধরেছেন অবৈধ প্রণয়ের কারণে কিভাবে সংসার ভেঙে যাচ্ছে এবং দ্বিতীয় সিরিজে দেখিয়েছেন মা-বাবার দাম্পত্য কলহের বোঝা কিভাবে সন্তানকে বয়ে বেড়াতে হয়। যা আজকের সমাজের কঠিন বাস্তবতা, যে বাস্তবতা থেকে আমাদের উত্তরণের বার্তা দিতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে।

তথ্যসূত্র:

১. বসু মিশ্র, কণা, চেনা মুখের মিছিল, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ২০২১, পৃষ্ঠা- ৫৬
২. বসু মিশ্র, কণা, চেনা মুখের মিছিল, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ২০২১, পৃষ্ঠা-৬০
৩. বসু মিশ্র, কণা, চেনা মুখের মিছিল, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ২০২১, পৃষ্ঠা-৯২
৪. বসু মিশ্র, কণা, চেনা মুখের মিছিল, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ২০২১, পৃষ্ঠা-৮৫
৫. বসু মিশ্র, কণা, চেনা মুখের মিছিল, প্রথম সংস্করণ বৈশাখ ২০২১, পৃষ্ঠা- ১০৪

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ:

১. বসু, মিশ্র, কণা, চেনা মুখের মিছিল, গার্গী প্রকাশনী, কলকাতা ৭০০০১৪, প্রথম সংস্করণ ১ লা বৈশাখ ২০২১

সহায়ক গ্রন্থ:

১. আজাদ, হুমায়ূন, নারী, কাকলী প্রকাশনী, কলকাতা ৭০০০৬৭, প্রথম সংস্করণ জুন ২০১৭
২. গুহ, লতিকা, স্ত্রী লিঙ্গ, দীপায়ন, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ২০২১
৩. চক্রবর্তী, সম্বুদ্ধ, অন্দরে অন্তরে উনিশ শতকের বাঙালি ভদ্রমহিলা, স্ত্রী, কলকাতা ৭০০০২৬, প্রথম সংস্করণ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 888-895
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.081

বনফলু: এক প্রেমানুভবী শিল্পী সত্ত্বা

দেবশ্রী পণ্ডা রায়, *বাংলা বিভাগ, সাঁওতাল বিদ্রোহ সার্ধশতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.03.2025; Send for Revised: 25.03.2025; Revised Received: 27.03.2025; Accepted: 28.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Banaful, a poet, a sensitive artist, whose soul's humanitarian appeal is woven with threads of love. Balaichand's tales are not so much about romantic love, but rather a profound subdued yearning. In his stories, we can see the sweet, idealized form of conjugal love. At the same time a stark realistic portrayal of married is also found. The main reason as he explores in his stories is the financial struggle and racism. There are numerous factors underlying the social dynamics of male-female social relationships. Banaful's tales evoke a yearning for the union of loved that transcends its fulfillment stirring the mind with the poignant sorrow of separation. It can be said that his characters are compelled to relinquish their love in deference to social obligations. Not everyone can defy societal and familial norms to give their love a lasting culmination. The sweet memories of youth's tender union are scattered, carried away by the autumnal winds of age, alongside the withered leaves. Banaful's tales frequently conclude on a melancholic note, imbuing the character's lives with a poignant romantic nostalgia. Balaichand, amidst the contemporary tough time, has cherised life and rested in the shade of his own existence. There is discernible tendency for our thoughts to be influenced by a lingering hesitation, veiled by conventional ideologies. Among these, the fictionalized portrayal of Balaichand's nature akin to a gentle breeze has been revealed through his storytelling.

***Key Words**: Romantic, Love, Separation, Love Experience, Revelation*

সৃষ্টি সূচনার শুভলগ্নে পৃথিবীতে এল প্রথম পুরুষ আদম্ ও প্রথম নারী ইভ্। এদের মিলনের ফসল হিসেবে সৃষ্টি হল মানব সভ্যতার। তখন সেই 'গহন কুসুমকুঞ্জ মাঝে' পাখির কলতানই হয়ে উঠেছিল মধুর ধ্বনি। সমস্ত বাঁধন খুলে হৃদয়ের কুণ্ঠিত কথা কণ্ঠনালি বেয়ে সমর্পিত হতে চাইল অন্যের বাহুডোরে। একাকিনী কাননে সোনালি রোদের খেলা আর পরস্পরের প্রতি স্পৃহাহীন আত্মগত সমর্পণ সভ্যতার ইতিহাসের অগ্রগতির বার্তা বহন করে আনল। তার বহুযুগ পরে কবি সমস্ত কাজের মধ্যে উচ্চারণ করলেন— "প্রেমের জোয়ারে ভাসাবে দোঁহারে।" এই 'দোঁহা' বা 'দুহু'র ভাবনা যদি প্রেমের একক রূপে ধরা যায় তবে পদাবলীর চণ্ডীদাস হয়ত বা সেই ভাবনা তাড়িত হয়ে তাকে বিশ্বময় ব্যাপ্ত করার উচ্চারণ করেন—

'শুনহ মানুষ ভাই,
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'[১]

নরনারীর মিলনের সংকীর্ণ ভাবনায় বাঁধনকে ছিন্ন করে বিশ্ব কবির গানের পংক্তিগুলি অজান্তেই মনের মধ্যে গুনগুন করে ওঠে—

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো
নয়ক বনে, নয় বিজনে,
নয়ক আমার আপনমনে,
সবার যেথায় আপন তুমি, হে প্রিয়
সেথায় আপন আমারো।"[২]

শিল্প-সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রেম হল অন্যতম উপজীব্য বিষয়। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রেমের অনুভূতিকে শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা দেয়। এ সত্ত্বেও বলা যায় শিল্পীর তুলি আর সাহিত্যিকের লেখনীতে পাঠকের দরবারে তা উপস্থিত হয় বিচিত্র রূপ, রস গন্ধ ও অর্থবহ ব্যঞ্জনায়। কবি সাহিত্যিকরা প্রেমের ভুবন নিয়ে বিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে অনুভববেদ্য আলেখ্য রচনা করেন।

বনফুল এরকমই একজন অনুভবী শিল্পী ব্যক্তিত্ব। যাঁর মানবিক আবেদন প্রেম ভাবনাকে করে তুলেছে বর্ণময়। বলাইচাঁদের গল্পে প্রেম নিছক রোম্যান্টিক ভাবনাজাত বিষয়ক নয়। তাঁর গল্পে দাম্পত্য প্রেমের মিঠে রূপ যেমন আমরা দেখতে পাই তেমনি বিবাহের পরিণতি না পাওয়া সম্পর্কের চিত্রও বড় বেশি করে দৃষ্টিগোচর হয়। এর মূল কারণ স্বরূপ অর্থনৈতিক ও বর্ণবৈষম্যকেই তুলে ধরছেন লেখক তাঁর গল্পে। আরও বিবিধ বিচিত্র কারণ নর-নারীর সম্পর্কের সমাজস্বীকৃত পরিণতিতে প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়েছে।

"মিলনে আছিলে বাঁধা শুধু এক ঠাঁই,
বিরহে টুটিয়া বাধা
আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ প্রিয়ে।"[৩]

রবি কবির এই ভাবনা ভালোবাসার ভুবন সম্পর্কে কতটা সার্থক তা বলা সহজ নয়। তবে বনফুলের গল্পে প্রেমের মিলনাত্মক পরিণতির চেয়ে বিরহ পাঠকের মনকে বিচলিত করে তোলে। বলা যেতে পারে তাঁর প্রেমমূলক গল্পের চরিত্ররা নিজেদের মনের মানসীকে প্রাপ্তির আনন্দ বলি দিয়েছে সমাজের যূপকাষ্ঠে।

"তুমি বিয়ত্রিচের গল্প শুনেছ? যার প্রেমে দান্তে পাগল হয়েছিলেন? শোননি? জোহান যোয়ারের লাইফ পড়েছে? যাতে সেই স্কুল মাস্টার? তাও শোন নি? বেশ, কেষ্ট-রাধার কথা তো জান? এবার ভেবে দেখ দিকি
সেই যমুনার কূলে—"
এবার রমণী বলিল— "আমরা হলাম কৈবর্তের মেয়ে" উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলাম— "হোক, তাতে ক্ষতি সেই। দোহাই তোমার, একটু কাছে সরে এসো।"

বলিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম এক ঝটকায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া সে আরও খানিকটা সরিয়া গেল। আমিও তৎক্ষণাৎ আবার তাহার কাছে গিয়া বসিলাম।
বৃষ্টি শুরু হইয়া গেল। গ্রাহ্যের মধ্যেই আনিলাম না। বলিলাম— "দেখ জীবন খুব ছোট—এই ক্ষুদ্র জীবনে যে শুভ মুহূর্তটি এসেছে নষ্ট কোরো না তাকে। শুনছ? যত টাকা লাগে।"[৪]

—পরস্পর হৃদয় সংবাদী দুই নর-নারী জীবনের ঘ্রাণকে আস্বাদ করতে উন্মুখ 'স্থূলের স্মৃতি' গল্পে।

মনোগহনের প্রস্ফুটিত হৃদয়কুসুম ভালোবাসার সৌরভে আবিষ্ট হয়ে, যতদূর সম্ভব মোলায়েম কণ্ঠে গান গেয়ে উঠল—

> "বুলবুলি তুই ফুল শাঁখাতে
> দিসনে আজি দোল বাগিচায়।"
> "ওকি, অমন করছ কেন?"
> ঝপাং করিয়া ধস ভাঙিল।
> হিসাব করিয়া দেখিলাম, সাড়ে তিন সেকেণ্ড স্থূলাঙ্গিনী আমার কণ্ঠলগ্না অবস্থায় ছিল। এতদুপলক্ষে আমরা উভয়েই স্থূলদেহধারণ করিয়াছি; কিন্তু স্কুলের স্মৃতিটি আজিও মর্মমূলে হূলের মতো বিঁধিয়া আছে।"[৫]

বস্তুত সমাজের এই মিথ্যে আভিজাত্যের অহংকারকে লেখনীর শলাকা দিয়ে বিদ্ধ করেছেন লেখক। গীতায় স্বয়ং কৃষ্ণ বলেছিলেন—

> "চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।"[৬]

দেশকালকে অতিক্রম করে যুগে যুগে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও জাতিভেদ প্রথা বিদ্যমান। অধুনা-কাল অবধি এই প্রথা সমাজ জীবনের বিস্তৃতপটে সহজাত ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধার প্রাচীর দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে নরনারীর প্রণয় যখন সামাজিক জাতিভেদ প্রথার রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করেছে—তখন অধিক ক্ষেত্রে বিচ্ছেদই অনিবার্য পরিণতি রূপে পরস্পরের জীবন প্রবাহকে ভিন্ন গতি প্রবাহী করে তুলেছে। বেদ-পুরাণের যুগেও অসবর্ণ বিবাহের চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। শুধু ভারতবর্ষ নয় পৃথিবীর প্রাচীন নানা গ্রন্থে অসবর্ণ বিবাহের নিদর্শন আমরা পাই। ভিন্ন-জাতি বা ধর্মে বিবাহ ধর্মীয় দিক থেকে স্বীকৃত। কিন্তু বারবার এক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন সমাজবেত্তাগণ।

সবাই সমাজ ও পরিবারের অনুশাসনকে ভেঙে ফেলে সম্পর্ককে পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। যৌবনের স্মৃতি মধুর মিলনাকাঙ্ক্ষা ঝরে পড়েছে বার্দ্ধক্যের পাতাঝরার সঙ্গে সঙ্গে। প্রখর সমাজ-সচেতন শিল্পী বনফুলের বেশিরভাগ প্রেম ভাবনাজাত গল্পগুলির চরিত্ররা জীবন উপান্তে এসে স্মৃতিমধুরতাকে রোমন্থন করেনি। বরং জীবনের বিবর্ণ পাতাগুলি তাদের জীবন সায়াহ্নকে ভারাক্রান্ত করেছে।

বনফুলের গল্পে, আধুনিক শিক্ষিত নারী-পুরুষ অনেক সময় পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে সমস্ত সংস্কারের উর্দ্ধে উঠে নিজেদের প্রেমকে সামাজিক প্রতিষ্ঠা দিতে পারেনি।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর নিজের মনের বার্তা সবসময় প্রাধান্য পাবে না এটাই স্বাভাবিক। শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা, সুরুচি সম্পন্না আধুনিক নারীও কৈশোরের প্রেমকে পরিবারের বিরুদ্ধে গিয়ে পরিণতি দিতে পারেনি। তা ছাই চাপা আগুনের মত মনোগহনে চাপা পড়েছিল। 'ঘটনাচক্র' গল্পের শ্রীমতী উষা নাম্নী চরিত্রের বাবা অন্নদাবাবু যখন শুনলেন—

> "তাঁহার কন্যা মনীন্দ্রমোহন নামক সহপাঠী কৈবর্তযুবকের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, তখন কাল বিলম্ব করিলেন না। বংশ, কুল, কোষ্ঠী, গণ প্রভৃতি দেখিয়া, শ্রীমান ব্রজবিহারী গুপ্তের হস্তে শ্রীমতী উষাকে সমর্পণ করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। ব্রজবিহারী বছর, তিনেক হইল ডাক্তারি পাস করিয়া কলিকাতার রোগীসমুদ্রে পাড়ি জমাইবার চেষ্টায় আছেন। পাড়ি এখনও তেমন জমে নাই। বিবাহের সময় উষা, বাধা দিতে পারেন নাই। মনের সে দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। অত্যন্ত মৃদু নরম মন। এই জন্যই আত্মহত্যা করিবার সঙ্কল্পটাও সুগোপন সঙ্কল্পই রহিয়া গেল— কার্যে পরিণত হইল না।"[৭]

'ঊষা' দেবী মনীন্দ্রকে ভালোবেসে কোনো সঙ্কল্পই রাখতে পারেন নি। মনীন্দ্রমোহন জর্জেটের শাড়ি ভালোবাসতেন। উষাদেবী সঙ্কল্প করেছিলেন জর্জেট আর পরবেন না। কিন্তু জর্জেটের খুব চল হওয়ায় তাঁর প্রতিজ্ঞা ভাঙতে বসেছিল।—

কিছুদিন পর বান্ধবী ছায়া এসে খবর দিল মনীন্দ্রবাবু কলকাতায় এসেছে।

> "ঠিকানাটি হাতে করিয়া উষা দেবী নির্বাক হইয়া বসিয়া রহিলেন। এত কাছে মনি আসিয়াছে। কলেজের অর্ধবিস্মৃত সেই দিনগুলি আবার মনের মধ্যে ভিড় করিতে লাগিল। সেই অতীত দিবসগুলির মাদকতায় সমস্ত অন্তঃকরণ আবার যেন আবিষ্ট হইয়া গেল। সেই ভীরু ভিতু মানুষটি শান্ত নিরীহ নিরহঙ্কার। মনীন্দ্রমোহনের মুখখানা সে যেন মনের ভিতরে সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছিল।"[৮]

কৈশোরের প্রেমের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়েছিল বাস্তবের নিঠুর অভিঘাতে। জর্জেট শাড়ির অনুষঙ্গে প্রতিহত প্রেমের মর্ম বেদনা বারংবার মনের মণিকোঠায় গুমরে উঠছিল। সমস্ত বাধার নিগড়কে ঠেলে ফেলে সে তার সোচ্চার প্রকাশের পদক্ষেপ ঘোষণা করতে পারে নি।

'অধ্যাপক সুজিত সেন' গল্পে ঠিক বিপ্রতীপ ছবিটি পরিলক্ষিত হয়। সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠে বনফুলই যেন অধ্যাপক 'সুজিত সেনের' মেয়ে সুমিতা আর উসমান খাঁ-র মিলনের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রতিষ্ঠা করেছেন। অধ্যাপক সুজিত সেন—

> "হিন্দু-মুসলমানের মিলন তিনি সর্বান্তঃকরণে কামনা করেন।
> এ নিয়ে অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন, বক্তৃতাও দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর মেয়ে একজন মুসলমানকে বিয়ে করেছে এতে তিনি খুশি হলেন না। মেয়ের দিকে চেয়ে দেখলেন মেয়ে আনত চক্ষে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে মুচকি হাসি।
>
> হঠাৎ পাশের ঘরে চলে গেলেন। পাশের ঘর থেকে ফিরে এলেন একটি রিভলবার নিয়ে।
> মেয়েকে বললেন বিবাহে কিছু যৌতুক দিতে হয়। এইটি নাও। যে পথে তুমি পা বাড়িয়েছ সে পথে অনেক বিপদ। বিপদে পড়লে এটি তোমার কাজে লাগতে পারে। রিভলবারটি দিয়ে বেরিয়ে গেলেন তিনি ঘর থেকে।"[৯]

পাঠকের মনের বিপরীত সম্ভাবনার জাল ছিন্ন করে সুজিত সেন মেয়ের সিদ্ধান্তের প্রতি প্রচ্ছন্ন, সমর্থন জানিয়েছেন। জাতের মোহকে অন্তরে অবদমিত করে সুজিত সেন সম্প্রীতির বার্তা বাহক হয়ে উঠেছেন।

বাল্য প্রেমের সারল্যের পরিচয় পাওয়া যায় 'একটু হাওয়া' গল্পে। যেখানে কামনার লেশমাত্র পরিচয় নেই। সদ্য মুকুলিত দুটি হৃদয় পুষ্পের অন্তরানুভূতির অনাবিল উদ্ভাস প্রকাশিত হয়েছে গল্প বর্ণনার পরতে পরতে।

> "মনে পড়ল থুবানের নাম দিয়েছিলাম থেবি। থেবি আমাদের ছেলেবেলাকার বান্ধবী ছিল। আমার বয়স তখন দশ, থেবির পাঁচ বা ছয়। বড়োবিনুনি করে চুল বাঁধত। পরত একটা ছিটের ফ্রক। বেড়ালের মতো গোল মুখ ছিল তার। গড়নটি থ্যাবড়া-থোবড়া। দুজনে একসঙ্গে নানারকম খেলা করেছি। কানা-মাছি-চোর-চোর আরও কত কি। তারপর থেবির বাবা বদলি হয়ে গেলেন। থেবি হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে।"[১০]

ছেলেবেলার হারানো প্রেম জীবনাকাশে মেঘে ঢাকা তারা হয়েছিল। সময়ের পথ আপন গতিতে জীবনের মধ্যগগনে এসে পৌঁচেছে। সেখানে কেবলই নিদারুণ বাস্তবের কঠিন পথ। হঠাৎ এক মহিলা এল গল্প কথকের সম্মুখে।

> "আমাকে চিনতে পারেন?
> অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছি না।"[১১]

এ 'অন্ধকার' বিস্মৃতির অন্ধকার। এখানে অন্ধকার Irony বহন করে আনে। সেই অন্ধকার পেরিয়ে হঠাৎ গল্প কথক শুনতে পান—

> "আমি থেবি। আজকাল স্কুল ইন্সপেকট্রেস হয়েছি। যা গরম। ওয়েটিং রুমে পাখার তলায় বসেছিলাম তারপর দেখলাম একটু হাওয়া উঠেছে ভাবলাম যাই আপনার সঙ্গে দেখা করে আসি। মনে আছে কি আপনার থেবিকে?"[১২]

বনফুলের গল্পে অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রেম রোম্যান্টিক ভাবাতুলতা বা আবেশের আবহ রচনা করেনি। জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্রের মধ্য দিয়ে ভালোবাসার শাশ্বত উপলব্ধির মূহূর্তকে তাঁর গল্পের বর্ণনীয় বিষয়বস্তু করে তুলেছেন। জীবনলগ্ন অভিজ্ঞতাই তাঁর প্রেমমূলক গল্পগুলিতে বিচিত্র উদ্ভাসের সৃষ্টি করেছে। 'তুচ্ছঘটনা' 'যুগলস্বপ্ন' 'ভ্রষ্টলগ্ন' 'জৈবিকনিয়ম' 'যূথিকা' 'তপন' 'প্রজাপতি' অলক্ষ্যে 'চঞ্চলা' গল্পগুলির অনবদ্য বর্ণনভঙ্গী পাঠকের দরবারে প্রেমের বিচিত্র স্বরূপের আস্বাদ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি গল্পকে সীমিত পরিসরে আলোচনা করা যেতে পারে। 'যুগল স্বপ্ন' গল্পটিতে চারজন- দুই যুগল নরনারী, সুধীর ও হাসি, অলকা ও অজয় পরস্পরকে নিয়ে ভালোবাসার স্বপ্ন রচনা করে। কিন্তু গল্পের শেষে দেখা যায় হাসি ও অজয় পরস্পরকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সংসারের স্বপ্ন রচনা করে। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে লিখেছিলেন প্রেমের কল্পনাভিসারে অবগাহন আর বাস্তবের ধূলিমলিন জগতের যাপিত জীবনের পথ ভিন্ন। তা বড় বেশি করে সত্য হয়ে ওঠে এই গল্পে ভিন্ন বাচনভঙ্গীতে।

'জৈবিক নিয়ম' গল্পটি বিষয় ভাবনার নতুনত্বে অনবদ্য আবেদন সৃষ্টি করে। সাবলীল বাচনভঙ্গিতে জীববিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বের জটিল তত্ত্বকে বনফুল বর্ণনা করেছেন গল্পারম্ভে। অনায়াস ভঙ্গিতে জীবনের স্বরূপকে উপস্থাপনই বনফুলের লেখনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবানানুভবের জটিলতম রূপের সহজতম উপস্থাপনে তিনি সিদ্ধহস্ত।

> "জৈবিক নিয়ম অনুসারে যৌবনের ধর্ম এই। মনে হয় বুকটা একটু ফুলাইয়া চলি, মাথাটা একটু উঁচাইয়া রাখি। হাব-ভাবে, চলনে-বলনে পৌরুষের মাহাত্ম্যটা পরিস্ফুট হইয়া উঠুক। মেয়েটি তাহা দেখুক অনুভব করুক, একবারও অন্তত মনে মনে ভাবুক- বাঃ, বেশ ছেলেটিতো! অকারণে কানের পাশ গরম হইতে থাকে, পেশিগুলির মধ্যে শিহরণ সঞ্চারিত হয়, শিরায় শিরায় শোণিত-স্রোতের গতিবেগ বাড়িয়া যায়। যৌবনকালে সকলেরই ইহা হয়। ইহাই নিয়ম। যৌবনের ধর্মই এরূপ বিচিত্র যে, বাহুল্য ও আতিশয্যেই তাহার সহজ প্রকাশ। কারণে অকারণে নিজেকে সাড়ম্বরে বিজ্ঞাপিত না করিতে পারিলে সে স্বস্তি পায় না। সকলেই তাই। নিজস্ব ধরনে নিজস্ব ভঙ্গিতে, নিজস্ব রুচি অনুসারে করে।"[১৩]

অকারণ কাব্যধর্মিতার পথ সযত্নে পরিত্যাগ করে চিকিৎসক বনফুল নিজস্ব নিরীক্ষনী দৃষ্টিভঙ্গিতে মানবদেহে যৌবন আগমনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে চিত্রিত করেছেন। যৌবনে জৈবিক নিয়মের তাড়নায়, গল্পে বর্ণিত যুবকটি একটি মেয়ের মন জয় করতে চায়। নিজের চরিত্রের বাহুল্য দেখানোর জন্য প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো মেয়েটির সামনে চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে পা ফসকে একেবারে চাকার নীচে পড়ে যায় যুবকটি। পূর্ণ বসন্ত অকালে ঝরে যায় নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে। গল্পের শেষে চরিত্রের এরকম ট্রাজিক পরিণতি বনফুলের পক্ষেই সম্ভব।

একই বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে বিবিধ situation তৈরি করা বনফুলের লেখনীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। 'জৈবিক নিয়ম' গল্পটির বিপরীতধর্মী গল্প হল 'যূথিকা"। উত্তম পুরুষে বর্ণিত গল্পটিতে প্রেমের মিঠে রূপ প্রকাশিত। একদিকে যৌবনে প্রেমিক হৃদয়ের আকুতি, আর অন্যদিকে প্রেমিকার চপলতা গল্পটিকে স্বতন্ত্র মাধুর্য দান করেছে।

প্রকৃতির রূপ-রস-গন্ধ মানব জীবনে বেঁচে থাকার রসদ জোগায়। সুশোভিত উদ্যান অন্তরের প্রশান্তি বৃদ্ধি করে। সৌন্দর্যাবেশে মন হয় অভিভূত। মানুষ তাকে যত্ন করে গড়ে তোলে নিজের জন্য। অন্যদিকে অরণ্যানীর মাতাল সমীরণ মন দরিয়ায় মাদকতা নিয়ে আসে। শরীরে সৃষ্টি হয় অকারণ চঞ্চলতা। সমগ্র সত্তা আবিষ্ট হয় দয়িতের পথ পানে চেয়ে। নর-নারী তাদের প্রেম যাপন করে প্রকৃতির আকুল আহ্বানের মধ্যে—

> "আবার এল দখিন হাওয়া, আবার এল ভ্রমরের দল, আবার এল সূর্যকিরণের আহ্বান, প্রতিবেশীদের মিনতি। দেহের শিরায় উপশিরায় সঞ্চারিত হল রসাবেগ। অবরুদ্ধ সৌরভ মথিত করে তুলতে লাগল উন্মুখ চেতনাকে।"[১৪]

'অলক্ষ্যে' গল্পে অরণ্য প্রকৃতির মাঝে সুখীয়া-ভিকুর-প্রেম যাপনের চিত্র পাঠকের অন্তর জগতেও উদ্বেলতার সঞ্চার করে, তারা নিজ প্রেমানুভূতিতে আত্মমগ্ন।

অনতিগম্য বিবিধ মানব-অনুভূতির একটি অংশ রূপে প্রেমকে দেখা যায়। অনুভূতির বিচিত্র ক্রিয়া প্রতিক্রিয়াই পরিগণিত হয় মনস্তত্ত্ব রূপে। মানব চরিত্রের নানান বিপরীতমুখী ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার জটিল আবর্ত নিয়ে দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিকরা গবেষণা করে চলেছেন। তা সত্ত্বেও বলা যায় কবি, সাহিত্যিকরা মানব মনস্তত্ত্বকে সবচেয়ে বেশী পর্যবেক্ষণ করেন। মানব চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে সম্যক অনুধাবন করতে না পারলে সাহিত্যে সার্থক চরিত্রয়ান সম্ভব নয়। বনফুলের সাহিত্যসম্ভার যেন মানব চরিত্রের মেলা। সেখানে জটিল কোনো ভাবনা নেই। কিন্তু মানব মনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুভূতি ছোট ছোট স্কেচের মাধ্যমে গল্পের বিষয় রূপে উঠে এসেছে।

বিবাহ-পূর্ববর্তী নারী পুরুষের প্রেমজ সম্পর্ক এবং তার সামাজিক পরিণতি না পাওয়া নিয়ে বনফুল লিখেছেন 'চিঠি পাওয়ার পর' গল্পটি। গল্পটির বিষয় প্রেমভাবনা হলেও গল্পে, প্রেমিক-প্রেমিকার মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন গল্পটির শরীর নির্মাণকে অনেক বেশী অভিনবত্ব দান করেছে। বনফুলের অন্যান্য অনেক গল্পের মতো গল্প কথকই গল্পের বর্ণনা দিয়েছেন। প্রেমিকা অমিতাকে তিনি বিয়ে করেননি শারীরিক অসুস্থতার জন্য। কিন্তু তাঁর বিশ্বাস—

> "আমার ধারণা, অমিতা আমাকে পাইলে বেশী সুখী হত।"[১৫]

গল্প কথকের ধারণা সত্যি হয়ে অমিতা পাঁচমিনিটের জন্য পাটনা স্টেশনে দেখা করতে চেয়েছে। লক্ষ্মৌ যাওয়ার পথে। চিঠি পেয়ে গল্প কথকের সমগ্র প্রেমিক সত্তা বলে উঠেছে—

> "ভুলি নাই একদণ্ডের জন্যও তোমাকে ভুলি নাই। ভুলিতে পারি না।"[১৬]

প্রেমিকা অমিতা ভালোবেসেছেন একপুরুষকে কিন্তু বিবাহিত জীবনযাপন করেছেন অন্য পুরুষের সঙ্গে। বিয়ের পরও তিনি ভুলতে পারেননি অতীতের প্রেম সম্পর্কের বর্ণসুষমাকে। নিজের Id প্রবৃত্তিকে অবদমন করে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে নিরন্তর অভিনয় করে চলেছেন সুস্থ মানসিক সম্পর্কের। সেইজন্যই হয়ত গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণনা করা হয়েছে। সমাজজীবনে আমরা নিজেদের ব্যক্তিগত ইচ্ছেকে অবদমন (suppress) করে জীবনযাপনে অভ্যস্ত হই। এই অবদমন থেকে শুরু হয় মানসিক টানাপোড়েন। অপূর্ণ প্রেমজ সম্পর্ককে অমিতা ভুলতে পারেনি। আবার স্বামীর প্রতি সম্পূর্ণ সমর্পিত হতে পারেনি। আমাদের যাপিত জীবন কি শুধুই অভ্যাস? ভালোবেসে জীবনের ঘ্রাণকে আমরা ক'জন উপলব্ধি করি। সাবলীল বর্ণনায় অমিতার মনের দোলাচলতা গল্পে চিত্রিত হয়েছে।

বহুমুখীনতা মানব চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। নবেন্দু ও সুরেন কে কেন্দ্র করে 'নারীর মন' গল্পে সুমিতার প্রেম-যাপনের চিত্র উঠে এসেছে। তার সঙ্গে দুই পুরুষ চরিত্রকে কেন্দ্র করে সুমিতার মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন সৃষ্টি হয়েছে। স্বল্প রোজগেরে সুমিতা তার আর্থিক অস্বচ্ছলতাকে নিবারণ করতে মনের মধ্যে বিয়ের ইচ্ছে পোষণ করেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে সুরেনকে কড়াভাবে জবাব দিয়েছে—

> "আমি যতদিন পর্যন্ত ভালোভাবে রোজগার করতে না পারি ততদিন বিয়ে করব না ঠিক করেছি। কারো গলগ্রহ হবার ইচ্ছে নেই।"[১৭]

দুই পুরুষকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে সুমিতার মন-দ্বন্দ্ব (inner-conflict)। সুরেন আর নবেন্দুর মাঝে শেষপর্যন্ত নবেন্দুকেই নির্ধারণ করেছে সুমিতা।

বনফুলের হাতে মানব মনের বিচিত্র রূপ কদাকার হয়ে ওঠেনি। তবে প্রেমকে ঘিরে গভীর বিষাদের ছবি এঁকেছেন 'ধনী-দরিদ্র' গল্পে। 'চিঠি পাওয়ার পর' গল্পে প্রেমিকার প্রিয় জিনিস আহরণের উৎসাহে প্রেমিক ঘড়িতে দম দিতে ভুলে গিয়েছিল। তারফলে তার মনে নেমে এসেছিল বিষাদের ছায়া। 'ধনী-দরিদ্র' গল্পে মহেশ দাশের জীবনে নেমে এসেছে বিষাদের ছায়া। গল্পের মধ্যে মানব মনের নানান স্কেচ ফুটে উঠেছে সহজ ভাষায় বর্ণনার মধ্য দিয়ে।

বিধবা মায়ের একমাত্র ছেলে ধনী নির্মলশঙ্করের মেয়ে জয়শ্রীকে প্রথমে বিয়ে করতে রাজী হননি।

> "নির্মলশঙ্করবাবু নিজে আরও দুবার এলেন, লোক পাঠালেন কয়েকবার। দরিদ্র মহেশের ক্ষুধিত অহংকারটা তৃপ্ত হল বোধহয়, কিংবা হয়তো আরও কিছু...। রাজি হয়ে গেল শেষপর্যন্ত"[১৮]

স্ত্রী জয়শ্রীর সঙ্গে অবনীর ঘনিষ্ঠতা চোখ এড়ায় নি মহেশ দাশের। কিন্তু যখন সে শুনল তাকে না জানিয়ে জয়শ্রী অবনীর সঙ্গে দেখা করেছে তখন সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি। বিবাহিত স্ত্রীর তার প্রতি অবহেলা— মহেশের সমস্ত সত্তা প্রতিবাদ করে উঠল—

> "রাত্রে ঘুম এল না। কিছুতেই এল না। ক্রমাগত এপাশ ওপাশ করতে লাগল সে। অবনী সেন? কী এমন আছে লোকটার মধ্যে। চেহারা ভালো, ভালো বাঁশিও বাজাতে পারে। তাতে কী! জয়শ্রী অবনীকে খবর দিয়েছে মৃণালপুরে যাবার জন্যে, অথচ তাকে কিছু লেখেনি, এর মানে কী? সে যে সিমলা থেকে চলে এসেছে এ খবরই তো জানে না সে! আশ্চর্য!"[১৯]

জামাই হিসেবে নিজের সম্মানবোধকে বিসর্জন দিয়ে জয়শ্রীর বাপের বাড়ি গিয়ে অবনীর বাঁশির সুরে জয়শ্রীর গান শুনতে পায়। তপ্ত হৃদয় বহ্নি দাহে অন্তরের চেতনাবোধ লুপ্ত প্রায় মহেশের। লোহার গেট টপকে লুকিয়ে বাড়িতে ঢুকতে গিয়ে বাড়ির পোষা অ্যালসেশিয়ান কুকুরের কামড়ে মারা যায় মহেশ। অবনী সেনের প্রতি প্রেমানুরক্ত জয়শ্রী মন থেকে মহেশকে মেনে নিতে পারেনি। নিয়তির বিড়ম্বনায় মহেশ দাসের জীবনে নেমে এসেছে নির্মম পরিণতি।

'তপন' গল্পের ট্র্যাজিক পরিণতি একটু ভিন্ন প্রকৃতির। দেশের জন্য সমর্পিত তপন ব্যক্তি প্রেমকে হারিয়েছিল। চপলা তপনের জন্য অপেক্ষার প্রহর না গুনে রায় বাহাদুরের গলায় বরমাল্য দান করে। তপন জেল থেকে ফিরে চপলার সঙ্গে জীবনের সূত্র রচনার জন্য উপস্থিত হয়। প্রেমের স্বীকারোক্তি সত্ত্বেও "চপলার কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া গেল।"[২০] অনুভবী তপন একদা মনসঙ্গী চপলার হৃদয় অনুরণনকে বুঝতে পেরে জীবনের গতিকে ভিন্ন পথগামী করে। নারী হৃদয়ের মর্মমথিত বেদনার আলেখ্য রচনায় রবীন্দ্রনাথ অতুলনীয়, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শিল্পী। জগদীশ গুপ্তের গল্পে প্রেমের স্নিগ্ধ রূপ অনুপস্থিত। তাঁর গল্পে প্রেম যৌনতা নির্ভর ও বিকৃত কামানা আশ্রয়ী। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বানুসারী নর-নারীর জৈবিক আকর্ষণের বিচিত্র বিন্যাসই প্রেমের রূপকল্প বিধৃত। সেই সঙ্গে মানব মনের তমোগহনের বিসর্পিল কূটৈষণা ও মনোবিকলনই তাঁর গল্পের প্রধান আশ্রয়। সুবোধ ঘোষ মানব চরিত্রের গহন অলিন্দে পদচারণা করলেও মানিকের মতো মনোবিকলনের আবর্তে তলিয়ে না গিয়ে বিচিত্রস্বাদী স্বার্থক প্রেমের গল্প লিখেছেন। তাঁর গল্পে প্রেম আসে নিঃশব্দ চরণপাতে, শিউলীফুলের মতো, জ্যোৎস্নার ভোরের মতো। সমালোচকের মতে এই মন্তব্য সার্থক।

বনফুল সমকালে রুক্ষতার মধ্যেও জীবনকে ভালোবেসেছেন তার ছায়াতলে বসে। আমাদের সনাতনী ধারণার ভেতরে মনের বিচিত্র জটিলরূপ দোলাচলতা, নিরন্তর লুকিয়ে থাকে— একথা স্বীকার্য। কিন্তু এসবের মধ্যেও বনফুলের প্রকৃতির মতো মিঠে ভাবটি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর বর্ণনায়।

তথ্যসূত্র:

১. মজুমদার, বিমানবিহারী (সম্পা.), চণ্ডীদাসের পদাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা- ৬, পৌষ, ১৩৬৭, পৃ. ১৮।

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৯১০, পৃ. ৩৮৩।

৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সোনার তরী, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩০০ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১০১।

৪. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুলের ছোটোগল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), বাণীশিল্প, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: মে ২০১৯, পৃ. ৪৭।

৫. তদেব, পৃ. ৪৭।

৬. শ্রীমদ্ভগবদগীতা, গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর, পৃ. ১৩।

৭. মুখোপাধ্যায, বলাইচাঁদ, বনফুলের ছোটোগল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), বাণীশিল্প, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: মে ২০১৯, পৃ. ১৫০।

৮. তদেব, পৃ. ২৪৪।

৯. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুলের ছোটোগল্প সমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড) বাণীশিল্প, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৬, পৃ. ৬৮৬।
১০. তদেব, পৃ. ৬৩১।
১১. তদেব, পৃ. ৬৩১।
১২. তদেব, পৃ. ৬৩১।
১৩. মুখোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ, বনফুলের ছোটোগল্প সমগ্র (প্রথম খণ্ড), বাণীশিল্প, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ: মে ২০১৯, পৃ. ১৭৬।
১৪. তদেব, পৃ. ৫১৫।
১৫. তদেব, পৃ. ১৮৭।
১৬. তদেব, পৃ. ১৮৭।
১৭. তদেব, পৃ. ৬৫১।
১৮. তদেব, পৃ. ৬৯২।
১৯. তদেব, পৃ. ৬৯৫।
২০. তদেব, পৃ. ২৭০।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 896- 902
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.082

বিনতা রায় চৌধুরীর গল্পে সামাজিক সংকট ও তার উত্তরণ

অপূর্ব রায়, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় (আসানসোল), পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2025; Send for Revised: 24.03.2025; Revised Received: 27.03.2025; Accepted: 28.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Bengali Short stories are an art form that has ushered in a new era in the world of fiction. With the changing times of the world, people's thoughts, ideas, and tastes are constantly changing. It can be seen that there is a change. The mind explores something new. As a variant of this exploration, short stories appeared to the reader with a different kind of satisfaction and taste. It can be said that the nineteenth century is a fertile time for creating worthwhile short stories. Short stories of Bengali literature can also take their place in world literature with nobility. The flame of Bengali short stories that was started by Trailokyanath Mukhopadhyay, Swarnakumari Devi, and Purnachandra Chattopadhyay in the Pre-Rabindra era, was developed and flourished by the golden hand of Rabindranath. Rabindranath's contemporary and later short story writers have tried and are continuing to take that pursuit to the peak of enthusiasm.

Keyword: *Demonic, degeneration, Globalization, Helplessness, Humanity, Indians, Situation, World, Danger, Uncertainty.*

আধুনিক জীবন সমস্যা ও জীবন জিজ্ঞাসা সব থেকে বেশি প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে ছোটগল্পেই। লেখকের আত্মজগতের জীবন জিজ্ঞাসা ও অন্তর্চেতনা, সর্বোপরি চিন্তন-মনন ও মূল্যবোধ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে উপস্থাপিত হয় পাঠকের কাছে। একুশ শতকের প্রথম দুটো দশক ইতিমধ্যে কেটে গেছে, এই সময় একদিকে Globalization অপরদিকে Internet-এর মাধ্যমে Android মুঠো ফোনে গোটাবিশ্ব তালুবন্দী। এর ফলে গোটা বিশ্বের সমস্ত তথ্য হাতের তালুতে এসেছে, পাশ্চাত্যের ভেদ ঘুচেছে, দূর নিকট হয়েছে তা যেমন ঠিক, তেমনি অন্যদিকে মূল্যবোধের কাছের মানুষ, মানস সরোবরের অগম তীরের বাসিন্দা হয়েছে। হাওড়ার বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপিকা বিনতা রায়চৌধুরীর জন্ম ও বেড়ে ওঠা কলকাতায়। পিতা মণিন্দ্রনাথ রায় ছিলেন আইনজীবী। বেথুন স্কুলের ছাত্রী বিনতা রায় চৌধুরী প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে স্নাতক ও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং পিএইচ.ডি. উপাধি পান। ১৯৯৭ সালে সাধনা সরকার স্মৃতি গবেষক সম্মান এবং ২০১৮ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান লীলা পুরস্কার। এছাড়াও তিনি হিন্দোলী সাহিত্য পুরস্কার, পাবলিশার্স অ্যাণ্ড বুক সেলার্স গিল্ড প্রদত্ত বিশেষ পুরস্কার তিনি লাভ করেন। শতপূর্ণা আশাপূর্ণা রৌপ্যস্মারক এবং বিভূতিভূষণ স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর গল্পগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে আমাদের সমাজের সেই সমস্ত অভিব্যক্তিগুলি যা চাপা থাকে আধুনিকতার কার্পেটে। লেখিকা তাঁর গল্পে যে জীবন সত্যের মুখোমুখি পাঠককে দাঁড় করিয়েছেন তা পাঠককে যেমন একদিকে

সাহিত্যরস আস্বাদিত করায়, তেমনি অপরদিকে বাস্তবের কষাঘাতে চমকিতও করে। সমাজকে কেন্দ্র করেই সাহিত্য। আর মানুষ নিয়েই সমাজ। এই সামাজিক মানুষের মূল চালিকা শক্তি হলো মন। এই মানব মনের যে বহুমুখিনতা তা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন লেখিকা। বিনতা রায়চৌধুরীর গল্প আমাদের চেনা পারিপার্শ্বিকের স্পন্দন জাগায়। মানব জীবন ও মননের যে বিবিধ স্তর, হোক তা সর্বদা গ্রহণযোগ্য নয় এবং অনেকাংশে নিন্দনীয়। সবই যে এক সুনিপুণ তুলির টানে চিত্রিত হয়েছে। ফলে সভ্যমানুষের মনে দোলাচলতা চলে, যে হীনমন্যতা চলে, যে রিরাংসা বিদ্যমান যা সভ্যতার শোভনতায় সর্বদা বাইরে আসতে পারে না, সেই গোপন-সুপ্ত মানবিক ক্রিয়াগুলির প্রতিভাস যেন মূর্ত রূপ পেয়েছে এই গল্পগুলিতে। অধ্যাপিকা বিনতা রায় চৌধুরী তাঁর কলমে যেমন একদিকে শ্লীলতার রাশ টেনে ধরে রেখেছেন তেমনি সেই পরিসরে থেকেও তথাকথিত নিন্দনীয় অথচ খুব চেনা ও স্বাভাবিক জীবনকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এনে দাঁড় করিয়েছেন সাহিত্যের শ্রীমণ্ডিত করে।

'প্রথমফুল' গল্পে এক গভীরতর বাস্তবের মুখোমুখি হই আমরা। চলমান জীবনের রেডিও-টিভি-নিউজ পেপার প্রতিদিনের সংবাদে যে ঘটনা আমাদের প্রতিবারই আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি করে একজন শিক্ষিত সচেতন রুচিশীল মানুষ হিসাবে, সেই বিষবৎ ঘটনা 'ধর্ষণ' – এই গল্পের বিষয়বস্তু। সতেরো বছর বয়সী শালিনী এই বীভৎস-পৈশাচিক-নারকীয় ঘটনার সম্মুখীন হয়, যখন জীবনে প্রথম কুঁড়ি আসার সময়। এই কুঁড়ি এক কিশোরী পরম যত্নে, ধৈর্য্যে, লালিত্যে ধীরে ধীরে ফুলে পরিণত করে – এই স্বাভাবিক জীবন ছন্দে পতন ঘটে ধর্ষিতা শালিনীর। শালিনীর ধর্ষণজাত যে শিশু তা সভ্যজগতের সমাজের চোখে সুকুমার মতি নয়, কুসুম পেলব নয়। স্নিগ্ধ নয় বরং তা পোকায় খাওয়া, পচা। গল্পের পরিণতিতে আমরা দেখি শালিনীর মাতৃসত্ত্বারই বোধন ঘটেছে ত্যাগ-তিতিক্ষা-সংশয়ের বেদীমূলে। সভ্যসমাজের অসভ্য কিছু দুস্কৃতী যারা, তারা অতর্কিতে ছিনিয়ে নিয়ে যায় কিশোরের স্নেহ সিঞ্চিত স্বপ্ন। যে নারীত্বের চরম ও পরম বিকাশ মাতৃত্বে কিন্তু পুরুষকৃত দুষ্কর্মের ফল, নারীকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভোগ করতে হয় পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দণ্ডবিধানে। তাই সন্ন্যাসিনীর বিগ্রহের সামনে প্রভাতী পূজোর নৈবেদ্য হিসাবে তাঁর গর্ভজাত প্রথম ফুলকে রেখে আসতে হয় শালিনীকে। শালিনী জানে তাঁর গর্ভের প্রথম ফুল নিষ্পাপ। কিন্তু তার বীজ পাপীর বীজ। তাই দেবতার নৈবেদ্যই, দেবতার পাদপীঠ থেকেই তাঁর শুভ মহরতের সূচনা। একইভাবে কমল কুমার মজুমদারের "মতিলাল পাদরী" গল্পে দেখা যায়, আষাঢ় মাসের ঝড়-জল-বজ্র-বিদ্যুৎ-এর দুযোর্গপূর্ণ রাতে মতিলাল পাদরীর জীবন সাধন-সৌধ গির্জা ঘরে এসে পড়েছে এক সাঁওতাল রমণী। এই সাঁওতাল রমণী ভামর আসন্ন সন্তানসম্ভবা, প্রসব বেদনায় কাতর এবং নিরুপায় অবস্থায় প্রায় বিবস্ত্র হয়ে এই গির্জাঘরে স্থান নিয়েছে। প্রসব বেদনায় কাতর ভামরের গোঙানি সমস্ত প্রাকৃতিক গর্জনকে অতিক্রম করেছিল যাতে তার গোঙানি মতিলালের কর্ণগোচর হয়েছে। এর পরেই মতিলালের উদ্যোগে ফুলন এবং বীণা হাঁড়ির সহযোগিতায় সাঁওতাল রমণী ভামর এক পুত্র সন্তানের জন্ম দেয়। এ ঘটনা সকলের কাছে অনাস্বাদিত। এই ঘটনায় কেউ রোমাঞ্চিত, কেউ আনন্দিত, কেউ বা বিমর্ষ। সদ্যজাত শিশুর কান্নার শব্দ প্রাকৃতিক ঝড়-জল-বিদ্যুতের ঝলকানিকে দাবিয়ে রাখতে চায়, শিশুর কান্নার মধ্যে মতিলাল অন্য রকমের অর্থ খোঁজার চেষ্টা করে। মতিলালের ভাবান্তর ঘটে যায়। সে বুঝতে চেষ্টা করে- এই ঝড়-জলের রাতে এই দীন দুঃস্থ গির্জা ঘরে কে জন্মাল। কিন্তু মতিলাল ভাবে শিশুটির পরিচয় কি? গির্জা পার্শ্বস্থিত এলাকার মানুষ- নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, খ্রীষ্টান-অখ্রীষ্টান নির্বিশেষে মতিলালের সম্মুখে বা পশ্চাতে সন্তানদাত্রী জননী ভামর সম্বন্ধে অপ্রীতিকর মন্তব্য করে। মতিলাল বিরূপ সমালোচনার বিষয়ে চিন্তিত নয়। সে মনে করে, "আজ এক সোনার মানুষ জন্মাইয়াছে রে"। মতিলাল আসন্ন সংকট ও বিপদের ভাবনায় চঞ্চল হয়। সে তৃতীয় রাত্রে ভামরকে দেখেছিল। "উদম নির্লজ্জ বিবসনা" অবস্থায় মদ্যপান করে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকতে। এটাই এই গল্পের climax হিসেবে চিহ্নিত। কিংবা সুবোধ ঘোষের "সুন্দরম" গল্পেও সেই লাশকাটা ঘরে গর্ভবতী তুলসির মর্মান্তিক মৃত্যু দৃশ্য উপস্থাপিত হয়েছে।

ইংরেজিতে প্রথম যখন গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছিল, তখন লেখক ও উপন্যাসের লক্ষ্যই ছিল নারীদের সতী নারীরূপে গড়ে তোলা। রিচার্ডসন বলেছেন, তিনি গল্পের ছলে নারীদের সতীত্ব শেখাচ্ছেন, তাঁর উপন্যাস হচ্ছে গল্পের চিনিতে ঢাকা নীতিকথা; এগুলোর ভেতর দিয়ে তিনি সতী নারী গড়তে চেয়েছেন। বাংলা ছোট গল্প ও উপন্যাসে দেখা গেছে, সেই প্রথম থেকে, কৃষ্ণকান্তের উইল, বিষবৃক্ষ, চোখের বালি প্রভৃতিতে, খুব ভালো মানুষ, খুব সুখী পরিবার তৈরির চেষ্টা। কিন্তু ভালো মানুষ পৃথিবীতে পাওয়া যায়নি, সুখী পরিবার তৈরি হয়নি। মাদাম বোভারি বা

আনা কারেনিনা বা বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইল এমনকি শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ ভালো মানুষের কাহিনি নয়। বঙ্কিম লিখেছেন, বিষবৃক্ষের শেষে তিনি বিষবৃক্ষ শেষ করলেন, এতে ঘরে ঘরে অমৃত ফল ফলবে। কিন্তু ঘরে ঘরে অমৃত ফল ফলেনি। দেখা যাচ্ছে পৃথিবীজুড়ে সেই ছোট গল্প, উপন্যাসগুলোই প্রধান হয়ে উঠেছে যেগুলো গৃহ ভাঙার গল্প। নারীর মাংস পিণ্ড লোলুপতার সামাজিক যে অবক্ষয় বারবার দেখা যায় সাহিত্যিকরা তাকেই গল্পের বিষয়বস্তু করে গড়ে তোলেন। বিনতা রায় চৌধুরীর গল্পেও সেই সামাজিক অবক্ষয়ের বাস্তব চিত্র বারে বারে প্রতিফলিত হয়েছে। বিশ্বায়িত সমাজ-ব্যবস্থায় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের সমীকরণ বদলে গেল। সম্পর্কের স্বাধীনতা, ভঙ্গুরতা, সম্পর্কের নিঃসঙ্গতা, সম্পর্কশূন্যতা এই যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য। একুশ শতকের প্রথম দুটি দশক জুড়ে নির্মিত তাঁর গল্প ও উপন্যাসের ধূ-কেন্দ্র হয়ে উঠেছে বিশ্বায়ন ও তার অভিঘাত। বিশ্বায়নের পূর্ববর্তী সময় আর তার পরবর্তী সময়কালের মধ্যে বিস্তর রদবদল ঘটে যায়। বিশ্বায়ন আমাদের সমাজ জীবনে যে পরিবর্তন সাধন করল সেগুলি হল; গ্রামের মফস্সলে রূপান্তর, পূর্ববর্তী প্রজন্মের সঙ্গে পরবর্তী প্রজন্মের দূরত্ব, যৌথ পরিবারের পরিবর্তে ছোট ছোট পরিবার, কেরিয়ারমুখী নতুন প্রজন্ম, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের রমরমা, প্রযুক্তির সর্বৈব ব্যবহার, ফ্ল্যাট কালচার, প্রোমোটাররাজ, বিবিধ নতুন নতুন পেশা, মানুষের নিজেকে পণ্য হিসেবে দেখনদারি, মাত্রাহীন পরিবেশ দূষণ, লৌকিক সংস্কৃতিতে শহুরে সংস্কৃতির আগ্রাসন, বাংলা চলচ্চিত্র ও বাংলা গানের বিশ্বায়ন এবং সেই সঙ্গে মানুষের মনের গভীর অসুখ ডিপ্রেশন ইত্যাদি। বিনতা রায় চৌধুরী তাঁর 'আকাশ অন্ধকার' গল্পে বিশ্বায়নের সাথে মানবতা-মানবিকতার যে পারস্পরিক ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক তার এক নির্জলা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। ভারতী ও বিদ্যাচরণ তাঁদের সুখী ও দাম্পত্য জীবন এক সুখময় আবেশ দিয়ে ঘিরে রেখেছে আজীবন। সুবৃহৎ কর্মজীবন এবং রিটায়ারমেন্টের প্রাতিভেট NGO-তে যোগ দেন। তাদের ছেলে পিনাকী। প্রতিষ্ঠিত, বিদেশবাসী, প্রবাসী। বিদ্যাচরণের খেদোক্তি স্ত্রী ভারতীর কাছে— 'তোমার পিনাকী বড় হয়েছে ঠিক-ই কিন্তু, মানুষ হয়েছে কিনা কে জানে?'

সপ্তাহ-অন্তে এক-দুবার ফোনালাপেই সন্তানের কর্তব্য পালন করে। গল্পের ক্রম পরিণতিতে বিদ্যাচরণের মৃত্যুর পর পিনাকী তাঁর মাকে তাদের কাছে আমেরিকায় নিয়ে যেতে চায় তাদের স্থাবর-অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বেচে দিয়ে। গল্পের পরিণতি-তে মনুষ্যত্বের নির্মম পরিণতিতে সচকিত হয়ে ওঠে পাঠক। গল্পের climax-এ দেখা যায় ভারতী ভোর-ভোর উঠে সব গোছ-গাছ করে স্বামী শোককে পিছনে ফেলে পুত্রের সাথে, তাদের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবনের নিকেতনকে পিছনে ফেলে আমেরিকার উদ্দেশ্যে গমনে তৎপর। নতুন দেশে নতুন পরিস্থিতিতে নতুন জীবন শুরুর আনন্দে সে ছিলো উদ্‌গ্রীব। ছেলের সময় সংকোচনের দ্রুততায় ভারতীয় শেষ বিদায়টুকু চেয়ে আসতে পারেনি তাদের বহু পরিচিত মণি ঠাকুরপোকে। কিন্তু Airport-এ পৌঁছানটাই তার হল সার। তাঁর গুণধর ছেলে পিনাকী বসত বাড়ি ভিটেমাটি, গয়না-গাটি সমস্ত কিছু বেচে ডোমেস্টিক সেকশানে বসিয়ে রেখে ফ্লাইট ধরে দিল্লী পালিয়ে যায়। আর তখনই রোদ্রজ্জ্বল দিন হওয়া সত্ত্বেও ভারতীর 'আকাশ অন্ধকার' হয়ে যায়। লেখিকা বিনতা রায় চৌধুরী এই গল্পে দেখিয়েছেন আধুনিক যন্ত্রসভ্যতা কত বড় হৃদয়হীন। এই সভ্যতার বিষবৃক্ষেই মঞ্জরীত হয় পিনাকীর মতো মুকুলেরা। আসলে মানব সভ্যতার যন্ত্র চালিত আধুনিক যুগে বয়স্ক মানুষরা যেন জীবনের কাছে সংকট। যে স্বপ্ন নিয়ে পিতা-মাতা স্বস্নেহে সন্তানকে শিক্ষিত করে তোলে একটু সচ্ছন্দ জীবন যাপনের আশায়, সেই স্বচ্ছন্দতার স্বাদ নিজেদের ভাগ্যে জোটে না ঠিকই কিন্তু সন্তান সেই স্বাচ্ছন্দতা পাওয়া মাত্রই বৈদেশিক কালচারে নিজের মূল্যবোধকে এমন ভাবে জড়িয়ে ফেলে যেখানে মানবিক মূল্যবোধ, পিতৃ-মাতৃ স্নেহ পরিহাস মাত্র। অর্থ যেমন মানুষকে মানুষের মানবিক মূল্যবোধ ভুলিয়ে দেয়, তেমনি অসহায়তা ও একটি শান্ত স্নিগ্ধ আশ্রয়ের খোঁজ মানুষকে কতটা অসহায় করে দেয় কতটা নির্বাক করে দেয় তা বিনতা রায় চৌধুরীর 'আকাশ অন্ধকার' গল্পটি পড়লে জানা যায়। আসলে যেখানে মানবিকতা, পিতৃ-মাতৃ স্নেহের কোনো মূল্য নেই, সামাজিক কর্তব্যের কোনো মূল্য নেই সেই সমাজের আকাশ তো অন্ধকারাচ্ছন্ন হতে থাকবেই।

সতীনাথ ভাদুড়ী বলেছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তর পর্ব হল: 'আনফিনিশড রিভিউলেশন' ও 'রিভিউলেশন বিট্রেড' এর কাল। সেই মোহভঙ্গের যন্ত্রনা, রাষ্ট্রের নিষ্ঠুর নিষ্পেষণে সবচেয়ে বেশি ভেঙ্গে তছনছ করে দিলো মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনের নানা দিক। এই মধ্যবিত্ত মানুষদের জীবনের বিভিন্ন সংকট নানান আঙ্গিকে ফুটে উঠেছে বাংলা সাহিত্যে। পরাধীন ভারতবাসীর মনে যে বিষ ক্রিয়াশীল ছিল তার প্রভাব আরো বেশি করে পরিলক্ষিত হতে থাকলো স্বাধীন

ভারতে নানা রাজনৈতিক উত্থান পতনের অভিঘাতে। স্বাধীনতাকে ঘিরে যে স্বপ্ন দেখেছিল পরাধীন ভারতবাসী, স্বাধীন ভারতে তেমন আশানুরূপ কিছুই হলো না। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের জগতে যেসব অন্যতম গল্পকার দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৯৬৩ সালে অশ্বমেধের ঘোড়া নামে তাঁর লেখা পাঁচটি ছোটোগল্পের সংকলন প্রকাশিত হয়। স্বয়ম্বর সভা, প্রহরা, মৃতশহর, বসন্ত এবং অশ্বমেধের ঘোড়া এই পাঁচটি ছোটোগল্পই এতে সংকলিত হয়েছে। এছাড়া জটায়ু, নরকের প্রহরী, হওয়া না হওয়া ইত্যাদি ছাটোগল্পেও বারবার মধ্যবিত্ত মননের সংকট, বাস্তবিক ঘাত-প্রতিঘাত প্রভৃতির মাধ্যে জীবনে এগিয়ে চলার কথা বারবার প্রতিধ্বনিত হয়। ঘোড়া গতির প্রতীক হলেও মিথ ভেঙে নামকরণের আড়ালে গল্পের অবয়বে লেখকের চিত্রায়িত মধ্যবিত্তের ক্ষত দেহের পচা-গলা অংশে অস্ত্রোপচার করেও সুখে বেঁচে থাকার চেষ্টা না অভিনয়? অসহায়তা ও আর্থিক সংকট যখন প্রকট হয় বাধ্য হয়ে অপরাধ জীবনে প্রবেশ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সেই আর্থিক সংকট ও সময়কে কেন্দ্র করে বিনতা রায়চৌধুরীর একটি গল্প হলো 'হৃদভূষণ'। 'হৃদভূষণ' গল্পে স্কুলের বন্ধু হৃদয় ও ভূষণ বহুবছর বাদে পুরোনো দুই বন্ধুর এক অ-প্রীতিকর পরিস্থিতিতে মুখোমুখি হয়। Flash back পদ্ধতিতে বর্ণিত এই গল্পে সেই সময়কার বর্ণনা করা হয়েছে যখন হৃদয় ক্লাস এইট এর মেধাবী ছাত্র। অঙ্কে তীক্ষ্ণাধী কঠিন অঙ্ক করার সময় হৃদয় ছিলো সারদের প্রিয়পাত্র। হৃদয়ের মেধার কাছে ভূষণ, ভূষি। কিন্তু জীবনের ট্রাজিক পরিণতিতে সেই মেধাবী হৃদয় আজ ছোরা হাতে ছিনতাইবাজ। ছাত্র-জীবনেই হৃদয়ের বাবা নিখিল মারা গেলে সংসারের তাগিদে তাঁর পড়াশোনা অনিয়মিত হয়ে পড়ে। যে হৃদয় আশাতে বুক বেঁধেছিলো জয়েন্ট দিয়ে ডাক্তার হয়ে বিনামূল্যে গরীব মানুষের সেবা করবে, চিকিৎসা করবে। এমনই সাধু সংকল্প ছিলো তার। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের হিসেব-নিকেশ যায় পালটে। অভাবের তাড়নায় চালচুরির মধ্য দিয়ে তার অন্ধকার জগতে পথচলা শুরু হয়। আসলে সে অন্ধকার জগতের পথিক হয়েও তাঁর পিতার অবর্তমানে মা এবং বোনকেওভাবের করাল গ্রাস থেকে দূরে রাখতে চেয়েছিলো। সে মেনে নিতে পারেনি তার মা পারুল এবং সুশোভন এর অনৈতিক সম্পর্ক। কিন্তু সে তখনই জীবন যুদ্ধে পুরোপুরি হেরে যায় যখন তাঁর মা তাঁর উপর আস্থা হারিয়ে সুশোভনরেই শরণাপন্ন হয়। এরপর সে ছোটবেলায় বাবার পরিয়ে দেওয়া 'সর্বমঙ্গলা'র মাদুলি বাজি রেখে জুয়োতে হাতে খড়ি দেয়। যে মাদুলি তার বাবা সর্ব মঙ্গলের জন্য তার গলায় বেঁধে দিয়েছিলো সেটা ছিঁড়ে ফেলে, কারণ তাঁর জীবনে অন্যরকম জীবনের সূচনা হয়। সেই অন্যরকম জীবন আসলে অন্ধকার জীবন। পরীক্ষার অঙ্কে একশোয় একশো পাওয়া হৃদয় জীবনের অঙ্কে শূন্যপায়। সমাজ ও পরিস্থিতির চাপে হয়ে ওঠে Antisocial। সমাজ পরিস্থিতির এক জাজ্বল্যমান আলেখ্য 'হৃদয়ভূষণ' গল্পটি। ছোটগল্পের আঙ্গিকে মধ্যবিত্তের বা নিম্নমধ্যবিত্তের সার্থক রূপকার হিসেবে পরিচিত সন্তোষকুমার ঘোষ (১৯২০-১৯৮৪)। তাঁর স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে বার বার এসেছে সেই সমাজ ও তাদের জীবনের নানামুখী সংকটের কথা। যার সার্থক পরিচয় মেলে মধ্যে 'কিনু গোয়ালার গলি' গল্পটির মধ্যে। অন্য আরেকটি গল্প "দ্বিজ"। গল্পটির প্রধান চরিত্র নিশিকান্ত ছিন্নমূল যজমানী গরীব ব্রাহ্মণ। পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক পটভূমিতে কলকাতায় এসে সম্মান রক্ষা করে জীবিকা নির্বাহই তার প্রধান সমস্যা। শেষ পর্যন্ত তাকে বাধ্য হতে হয় গোপনে কারখানায় কাজ করতে বা পানের দোকান খুলতে। উচ্চতর পেশা থেকে নিম্নতর পেশায় অবতরণ নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনে যে আত্ম-সংকট তৈরি করেছে তা নিপুণভাবে তুলে ধরেছেন গল্পাকার।

সময়ের ফল্গুধারায় বহমান মনুষ্য সমাজ, ডারউইনের অস্তিত্বের জন্য বেঁচে থাকার লড়াই করতে করতে ক্রমে দ্বিধারায় এবং পরবর্তীতে ত্রিধা বিভক্ত হয়। প্রথম দুই ধারা নিম্ন ও উচ্চ বিত্ত শ্রেণি কিন্তু তৃতীয় যে শ্রেণির উদ্ভব এই সংগ্রামে ঘটেছে, সে সকল পাওয়া-না পাওয়ার মধ্যবর্তী অর্থাৎ তার অস্তিত্ব অনেকটা সীমান্তের কাঁটাতারের মতো; প্রয়োজনীয় অথচ কুদর্শন। আর্থিক সংকট, অসহায়তা, বিপন্নতা, অনিশ্চয়তা এসবের টানাপোড়েনে হারিয়ে যেতে বাধ্য হয় হৃদয়-এর মতো কতশত মেধাবী।

বিংশ শতাব্দীতে বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য পরিবার ও স্বজনদের থেকে আলাদা আবাস বা আশ্রয়ের নাম বৃদ্ধাশ্রম। মূলত অসহায় ও গরীব বৃদ্ধদের প্রতি করুণার বোধ থেকে বৃদ্ধাশ্রমের সৃষ্টি হয়েছিল। যেখানে বৃদ্ধদের প্রয়োজনীয় সেবা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। ছোটবেলায় যে পিতা মাতার কাছে সন্তান সবচেয়ে বেশি আপন, যারা নিজেদের আরাম সর্বস্ব জীবন ত্যাগ করে সন্তানকে মানুষ করার জন্য নিজেদের দুঃখ কষ্ট বুকে চেপে সন্তানের হাসি-মাখা মুখ দেখার জন্য ব্যকুল থাকতেন, সন্তান না খেলে যারা খেতেন না, সন্তান না ঘুমালে যারা ঘুমাতেন না, অসুস্থ হলে যারা

ঠায় বসে থাকতেন শিয়রে, সেই বাবা-মা তিলে তিলে সন্তানের জন্য নিজেদের সবকিছু বিসর্জন দিয়েছেন, সেই বাবা-মায়ের শেষ বয়সের ঠিকানা এখনকার বৃদ্ধাশ্রমগুলো। মানবতার প্রতি এ যেন এক চরম উপহাস। সামাজিকতার এই অবক্ষয়কে সামনে রেখে বিনতা রায় চৌধুরীর 'সায়া-শকী' গল্পটি রচিত হয়েছে। মহামায়া আর পূর্ণশশীর আজীবন বন্ধুত্বের বুনিয়াদে 'সায়া-শকী' গল্পটি। দুই বান্ধবীর কিশোরী থেকে প্রৌঢ়া-তে উত্তীর্ণ হওয়ার মধ্য দিয়ে যে জীবন সেই জীবনালেখ্যই গল্পের মূল কাঠামো। দৃঢ় বন্ধুত্ব ও সুষ্ঠ প্রতিযোগীতায় সর্বোপরি পরস্পরের পতি সহানুভূতিশীলতা ও ভালোবাসায় তাঁদের বেড়ে ওঠা। রসায়নের ছাত্রী এবং দর্শনের ছাত্রী অর্থাৎ শশী ও মায়া তাদের জীবনসঙ্গিনী হিসাবে বেছে নিয়েছিলো আসামের ফরেস্ট রেঞ্জার এবং রেলওয়ে অফিসারকে যথাক্রমে। বিবাহের পর যথাক্রমে কেটে গেছে সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর। মায়া নিঃসন্তান, শশীর ছেলে ইঞ্জিনিয়র। এক সময় শশী দৃঢ় বন্ধুত্বের সম্মানে অঙ্গীকার করেছিলো মায়ার কাছে— 'আমার ছেলে কি তোর ছেলে নয়?'

এই অঙ্গীকার প্রমাণের যখন সময় আসে, তখন শশী নিজেদের মধ্যে অভেদত্ব খুঁজে পেলেও তাঁর পুত্রবধূ নিপা, তার শাশুড়ির বন্ধুকে সংসারের মধ্যে সবসময় গ্রহণ করে নিতে পারেনি। গল্পের চতুর্থ পরিচ্ছেদে আমরা দেখি মায়া এবং শশীর মধ্যে যে পারস্পরিক ভালোবাসা সর্বোপরি সৌজন্যবোধ বজায় ছিলো তা এক প্রজন্ম পেরিয়ে যাওয়াতেই নীপার মধ্যে তার বিন্দু-বিসর্গ নেই। এ যেন সময়ের সাথে সমাজ যতোই অগ্রগামী হচ্ছে ততোই যেন আত্মসুখ সর্বস্ব হৃদয়হীন হয়ে পড়ছে—এ যেন তারই দৃষ্টান্ত মাতৃসমা শাশুড়িকে বৃদ্ধাবাসে পাঠিয়ে তার ঘরটাকে দখল করা পুত্রবধূ নীপার কাছে মুখ্য হয়ে উঠছে। আর এই কারণে শাশুড়ি এবং স্বামীর প্রতি যে পারস্পরিক ভালোবাসা-স্নেহ সম্পর্ক তাকেই প্রাধান্য দিতে গররাজি। শশী, তার পুত্র এবং পুত্রবধূর পরিকল্পনা জানতে পেরে তাঁর উপলব্ধি মায়ার কাছে ব্যক্ত করে বলে— 'এতদিন মনে মনে তোর কথা ভেবেছি, জীবনের খেলার আমি বুঝি এগিয়ে আছি। কিন্তু না, রে, আমি হেরে ভূত হয়েছি। কাল রাতে নিঃস্ব হয়ে গেছি আমি। যথাসর্বস্ব গেছে আমার।'

আজীবন স্নেহলালিত পুত্রও যখন তাঁকে বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়ার চক্রান্তে লিপ্ত, তাই জানতে পেরেই পূর্ণশশীর এই খেদোক্তি। অবক্ষয়িত মানবিক সত্তা কিভাবে মাতৃ স্নেহ-মমতার কাছে স্বার্থ লোলুপ হয়ে উঠেছে তা এই গল্পটির পরতে পরতে ফুটে উঠেছে। যেখানে দুটি প্রতিকূল চরিত্রের মধ্যে একজনের সন্তানহীনতা আর একজনের সন্তান থেকেও তাকে বাড়ি থেকে বের করার চক্রান্ত মিলেমিশে হৃদয় শূন্য এক মানবিক হাহাকার প্রকাশ পেয়েছে।

পুরুষ শাসিত নিষ্ঠুর সমাজের লোভ-লালসায় ঘৃণ্য পৈশাচিক উল্লাসে ভারতীয় নারীর প্রেম-প্রীতিময় নীড় রচনার স্বপ্ন বারে বারে ভেঙ্গে গেছে। বারে বারে নারী তার জীবনের ব্যথা-বেদনার অভিশাপ মাথায় নিয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে চরম দুর্ভাগ্যের তীরে। সেখানে সে পণ্য বিকি কিনির নিজ মানদণ্ডে হয়েছে স্বর্ণ রাগ কসের শাসন পীড়ন, অত্যাচার, নিগ্রহের নির্মম শিকার। অবশেষে মৃত্যুর কোলেই সে খুঁজে পেয়েছে তার পার্থিব গ্যথা বেদনার সমাপ্তি। ভারতের বহু কলঙ্কিত পণ প্রথার জগদ্দল পাষাণভার বুকে নিয়ে এইভাবে ভারতীয় নারী যুগ যুগ ধরে করুণ কণ্ঠে কাতর আর্তনাদ করেছে—তার করুণ আর্তনাদে পাষাণ গলেছে—কিন্তু সমাজের বুকে জাগেনি বিন্দুমাত্র বেদনা সহানুভূতি বা সমবেদনা।

পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত 'কালো রাজকন্যা' গল্পে লেখিকা বিনতা রায় চৌধুরী দেখিয়েছেন সে যুগেও যেমন তেমনি এযুগেও, সমাজের চোখে কৃষ্ণকায় মানুষেরা বিশেষত নারীরা তাদের জীবনকে নিয়ে আজও বিড়ম্বিত হয়ে পড়ে। গল্পের নায়িকা কালীশ্রী। কালো গায়ের রঙের জন্যই তার এমন নাম। অর্থাৎ তাঁর শ্রীমণ্ডিত জীবনে যেন কালিমা লিপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু সম্পন্ন জাতি সুবলের কাছে তার মেয়ে অত্যন্ত আদরের, রাজকন্যা তুল্য। পিতা সুবল, তার স্ত্রী সুমনাবতীর মৃত্যুর পর মাতৃহারা কন্যাকে অত্যন্ত স্নেহে-যত্নে লালিত-পালিত করে। কন্যা উপযুক্ত বয়স্কা হলে বিবাহযোগ্য পাত্রের সন্ধান করতে উদ্যত হয়। কালোমেয়ের জন্য সুন্দর দেখতে বরের খোঁজার অভীপ্সা এবং তা খঁজে বের করা এই দুয়ের মধ্যে যে ফারাক অন্ত্যহীন সে সেই কথা দুই দিনেই টের পায়। বহুকষ্টে কাগজ কলের শ্রমিক বিপুলকে কন্যাদানের জন্য মনস্থ করে মোটা পণের বিনিময়ে। বিয়ের পর কালীশ্রীর জীবনে তার নতুন নামকরণ হয় 'কালো বউ' নামে। যে কালীশ্রী একদিন তাঁর পিতার গৃহে রাজকন্যার মতো দিনযাপন করতো গ্রামে, দ্বিজু কাকার গোয়াল ঘরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাকে কাপড় দিতো গন্ধে, আজ তাকে শ্বশুর বাড়ীতে গোয়াল পরিস্কার করতে

হচ্ছে খালি পেটে। শ্বশুর বাড়িতে সে খেলো কিনা না খেলো সে বিষয় নিয়ে কারো ভাববার বা মাথা ব্যথার দরকার নেই। সে সারাদিন পরিশ্রম করে একদিকে যেমন পেটের উপযুক্ত ভাত পায় না তেমনি অপরদিকে পায় না স্বামীর ভালোবাসা। তাঁর স্বামী কালীশ্রী সম্পর্কে মন্তব্য করে— 'কোথা থেকে এক কালো পেত্নি এনে মা আমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছে।' এই তিক্তজীবন অভিজ্ঞতায় কালীশ্রী বুঝতে পেরেছে সমাজের চোখে তাঁর কদর। তাঁর পিতার দেওয়ার পণ-যৌতুকে শ্বশুর বাড়ির সমৃদ্ধি শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। এই পণের গায়ে কালো রং লেগে নেই কিন্তু কালীশ্রীর গাত্রবর্ণ কালো। তাই শ্বশুর বাড়িত অচ্ছ্যুত কালো শরীর নিয়ে সে দিনভর গতর খাটাবে আর কালো বউ-এর সুন্দর বড় সুন্দর বৌদির ঘরে হিসাব মেলাবে। এই হিসেব আমাদের শুভ বুদ্ধিকে আহত করে, বিপর্যস্ত করে।

বিনতা রায় চৌধুরীর এই গল্পগুলি সার্চ-লাইট ফেলেছে সচেতন মানুষের চেতন-অবচেতন-অর্ধচেতন তিনটিই প্রকোষ্ঠে। তাই জীবনকে নিয়ে লেখা তাঁর জীবনমুখী গল্পগুলিতে ধরা পড়েছে আমাদের সমাজের অত্যন্ত পরিচিত জটিল-কুটিল সমস্যাগুলি। তঁর লেখনীর প্রিজমের মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজের আলো প্রতিভাসিত হওয়ায় মানুষের সমাজ ও মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা যে ফল্গুধারা তা অত্যন্ত সুস্পষ্ট হয়েছে। এই গল্পগুলিতে সমাজেও বাস্তবতার যে স্পন্দন স্পন্দিত হয়েছে তা একদিকে আমাদের যেমন সচকিত করে তেমনি অপরদিকে সাহিত্য রসাস্বাদন করানোর সাথে-সাথে নতুন জীবন-জিজ্ঞাসায় ভাবতে উৎসাহিত করে।

পণপ্রথা একটি সুপ্রাচীন সামাজিক ব্যাধি। যার ফলস্বরূপ প্রবহমান নারীজীবন হয়েছে বিপর্যস্ত, ব্যাহত ও সীমাহীন পশ্চাৎপদ। নারীজীবনের এ পশ্চাৎপদতার মূলে আছে জেন্ডার বৈষম্য। পিতৃতান্ত্রিক, পুরুষ- নিয়ন্ত্রিত সমাজ কখনোই নারীদের পারিবারিক শৃঙ্খলের জগদ্দল থেকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষা করেনি। বরং বারবার সামাজিক ও অপসংস্কৃতির দোহাই দিয়ে নারীদের জীবনকে করেছে দুর্বিষহ ও ক্ষতিগ্রস্ত। দুর্বিষহ এই বর্বর প্রথাকে সাহিত্যের আঙিনায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার 'দেনা পাওনা' গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'দেনা পাওনা' গল্পেও কালো রাজকুমারীর মত নিরুপমা পণপ্রথার বলি হয়েছিল। তার পিতা রামসুন্দর ভিটেমাটি বিক্রি করেও চেয়েছিল পণের টাকা শোধ করতে। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। শ্বশুরালয়ে অনাদরে-অবহেলায় নিরুপমার সম্ভাবনাময় জীবন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। কিছুদিন পরেই তার স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য কনে পাওয়া গেল। গল্পের ভাষায়, 'এবার বিশ হাজার টাকা পণ আর হাতে হাতে আদায়'। এই প্রথা শুধুমাত্র একটি জনগোষ্ঠীর নামমাত্র প্রথা নয়, এ ছিল কন্যাগ্রস্ত পরিবারের সর্বোচ্চ হারানো সামাজিক ব্যাধি। গল্পকার বিনতা রায় চৌধুরী বারবার সেই সামাজিক সংকটের প্রতিচ্ছবিকে গল্পের বিষয়বস্তু হিসেবে তুলে আনতে চেয়েছেন। 'আকাশ অন্ধকার', 'কালো রাজকন্যা', 'হৃদভূষণ' বা 'মায়াশশী'র মতো অনেক গল্পই সমাজ সমস্যামূলক। যদিও গল্পকার গল্পগুলির বিষয়বস্তুতে থাকা সমস্যা থেকে যে সব আগুনের তির ছুটে আসে তার নিছক চিত্রণ করেননি লেখিকা। তিনি চেষ্টা করেছেন মানব মূল্যবোধের উজ্জীবন ঘটাতে। যে মূল্যবোধ একমাত্র পারে অবক্ষয়িত সমাজের চেতনা ফিরিয়ে আনতে। তিনি মনে করেন ঘৃণার উত্তরে ঘৃণা কিংবা হিংসার বদলে হিংসা উছলে উঠলে মানুষের জন্য আর কিছুই রেখে যাওয়া যায় না। তাই বিনতা রায় চৌধুরী চেষ্টা করেছেন তার লেখনীতে মানুষের চেতনে অবচেতন ঘটানো ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া যথাযথ প্রতিফলন ঘটিয়ে মানবিক মূল্যবোধ জাগরিত করতে। যার ফলস্বরূপ অশুভ শক্তির ছায়া থেকে দূর হবে সামাজিক সংকট।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, চৌধুরী বিনিতা, প্রকাশ ২০১৮, 'গল্প ২১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা ২৪।
২. তদেব: পৃষ্ঠা ৪২

আকর গ্রন্থ:

১. ভট্টাচার্য, সুতপা, প্রকাশকাল ১লা জানুয়ারি ২০১৮, মেয়েলি আলাপ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।
২. সেনগুপ্ত, মল্লিকা, প্রকাশকাল ২০১২, গদ্য সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
৩. রায়চৌধুরী, বিনিতা, প্রকাশ ২০১৮, গল্প ২১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।
৪. বসু, অঞ্জলি, (সম্পা), জানুয়ারি ২০১৯, সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

৫. রায়, চৌধুরী, বিনীতা, জানুয়ারি ২০১৪, আলোর রাত আঁধার রাত, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা।
৬. পাল, বিপুল ও পাল, অরূপ (সম্পা), প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা, ২০২২, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা ছোটগল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।
৭. খা্ শান্তিময়, মন্ডল লিন্টু সম্পদনা,প্রথম প্রকাশ ডিসেম্বর ২০১৯, স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্য, কলিকাতা লেটারপ্রেস, কলকাতা।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 903-915
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.083

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের গল্প: সমাজ ও জীবন-ভাবনা

মো : আবু বাকার সিদ্দীক, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, মাধবদী মহাবিদ্যালয়, মাধবদী, নরসিংদী, বাংলাদেশ

Received: 18.03.2025; Send for Revised: 27.03.2025; Revised Received: 28.03.2025; Accepted: 28.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Syed Waliullah (1922-1971) is one of the pioneers of modern art in short stories in Bangladesh. He emerged in Bengali literature in the 1940s. Syed Waliullah's first collection of stories is Nayanchara (1945). Nayanchara's stories can be divided into two main categories according to their subject matter and the depth of the author's imagination. The first category includes 'Nayanchara', 'Mrityu-Jatra', 'Rakta', and 'Sei Prithibha'. In the four stories mentioned above, Syed Waliullah has beautifully portrayed the 'pain, anguish, and sadness of the famine-stricken people' of his time. The stories marked in the second category are basically realistic stories of the lives of the people living close to the soil of river-rich East Bengal, their joyless and hopeful lives. The stories in this series are 'Jahazi', 'Parajoy', and 'Khuni'. In Nayanchara, he has brought talented people from the lowest strata of society and made them represent their own class. Syed Waliullah Nayanchara's subject matter is conscious of time and society and human responsibility, and his aesthetic creation is artistic and modern in its knowledge. Syed Waliullah's multidimensional life inquiry has been revealed in the book Duhi Tir O Anano Galpo (1965), published in the mid-sixties. The pain of rootlessness of people wandering against the backdrop of time and history has found an impeccable form in this book. The touching experience of the historical crisis caused by the partition, famine (1943), the journey of man and death, along with the isolation of the individual, are the themes of his story of Naishang Waliullah. However, anyone can understand through reading that the author is strongly aware of the times in Duhi Teer and Anano Galpo. Like a dispassionate seer, he has witnessed the cruel fate of history and realized the boundless calamity and humiliation of the people who are driven by fate. The Second World War (1939-1945), the terrible images of death, economic depression, dangerous times, and famine have emerged in Duhi Teer and Anano Galpo.

Keywords: *Nayanchara, Mrityu-Jatra, Rakta, and Sei Prithibha and life thought.*

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ (১৯২২-১৯৭১) বাংলাদেশের ছোটগল্পে আধুনিক শিল্পদৃষ্টির অন্যতম পুরোধা ব্যক্তি। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব ১৯৪০-এর দশকে। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নয়নচারা' (১৯৪৫)। বিষয়-বিবেচনায় ও স্রষ্টার অনুভাবনার আততি অনুসারে 'নয়নচারা'-র গল্পগুলোকে মুখ্যত দুভাগে বিভাজন করা যায়। প্রথম শ্রেণিতে পড়ে 'নয়নচারা', 'মৃত্যু-যাত্রা', 'রক্ত', ও 'সেই পৃথিবী'। উল্লিখিত

গল্পচতুষ্টয়ে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর কালের 'দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের যন্ত্রণা, আর্তি ও বিষণ্ণতা'-কে রূপময় করেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণিচিহ্নিত গল্পগুলো মূলত নদীবহুল পূর্ববাংলার মৃত্তিকাসংলগ্ন মানুষের জীবন স্বরূপ, তাদের নিরানন্দ ও প্রত্যাশাদীপ্ত জীবনের বাস্তবভিত্তিক কাহিনি। এ শ্রেণির গল্পগুলি হচ্ছে 'জাহাজী', 'পরাজয়', ও 'খুনী'। 'নয়নচারা'-য় সমাজের একেবারে নিম্নস্তর থেকে প্রতিভূ মানুষদের এনে তাদের দিয়ে তিনি প্রতিনিধিত্ব করিয়েছেন স্ব-স্ব শ্রেণির। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'নয়নচারা'-র বিষয়বিবেচনায় সময় ও সমাজ-সচেতন ও মানবিক দায়িত্ববোধ-জাগরিত এবং রূপাঙ্গিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে চিত্রকলাপ্রিয়, আধুনিক মনস্তত্ত্বজ্ঞান-পরিস্রুত। ষাটের দশকের মধ্যপর্যায়ে প্রকাশিত 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' (১৯৬৫) গ্রন্থে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ বহুমাত্রিক জীবনজিজ্ঞাসার প্রকাশ ঘটেছে। দেশকাল ও ইতিহাসের পটভূমিকায় বিচরণশীল মানুষের শেকড়হীনতার যন্ত্রণা তাঁর এ গ্রন্থে অনবদ্য রূপ লাভ করেছে। দেশভাগজনিত ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালের মর্মস্পর্শী অভিজ্ঞতা, দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩), মন্বন্তর ও মৃত্যুযাত্রার পাশাপাশি ব্যক্তির বিচ্ছিন্নতা, তাঁর নৈঃসঙ্গ ওয়ালীউল্লাহ্ গল্পের প্রতিপাদ্য। তবে পাঠের মাধ্যমে যে কেউ বুঝতে পারবেন 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থে লেখক প্রবলভাবে কালসচেতন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫), মৃত্যু, অর্থনৈতিক মন্দা, বিপন্ন সময় এবং দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ চিত্র দুই তীর ও অন্যান্য গল্প গ্রন্থে উঠে এসেছে। নিরাসক্ত দ্রষ্টার মতো তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ইতিহাসের নিষ্ঠুর নিয়তি এবং উপলব্ধি করেছেন ভাগ্যতাড়িত মানুষের সীমাহীন বিপর্যয় ও লাঞ্ছনা যা প্রবন্ধটির মূল আলোচ্য।

সমাজ ও জীবন ভাবনার স্বরূপ ও প্রকৃতি:

ছোটগল্পে সমাজ ও জীবন দুটোরই আধিপত্য থাকে। সমাজ ও জীবন প্রকৃতপক্ষে পরস্পরেরই পরিপূরক দুটি বিষয়। সমাজ-জীবনে সংঘটিত অনাচার, ব্যভিচার ও কুৎসিত কুটিল প্রকৃতি সমাজ-জীবনের সুস্থ প্রবাহ বিঘ্নিত করে। শিল্পী তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ-শক্তিতে সমাজ ও জীবনের বাস্তব চিত্র অংকন করেন। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ তাঁর গল্পে স্বকাল ও সমাজবাস্তবতাকে ধারণ করেছেন সূক্ষ্মদর্শী শিল্পী হিসেবে:

> "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ স্বকালের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও দুর্যোগময় ঘটনা ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ। বাংলায় ১৮৯৯, ১৯১৮ ও ১৯২৮ সালে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। কিন্তু ১৯৪৩-এর মন্বন্তর সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ এবং দুর্ভিক্ষ-জর্জরিত অঞ্চলের আয়তন ও পূর্বাপেক্ষ ব্যাপক ও বিস্তৃত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অর্থনৈতিক অভিশাপ ১৯৪৩-এর মন্বন্তরে বাংলায় ১৫ লক্ষ মানুষ চরম দুর্দশা ও দুর্ভিক্ষের শিকার হয়।"[১]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ প্রথমদিকের গল্পগুলোর পটভূমি ছিল সমাজের বিস্তৃত প্রান্তর কিন্তু তিনি ধীরে ধীরে যাত্রা করেন ব্যক্তি-মানুষের অন্তরের কন্দরে। একে আমরা বড় থেকে ছোটতে প্রত্যাবর্তন বলব না, এ হ'লো সীমা থেকে সীমাহীনতার দিকে ধাবিত হওয়া। কোনো সৎ ও সচেতন শিল্পীর পক্ষে দ্বিতীয় মহাসমর, মন্বন্তর এবং এ কালের সৃষ্ট সমাজ-সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা সম্ভব হয়নি। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ছোটগল্পও এক্ষেত্রে বিশেষ মনসংযোগ ও সহানুভূতি আকর্ষণ করেছে:

> "সেদিন (১৯৪৩-৪৭) কোনো লেখকই পরিবর্তমান সমাজ, ভাঙন ও বিপর্যয় সম্পর্কে অনবহিত থাকতে পারেন নি। থাকা সম্ভব ছিল না। কেউ অধিক সচেতন, কেউ অল্প সচেতন। বারুদের গন্ধ সবাই পাননি, কামানের গর্জন সবাই শোনেন নি, কিন্তু সব লেখকই উদভ্রান্ত বিক্ষোভের জগতে পা ফেলেছেন, দূরে দেখেছেন বহ্নিবলয়বেষ্টিত দিগন্ত।"[২]

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সময় ও দুঃসময়ের দাবি মেনে নিয়েই পালন করেছেন তাঁর সামাজিক ও মানবিক দায়িত্ব। ওয়ালীউল্লাহের গল্পে কখনোই মূল্যবোধের সামগ্রিক অবক্ষয়, মানবিক নীতি-আদর্শের সর্বাত্মক

ব্যত্যয় ও স্খলন কিংবা জৈব-পঙ্কিলতার কোনো মনোহর ছবি উপস্থাপিত হয়নি। তাঁর 'নয়নচারা' গ্রন্থের প্রথম গল্প 'নয়নচারা'। 'নয়নচারা'গল্পটি তাঁর সুস্থিরও আদর্শায়িত এবং দুর্ভিক্ষের ব্যক্তি-চেতনাপ্রবাহ-আশ্রিত, অনুভূতিমগ্ন রূপেরই শিল্পকথা। 'নয়নচারা' গ্রন্থে ওয়ালীউল্লাহ্ সমানভাবে কাল ও সমাজ সচেতন:

> "সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের ছোটোগাল্পিক শিল্পীসত্তা নয়নচারা-য় পৌঁছে একটি স্পষ্ট ও স্বতন্ত্র রূপ পেয়েছে। এ পর্বে তিনি সমকালীন সমাজও রাষ্ট্র-মানসের ঘটনাবর্তে আলোড়িত হয়েছেন এবং নিজস্ব সমাজ ও সমাজ-আশ্রিত মানুষের জীবন-জিজ্ঞাসা রূপায়নে হয়েছেন আন্তরিক। নয়নচারা-য় সংকলিত গল্পমালা সে-অর্থে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের চেতনাস্রোত, অনুভূতি, অন্তঃকরণ এবং কাল ও সমাজ- সচেতন মনস্ক্রিয়ার অনুভূতি ও শিল্প-অভিজ্ঞান।"[৩]

১৩৫০-এর দুর্ভিক্ষে গ্রাম উজার হলে খাদ্যের সন্ধানে আগত মানুষের মিছিলে কলকাতা শহরে আসে আমু। সে একা নয়। তারই মতো আরো অনেকেই আছে তার সঙ্গে। তারা মরে যাচ্ছে কেউ কেউ। যেমন মরে ভুতনির ভাই ভুতো। এই মৃত্যুলোকের মধ্যেই ময়রার দোকানে থরে থরে মিষ্টি সাজানো। সেখান থেকে আমু তাড়া খায়। আর-একবার হোটেলের সামনে সে যখন দৃপ্ত প্রতিবাদী, সেখান থেকেও তাকে প্রত্যাহত হয়ে ফিরে আসতে হয়। আমুর ক্ষুধাতাড়িত অবসন্ন দেহ একমুঠো ভাতের আশায় যখন শহরের অলিগলিতে ঘুরছে, তখন একটি বাড়ির দরোজা খুলে এক অচেনা মেয়ে তাকে ভাত দিলে আমুর বিস্মিত জিজ্ঞাসা, 'নয়নচারা গাঁয়ে কি মায়ের বাড়ি?' কারণ আমু এখন অদ্ভুত শহরের অধিবাসী যেখানে,'শহরের কুকুরের চোখে বৈরিতা নেই। এখানে মানুষের চোখে এবং দেশে কুকুরের চোখে বৈরিতা।' শহরে মানুষের অভাব নেই, 'অভাব শুধু মনুষ্যত্বের।' বস্তুত, 'নয়নচারা'য় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আমুর ক্ষুৎপীড়িত অন্তরের কথকতা নির্মাণের মাধ্যমেই তাঁর কালের সমাজ ও মানুষের সঙ্গে হয়েছেন সহমর্মী, অভিন্নহৃদয়।'[৪] 'নয়নচারা' গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ দেখিয়েছেন, দুর্ভিক্ষ এমনি এমনি প্রাকৃতিকভাবে আসেনি, এসেছে মুনাফাখোর, অপরাজনীতিবিদদের কারণে। দুর্ভিক্ষের করাল মুহূর্তেও সামাজিক শ্রেণিভেদ লোপ পায় না। দুর্ভিক্ষের তোড়ে আমুর মতো দরিদ্র, নিঃস্ব মানুষেরাই ছিন্নমূল হয়ে শহরের ফুটপাতে আশ্রয় নিয়েছে। 'ক্ষুধার পৃথিবীতে ফেলে আসা গাঁয়ের স্মৃতিদীর্ণ আমুর মনোভঙ্গির স্বরূপ উদঘাটনে ব্রতী হয়েছেন লেখক।'[৫] 'নয়নচারা' তাই আমু-ভুতনি-ভুতোর ক্ষুধাদীর্ণ মনের কথা; তাদেরই শহরাভিজ্ঞতার এক রুধিরাক্ত রূপকল্প।

'জাহাজী' নিঃসঙ্গ সারেং জীবনের এক মর্মান্তিক চিত্রকল্প। করিম সারেং আত্মীয়-সংসর্গবিহীন। জাহাজী জীবনে তার মন বিচিত্র ভাবনার রাজ্যে সংশ্লিষ্ট হয়। করিম সারেং কখনো শূন্যতায় হাহাকার করে ওঠে, কখনো বিনম্রচিত্রে প্রার্থনা-নিরত হয় রাহমানুর রহিমের প্রতি। জীবনের অন্তসারশূন্যতায় বিদীর্ণ হয়ে এক ধরনের অভিযোগসহ কখনো অসীমের উদ্দেশ্যে এক অপ্রতিরোধ্য জিজ্ঞাসার তাড়নায় উদ্বেলিত হয় তার মন: 'তুমি কী দিলে আমাকে আর আমি কী দিলাম তোমাকে।' কিন্তু তার উত্তর কখনো সে পায় না। এই রূঢ় বাস্তবতার সংঘর্ষে ধ্যাননিমগ্ন মনটি তার আকস্মিকভাবে কখনো কখনো রুক্ষতায় প্রতিশোধস্পৃহ হয়ে ওঠে। চীফ অফিসারের লাথি খেয়ে সাত্তার যখন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদে তখন স্বভাবের তাড়নায় নির্মম হয়ে ওঠে, সে মুহূর্তে তার দুচোখ যেন আগুন ঝলসে ওঠে। প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে সাত্তারকে বলে-'যা, আই দেইক্যুম।'

করিম জাহাজীর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নেই, জন্মভূমিও তার কাছে মিথ্যা হয়ে গেছে, এই আত্মীয়বিহীন নির্বান্ধব জীবন কখনো কখনো তার হৃদয়ের অভ্যন্তর থেকে এক মর্মান্তিক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। তার কাছে এখন মনে হয়- 'অতিক্রান্ত দীর্ঘ জাহাজী জীবন শূন্য কলসের মতো শুধু ঠনঠন করছে।' বিগত জীবনের অনুশোচনায় সে ব্যথিত ও অনুতপ্ত। বৃদ্ধ করিম সারেংকে মা, মাটি বার বার কাঁদায় কেন? তার কারণ সম্ভবত সেখানে 'মাটি আছে, আর মানুষ আছে।' তাঁর জীবন বন্ধনহীন; কিন্তু সাত্তার তো বাপ-মা-ভাই-বোনের স্নেহ-

ভালোবাসায় বন্দী-তাই করিম সারেং তার মুক্তির ব্যবস্থা করে দেয়। আর সে ভেবেছিল 'এবার শেষ হবে তার সামুদ্রিক জীবন, এবার এ-অশান্ত জীবন থেকে মুক্তি পাবে', সেই করিম জাহাজ বন্দরে ভিড়তে-না-ভিড়তে সিদ্ধান্ত নেয়: আবার সে জাহাজে চুক্তি নেবে এবং যদি পারে আমৃত্যু সমুদ্রেই বাস করবে। তার কারণ হলো:

> "যে-ছাত্তারকে সে প্রায় পিতৃস্নেহে জাহাজী জীবন থেকে মুক্তি দিল, সে ফিরে ও তাকাল না জাহাজ থেকে নেমে যাবার সময়। এই স্বজনহীনতা, নিঃসঙ্গতা, 'প্রশ্নের কাঁটার মধ্যেই তো মানুষের জীবনের অবসান ঘটে', বৃদ্ধ করিম সারেঙের জীবনে এই দার্শনিক বোধ বিস্তীর্ণ হয়। করিম সারেঙের অক্ষিত প্রবহমান জাহাজী জীবনে আবার ভেসে যাওয়ার মধ্যে এক অমোঘ নিয়তি কাজ করে যায়-যে-নিয়তিচেতনা ওয়ালীউল্লাহ্ বহু রচনার এক নির্দেশক।"[৬]

'পরাজয়' ও 'খুনী' গল্প দুটি পূর্ববাংলার নদী তীরে জেগে-ওঠা চরতাড়িত ও চরপীড়িত জীবনের নির্মম ভাষ্য, নিরাবেগ কাহিনি। নদী-চরের জীবন অনিশ্চিত। এজীবন প্রকৃতির কাছে অসহায়, নিরুপায়ভাবে পরাজিত। কিন্তু বিপত্তি, পৌনঃপুনিক বিপর্যয় ও পরাভব সত্তে ও তাদের সংগ্রাম থামে না। নব আশা ও চেতনায় দীপ্ত ও প্রাণিত হয়ে জীবন আবার সামনের দিকে অগ্রসর হয়। এভাবেই নতুন চরে মাচা বেঁধেছিল ছমির ও কুলসুম। কিন্তু তাদের স্বপ্ন, প্রত্যাশা সফল হয়নি। মাচায় ওঠার অনতিকাল পরেই সর্পদষ্ট হয়ে ছমির মারা যায়। তখন মধ্য রাত। নিকটবর্তী মাচার আলো দেখা গেলেও দুই মাচার ব্যবধান বিস্তর। তাই রাতের নিস্তরঙ্গ নদীতে কুলসুমের অনুচ্চ কণ্ঠের ডাক কেবল শূন্যেই মিলিয়ে গেছে, কুলসুমের সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসেনি। পরের দিন মজনু ও কালু এসে ছমিরের মৃতদেহ নিয়ে গেছে, সঙ্গে সদ্য বিধবা কুলসুমকেও। চরের জীবন এমনই শ্বাপদসংকুল, মৃত্যু ও মড়কের মধ্য দিয়ে বহমান। ছমির-কুলসুম তাই কোনো বিচ্ছিন্ন দম্পত্তি নয়, চরবাসী মানুষদেরই তারা প্রতিভূ, বিশেষে নির্বিশেষ। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যেমন তাঁর নিজের সমাজ ও মানুষদের জীবনাশ্রিত সাহিত্য রচনা করতে চেয়েছিলেন তেমনি তিনি বুঝেছিলেন যে, ঐতিহ্যানুরক্তিতে মুক্তি খুঁজলে চিত্রল পতঙ্গের মতই আহূতি দিতে হবে। তাই উত্তরাধিকারে সমর্পিত ও ঐতিহ্যকে স্বীকার করেই তিনি আত্মমুক্তি অন্বেষণ করেছেন। ফলে তাঁর চরাঞ্চল আশ্রিত গল্পগুলোতে সেই বিশেষ অঞ্চল, নির্দিষ্ট এলাকার নির্বিশেষ মানুষের জীবন সংগ্রামই মুখ্য, ব্যক্তি সেখানে সমষ্টিরই প্রতিনিধি, প্রতীক ও প্রতিভূ।

'মৃত্যু-যাত্রা' গল্পটি দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের জীবন আখ্যান। যেখানে নির্দিষ্টকোনো চরিত্র মুখ্য নয় বরং তিনু, করিম, কমলি, আসগর, ময়না, হাজুর বাপও মা, আনু, হালুর মা, রব্বি মিঞার বউ, তোতা প্রমুখ চরিত্রের মাধ্যমে গোটা সমাজকে তোলে ধরেছেন। 'নয়নচারা'র মতো 'মৃত্যু-যাত্রা'ও ধারণ করে রেখেছে ১৩৫০-এর মন্বন্তরকে: দুর্ভিক্ষের পটভূমিতে বাংলা সাহিত্যে এ দুটি প্রতিভূ-গল্প। 'মৃত্যু-যাত্রা' গল্পে দুর্ভিক্ষ রূপ লাভ করেছে 'নয়নচারা' থেকে ভিন্ন প্রক্রিয়ায়, ব্যাপক মানুষের বাস্তব ও ক্ষুধা-উৎসারিত চৈতন্যের একান্তবর্তী হয়ে। গ্রামে খাদ্য নেই। দীর্ঘ অনাহারে নির্জীব কঙ্কালসার মানুষগুলো তাই গঞ্জে চলেছে। কিন্তু সে পথ অনেক দূরের। এ অভিযান বন্ধুর, প্রতীক্ষার, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার। অভিষ্ট লক্ষে তাই অনেকেই পৌঁছতে পারেনি। পথেই অনেক অনাহারী-জীবন অকালে ঝরে গেছে। বস্তুত, 'মৃত্যু-যাত্রা' সেই সব মানুষের ব্যর্থ যাত্রার কাহিনি যারা ক্ষুধায় কাতর, শীর্ণ, অস্থিচর্মসার, অথচ পরমভাবে তারা আকাঙ্ক্ষা করছে বাঁচার, সামান্যতম আশ্রয়ের, ক্ষুধার খাদ্যের। এক কথায় 'বাংলাদেশের অনাহারক্লিষ্ট জীবনমৃত মানুষ যেন মিছিল করে মৃত্যুর দিকে যাত্রা করেছে।'[৭]

গাঁয়ে বিভৎস আকাল দেখা দেয়ায় হালু, রবিব মিঞার বউ; দুটো ছেলে এবং সারা গাঁয়ে বহু লোক মারা গেল। তাই তারা ওপারে যাবে বলে ঘর থেকে বের হয়েছে: 'তা ওপারে বড় গাঁ, চাল পাওয়া যাবে নেশ্চয়।'[৮] কিন্তু তাদের এ মৃত্যু-যাত্রায়ও বাধাঁ আছে। সে বাধা হাজুর অতিবৃদ্ধ বাপ-মা। হাজুর বৃদ্ধ মা অনাহারে মৃত্যুবরণ করে নদীর ঘাটে। দলের লোক মারা গেল, তাকে সৎকার না করে কী করে তারা যাত্রা শুরু করবে। কিন্তু তাদের আছে ক্ষুধার জ্বালা, সেই সঙ্গে নেই কোনো সহায় সম্বল। এমন সময় ঘাটে আরো একটি মৃত্যু ঘটে। এই মৃত্যুতে সবাই বিরক্ত হয়। কারণ প্রথম মৃত্যুতে তাদের মানবিকতা জাগ্রত হলেও দ্বিতীয় মৃত্যুতে তাদের ক্ষুধার জ্বালায় মানবিকতা আর জাগে না। ক্ষুধার জ্বালায় তারা হাজুর বাবার লাশ ফেলে এক মুঠো খাবারের জন্য চৌধুরী বাড়ির দিকে রওনা হয়। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ এ গল্পে মৃত্যুর চেয়ে জীবনকে বড় করে দেখেছেন। কারণ জীবনই যদি না থাকে মৃত্যুবরণ করবে কী। জীবন আছে বলেই তো মৃত্যু। মৃত্যু স্থবির পড়ে থাকে নদীর ঘাটে; জীবন নিজকে বাঁচাতে চৌধুরী বাড়ির দিকে খাবারের জন্য রওয়ানা দেয়। কারণ মৃত্যুর চেয়ে জীবনই শক্তিশালী।

'খুনী' গল্পে খুনী রাজ্জাকের প্রতি সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের গভীর ভাবাবেগ ব্যক্ত হয়েছে। একজন খুনীও যে জীবনকে ভালোবাসে এবং জীবনকে ভালোবেসে বাঁচতে চায় তার শিল্পসম্মত প্রকাশ 'খুনী' গল্প। মূহুর্তের ঝোঁকে চৈত্র মাসে ফজু মিয়াদের বাড়ির ফইন্যার মাথা ফাটিয়ে দেয় চর আলেকজান্দ্রার সোনাভাঙ্গা গ্রামের রাজ্জাক। সে আর স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে না, যদিও স্বাভাবিক জীবনের জন্য তার তৃষ্ণা দুর্মর। বিবাহ করে গৃহী জীবনযাপনের স্বপ্নে আবেদ দর্জির বিধবা পুত্রবধূ জরিনাকে ভালোবেসেও রাজ্জাক দর্জির কাছে তাকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে ইতস্তত করে। কিন্তু যখনই রাজ্জাক সেই প্রস্তুতি নেয়, তখনই আকস্মিকভাবে দীর্ঘ দিন পরে ফিরে আসে দর্জির নিরুদ্দেশ পুত্র মোমেন। তখন রাজ্জাকের 'অন্তর্ময় ঝলকে উঠল তীক্ষ্ণ বেদনা।' মুহূর্তে সে বুঝে নেয় সুস্থ স্বাভাবিক গৃহী জীবনে সে ফিরে যেতে পারবে না। গল্পে বিষয়-বৈচিত্র্য না থাকলেও মানুষের অন্তর্জীবনের বিশ্লেষণ-প্রয়াস যথারীতি রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের মধ্য থেকেই জীবনের সত্য আশ্চর্যভাবে বেরিয়ে আসে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সব মানুষের মনের অন্তর্মুখী ভাবনা-কামনা কিংবা ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সর্বোপরি জ্বালা-যন্ত্রণাগুলোকে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ অনন্য শিল্পকৌশলে বিকাশ লাভের অবকাশ দিয়েছেন তাঁর মানুষের অন্তর্জীবনের বিশ্লেষণ এই ধারার গল্পগুলোতে: 'আধুনিক শিল্পের এক কুললক্ষণ: সমাজের অজ্ঞাত, খ্যাত, অবহেলিত, ঘৃণিত ও পরিত্যক্তদের জন্যে সহানুভূতি ও মমত্ব, তাদের সমস্যাকে মানবিক চোখে দেখা।'[৯] খুনী রাজ্জাকের মনের অপরাধবোধকে ওয়ালীউল্লাহ্ অন্তবর্তী চেতনার আলোকে বিশ্লেষণ করেছেন: 'শেষে একটি কথা ভেবে শান্তিতে তার কান্না শান্ত হল। যে লোক খুন হয়, সে বেহেশতে যায়। ফইন্যা বেহেশতে যাবে। খোদা কখনো তাকে ক্ষমা না করুক, কিন্তু ফইন্যার বেহেশত-লাভের কথা তাকে চিরদিন শান্তি দেবে।'[১০]

'খণ্ডচাঁদের বক্রতায়' ঢাকার এককালের বস্তিবাসীদের জীবনের কাহিনি বেশ কৌতূহল ও কৌতুকের সঙ্গে বিবৃত হয়েছে। শেখ জব্বার পাড়ার একজন ধনী লোক। তাঁর দুটি গাড়ি, দুটি ঘোড়া আর অন্দরমহল ভর্তি চাকর-বাকর এবং চারজন বিবি রয়েছে। তিনি সেখানে ঘোড়েকা বাদশা নামেও পরিচিত। সেই পাড়ার সব অধিবাসীরা গাড়োয়ান। সারা বস্তি জুড়ে সেদিন বেজায় ধুমধাম চলেছে: 'এ বস্তিতে আজ এই যে এত আনন্দ ও কোলাহল, এর মূলে রয়েছে শেখ জব্বারের চতুর্থ বিবির আগমন।'[১১] জব্বার মিয়া আজ ছোট বিবিকে ঘরে তোলবেন। সে উপলক্ষে জীর্ণ গ্রামোফোনে কোনো এক অখ্যাত বাইজীর খ্যামটা নাচের গান চলছে। এক ছোকরা কোমরে বাঁ হাত রেখে ডান হাতে ওড়না টেনে ঘুরে ঘুরে নেচে সবাইকে মাৎ করছে। এমনকি শেখ জব্বার মিয়াও রসে টগমগ হয়ে মন্তব্য করেন: 'ওয়াহওয়া, কেয়া নাচনা। এই ভাই কামাল, এইসা নাচ দেখা কভি?'[১২] সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ গল্পটিতে বস্তিবাসীদের উল্লাস, শেখ জব্বারের চার বিবির

পারস্পরিক ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, হতাশা, মারামারির মধ্য দিয়ে বস্তিবাসীদের বহির্জীবন এবং অন্তর্জীবন ফুটিয়ে তোলেছেন। ফলে গল্পটি হয়ে উঠেছে নগরের উপান্তে পল্লবিত জীবনের এক বাস্তব চিত্র যা শেখ জব্বারের হয়েও নির্বিশেষ বস্তি মালিকের, সেই সব স্ত্রীর যারা নিরুপায় হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছে বহু-বিবাহের নিষ্ঠুর গিলোটিনে। শেখ জব্বার নিজের আনন্দ-অগ্নির উত্তাপ সকলের মধ্যে সংক্রমিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। অন্যদিকে জব্বারের অন্দরে তার প্রাক্তন তিন স্ত্রী তাদের অবস্থান পরখ করছে নতুন বিবির সঙ্গে। মেয়েদের শক্তি পরীক্ষার এ পরিবেশ স্থূল, লঘু, হাতাহাতি ও চুলোচুলিতে সংঘাতময়, উচ্চকণ্ঠ বাক্যালাপে মুখর হলেও বাস্তব, সমাজ-সত্যেরই স্মারক।

'সেই পৃথিবী' গল্পে পাপবোধ সাদেককে বারবার দংশন করছে। চুরি করতে গিয়ে একবার একটি বিশেষ দৃশ্য তার মনে গাঁথা হয়ে যায়। দেয়ালের ফুটো দিয়ে সে দেখেছিল একটি ঘুমন্ত মেয়ে: ঘুমন্ত মেয়েটির মাধুর্য যে তাকে আকৃষ্ট করছিল তা নয়; যে-জন্যে সে ফুটো থেকে দৃষ্টি সরাতে পারছিল না-সেটি হল মেয়েটির একটি স্তন। একটু আগেও হয়তো শিশুকে মাই দিয়েছিল, এখনো সেটি অনাবৃত।[১৩] সাদেকের পেশা হচ্ছে চুরি করা কিন্তু তার একটা কোমল অন্তর আছে যার কারণে সে অপরাধ জগৎ থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। সাদেক একদিন চাকরিও পেয়ে যায়-ফলে সে চুরি ছেড়ে দেয়। সে তার প্রাক্তন চোর-গুণ্ডা-বদমাশ বন্ধুদের মাস-মাইনের সব টাকাই দিয়ে দেয়। সাদেক হৃদয়হীনতার অপবাদ দূর করতে বদ্ধপরিকর। তাই সে 'প্রাক্তন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েও কোথায় একটি পৃথক সত্তা বোধ করতে থাকে। তা আর-কিছু নয়-সংসার জীবনের সাধ।'[১৪] 'পৃথিবীর মধ্যেও যেন কোথায় আবার রূপকথার দেশ...' সেই পৃথিবীর জন্যেই তার তৃষ্ণা। 'যে-পৃথিবী ভরা সূর্যালোক-ও মুক্তি, যে-পৃথিবীতে শিশুরা কাঁদে ও দম্পতিরা হাসে, যে-পৃথিবীময় শুধু টলমল স্নেহ, সে-পৃথিবীই বেহেশত?' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ১৩৫০-এর মন্বন্তর, অপরদিকে অপরাজনীতি, শাসন- শোষণ প্রত্যক্ষ করে এ গল্পটিতে একটি শান্তিময় পৃথিবীর প্রত্যাশা করেছেন। যেখানে থাকবে শুধু 'ঘরময় অসম্ভব শান্তি।'

'দুই তীর' গল্পে আফসার উদ্দিন ও তার স্ত্রী হাসিনার দাম্পত্য-সমস্যাকে প্রধানত জীবনের দুই তীর থেকে বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়: 'প্রবাহিত নদীর দুটি তীরের মতোই মিলনহীন দুই নর-নারীর দাম্পত্য কথকতা এই গল্পের উপজীব্য বিষয়। এরা দু'জন আফসার উদ্দিন ও হাসিনা, আমাদের এই শ্রেণিভূক্ত সমাজের উঁচু-নিচু দু'টি শ্রেণির বলিষ্ঠ প্রতিভূ।'[১৫] আফসার উদ্দিনের শ্বশুর আরশাদ আলী পূর্ববঙ্গে সুপরিচিত খানদানী বংশের সন্তান এবং শ্বাশুড়ি মরিয়ম খানমও উচ্চ বংশীয়। কিন্তু আরশাদ আলী পারিবারিকভাবে সুখী হতে পারেননি। অপরদিকে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান অথচ উচ্চ-শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বড় চাকুরে আফসারউদ্দিন ধনী পিতার কন্যা হাসিনার সঙ্গে পরিণয়ে আবদ্ধ হন। আফসার উদ্দিনের ছোট বংশ পরিচয় হাসিনার কাছে অজ্ঞাত থাকে না, কারণ, বিশেষ করে নিজের বংশ-গৌরব সম্পর্কে সে অতি সচেতন। এতে করে তাদের দাম্পত্য জীবনের মাঝখানে উঠে যায় এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর এবং শয্যা সঙ্গী হয়েও পরস্পরের কাছে থেকে যায় অপ্রকাশ্য, অনাত্মীয় ও দুর্বোধ্য, যার সমাপ্তি বিচ্ছেদে।

আফসারউদ্দিন দারিদ্র্য-জর্জরিত পরিবার থেকে উঠে এসেছে। যে জীবন সে ফেলে এসেছে, সে জীবনের প্রতি তার কোন মমতা নেই। কারণ দারিদ্র্য ছাড়া সে জীবন আফসারউদ্দিনকে মোহনীয় আদরণীয় কিছুই দিতে পারেনি। তবু বিগত জীবনকে তার ঘনিষ্ঠ মনে হয়। লেখক বলেন: 'হয়তো সে-জন্যই দু-বছরব্যাপী প্রচেষ্টার পরেও রস তার নতুন জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে নাই। তার আবরণই কেবল গ্রহণ করেছে, তার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি।'[১৬]

আফসারউদ্দিনের দারিদ্র্যপীড়িত জীবনের অবসান হয়েছে সত্য, কিন্তু তার ভিতরে অস্ফুট ভয়-শঙ্কা কাজ করছে কারণ আফসারউদ্দিন ও হাসিনার দাম্পত্য জীবনের মধ্যে যে-পুল, সে-পুলের মধ্যখানে হাত

বাড়িয়ে পথরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে তার স্ত্রী হাসিনা। হাসিনার এই দুর্বিনীত স্বভাব স্বাভাবিকতার পর্যায়ে পড়ে না। কারণ তার শরীর সুস্থ। সে লাবণ্যময়ী। স্বামীকে সহ্য না করার কারণটা অন্যস্থলে এ বৈকল্য, অস্বাভাবিকতা তার মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া। গল্পে আরশাদ আলী ও আফসারউদ্দিন দুজনেই নিয়তির হাতের পুতুল:

> "আরশাদ আলী ও আফসারউদ্দিন দুজনেই প্রীতিহীন দাম্পত্য-জীবনের শিকার। সেখানে আলোর বিচ্ছুরণ নেই, আছে শুধু নিবিড় তমিস্রা, নারী সেখানে নিষ্ঠুরতার প্রতীক, পুরুষ অদৃশ্য নিয়তির ক্রিড়ানক মাত্র। সংসারের রীতিমাফিক নিয়মে দেখা যায় সাধারণত নারীই সযত্নে তার সংসারটি গড়ে তোলে। সেখানে নারীধর্মের স্বাভাবিক পরিণতির বিকাশ ভালোবাসা। কিন্তু 'দুই তীরে' তার বিপরীত রূপটিই দেখা গেল। আরশাদ আলীর সংসারে বিপর্যয় সৃষ্টি করে নারী, আফসারউদ্দিনের জীবনকে ধ্বংস করে নারী।"[১৭]

আফসারউদ্দিনের বিশ্বাস ছিল বিয়ের পরে অপরিচিত নরনারীর মধ্যে ভালোবাসা সঞ্চার না হওয়াটা প্রকৃতির রীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু তার এ বিশ্বাস এখন ভেঙ্গে গেছে। তার এখন মনে হচ্ছে দাম্পত্য জীবন একটি প্রহসন মাত্র। 'দুই তীর' গল্পের নিষ্প্রাণতা ও নিষ্প্রেমের কাহিনি যেন কোনো ব্যক্তির জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, তা আমাদের সমাজে যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হওয়া জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। আর আফসারউদ্দিন তা দেখতে পান শ্বশুরের না দেখা জীবনে। আফসারউদ্দিন অনুভব করেন তাদের অসঙ্গত সম্পর্কের অভ্যন্তরীণ ফারাক 'দুই তীর' যেন হাসিনা ও আফসারউদ্দিনের অনুরাগহীন, মরুকল্প হৃদয়ের দুই মেরুবিন্দু: 'দুই তীর ও অন্যান্য গল্প' গ্রন্থের নাম গল্পটিতে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আলো ফেলেছেন সমাজের উচ্চ-মধ্যবিত্ত ও বুর্জোয়া মুৎসুদ্দী শেণির ভিতর বাড়িতে; সেখানকার আপাত উজ্জ্বলতার আড়ালে যে হতাশা, বঞ্চনা, দীনতা, নিষ্প্রেম-তারই চিত্রাঙ্কন করেছেন তিনি।'[১৮]

শিল্পী হিসেবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যদিও বিদ্রোহের নন, কিন্তু স্বসমাজকে নিরপেক্ষভাবে পর্যালোচনা করেছিলেন তিনি, তাই সমাজের সকল প্রকার অন্যায়, অন্ধতায় তিনি আহত হয়েছেন এবং সে-সবের বিরুদ্ধে মৃদু-প্রতিবাদ ও বিদ্রুপ উচ্চারিত হয়েছে তাঁর ছোটগল্পে। ওয়ালীউল্লাহের সমাজ সচেতনতার দীপ্ত সাক্ষর 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী', ঢাকা থেকে প্রকাশিত 'নয়া-সড়ক' নামক সাহিত্যপত্রে গল্পটি বেরোয় ১৯৪৮ সালে, সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক কারণে ভারত ও পাকিস্তান বিভক্তির (১৯৪৭) করুণ পটভূমিতে এটি একটি প্রতিনিধি-গল্প।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের গল্পে প্রতীক দেশ-কাল ও মানবজীবনের ব্যাপকতর পটভূমিকায় বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। ঐতিহাসিক ও রাজনেতিক বিপর্যয় এবং ব্যক্তি-সমাজ ও পরিবার জীবনের ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতার অনুষঙ্গে দুই তীরও অন্যান্য গল্পগ্রন্থে প্রতীক স্বতন্ত্র্য মাত্রা লাভ করেছে। 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহপ্রতীক-ফর্মে বিন্যাস করেছেন মানবিক মহত্ত্বের দীপ্তিকে। দেশবিভাগের উত্তেজনায় কলকাতা থেকে আসা কয়েকজন মুসলিম যুবক দখল করে একটি পরিত্যক্ত হিন্দু বাড়ি। এত বড় বাড়িতে তারা কখনো থাকেনি। নিশ্চিত আশ্রয় লাভের উল্লাসে যখন তারা আত্মতৃপ্ত, এমনি সময়ে অকস্মাৎ মোদাব্বের আবিষ্কার করে তুলসীগাছটি। তুলসীগাছটির প্রতি প্রথমে তারা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেও ক্রমে হিন্দু গৃহকর্ত্রীর কাছে তুলসীগাছের যে-মর্যাদা ও পবিত্রতা তা'যেন ওদের প্রত্যেকের মধ্যেই সঞ্চালিত হয়ে যায় ফলে 'অক্ষত দেহে বিরাজ করতে থাকে তুলসীগাছটি।' কিন্তু বাড়ি দখলকারীদের আশ্রয়-সুখ অল্পদিনেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সরকার বাড়িটি রিকুইজিশন করে, ফলে তাদের ঐ বাড়িটি ত্যাগ করতে হয়: বস্তুত, 'পরিত্যক্ত বাড়িতে আশ্রিত ব্যক্তিরা বিচ্ছিন্ন বলেই ভীত, একদা আশ্রয় পেয়েও বিতাড়িত। সাম্প্রদায়িক

সংকট, দুই বাংলার মানুষদের বাস্তুভিটা ত্যাগের কারণেই তাদের এই বিচ্ছিন্নতা, পরস্পর পরস্পরকে অনাত্মীয় ও শত্রুজ্ঞান।[১৯]

অতঃপর দেখা যায়, উঠানের শেষে তুলসীগাছটি আবার শুকিয়ে উঠেছে। তার পাতায় খয়েরি রঙ। যে দখলদার নিম্নবিত্ত মানুষেরা হিন্দু বাড়িটি দখল করেছিল, মনে-মননে হিন্দু-বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও তারা কিছুতেই হিন্দু আচারের প্রতীক সেই তুলসীগাছটিকে ধ্বংস বা নির্মূল করতে পারেনি। তুলসীগাছের অম্লান উপস্থিতি মানবিকতার ধ্রুব স্থায়ীত্বেরই যেন প্রতীক:

> "এ গল্পে প্রতীকের প্রয়োগ ঘটেছে দুটি বিষয়, তুলসীগাছ ও পুরোনো আমলের দোতলা বাড়িটিকে আশ্রয় করে। শীর্ণ তুলসীগাছটি দেশ-বিভাগের ফলে বাস্তুচ্যুত, বিশীর্ণ ব্যক্তিদের অস্তিত্বেরই প্রতীক। আর পুরোনো বাড়িটি দ্বিজাতিতত্ত্ব- নির্ভর এ দেশীয় রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থাকেই করেছে প্রতীকায়িত। আশ্রয়হারা, উন্মুল মানুষগুলি যে-গৃহের আশ্রয়কে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছিল তা তাদের নির্ভরতা দিতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত তারা হয়েছে আশ্রয়হারা। ১৯৪৭-এর রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে পূর্ববাংলার অধিবাসীরাও তাঁদের স্বদেশ ও স্বাদেশিক অস্তিত্বকে আবিষ্কার করতে গিয়ে দেখেছেন যে, তাঁরা মূলত বাস্তুচ্যুত, নিজ দেশে পরবাসী।"[২০]

একটি 'তুলসীগাছের কাহিনী' সম্পর্কে আব্দুল মান্নান সৈয়দ (১৯৪৩-২০১০) মোতাহের হোসেন চৌধুরী[২১] (১৯০৩-১৯৫৬)-র মতো বৃক্ষকেই জীবনের প্রতীকজ্ঞানে স্থিতধী হয়ে মন্তব্য করেছেন: 'সবক্লিন্ন রাজনীতি, ধর্মনীতি ও সমাজনীতির উপরে যে-মানুষ, মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা-এই গল্পে আছে তার ভাস্বর চিত্রণ।.... 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' আসলে বৃক্ষের কাহিনী নয়-মানুষের কাহিনী।'[২২]
আর তানভীর মোকাম্মেল গল্পটির মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের আত্যন্তিক 'সমাজচেতনা' আবিষ্কার করে লিখেছেন:

> 'দেশভাগের ট্রাজেডীর ঋত্বিকীয় যন্ত্রণাময় আর্তি ছাড়া ও আরেকটি যে বৈশিষ্ট্য 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' গল্পটিতে মূর্ত, তা হচ্ছে স্বল্পবেতনভূপেটিবুর্জোয়া কেরানী কূলের চরিত্রচিত্রণে ওয়ালীউল্লাহ্র প্রশংসনীয় দক্ষতা, যাদের মধ্যে সবচেয়ে "বামপন্থী"-টির কাঁটা ও সংশয়ে দুলে দুলে অবশেষে ডান দিকেই হেলে পড়ে।'[২৩]

একটি বিশেষ রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার পটভূমিতে রচিত হওয়া সত্ত্বেও এ গল্পে কোনো প্রচারধর্মী উচ্ছ্বাস স্থান পায়নি। সাময়িক ঘটনা উপলক্ষ মাত্র, প্রকৃতপক্ষে এ গল্পে চিরন্তন মানব-মনের বার্তাই পরিবেশিত হয়েছে, উচ্চারিত হয়েছে মানুষের জয়ধ্বনি। সেজন্যেই দখলদার নিম্নবিত্ত মানুষেরা আজ যখন হিন্দু সম্প্রদায়ের নিন্দা করছে, তখনই আবার যত্ন নিচ্ছে তুলসীগাছের। ফলকথা, 'একটি তুলসীগাছের কাহিনী' এ দেশীয় সমাজের এককালীন সংকট, দেশবিভাগপীড়িত ও প্রহত অস্তিত্ব-অন্বেষার রূপকল্প, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের অসাম্প্রদায়িক ও মানবপ্রেমী চৈতন্য, তাঁর সমকালকে স্পর্শ করে কালান্তরে উপনীত হওয়ার আলেখ্য, রূপবর্ণিমা।

অসাধারণ সমাজবাস্তবতার গল্প 'পাগড়ি'। কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির হলেও 'দুই তীর' এর আফসারউদ্দিনের মতোই 'পাগড়ি' পৌঢ় খানবাহাদুর মোত্তালেব সাহেবের নিঃসঙ্গতাবোধ, তাঁরই জীবনকে পদে পদে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ-আকাঙ্ক্ষার রূপকল্প। মোত্তালেব সাহেব আইনের লোক, সারা জীবন আইনের অলিগলিতে অশান্ত কীটের মতো ঘোরাঘুরি করেছেন, পসার জমিয়েছেন, পয়সা করেছেন। মফস্বল শহরে দোতলা বাড়ি করেছেন। পাঁচ সন্তানের জনক তিনি। কিন্তু এই জীবন তাঁকে এতটুকু শান্তি দিতে পারেনি। কারণ বিকৃতমস্তিষ্কা স্ত্রী তাকে সুখী করতে পারেনি। যার কারণে মোত্তালেব সাহেবের মনের অন্ধগলিতে

একদিন নীরবেই জন্ম নেয় একটি সংকল্প, তা হলো তাঁর দ্বিতীয় বিয়ের পয়গাম। দ্বিধার সঙ্গে হলেও সন্তানদের কাছে তিনি এ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। মাঝবয়সী পিতার এ সিদ্ধান্তে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া ক্ষোভ ও বেদনার জন্ম নিলেও তারা বাহ্যিক সংযম হারায়নি। নজু মিয়ার মাধ্যমে চলেছে বিয়ের আয়োজন। বিয়ের জন্য মোত্তালেব সাহেব নতুন পোশাকে সজ্জিত হয়েছেন, বজরা ভাড়া করেছেন, নববধূর জন্য শাড়ি-গহনা কিনেছেন। কিন্তু কিনতে পারেননি 'আড়ম্বরের চুম্বকশীর্ষ' এবং 'নওজোয়ানের উদগ্র নিশানা' একটি পাগড়ি। সবার অজান্তেই মোত্তালেব সাহেব ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বিয়ে সম্পন্ন করেন। 'ইট-সুরকি ঢালা রাস্তায় ঘোড়ারগাড়ি লোহার-পাতে-ঘেরা চাকা ঘড়ঘড়িয়ে মচমচিয়ে চলে।'[২৪] নববধূসহ মোত্তালেব সাহেবগৃহে প্রত্যাবর্তনকালে মুষলধারে বৃষ্টি নামায় তাঁর পোশাক, শরীর, মাথার কিস্তি টুপি, নববধূর দামি শাড়ি ভিজে যায়। তবে ভিজেনি মোত্তালেব সাহেবের দামি মাসহাদি পাগড়ি।

বয়সের বাধা কিংবা ছেলেমেয়েই বিয়ের যোগ্য হয়েছে, তা মোত্তালেব সাহেব মানেননি, কারণ তিনি বাহাদুর, উকিল, জমিদার। তিনি তাঁর বৃত্তে প্রভু। সুতরাং যৌনপিপাসা মেটানোর জন্য বারবার বিয়ে করবেন। তাই সব কিছু ভিজে গেলেও পাগড়িটি ভিজে না। 'পাগড়ি' গল্পটি বাঙ্গালি মুসলমানের সামন্ত-বুর্জোয়াও পাতি বুর্জোয়া-মুৎসুদ্দী সমাজের চিত্র। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এ সমাজে যেমন শ্রেণিবিভাজন, তেমনি নরনারীর মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও:

> "এই সামন্ত-মুৎসুদ্দী সমাজে পুরুষেরই প্রতাপ; পুরুষ সেখানে প্রভু: স্বার্থপর, স্বেচ্ছাচারী ও লোভী; নারী সেখানে বন্দিনীই শুধু নয় সে নির্যাতনের পাত্রী, সেবিকা বা ক্রীতদাসের চেয়ে বেশি কিছু নয়; পুরুষের নির্যাতনে অভিশপ্ত তার জীবন: সে শাসনেরও শোষণের বস্তু মাত্র।"[২৫]

'পাগড়ি'র খান বাহাদুরএর পাগলি স্ত্রী এই সমাজের অবহেলিতা প্রতিরোধহীন নারীর প্রতীক, খান বাহাদুর লোভীও নির্বিবেক পুরুষের।

'কেরায়া' গল্পটি সংক্ষিপ্ত নৌ-যাত্রার কাহিনি। মাঝিদের কেরায়া-বঞ্চিত, ব্যর্থ প্রত্যাশাও তিক্ত অভিজ্ঞতার এক পিঙ্গল আখ্যান। কাহিনির শুরু এক সন্ধ্যায়, শেষ পরবর্তী দিবাগত রাত্রিতে। কেরায়া নৌকার দুজন দরিদ্র মাঝি গুড়ের কেরায়া নেবে বলে অপেক্ষা করছে। কিন্তু মহাজন আসেনি তাই মাঝিরা শূন্য নৌকা নিয়েই ফিরে এসেছে। দারিদ্র্যের হাহাকার গল্পটিতে স্পষ্ট। কেরায়া নৌকাই মাঝিদের জীবিকা সংস্থান করে, তাদের স্ত্রী-সন্তানেরা সামান্য ঐ টাকার আশাতেই দূর গাঁয়ে থাকে বুক বেঁধে: 'জোয়ান মাঝি দুটির পেটে, এতিম ছেলেটার পেটে ক্ষিদের আগুন জ্বলে। দূর গাঁয়ে তাদের বাড়িতেও সে- আগুন জ্বলে ধিকিধিকি করে।'[২৬] জীবনবাদী শিল্পী সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ 'কেরায়া' গল্পে জীবনের জয়গান ঘোষণা করেছেন। কারণ মৃত স্থবির, জীবন চলমান। জীবনের যে জৈবিক বিক্রিয়া তা মৃত্যুর জন্য থেমে থাকে না। তাই নৌকায় মৃতদেহ দেখেও বালকটি ঘুমায়, মাঝি এসে তার পাশে ঘুমায়: 'অন্তর্লোকে, নিজের অবিভাজ্য সত্তায় প্রতিটি মানুষই বিচ্ছিন্ন, পরমভাবে একা। তৎসত্তে ও জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়েই জীবন বয়ে চলেছে।'[২৭]

'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা'য় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আলো ফেলেছেন আমাদের সমাজের অন্যতম ব্যাধি হিংসা-বিদ্বেষের উপর। যার কারণে ব্যক্তি বা পরিবার তাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে জীবনকে নিষ্ফল করে তোলে। জীবন হয়ে ওঠে সুখ-শান্তি বিবর্জিত। সদরউদ্দিন ও আখলাকের বাল্য জীবনের কলহ-বিবাদ হাতাহাতি মারামারি পরবর্তী জীবনে একটি মারাত্মক হিংসা-বিদ্বেষে পরিণত হয়। বাল্যকালে সদরউদ্দিন আখলাকের শার্টটি যেভাবে ছিড়ে ফেলেছিল, সেইভাবেই তার জীবনকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে: 'সারাজীবন সে একটি বিষাত্মক একনিষ্ঠতার সঙ্গেই আখলাকের সুখ শান্তি- ধ্বংস করেছে।'[২৮]

বাল্যকালে আখলাক অধ্যয়নশীল, সচ্চরিত্রবান এক সুবোধ বালক ছিল। আর্থিকভাবে সচ্ছল না হলেও এই গুণাবলির কারণে সে হয়তো অর্থসম্পদ সুখ-শান্তি লাভ করতে পারত। কিন্তু পারেনি সদরউদ্দিনের জন্য। সদরউদ্দিনের চক্রান্তে আখলাক দীর্ঘ মকদ্দমায় লিপ্ত হয় এবং সর্বস্বান্ত হয়:

> 'সদরউদ্দিন তার বুকে যে সর্বনাশী আগুন জ্বালাতে সক্ষম হয়, সে-আগুনে সে জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়। আজ সে ভগ্ন-দুস্থ মানুষ। মুখের বাঁ দিকে তার পক্ষাঘাত; চোখে পরাজয়ের নিবিড় গ্লানি। সে আজ যে-ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয়েছে, সে-ধ্বংসস্তুপের সৃষ্টিকর্তা সদরউদ্দিনই।'[২৯]

জীবনের অন্তিম সময়ে এসে সদরউদ্দিনের যে আত্মশোচনা-আত্মগ্লানি তা আমাদের সমাজের বিবেকবান মানুষের প্রতীক। 'নিষ্ফল জীবন নিষ্ফল যাত্রা'য় সদরউদ্দিনের কূটঅভিসন্ধি ও ষড়যন্ত্রে আখলাকের জীবন হয়েছে বিপৎসঙ্কুল, দুঃখময়ও দারিদ্র্যকীর্ণ। তাই সদরউদ্দিন তার কৃতকর্মের জন্য আখলাকের কাছে মাপ চাওয়ার সংকল্প করে। কিন্তু যখনআখলাকের সঙ্গে তার দেখা হল, তখন অশ্রুপ্লুত আখলাককে দেখে সদরউদ্দিনের সমস্তই বিস্মৃত হল,মাফ চাওয়ার কথাই ভুলে যায়,বুঝে উঠতে পারে না তার এ বিচিত্র শেষ যাত্রাটিরই-বা অর্থ কী: 'এই নির্বাক নিরর্থক তাতেই তার জীবন শেষ হয়। হয়তো আমাদের সবারই জীবন।'[৩০]

ওয়ালীউল্লাহ্ সুযোগ পেলেই মধ্যযুগীয় রীতিনীতির প্রতিভূ এদেশের তথাকথিত বনেদী সম্প্রদায়কে যেমন শ্লেষও বিদ্রূপে বিদ্ধ করতেন, তেমনি মধ্যযুগীয় অজ্ঞতার পূজারী এ-দেশের একশ্রেণির ধর্মব্যবসায়ীর মুখোশ উন্মোচন করতেও তিনি তৎপর ছিলেন। তাঁর 'গ্রীষ্মের ছুটি' গল্পে সামাজিক কুসংস্কারের উপর এক নীরব প্রতিবাদ। গল্পে ওয়ালীউল্লাহ্ আবিষ্কার করেছেন মানব-অস্তিত্বের ভিন্নতর স্বরূপ। ধর্মীয় আবরণের অন্তরালে ব্যক্তির যে লিপিডো চেতনা সুপ্ত থাকে এবং অনুকূল পরিবেশে সেই আদিম প্রবৃত্তি কদর্যরূপে প্রকাশ পায় আম-মৌলবী চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে:

> "তারপর সহসা যেন মস্তিষ্কশূন্য হয়ে সে একটি অদ্ভুত কাণ্ড করে বসে। ক্ষিপ্রভঙ্গিতে সেলিনার সামনে উবু হয়ে বসে তার গালের ক্ষত স্থানে মুখ দিয়ে সে চুষতে থাকে ক্ষত স্থানটি। তার গালে আম-মৌলবীর কর্কশ ঠোটের স্পর্শ পেয়ে সেলিনা হঠাৎ নিথর হয়ে পড়ে। মনে হয় তার সমস্ত শরীর জমে পাথর হয়ে গেছে। পরক্ষণেই ঝটকা দিয়ে মাথা সরিয়ে নিয়ে সে কঠিন দৃষ্টিতে আম-মৌলবীর দিকে তাকিয়ে কঠিনতর কণ্ঠে বলে, আপনি আমার গা ধরেছেন। দাদাসাহেবকে বলে দেব।"[৩১]

ক্ষত স্থানে মুখ দিতেই সেলিনার আত্মজাগরণ ঘটেছে এবং সে ফিরে পেয়েছে তার জাগরণ সত্তা, নারী ব্যক্তিত্ব ও সচেতনতা। গল্পটিতে একসঙ্গে শিশু-মনস্তত্ত্ব ও গেঁয়ো মোল্লাদের শঠতার এক নিষ্ঠুর বাস্তবচিত্র অঙ্কিত। আম-মৌলবীরা মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে সমাজ জীবনকে অসুস্থ করে তোলে, আবার তারাই দায়িত্ব নিতে চায় স্ব-সৃষ্ট রূগণ সমাজকে সুস্থ করে তোলার, যার পরিণতিতে সমাজ আরো বেশি অসুস্থ এবং অনারোগ্য হয়ে পড়ে। গল্পটিতে এই সামাজিক দিকটির প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে, সরাসরি নয়-পরোক্ষে; সংস্কারের মতো নয়-শিল্পীর মতোই।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ আম-মৌলবীর হাস্যকর, বিরক্তিকর, উপহাস্পদ চেহারাস্পষ্ট করেছেন 'গ্রীষ্মের ছুটি' গল্পে। আম- মৌলবীর কূটকৌশলে দাদাসাহেবসহ বাড়ির সকলে বিভ্রান্ত হয়েছে। তার মিথ্যা ফতোয়ার জন্যেই বাড়ির লোকেরা ভূতের চোখ এড়ানোর জন্যে সেলিনার মাথার সুন্দর চুলগুলো কর্তন করেছে। জীনাত ইমতিয়াজ আলী এ সম্পর্কে মূল্যায়ন করে বলেন:

> "আমাদের ধর্মশিক্ষা অনেক ক্ষেত্রে অপূর্ণ, একদেশদর্শী হওয়ায় ধর্মবেত্তা বলে পরিচিত ব্যক্তিদের মধ্যে চারিত্রিক অসংগতি, প্রবল মানস-বিকারও বৈকল্যের উপস্থিতি সবচেয়ে প্রকট। 'গ্রীষ্মের ছুটি' গল্পে সেলিনার কথামালা ও আম মৌলবীর আচরণের মাধ্যমে গল্পকারের সেই মানব মনস্তত্ত্ব-জ্ঞানী ও অসম্পূর্ণভাবে বিকশিত সমাজে ব্যক্তি-মননের স্বরূপ-সচেতন অন্তরের প্রকাশ ঘটেছে।"[৩২]

প্রখর সমাজচেতনা বিচ্ছুরিত গল্প 'মালেকা'। গল্পটিতে দারিদ্রজজ্জরিত নিম্নমধ্যবিত্ত জীবনের হতাশা, নৈরাশ্য, দীনতা চমৎকার নৈপুণ্যে উপস্থাপিত হয়েছে। গল্পের প্রধান চরিত্র মালেকা অনাহারে ও অচিকিৎসায় মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছে। দ্বিতীয় বিশযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের ঠিক পূর্বমুহূর্তের শিক্ষক সমাজের দৈন্যদশা মালেকা গল্পের উপজীব্য। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ মাস্টার শ্রেণির প্রতি অসম্ভব ভালোবাসায় সিক্ত গল্পটি:

> "মাস্টরনিরাও মানুষ। তারা কলযন্ত্র নয়। তাদেরও পরিবার আছে; তাদেরও সমস্যা আছে। চালের দরটার কথা ভেবে দেখ। চল্লিশ-পঞ্চাশের মধ্যেই ওঠা-নাবা করে। নাবলে কাকর বাড়ে অথবা ভেঙ্গে ক্ষুদ্র হয়। উঠলে ঘরে এক মুঠো আসে কি আসে না। মানুষের পেটে দানা নেই, 'কুত্রাপি শব্দের অর্থ জেনে কী হবে?"[৩৩]

স্বামী, শাশুড়ি আর দুটি ছেলে-মেয়ের জন্য মালেকা জীবনযুদ্ধে নামে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষকতা সূত্রে পাওয়া অর্থ সামান্যই। মালেকার গার্হস্থ্য জীবন তাই দারিদ্রতায় পরিপূর্ণ, হিসাব-শাসিত, অভাবক্লিষ্ট ও অপ্রাপ্তির বেদনায় দীর্ঘায়িত। 'মালেকা' সেদিক থেকে তারই সংগ্রামী সত্তা; এবং জীবনযুদ্ধের করুণ অথচ বাস্তবানুগ কাহিনি। মালেকা জীবনযুদ্ধে পরাজিত এবং অস্তিত্বের সংকটে বিধ্বস্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি।

মূল্যায়ন:

ছোটগল্পকার হিসেবে বাংলা ভাষায় শুধু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেই তুলনীয় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্। জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত ও অনুপুঙ্খ জটিলতা যেমন পর্যাপ্ত পাওয়া যায় তাঁর ছোটগল্পে তেমনি বাংলার সমাজজীবনের বাস্তবতাও পুরোপুরি উপস্থিত, তবে তা প্রতিবেদনের মতো নয়। আধুনিক শিল্পে যেমনটি থাকা বাঞ্চনীয় তেমনই সূক্ষ্মভাবে। ওয়ালীউল্লাহ্ তিরিশের লেখকদের মতো ঘোষণা দিয়ে বস্তিতে, নর্দমায়, অবজ্ঞাত, পরিত্যক্তদের এলাকায় যাননি সেখানকার মানুষের জীবন আঁকতে, তবে তাঁর লেখায় বাংলাদেশের বিস্তৃত এলাকা বিম্বিত হয়েছে। তাঁর ছোটগল্পগুলোয় পাওয়া যায় নদীতীরবর্তী জনপদ, মাঝিমাল্লার সংগ্রামী জীবন, নৌকায় খরতালের ঝনঝন্ শব্দ, খাল বিল পুকুর ডোবার সোঁদা গন্ধ, গাঁয়ের মেয়েদের ঘন কালো চুল, অন্তেবাসী মানুষের হিংসা-বিদ্বেষ নিষ্ঠুরতা প্রেম ভালবাসা রিরংসা দীনতা মহত্ত্ব, তাদের জন্ম-মৃত্যুর কথা এবং স্বপ্ন ও সংগ্রাম, যুদ্ধের বাজারে আধপেটা-থাকা বিপন্ন মানুষ, দুর্ভিক্ষের অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মৃত্যুযাত্রা, উঠতি মুসলমান মধ্যবিত্তের নিষ্প্রাণ জীবন, মুসলমান পরিবারের নারীর অবরুদ্ধ জীবন, পতিপরায়না নারীর বৈচিত্রহীন একঘেয়ে জীবন, মুসলমান সমাজের বহু-বিবাহ, পরিপূর্ণ যৌবনা অশ্রুমতী নারী, সতীনের সঙ্গে সতীনের ব্যতিক্রমী সম্পর্ক, উচ্চ-মধ্যবিত্ত জীবনের হাহাকার, বনেদী মুসলমানদের আত্মঘাতী অহংকার, দেশবিভাগজনিত উদ্বাস্তু সমস্যা, হিন্দুবাড়িতে প্রতি দিনান্তে গৃহকর্ত্রীর তুলসীতলায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, মফস্বল শহরের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রা, দরিদ্র ইস্কুল-শিক্ষয়িত্রীদের জীবন সংগ্রামের করুণ কাহিনি, ধর্মব্যবসায়ী কাঠমোল্লা ও আম-মৌলবীদের ভণ্ডামী, দক্ষিণ অঞ্চলের মানুষের সারেং খালাসীর সামুদ্রিক ও বন্দরের জীবন, মুসলমান গাড়োয়ান, ঘোড়া আর আস্তাবলের চিত্র, সর্বোপরি ব্যক্তির অন্তর্জীবনের জটিলতার অনুপুঙ্খ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ। তা ছাড়া সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ বাংলা সাহিত্যের অনেকটাই পূরণ করেছেন সেই অভাব যা দীর্ঘদিন যাবৎ উপলব্ধি করেছেন এ ভাষার পাঠকগণ: তিনি

উপহার দিয়েছেন মুসলমান সমাজের একেবারে ভেতরকার চিত্র। সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যখন গল্প লেখা শুরু করেন তখন বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণকাল: প্রধান গদ্যশিল্পীগণ শুধু জীবিত নন প্রবলভাবে সৃষ্টিশীল। মাত্র পঞ্চাশ-বাহান্নটি গল্পই ওয়ালীউল্লাহকে বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ গল্পকারদের অন্তর্ভূক্ত করে দিয়েছে। জীবন রূপায়ণে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যেমন স্বয়ং স্বতন্ত্র, জীবন-বিন্যাসের প্রকরণেও তিনি বিশ্বমুখী। চরিত্রে, কাহিনি নির্মাণে, জীবন ও সমাজ-ভাবনায় তাঁর ছোটোগল্পগুলো একেবারেই অন্য কারো মত নয়।

তথ্যসূত্র:

১. শ' রামেশ্বর, আধুনিক বাংলা উপন্যাস: যুগ-পরিবেশ ও সামাজিক পটভূমি(প্রথম খণ্ড), কলকাতা: ১৯৮২, পৃ. ৬৪
২. মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার, কালের পুত্তলিকা, কলকাতা: ১৯৮২, পৃ. ৪৮৪
৩. ইমতিয়া, আলী জীনাত, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: জীবনদর্শন ও সাহিত্যকর্ম, ঢাকা, ২০১৫,পৃ. ৫২
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪
৫. হামি, শামীমা, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের সাহিত্যকর্ম শব্দ ব্যবহার ও চেতনাপ্রবাহ রীতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ২০
৬. সৈয়, আব্দুল মান্নান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ঢাকা, ২০০১, পৃ. ১৯
৭. মকসু, সৈয়দ আবুল, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহের: জীবন ও সাহিত্য, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ১৬৬
৮. সৈয়, ওয়ালীউল্লাহ্, গল্পসমগ্র, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ২১
৯. সৈয়, আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১
১০. সৈয়দ,ওয়ালীউল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩
১১. সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২
১২. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
১৪. সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ.২২
১৫. হামিদ, শামীমা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭
১৬. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ.৫৪
১৭. ইসলাম, আজহার, বাংলাদেশের ছোটগল্প বিষয়-ভাবনা স্বরূপ ও শিল্পমূল্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ১৩২
১৮. মকসুদ, সৈয়দ আবুল, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬
১৯. আলী, জীনাত ইমতিয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯
২০. বোস, চঞ্চল কুমার, বাংলাদেশের ছোটোগল্পের শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৩৯
২১. চৌধুরী, মোতাহের হোসেন, সংস্কৃতি-কথা, ঢাকা, ১৩৬৫, পৃ. ১৩৫-১৩৭
২২. সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ৪৪
২৩. মোকাম্মেল, তানভীর, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্: সিসিফাস ও উপন্যাসে ঐতিহ্যজিজ্ঞাসা, ঢাকা, মুক্তধারা, ১৯৮৭, পৃ.২৩
২৪. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৪
২৫. সৈয়দ, আবুল মকসুদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৯

২৬. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৭
২৭. জীনাত, ইমতিয়াজ আলী, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৩
২৮. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ.৮৭
২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৮
৩০. মান্নান, সৈয়দ আব্দুল, প্রাগুক্ত, পৃ.২৮
৩১. ওয়ালীউল্লাহ সৈয়দ, সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩-৯৪
৩২. আলী, জীনাত ইমতিয়াজ, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৭
৩৩. ওয়ালীউল্লাহ্ সৈয়দ, সৈয়দ, প্রাগুক্ত, পৃ.৯৮

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 916-922
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.084

তিরিশের দশক: জগদীশ গুপ্তের গল্পে স্বতন্ত্র নারী

মানালী হালদার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Although Rabindranath Tagore laid the foundation for the Bengali short story, after the First World War, distinct literary tendencies emerged in short fiction. These were expressed through rebellion against Rabindranath, psychoanalytic explorations of sexuality, existential despair, symbolism, and melancholy. After the war, literature and society began to break away from traditional conventions, and under the editorship of Pramatha Chowdhury, the literary magazine Sabujpatra emerged as a harbinger of change.

It was during the Kallol Era that Freud's influence penetrated Bengali literature. His psychoanalytic theories, which had already transformed European thought, crossed the seas and created a sensation in Bengali storytelling. Love was no longer seen as separate from the physical body, leading to a realistic analysis of physical love in literature. Consequently, young writers of this period began depicting primitive human societies that lived far from urban civilization, struggling with their primal desires.

This group of writers also turned their attention to the oppressed and exploited working-class and peasantry. Notably, nine short stories were published in the first volume of Kali-Kalam (1926–27), a literary magazine of the time.

One of the most powerful short story writers of the 1930s was Jagadish Gupta, a prominent contributor to Kali-Kalam. His first short story collection, Binodini (1927), created a significant stir in Bengali literary circles. Like Jatindranath Sengupta, he was deeply influenced by pessimism. While contemporary young writers sought an escape from uncertainty and disbelief through romanticism, Jagadish Gupta wandered through the corridors of doubt and skepticism. His works were rooted in realism, portraying the harsh realities of contemporary life, social contradictions, and psychological complexities. In our discussion, we will attempt to explore these aspects in greater detail.

Keywords: Post-World War I Literature, Revolt Against Rabindranath, Psychoanalysis of Sexuality, Realistic Analysis of Physical Love, Kali-Kalam Magazine, Kallol Era, Pessimistic Literature, Romanticism vs Realism

রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ছোটগল্পের সার্থক সূচনা হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ছোটগল্প গুলিতে সাহিত্যিক প্রবণতাগুলি দেখা দিল বিশিষ্টরূপে- যার প্রকাশ ঘটল রবীন্দ্র বিদ্রোহ, যৌনমনস্তত্ব বিশ্লেষণ, জীবনসম্বন্ধে হতাশাবোধ, সাংকেতিকতা, বিষণ্ণতা প্রভৃতিতে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাহিত্য ও সমাজের পুরানো গতানুগতিকতাকে ভেঙে দিয়ে প্রথম চৌধুরীর সম্পাদনায় আর্বিভূত হয়েছিল সবুজপ্রাণের জয়বার্তা। যিনি চলিত ভাষার সাহায্যে বাংলা

ছোট গল্পে গতি দান করেছিলেন। আবার বাংলার সমাজে ও জীবনে যে জলন্ত জিজ্ঞাসার সূত্রপাত ঘটেছিল তার বাস্তব রূপায়ন করে রবীন্দ্রোত্তর যুগকে চিহ্নিত করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আবার শরৎচন্দ্রেরও পরবর্তী যুদ্ধোত্তর সাহিত্যিকরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে, সাহিত্যের আসরে নামলেন বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে। সেগুলি হলো 'কল্লোল', 'কালিকলম' ও 'প্রগতি'। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর বাংলার সমাজ, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর প্রভৃতি বিভিন্ন ঘটনাস্তম্ভের বাস্তব রূপায়নের মাধ্যমে ছোটগল্পে ক্রমশ আধুনিকতার চিহ্ন অঙ্কন করতে এলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখগণ। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাবে পুরাতন বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এ পর্যায়ে অবশ্য গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাস, মনীন্দ্রলাল বসুর নামও উল্লেখ করতে হয়।

একদিকে হতাশা, নৈরাশ্য ও অবক্ষয় যুব সমাজকে নাগপাশে পিষ্ট করছে, অন্যদিকে যৌবনের রোমান্টিক প্রেরণায়, যৌবনের দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষায় কোন কিছুর নির্দিষ্ট প্রত্যাশা না রেখে স্বাভাবিক বিশ্বাস প্রবণতায় উদ্দীপ্ত হয়ে অন্ধকার ভেদ করে ছুটে যেতে চাইছে। যুব সমাজের এই প্রবণতার প্রতীক হয়ে উঠল 'কল্লোল'। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় কয়লাকুঠির শ্রমজীবী মানুষের ব্যথা-বেদনার কাহিনি শোনালেন। বিদ্রোহ-হল এই পর্যায়ের লেখকদের আধুনিকতার মূল মন্ত্র। তারুণ্যই হল তাদের বীজমন্ত্র। এক বিপ্লবাত্মক চিন্তাধারাকে তারা হাতিয়ার করে তুলল। জীবেন্দ্র সিংহরায় তাঁর 'কল্লোলের কাল' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন- "তাঁদের সামনে ছিল সামাজিক Taboo-র দড়িদড়া এবং তাঁদের বিদ্রোহ সেই দড়িদড়ার গ্রন্থিমোচন করে দেওয়ার দিকে নিয়োজিত ছিলো"। কল্লোল সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসুও বলেন- কল্লোলের অর্থই হল বিদ্রোহ এবং সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথ। এই সময়ের লেখকগোষ্ঠীর প্রধান লক্ষ্য হল পূর্বতনসাহিত্য তথা রবীন্দ্র প্রভাব মুক্তির প্রয়াস।

বাংলা সাহিত্যে কল্লোল যুগেই অনুপ্রবেশ ঘটল ফ্রয়েডের। তাঁর মনোবিকলন তত্ত্বের প্রভাব ইউরোপ থেকে সাগর পার করে এসে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল বাংলা সাহিত্যে। দেহকে বাদ দিয়ে প্রেম নয়, তাই দেহবাদী প্রেমের বাস্তব বিশ্লেষণ প্রয়োজন। তাইতো এই তরুণ লেখক গোষ্ঠী তাঁদের গল্পের ক্ষেত্রে নিয়ে এলেন সেই সব আদিম গোষ্ঠীর মানুষকে যারা শহুরে সভ্যতা থেকে দূরে তাদের জৈবিক কামনা-বাসনা নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এই লেখকগোষ্ঠীর দৃষ্টি গেল নির্যাতিত, শোষিত কৃষি বা শ্রমজীবী মানুষের উপর। ভিখারির রোজগার, কুলির জীবনের ব্যাভিচারের আশ্রয়হীনতা, দারিদ্র ও অত্যাচারে নারীর পতিতাবৃত্তি অবলম্বন প্রভৃতি বহু বিচিত্র বিষয়ের সম্ভারে বাংলা ছোটগল্প এক সমৃদ্ধরূপ লাভ করল। এযুগের ছোটগল্প স্বল্প পরিসরে বহু বিচিত্র চরিত্রের মাধ্যমে এক অনবদ্য শিল্পরূপ লাভ করল।

বোঝা যাচ্ছে, বাংলাসাহিত্যের নবীন সাহিত্যকগোষ্ঠী চাইছিলেন নতুন কিছু। তিরিশের দশকের ১৯২৩ সালে 'কল্লোল' পত্রিকা সেই নতুনের আগমনী ধ্বনিত করল। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে বলেছেন- 'উদ্ধৃত যৌবনের ফেনিল উদ্দামতা; সমস্ত বাধা বন্ধনের বিরুদ্ধে নির্ধারিত বিদ্রোহ, স্থবির সমাজের পচা ভিত্তিকে উৎখাত করার আলোড়ন'। কিন্তু রোমান্টিক আন্দোলনের ঢেউ তাঁদের মধ্যে প্রবল। সেকারণেই তারা কল্লোল পত্রিকার সঙ্গে অন্য পত্রিকার আশ্রয়ে ও নতুন নতুন চরিত্রের আহ্বান করলেন। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'রসকলি', অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'বেদে' গল্পগুলি বিচিত্র রোমান্সের ঢেউ আনল। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় 'কয়লাকুঠি' গল্পে সাঁওতালি মেয়ের চঞ্চল হাসির সঙ্গে কুলিজীবনের রুক্ষ দিককে তুলে ধরলেন। আবার প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'শুধু কেরাণী'-র মত গল্প আমরা পেলাম।

'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত বলেন- কল্লোলের সে যুগটাই সাহসের যুগ, সে সাহসে রোমান্টিসিজমের মোহ মাখানো। বাংলা ছোটগল্প ক্ষেত্রে কল্লোল গোষ্ঠীর দানের কথা স্মরণ করা দরকার। অচিন্ত্যকুমার আরও বলেছেন-সমস্ত দিক দিয়ে একটা নাড়া দেওয়ায় উদ্যোগ, এই উদ্যোগে উদ্যোগী তিন প্রধান তরুন- অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও বুদ্ধদেব বসু। এঁরা ছাড়াও অন্য তরুণরাও 'কল্লোল' মাসিকপত্র ছাড়াও 'কালিকলম' (১৯২৬) ও 'প্রগতি' (১৯২৭) মাসিকপত্রেও লিখতেন। মনীশ ঘটক, প্রবোধকুমার সান্যাল, জগদীশ গুপ্ত, গোকুলচন্দ্র নাগ, দীনেশরঞ্জন দাশ, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখও ছিলেন এঁদের সঙ্গে। 'কল্লোল' (১৯২৩-২৯) বন্ধ হয়ে গেলেও তার ঢেউ ছড়িয়ে যায় অনেক দূর। রবীন্দ্রনাথ- প্রভাতকুমার-শরৎচন্দ্রের রচিত গল্পধারার গতিকে মনে রাখার মত বাঁকবদল ঘটিয়েছিলেন প্রমথ চৌধুরী। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত মনে করেন- প্রমুখ চৌধুরী প্রথম সরে আসা মানুষ। বিষয়ের দিক থেকে না হোক, মনোভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে। আর দ্বিতীয় মানুষ নজরুল।

বাংলা ছোটগল্পের নতুন বাঁকের পথে এগিয়ে গেছেন প্রথম চৌধুরী তাঁর নিজের প্রতিভায়। সবুজপত্র ১৯১৪ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছিল। তারই মাঝে ১৯২৩-এ 'কল্লোলের' আর্বিভাব। শুধু কল্লোল নয়, এর সঙ্গে ছিল 'সংহতি', 'ধুপছায়া', 'বিজলী', 'কালি কলম', উত্তরা', 'বিচিত্রা', প্রগতি, প্রবাসী এবং মাসিক বসুমতীও। ১৯২২, ১৯২৩, ১৯২৪, ১৯২৫ সালে শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্রমিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্তের গল্পগুলি এইসব পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯২২-২৩ সাল থেকে বাংলা ছোটগল্পের বাঁকবদলের কাজে যাদের নাম যোগ হল তাঁরা হলেন নজরুল ইসলাম, শৈলবালা ঘোষজায়া এবং দুই বিভূতিভূষণ। আর ১৯২৮-২৯ থেকে যোগ করব মানিক এবং তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। বিশ শতকের তৃতীয় দশক (১৯২০-১৯২৯) থেকে গল্পধারার যে নতুন বাঁকটি সূচিত হল তা আজও বাংলা ছোটগল্পের প্রধান ধারা হিসাবেই বর্তমান।

বাংলার প্রগতিশীল ছোটগল্পের ধারা তিরিশ ও চল্লিশের দশকে লেখকদের কলমে পূর্ণতা পেতে লাগল। ১৯১৭-এ রুশ বিপ্লবের ফলে যেন সর্বহারা জনগোষ্ঠীর উত্থান চোখে পড়ছে। সর্বহারা, নিম্নবর্গীয় সমাজ ভিন্ন দৃষ্টিতে উঠে আসছে। যেমন-শৈলজানন্দের খনিশ্রমিক, সাঁওতাল, বাউড়ি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের অভাবী কেরাণী, বিভূতিভূষণ, অচিন্ত্যকুমার সেনসগুপ্তের গ্রামীণ কৃষক, শৈলবালা ঘোষজায়ার নিরূপার্জন পরিত্যক্ত গৃহবধূ, তারাশঙ্করের বীরভূমের জনগোষ্ঠী এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গরীব ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির মানুষরা। আমাদের মনে হয় এই বিশ শতকের তিরিশের দশকের যে গল্পধারা তার মূল প্রবণতা- মধ্যবিত্ত এবং দরিদ্র শ্রেণির শ্রেণিগত বৈষম্য তুলে ধরা।

জগদীশ গুপ্ত, (১৮৮৬-১৯৫৭) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অগ্রগামী এবং মানিকের মত তিনিও নীচুতলার মানুষের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোন লেখা 'কল্লোল' বা 'কালিকলম' পত্রিকায় যেমন প্রকাশিত হয়নি তেমনি জগদীশ গুপ্তর প্রথম গল্প 'পেয়িং গেস্ট' সাপ্তাহিত 'বিজলী' পত্রিকায় (১৯২৫) প্রকাশিত হয়। পরে অবশ্য নয়টি গল্প প্রকাশিত হয় মাসিক 'কালি-কলম' এর প্রথমবর্ষে (১৯২৬-২৭) ।

ত্রিশের দশকের বাংলা ছোটগল্পের একজন শক্তিমান লেখক জগদীশ গুপ্ত। তৎকালীন 'কালি-কলম' পত্রিকার তিনি একজন প্রধান লেখক। এছাড়াও তিনি অন্যান্য পত্রিকায় লিখতেন। আমাদের সমাজে আপাত দৃশ্যমান ঘটনার পিছনে যে বেদনা, যে যন্ত্রণা, যে বাস্তবতা নিহিত থাকে তাকেই তিনি তাঁর সাহিত্যে প্রকাশ করেছেন। জগদীশবাবু গভীর অন্তর্দৃষ্টির সঙ্গে বাস্তব ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তা রূপায়িত করেছেন। তাইতো তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ 'বিনোদিনী' (১৯২৭) প্রকাশের পর বাংলা সাহিত্য জগতে বেশ একটা আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তাঁর জন্ম কুষ্ঠিয়ায়। নিবাস ফরিদপুর জেলা। দারিদ্রের চাপে পরীক্ষার পড়া ছেড়ে কর্মজীবনে প্রবেশ। প্রথম তিনি শুরু করেন কবিতা দিয়ে তারপর গল্প।

কল্লোল কালিকলমের লেখক জগদীশ গুপ্ত কিন্তু মানসিকতায় ছিলেন অ-কল্লোলীয়। নিজস্ব ভাবনায়, নিজস্ব ভঙ্গিতে তিনি স্বতন্ত্র মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। জীবনের গূঢ় সমস্যা নিয়ে তাঁর শিল্পসৃষ্টি। তাঁর গল্প উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছে জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে সংশয়। সে কারণেই তিনি আধুনিক। সে কারণেই তিনি স্বতন্ত্র হয়েও কল্লোলীয়। তিনি কল্লোলের তরুণ লেখকদের থেকে প্রবীণ হয়েও কল্লোল লিখেছেন। তিনি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের মত দুঃখবাদী। সমকালীন তরুণ লেখকরা যখন রোমান্টিসিজমের পাখায় ভর করে সংশয় ও অবিশ্বাসের ঘেরাটোপ থেকে বাইরে বেরোনোর পথ খুঁজছিল তিনি তখন জীবনের সংশয় ও অবিশ্বাসের গলিতে ঘুরে বেরিয়েছেন। আসলে তিনি ছিলেন একান্তভাবে বাস্তবনিষ্ঠ। তাঁর 'পেয়িংগেস্ট', 'দিবসের শেষে', 'যৌবনযজ্ঞের কবি'-গল্পগুলি পাঠ করলে আমরা যেন একই পরিবারের বিভিন্ন সুবিধাবাদী, স্বার্থপর মানুষগুলোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। যাইহোক, এখন আমরা তাঁর লেখা গল্পগুলি নিবিড় পাঠে দেখার চেষ্টা করব তাঁর সৃষ্ট নারীরা স্বাতন্ত্রের দাবী রাখে কি না?

'অরূপের রাস' জগদীশ গুপ্তের এক নতুন ধরনের সৃষ্টি। গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত। কথক কানু। কৃষ্ণের রাসলীলাকে এ গল্পের নামে প্রতীকী করে প্রয়োগ করেছেন। অরূপ শব্দের অর্থ রূপাতীত আর রাস হল আক্ষরিক অর্থে গোপনারীদের মন্ডলে কৃষ্ণরাধিকার নৃত্য উৎসব। রানু ও কানুর মিলন এ গল্পে হয়নি। কিন্তু কানুর স্ত্রী ইন্দিরার স্পর্শে রানু চেয়েছে তার প্রেমকে পরিতৃপ্তি দিতে। আর সেই চাওয়ার মধ্য দিয়েই রানু হয়ে উঠেছে স্বতন্ত্র। অভিনব ধারার গল্প 'অরূপের রাস, এ রানু ও ইন্দিরার সম্পর্কে রানুর বাঞ্ছিত রাসলীলার আভাস পাওয়া যায়। মেয়েদের সমকামিতা গল্পের মূলে অবস্থান করছে, আর তার প্রকাশ ঘটেছে রানু চরিত্রের মাধ্যমে।

গল্পের সূচনায় লেখক জানিয়েছেন- 'সে সাত, আমি চোদ্দ বছরের'। দুজনে বাল্যকাল থেকে পরিচিত। রানুর বাল্যপ্রেমের অবোধ বাসনা থেকেই শেষপর্যন্ত স্বামী পুত্র নিয়ে সংসারে থেকেও যেভাবে কানুর স্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছে; তাতে রানু চরিত্রটি স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। বাংলা সাহিত্য এর আগে এরকম নারী চরিত্রের উপস্থিতি আমরা কোথাও পেয়েছি বলে মনে হয় না। গল্পে রানু-র যে অদ্ভুত ব্যবহার আমরা দেখি তার মূলে কাজ করেছে রানুর বাল্যপ্রেমের বাসনা। আর সেই বাসনা থেকেই কানুর সঙ্গলাভ করার উপায় হিসাবে অবলম্বন করেছে সমকামিতাকে। বাল্য এবং কৈশোরের প্রেম বিবাহিত জীবনেও অনড় থেকেছে। তাই স্বামী পুত্রসহ সংসারের পাশে রানু সঙ্গ লাভ করেছে কানু পত্নী ইন্দিরার সাহচর্যে। তাইতো গল্পের শেষে রানুর স্বামী বসন্তবাবুর বদলির খবর এলে রানু সরাসরি কানুর কাছে প্রস্তাব দেয়- 'তোমার বৌ আজ রাত্তিরে আমার কাছে শোবে। বৌটি বড়ো ভালো মানুষ।' একজন নারীর এ ধরনের প্রস্তাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় রানুর বিশেষত্ব।

ইন্দিরার সঙ্গে শয়ন করবার অভিপ্রায় প্রকাশের মধ্য দিয়ে রানু বিশেষায়িত হয়েছে। আরও বেশি হয়েছে যখন ইন্দিরা শয়নকালীন অভিজ্ঞতার অভিব্যক্তিতে প্রকাশ করেছে- 'ইন্দিরা বলিল, - যেন স্বামী আর স্ত্রী, সে আর আমি' আসলে ইন্দিরার শরীরে রয়েছে কানুর স্পর্শ। ইন্দিরার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলে কানুর স্পর্শ পাওয়া যাবে এই কল্পনা থেকেই রানু বোধহয় ইন্দিরার দেহকে ব্যবহার করেছে। আবার অন্যদিকে কানুও বিষয়টিকে অনুভব করতে পেরেছে বলেই বলতে পেরেছে- "আমি তৃপ্ত"। যে নারী নিজের বাসনা পূরণে এ ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে যে নারী তো সাধারণ নারী হতে পারে না। সে নারী বিশেষ হিসাবেই মর্যদা পায়।

রানু এক অদ্ভুত নারী। রানুর বয়স যখন দশ তখন কানুর বয়স সতেরো। দশ বছর বয়সেই রানু স্বভাবে অন্যরকম। কানু যখন তার কোমর জড়িয়ে ধরে সাধারণ কথা বলে তখন রানুর এক অদ্ভুত আড়ষ্টতা লাগে- "চট করিয়া একবার পিছন দিককার দরজার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রানু নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া বলিল, - আর কী কী ছবি আছে দেখাও'। আসলে দশ বছরের বালিকার এ ধরনের আকালপক্কতাকে আমরা লক্ষ্য করি। সাত বছরের বড়ো হওয়ার অধিকারে কানু শাসন করার চেষ্টা করেছে ঠিকই কিন্তু রানু তখন- "আমার গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া সে হাসিয়া আমার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িত; - 'কানুদা একটা বড়ো মানুষ কিনা, তাই বকতে বসেছে। হি হি হি...।'

দুদিনের মধ্যেই রানুর বিবাহের সংবাদে কানুর উল্লাস দেখে রানুর ক্ষোভ দেখা যায়। আসলে কানুর প্রতি রানুর যে দুর্বলতা তা কানু অনুভব করতে পারে নি। রানুর অভিমান, দুর্বলতাকে সে ক্রোধ বলে মনে করেছে। তাইতো – "একদিন দৈবাৎ তাহাকে হাতের কাছে পাইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়াছিলাম, তাহাতে সে হঠাৎ এমন এমনই গর্জন করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছিল যে, আমি সাত তাড়াতাড়ি তাহার হাত ছাড়িয়া দিয়া পালাবার পথ পাই নাই"। রানুর বিবাহ হয়ে যায়, এবং কানুও পড়াশোনার জন্য কলকাতায় চলে যায়। কিন্তু রানুর অভিমান বর্তমান থাকে। তাইতো কানুর সঙ্গে তাঁর দেখা হলে রানু বলে- 'তুমি আমার মুখ দেখবার যোগ্য নও'। এই কথায় আমাদের মনে পড়ে যায় বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের নায়িকা শৈবলিনীর কথা।

নায়িকা রানুর এক অদ্ভুত আচরণ, তাইতো অদ্ভুত সখিত্বে কাছে টানে ইন্দিরাকে। রানু অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও বটে। গল্পের শেষ দিকে তাই আমরা দেখি বাবা- মাকে হারিয়ে নিঃসঙ্গ স্বামী বসন্তবাবু ও শিশু পুত্রকে নিয়ে সফল গৃহিণী সে। কিন্তু তার মধ্যেই সে নিজের সন্তান বেনুকে সামনে রেখে ইন্দিরার সন্তানের বাসনাকে তীব্র হওয়ার সুযোগ করে দেয়, 'আয় বৌ তুই আমি এক হয়ে যাই'। এই ধরনের প্রস্তাবে, সমকামিতায় নিজে স্বামী হয়ে স্ত্রীর ভূমিকায় ইন্দিরাকে বসায়, এবং ইন্দিরার শরীরের মধ্যে থাকা কানুর দেওয়া উত্তেজনা, আনন্দ, উত্তাপকে নিজের শরীরের কামনা-বাসনার গভীর খাদ ভরাট করতে চায়। অন্য নারীর মধ্য দিয়ে প্রেমিকের প্রেমকে চিরন্তন করে রাখার চেষ্টা বাংলা ছোটগল্পের নারী চরিত্রে দুর্লভ। রানু সে কারণে এক জটিল নারী, সাধারণ সংসারী নারী হয়েও এভাবে নিজের কামনা চরিতার্থতায় যে বিচিত্র পন্থা অবলম্বনকারী সে নারীতো সাধারণ হতে পারে না। সে নারী বিশেষের দাবীদার। সে নারী স্বতন্ত্র, যার সাথে অন্য কারোর তুলনা চলে না।

'শঙ্কিতা অভয়া' গল্পটি 'মেঘাবৃত অশনি' গল্প গ্রন্থের অন্তর্গত। গল্পটির নামকরণে বিরোধাভাস এর কথা মনে করিয়ে দেয়। গল্পটি ত্রয়ী চরিত্র কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে। অকুল-অভয়া-শান্তি–এই তিন-নর-নারীর জীবনের সম্পর্কের কথা কাহিনির স্তর অনুযায়ী অনাবৃত হয়েছে। আর সেই সম্পর্কের সূত্রেই আমরা খুঁজে নেব এমন এক

নারীকে যে নিজ গুণে হয়ে উঠবে অনন্যা। গল্পটির কেন্দ্রিয় চরিত্র হয়তো অভয়া। সমগ্র গল্পে অভয়ার শঙ্কা, ভয় প্রকাশ পেয়েছে। তিনটি চরিত্রের ত্রিভুজ অবয়বে এক গোপন দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু গল্পপাঠে আমাদের মনে হয়েছে কেন্দ্রিয় চরিত্র অভয়া হলেও, অভয়ার মাতৃহৃদয় কন্যা শান্তিকে নিয়ে শঙ্কিত থাকলেও অভয়ার আত্মজা শান্তি চরিত্রটি কোথায় যেন আলাদা হবার দাবীদার। কারন মাতৃহৃদয় এমনই হয়, যে কিনা সন্তানের চিন্তায় ব্যাকুল থাকে। অভয়া ও তাঁর ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু গল্পপাঠে দেখি অভয়ার আত্মজা শান্তি নামক মেয়েটি কত আলাদা। সে কত প্রানখোলা, সহজ এবং বুদ্ধিমতী।

প্রথমে অনুচ্ছেদেই দেখা যায় মা অভয়ার মানসিক উৎকণ্ঠা এবং অসাহয়তা মূর্ত হয়ে ওঠে। শেষপর্যন্ত গল্পের শেষ পর্যায়ে অভয়া ও অতুলের গোপন সম্পর্কের কথা মেয়ে শান্তির কাছে ফাঁস হয়ে যায়। তা শুনে শান্তির সক্রিয়তা অনেক বেশি প্রসারিত মনে হয়। গল্পটি তিনটি চরিত্রের মনোধর্মের টানাপোড়েনে নিঁখুত। মেয়ে সপ্তদশ বর্ষীয়া শান্তি সুশ্রী, তন্বী, শারীরিক গঠনে পূর্ণরূপা এবং চঞ্চল। মেয়ের এই সৌন্দর্যে মা অভয়া উদ্বিগ্ন। মেয়ে বেশি হাসিখুশি হলে যে কোনো মায়ের দুশ্চিন্তা করা স্বাভাবিক। আবার শান্তির নানা বিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনাও যেন উদ্ভট মনে হয়। আশরীরী প্রেম, পরকীয়া প্রেম, নারী-পুরুষের সম্পর্কের প্রচ্ছন্ন যৌনতা, চুম্বন এসব নিয়ে শান্তি বাবার সঙ্গে তর্ক করে- 'গভীর অনুসন্ধিৎসার সহিত শান্তি জানিতে চায়, বাবা, তা কি সম্ভব?' বাবার কাছে মেয়ের এ ধরনের জানতে চাওয়া আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হয় না। কিন্তু আমরা শান্তিকে যদি গভীরভাবে লক্ষ্য করি তাহলে বুঝব শান্তি আসলে অনেক আধুনিক মনস্ক। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক সপ্তদশবর্ষী নারী। যার মনে কোন সংকোচ নেই। যার কোন ভয় নেই, যে উচ্ছল এবং মনের দিক থেকে অনেকবেশি আধুনিক। তাইতো সে অবলীলায় বাবার কাছে যৌনতা নিয়ে প্রশ্ন রাখতে পারে। একজন মুক্তমনা নারী কিভাবে তার প্রশ্নগুলোকে বাবার সামনে ছুড়ে দিতে পারে তা শান্তিকে দেখলেই বোঝা যায়। তাইতো শান্তি মায়ের কথার প্রতিবাদ করে বলে- "মা একেবারে ষোলো আনা সেকেলে- '...মা বোঝে না যে, খোলাখুলি কথায় মন পরিস্কার স্বচ্ছ থাকে; যতো গ্লানি, অপরাধ আর দুষ্টমি দেখা দেয় মনের প্রশ্ন আর ইচ্ছা গোপন রাখার দরুন। লজ্জা বা চক্ষুলজ্জা করবো কেন? শিক্ষা নেবো না?"

শান্তির এই উক্তি থেকেই আমরা অনুভব করতে পারি শান্তি কতটা স্বতন্ত্র একটি নারী। আবার সে যে প্রতিবাদী একটি নারী সেটাও তার এই উক্তিতে পরিস্ফুট হয়। পিতা-পুত্রীর আলোচনার মাঝে-এসে মা শাসনের অঙ্গুলি নির্দেশ করলেই পুত্রী শান্তি প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। শান্তির আত্মবিকাশ আমাদেরকে যেন অন্য এক জগতে পৌঁছে দেয়। শান্তি মায়ের কাছে জানতে চায় কেন, তার বাবা-মা নিজেদের সমস্ত আত্মীয় স্বজনদের থেকে নির্বাসিত জীবন কাটায়। সে শুধুমাত্র প্রতিবাদী-ই নয়; সে শিক্ষাদাত্রী ও বটে। তাইতো সে বাবাকে এসরাজ বাজানো শিখিয়েছে। এবং নিজেও বাবার সামনে মুক্ত নাচের অফুরন্ত তালিম দিতে পিছপা হয় নি।

রাস্তায় একদিন বাবার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে এক ভদ্রলোকের সম্মুখীন হয় এবং বাবার তাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা দেখে শান্তির মনে প্রশ্ন জাগে। কিন্তু বুদ্ধিমতী শান্তি বাবাকে তাঁর অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসে। শান্তির খোলামেলা মনোভাব এবং চাপল্য স্বভাব এর জন্য তার মা অভয়া কেমন যেন দুশ্চিন্তায় থাকে। আমাদের হয়ত মনে হতে পারে অতুল এবং শান্তির যে সম্পর্ক তার মধ্যে একটা অস্বাভাবিকতা-র রেখা রয়েছে। যে রেখা-র কথা সবসময় মনে করেছে অভয়া। তাইতো মা হিসাবে অভয়া শঙ্কিত থেকেছে, কিন্তু মেয়ের কাছে তো বাবা শিখতেই পাবে। আর সেই মেয়ে যদি হয় শান্তির মতো আধুনিক মনস্কা।

সেদিন অতুল মেয়েকে নিয়ে সিনেমায় যায় ও দেরি করে বাড়ি ফেরে। সেই দিনই অভয়া অতুলের চরিত্র দোষের কথা তোলে। মেয়ের সামনেই অভয়ার সন্দেহ-এক বিকৃত রূপ ধারণ করে। সরল নিশ্চুপ শান্তির সন্দেহ চরমে ওঠে। মায়ের সবসময় বাবাকে সন্দেহ করার কারন বুদ্ধিমতী শান্তি অনুভব করতে পারে। তাই সে মাকে ডেকে বলে- 'তোমাদের সব কথা আমি বুঝলাম না কিছুই; কিন্তু মনে হচ্ছে, কথাটা দুঃখের – তোমাদের ভিতরে একটা দুঃখ আছে। বাবাকে নিয়ে তোমার কোথায় যেন বিপদ ঘটেছে, কি ঘটবে বলে, ভয়, করছ। সেটা কী মা? বাবার কি চরিত্র দোষ ছিলো?' কতটা অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্ন হলে এই অনুভব হয় তা শান্তি আমাদের বুঝিয়ে দেয়। শিক্ষিত, বুদ্ধিমতী, আধুনিকমনস্ক নারীমন অনুভব করতে পারে মায়ের সন্দেহের মূল কোথায় নিহিত।

'মা, আমরা কি এখানে নির্বাসিত?- শান্তির এই জিজ্ঞাসা শাণিত প্রতিবাদের ভাষা। মেয়ে যত বড় হতে থাকে, তার সঙ্গে বাবা মায়ের বন্ধুর মতো ব্যবহার করা উচিত, এটাই আধুনিকতম জীবনসত্য। আর সেই সত্য বিশ্বাসী শান্তি

কিন্তু বাবার সঙ্গে সেরকম ব্যবহার করেছে। প্রেম, যৌনতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে খোলামেলা আলোচনা করে শান্তি নিজের স্বতন্ত্রতাকে প্রতিষ্ঠিতই করেছে। নিজেদের পরিববারের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলেও যেন শান্তি নিজ চরিত্রের বিশেষত্বের মর্যাদা বাড়িয়ে তুলেছে। এখানে শান্তি-না হয়ে যদি অন্য কোন নারী চরিত্র উপস্থিত থাকলে বোধহয় নিজ পরিবারের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারতো না। এমনকি বাবার চরিত্র নিয়ে সন্দেহের জায়গা যদি তৈরিও হয় সেটা যে মেয়ের কাছে খুলে বলা উচিত সে সম্পর্কেও মাকে অভিযোগ করতে সে দ্বিধান্বিত হয়নি। কতটা প্রতিবাদী হলে একজন মেয়ে মাকে বলতে পারে- 'বাবার চরিত্র কু হলেও সে ইঙ্গিত বারবার কেন করছ, আর আমার সামনে কেন করছ, আমাকে জানানো উচিত নয়'। বাবার চরিত্র প্রসঙ্গে কোন সংশয়ে থাকতে সে চায় না। সে চায়, সে সংশয়ের খোলাখুলি সমাধান। কতটা প্রসারিত মনের ও মার্জিত বিবেক বুদ্ধির অধিকারী হলে একজন মেয়ে মায়ের সঙ্গে আলোচনা করতে চায় তা অনুভবনীয়। এসব ব্যাখ্যাতেই শান্তি সমগ্র গল্পে হয়ে উঠেছে ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র।

গল্পের একদম শেষ পর্যায়ে পৌঁছে দেখি সদা জিজ্ঞাসু শান্তিকে যখন তার মা অগভীর ঘুম থেকে তুলে প্রশ্ন করে- 'বল সত্যি করে শান্তি, ও তোকে নষ্ট করে নি তো?'- এ প্রশ্ন শুনে সদা জিজ্ঞাসু শান্তি স্তম্ভিত হয়ে যায়। তবুও সে চুপ না থেকে বলতে শোনা যায়- 'বাবা চরিত্রহীন, একথা তুমি অনেকবার বলেছ, কিন্তু এ কী কথা তোমার মুখে!' আসলে শান্তি একেবারে আলাদা সপ্তদশী। তার প্রশ্ন, সারল্য, আত্মগত জিজ্ঞাসা এবং সর্বোপরি প্রতিবাদ চরিত্রটিকে ক্রমশ অন্য মাত্রা দেয়। শান্তি অতুলের মেয়ে নয়, তার নিজের বাবা হল অভয়ার প্রথম স্বামী। এই নির্মম সত্যটা জেনেও শান্তি যেভাবে অভিজ্ঞ হয়েছে তাতে তার সারল্যের দ্যুতির মধ্যে দিয়েও সতর্ক, সপ্রশ্ন এবং সহনশীলতার ব্যঞ্জনাকে প্রকাশ করে। সপ্তদর্শী শান্তিময়ী, সে কতটা ব্যক্তিত্বময়ী নারী হতে পারে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারি। শান্তির এই যে পরিণত ছবি ও তার সক্রিয়তা ক্রমশ তাকে আধুনিকোতম একজন সত্যিকারের নারীব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সেদিক থেকে শান্তি হয়ে উঠেছে এক ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র।

পরবর্তী আলোচিত গল্প 'হাড়' গল্পটি 'শঙ্কিতা অভয়া' 'গল্পের প্রায় পাশাপাশি লেখা। পরবর্তীকালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এর লেখা 'হাড়' গল্পটির প্রসঙ্গ মনে পড়ে যায়। যদিও সেখানে আমরা দেখতে পাই বিশ-শতকের তেতাল্লিশের মন্বন্তরের প্রসঙ্গ। আমাদের আলোচ্য জগদীশ গুপ্তের 'হাড়' গল্পটিতে আমরা ডাইনি প্রসঙ্গ দেখতে পাই। এই ডাইনি প্রসঙ্গ নিয়েও গল্প লিখেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও মহাশ্বেতা দেবী আদিবাসী অধ্যুষিত জীবন চর্যায় ডাইনির গল্প লেখেন। জগদীশ গুপ্তের 'হাড়' গল্পে ডাইনির প্রতিক্রিয়ার কথা থাকলেও নিয়তির ফল নায়কের জীবনের দুর্ভাগ্য হিসাবে উপস্থিত। ডাইনি বা নিয়তির প্রসঙ্গ থাকলেও গল্পে 'রসি' নামক নারী চরিত্রটি কিভাবে 'মাসি'র দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর সেটাই আমরা দেখার চেষ্টা করবো। কারণ রক্ষা মারা যাবার সময় বলে গিয়েছিল যে- 'মাসি, দেখো মথুরকে; যেন বাপের মতো না হয়।" এই কথার পরে নারীর মাতৃহৃদয় অপমানিত হয়েও মায়ের দায়িত্ব পালনে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। একজন সন্তানের কাছে মায়ের পরেই তো মাসি মায়ের স্থান দখল করে।

গল্পের শুরু হয় 'রক্ষা'-র মৃত্যু দিয়ে। সেই মৃত্যু রহস্যজনক– কিনা সেটা নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন না করলেও, প্রশ্ন করল রসি। কারণ রসিকে যে মাসি বলে ডাকত রক্ষা। রসির হাড়ে জোর নেই। মুখেও দন্ত নেই, কিন্তু মনের জোর বেজায়। রক্ষার দুঃখে রসি কেঁদে বেড়ায়। কারণ রসি ও রক্ষার মধ্যে যে মমত্বের সম্পর্ক ছিল। তাইতো রক্ষা মরার সময় বলে মথুরকে বাপের মত না করতে। সনাতন রক্ষার স্বামী। সে কিন্তু রশ্মিকে ডাইনী বলে অপমান করতে থাকে, তাকে দেখলে থুতু ফেলে। রসি কিন্তু আসলে ডাইনি নয়। সে বরং এ সবকিছুর তীব্র প্রতিবাদ করতে ছাড়ে না। সনাতন যখন তাকে গালাগালি দেয় তখন রসি কাঁদে না। বরং তার মাতৃহৃদয়ে আগুন জ্বলে ওঠে। তাইতো- 'রসির একান্ত ইচ্ছা, মরা মানুষের কথাটা রাখে। অপমান হইয়াও সে নিরস্ত হইতে চাহে নাই। এবার সে মনের ইচ্ছাটা মানুষের মুখে গুঁজিয়া দিলো। ....ইহজন্মে রসিকে কেহ মা বলিয়া ডাকে নাই... কেহ ডাকিবে এ আশাও নাই....তবু একটি কচি প্রাণ, প্রথমে নির্লিপ্ত তারপর ধীরে ধীরে বেড়িয়া ধরিবে- এ যে বড়ো লোভের জিনিস।' রসির এই যে অনুভব তা জীবন্ত, তা বিশুদ্ধ এবং মানবিক। এই মানবিকতাবোধ -ই রসিকে নারী হিসাবে বিশিষ্ট করে তোলে।

রসি বোঝে ছেলের অধিকার আগে বাবার। তাই মথুরকে নিতে গেলে তো সনাতনের অনুমতিও দরকার। এই যে ন্যায়ের বিচার রসির আছে তা তো সবার থাকে না। সনাতন একজন জেলখাটা, বেপরোয়া, দাম্ভিক বাবা। সে তো রসিকে ছেলেকে মানুষের অনুমতি দেয় না। বরং তাকে 'মাগি ডাইনি' বলে গালাগাল দিতেও ছাড়ে না। সেই অপমানে রসি অপমানিত হয় না। বরং মনে মনে সে জ্বলতে থাকে।। এটা আসলে রসির ভারসাম্যপূর্ণ এক ব্যক্তিত্বের প্রকাশ যা রসিকে সকলের মাঝে আলাদা করে তোলে। তাইতো বিপদে, অপমানে, আঘাতে সে নীরব থাকতে জানে।

সমগ্র গল্পে দেখি সনাতন একজন বেপরোয়া পুরুষ। পৌরুষের অধিকারে নিজের ছ'বছরের সন্তান মুথুরকে কাছে রাখতে চায়। তাই সে গ্রামের মজলিশের কোন কথা শোনে না' চাটুজ্যে মশায়ের বুদ্ধি নেয় না। রসির একান্ত আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে উৎখাত করে দেয় এবং তাকে আটকুড়ি, ডাইনি বলে অপবাদ দিতে থাকে। কিন্তু রসি নিজ ব্যক্তিত্বে অটল থাকে। একদিন সনাতন যখন মাছ ধরতে যাবার জন্য বার হয় তখন রসি বলে- 'তুই মাছ ধরতে চলেছিস, ঐ মাছই যেন আজই তোকে মারে।' এই কথা রসি হয়ত বলে' ঠিকই, কিন্তু এ কথা কোনো অভিশাপ নয়। কিন্তু ভাগ্যের চক্রে সনাতন কিন্তু শেষপর্যন্ত মারাও যায়। মাছশিকারে যাওয়ার সময় তার সঙ্গী ভুবন তার সঙ্গ দেয় না। এবং গাছের মতো বিশাল মাছ পেয়েও সনাতন কিন্তু মাছ নৌকায় তুলতে পারে না। শেষ পর্যন্ত ঘটনার আবর্তে ছেলে মথুরকে নিয়ে আনন্দ সহকারে মাছ ভাত খাবার সময় সাবধান থাকা সত্ত্বেও শ্বাসনালীর মুখে মাছের হাড়ের চাপ অনুভব করতে থাকে। হাড়ের বাধায় অসহায় চিৎকারের মধ্যেই সনাতনের মৃত্যু ঘটে। ভাগ্যের পরিহাসে, নিয়তির আঘাতে সনাতন মারা গেলে রসি এসে উপস্থিত হয়- 'রসিও আসিয়াছিল, অন্ধকারে দাঁড়াইয়াছিল। লুকাইয়া আস্তে আস্তে সে বাহির হইয়া গেল।'

সনাতনের এই পরিণতির জন্য ডাইনি রসির অবশ্য কোন উচ্ছ্বাস বা উল্লাস ফুটে ওঠেনি। আসলে নীরবতাই তার অলংকার। সে তো ডাইনি নয়, সেতো মাতৃরূপিনি এক নারী। মানবিক ও সন্তানকামনায় কাতর এক নারী। প্রতি মুহূর্তে সে ডাইনি অপবাদে পরিচিত হতে থাকলেও তার নীরবতার মধ্য দিয়ে যে আত্ম সংযম এবং মাতৃত্বের গভীরতায় পরিপূর্ণ হতে থাকে। আর এই সামাজিক প্রতিকুল পরিবেশে যেভাবে নিজেকে নীরব রেখে এই অপাবাদের প্রতিবাদ করে গেছে তা পাঠক মনে জায়গা করে নিয়েছে। তার এই নীরবতাই তার নারীসুলভ মাতৃহৃদয়ের প্রকাশ ঘটায়। আর এভাবেই রসি হয়ে ওঠে ব্যতিক্রমী এক নারী।

তথ্যসূত্র:

১। সিংহরায়, জীবেন্দ্র, কল্লোলের কাল, কথাশিল্প, ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, পৃষ্ঠা-১৫৪
২। সেনগুপ্, অচিন্ত্যকুমার, কল্লোল যুগ, পৃষ্ঠা-৩০
৩। চক্রবর্তী, সুমিতা, ছোটগল্পের বিষয়-আশয়, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলি-৯
৪। জগদীশ গুপ্তর গল্প, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলি-৭৩।
৫। দত্ত, বীরেন্দ্র, বাংলা ছোটগল্প প্রসঙ্গ ও প্রকরণ, পুস্তক বিপণি, ২৯, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯।
৬। মিত্র, ড. সরোজমোহন, বাংলায় গল্প ও ছোটগল্প, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলি-০৯
৭। চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ, বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ, বামা পুস্তকালয়, ১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলি-৭৩।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 923-928
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.085

জ্যোতির্ময়ী দেবীর ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ ও দেশভাগ- একটি পর্যালোচনা

অরুনিমা রায় চৌধুরী, *সহযোগী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যানগর কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*
পার্থ প্রতিম সেন, *সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, বিদ্যানগর কলেজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 08.03.2025; Send for Revised: 11.03.2025; Revised Received: 30.03.2025; Accepted: 31.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The Partition of India in 1947 has been a historical event embedded in the minds of all Indians. A large number of people were rendered destitute and became disoriented, having to lose their homes and hearths forever. This partition became a heart-wrenching saga of the uprooted people which is some thing unprecedented in the history of humankind and therefore has been a subject of interest for historians and researchers. Jyotirmoyee Devi, in her novel Epar Ganga Opar Ganga, portrays the trauma of partition. The way she has done so is unparalleled in the field of Bengali literature. She has portrayed the increase in agony and humiliation of the female mind as a result of the partition in a very vivid way. Our research aims to answer the following questions from this novel by Jyotirmoyee Devi: Firstly, how does the female body get wrapped in the fake attire of sanctitude, thereby losing acceptability in society, and is nearly ostracized? Secondly, how did Jyotirmoyee Devi, through the character Sutara Dutta, portray that the female body becomes a ground for the exhibition of power and thereby becomes a symbol of gender-based violence in post-independent India?

Key Words– *Partition, Riots, Communal- violence, societal mores, Empowerment, Epar Ganga Opar Ganga.*

১৯৪৭ এর বিভাজিত ভারতবর্ষ। বিভাজনের ইতিহাস সকল ভারতীয়ের কাছে পরিজ্ঞাত এক ঐতিহাসিক পর্যায়। বিভাজনের ফলে এক বিশাল সংখ্যক মানুষ ভূমিহারা হয়ে পরে। এই বিশাল সংখ্যক মানুষের দিশেহারা হয়ে ভিটেমাটি চিরকালের মতো পরিত্যাগ করে আসার মতো বেদনাদায়ক ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রায় দুর্লভ। দেশভাগজনিত ঘটনা ইতিহাস চর্চা ও গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ‘এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা’ উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী দেশভাগ এর যে যন্ত্রণা ফুটিয়ে তুলেছেন তা তুলনাহীন । বিশেষত তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি নারীমনের যে যন্ত্রণা এবং লাঞ্ছনা যা কিনা দেশভাগ এর ফলে এ বহুগুণ বৃদ্ধি হয়েছিল তা ফুটিয়ে তুলেছেন। আমাদের গবেষণা মূলক নিবন্ধের উদ্দেশ্য কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা-

১. জ্যোতির্ময়ী দেবীর লেখনীর মাধ্যমে কি ভাবে নারীদেহকে পবিত্রতার মোড়কে বেঁধে তাকে সমাজ থেকে চ্যুত করার চেষ্টা হচ্ছে।
২. মূল নারী চরিত্র সুতারা দত্ত, কিভাবে নারী দেহকে ক্ষমতা প্রর্শনের ক্ষেত্র হিসেবে স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংষতার প্রতীক হয়ে উঠেছে ।

১৯৪৭ এ ভারত বিভাজন হয় তার কারণ, মূলত ধর্মীয় হলেও বিভাজন প্রক্রিয়াটি ছিল রাজনৈতিক। ঐতিহাসিক শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন যে, এশিয়ার ইতিহাস চর্চায় দেশভাগ বা 'পার্টিশন' একটি অত্যন্ত' বিতর্কিত বিষয়'।[১] কিন্তু এর প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে গেলে দেখা যায় যে ১৬ই অগাস্ট ১৯৪৬ নজিরবিহীন দাঙ্গার ফলে 'গোটা ভারতের প্রেক্ষাপট অতি দ্রুত পাল্টাতে থাকে'।[২] ১৯৪৬এ মুসলিম লীগের 'প্রতক্ষ্য সংগ্রাম দিবস' এর ডাকের ফলে কলকাতায় শুরু হয় সাম্প্রদায়িক হিংসা। প্রথমে একতরফা হিন্দু হত্যা এবং পরে মুসলমান হত্যা হতে থাকে। কলকাতার দাঙ্গা শুরুর দিনের স্মৃতি তার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে' লিখে গেছেন বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানও। তিনি লিখছেন, 'কলকাতা শহরে শুধু মরা মানুষের লাশ বিক্ষিপ্তভাবে পড়ে আছে। মহল্লার পর মহল্লা আগুনে পুড়ে গিয়েছে। এক ভয়াবহ দৃশ্য। মানুষ মানুষকে এইভাবে হত্যা করতে পারে, চিন্তা করতেও ভয় হয়!' অসমাপ্ত আত্মজীবনীর ৬৬ পাতায় লিখেছেন শেখ মুজিব।[৩]

১৬-১৭ ই অগাস্ট কলকাতায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে এবং অক্টোবর মাস নাগাদ পূর্ববঙ্গের নোয়াখালীতে দাঙ্গা শুরু হয়। দাঙ্গার ফলস্বরূপ মৃত্যু হয় হাজার হাজার মানুষের। এই দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে লেখা কাহিনির মূল চরিত্র সুতারা একদিন অনাথ হয়ে পড়ে। তার ওপর শারীরিক নির্যাতন হয়। যেহেতু দেশভাগ বা পার্টিশন নামক বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে দুটি ধর্মের সাথে জড়িত, সেহেতু এই প্রক্রিয়টির সাথে জড়িয়ে আছে হিন্দু এবং মুসলিম সামাজিক সত্ত্বার জটিল মিথস্ক্রিয়া। সুতারা তার অত্যন্ত পরিচিত মুসলমান পরিবারে আশ্রয় পাওয়ার পরে প্রাণ সংশয় থেকে নিস্কৃতি পেলেও সুতারার আশ্রয়দাতা এবং তার নিজের রক্তের সম্পর্কের আত্মীয়দের মনের অন্তরে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রয়েই যায়। আশ্রয়দাতা তামিজুদ্দিন হিন্দুর মেয়ে সুতারাকে অচেনা 'রিলিফ পার্টির' হাতে ছাড়তে পারছেন না, অথচ কাছে রাখলে তাঁর ওপর হিন্দু মেয়েকে ধর্মান্তকরণের আরোপ লাগার উপক্রম হচ্ছে। অন্যদিকে, সুতারার দাদা সনৎ এর বোনকে ফিরিয়ে আনার চার দেখা যাচ্ছে না। হিন্দু সমাজে নানা কথা উঠবে এই আশঙ্কায় সনৎরা বোনের খোঁজ পেয়েই ক্ষান্ত থাকছে। এ যেন এক উভয় সংকট অবস্থা।

কলকাতার রেশ বাঙলার জেলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। মনে রাখতে হবে যে হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কোনো নতুন সমস্যা নয়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরপরই দেখা গিয়েছিল যে, হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমশ বাড়তে থাকা চাপা উত্তেজনা একপ্রকার সাম্প্রদায়িক শত্রুতাতে পরিণত হয়ে পড়ে। এর মূলে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বাড়তে থাকা অর্থনৈতিক বৈষম্য, হিন্দু জমিদারদের দ্বারা মুসলমান প্রজাদের প্রতি বঞ্চনা এবং তার ফল স্বরূপ প্ররোচনা সাম্প্রদায়িকতাকে এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়।[৪] অতএব, তখনকার মতো বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেলেও বাংলার মাটিতে হিন্দু এবং মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ফাটল ধরার প্রক্রিয়া তখন থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাই, যখন সুতারার পৈতৃক ভিটা আক্রান্ত হয় তখন ছোট থেকে পরিবারে বড় হয়ে ওঠা দুই ভৃত্য- রহিম ও করিম, সুতারার মা এবং দিদিকে আক্রমণকারী মুসলিম মারমুখী জনতার হাতে অনায়াসে ছেড়ে দেয়। 'এপার গঙ্গা ওপর গঙ্গা' উপন্যাস এর মূল আখ্যান হলো দেশভাগ জনিত অগণিত নরনারীর মৃত্যু, লাঞ্ছনা, অবমাননা। সেই অবমাননার অসামান্য চিত্র ফুটে উঠেছে মূল চরিত্র সুতরার মাধ্যমে আর ফুটে উঠেছে অগণিত নারীর লাঞ্ছনা ও ভন্ড সামাজিক রীতিনীতি।

সেই কারণে বলা বোধহয় সঙ্গত যে ধর্মের কারণে দেশভাগের যে সমস্যা তা আজ ও দূর হয় নি। গোপাল কৃষ্ণা এই প্রসঙ্গে বলছেন যে, দেশভাগের মাধ্যমে যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার উৎপত্তি হয়েছিল তার কিছুটা নিষ্পত্তি হয়েছিল ঠিকই কিন্তু এটি সর্বত সমাধান ছিল না কারণ, বাকি ভারতবর্ষ ছিল বহুত্ববাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ। তাই কেবলমাত্র আংশিক সমাধান ঘটেছিলো।[৫]

একদিকে যদি ধর্মকে কেন্দ্র করে এই মহা বিবাদ অন্য দিকে এই বিবাদের শিকার হয়ে অগণিত নারী পুরুষ ও শিশু। জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপর গঙ্গা' দেশভাগ জনিত সাহিত্যের এক অসামান্য অবদান। ওনার রচনার মধ্যে দিয়ে একদিকে যেমন ধর্মীয় বিবাদ এর ফলস্বরূপ যে দেশভাগের চিত্র ফুটে উঠেছে তেমনি ফুটে উঠেছে মূল চরিত্র সুতারার মাধ্যমে স্বাধীনতা উত্তর অগণিত নারীর লাঞ্ছনা ও ভন্ড সামাজিক রীতিনীতি। সুতারার জীবনের গতি তাকে অনাথ অবস্থা থেকে পরাশ্রয়ে এবং প্রায় একঘরে থাকার পরিস্থিতি থেকে উত্তীর্ণ করে। এমন এক অবস্থায় যেখানে সুতারা নিজের কণ্ঠস্বর ও নিজস্বতা কে খুঁজে পায়। ঘটে তার আত্মউন্মোচন। এই আত্ম উন্মোচন আসে অনেক যন্ত্রণা ও সাধনার মাধ্যমে। বিদ্যাচর্চার অধিকার সে পায় কিন্তু তথাকথিত সামাজিক রীতিনীতির বেড়াজাল

থেকে মুক্তি পায় না। এমন কি সে যখন দিল্লিতে অবস্থিত এবং যাজ্ঞসেনী কলেজ এর অধ্যাপিকা হিসেবে কর্মরত, তখনও অব্দি তার অভিশপ্ত এবং অকারণ জর্জরিত মেয়েবেলা থেকে মুক্তি পায় না। কিন্তু উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকেই নারী মুক্তি এবং নারী চেতনার সূচনা ঘটেছিল যার ফলস্বরূপ নারী কণ্ঠস্বরের খুব বেশি না হলেও তার স্পন্দন শুরু হয়েছিল। সোমা ভদ্র রায় তার গবেষণা মূলক নিবন্ধ 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা: নারী মুক্তির রূপান্তর'- এ বলেছেন, 'পুরুষের নির্ধারিত বিধানের ঘেরা টোপকে তেমন ভাবে অগ্রাহ্য পারলেও পুঞ্জীভূত একটি ক্ষোভ ভিতরে ভিতরে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছিল'।[৬]

জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর গল্পের পরতে পরতে কোথাও এই সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের মধ্যে একটি সম্বাদ বা synthesis খোঁজার চেষ্টা করেছেন। প্রথমে যখন সুতারা তার দাদাদের গলার কাঁটা হয়ে ওঠে, তখন দেখা যাচ্ছে যে তারা তাদের বোনকে একটি খৃষ্টান মিশনারি পরিচালিত হোম বা হস্টেলে ভর্তি করে দিতে দ্বিধা বোধ করছেন না। হিন্দু বাড়ির রক্ষণশীলতা এবং মুসলিম পরিবারে কাটানোর কলুষতাকে অনেকটাই যেন নিষ্ক্রিয় করছে, মা মেরির কোলে যীশুর ভজনা।

গল্পের শেষে, যখন প্রমোদ, সুতারাকে একপ্রকার বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে তাকে অপেক্ষা করতে বলে বিদেশে চলে যায়, পাঠকের কাছে জ্যোতির্ময়ী দেবী একটি বার্তা দেন, আর সেটি হলো এই যে একমাত্র আধুনিক উদারপন্থী শিক্ষাই এই ভন্ড রক্ষণশীলতা এবং স্বল্প দৃষ্টিজনিত মানসিকতাকে কলুষমুক্ত করতে পারে।

তাই সুতারার মধ্য দিয়ে জ্যোতির্ময়ী ভাবতে শিখছেন, 'মানুষে মানুষে জমাট, আবার বিস্তৃত যে সমষ্টি বা সমাজ বন্ধন, আবার কত নির্লিপ্ত যার মাঝে একটি অবাঞ্ছিত কারোর আর জায়গা হয় না, জায়গা হবে না' ।[৭]

জ্যোতির্ময়ী দেবী সুতারার মধ্যে অনুভব করেছেন যে, যেকোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় নারীর কোনো মর্যাদা থাকে না। অবলীলায় তা হরণ করা যায়। সেই কারণেই আজিজ চরিত্রের মা বলছেন 'ওরা তো নেয় না, এমন মেয়ে নেবে তো?' [৮]

সুতরার মধ্যে দিয়ে জ্যোতির্ময়ী দেবী বারবার ভাগাভাগি করে দেশের স্বাধীনতা কেন, এই প্রশ্ন করতে চেয়েছেন। এই রক্তাক্ত স্বধীনতা যেখানে সাধারণ জনমানস বিপর্যস্ত হয় এমন স্বাধীনতা তো সুতারা চায়নি। তা চায়নি বহু দেশ হারানো স্বজন হারানো মানুষ। সুতারা কলকাতায় আসার পূর্বে যে মুসলমান পরিবার এর আশ্রয়ে ছিল তারা বুঝেছিলেন যে সুতারার পরিবার সুতারাকে কেবলমাত্র মুসলমানের বাড়িতে থাকার কারণে গ্রহণ করবে না। জ্যোতির্ময়ী দেবী তার রচনার মাধ্যমে যেন সুতারার মতো লাঞ্ছিত নারীদের চিত্রই তুলে ধরতে চেয়েছেন। তাই তার উপন্যাস কে উৎসর্গ করেছেন 'সকল দেশের অপমানিত লাঞ্ছিতা নারীদের উদ্দেশ্যে'। [৯]

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'তে তাই বার বার উঠে এসেছে সুতারার গৃহত্যাগ, দেশত্যাগ ও ছিন্নমূল এর কথা- নোয়াখালী থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে দিল্লি। এই যে সুতারার ক্রমান্বয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় অস্থায়ী ঠিকানা সুতরার অন্তরকে বিদ্ধ করেছে ঘটিয়েছে পরিবর্তন। 'স্ত্রী পর্বে'র মাধ্যমে জ্যোতির্ময়ী দেবী দেখিয়েছেন কর্মসূত্রে সুতারাকে কলকাতা ছেড়ে দিল্লি চলে আসতে হয়। এখানে এসেও সুতারা লক্ষ্য করে দেশভাগ এর ফলস্বরূপ উৎপাটিত জনসাধারণ। জ্যোতির্ময়ী দেবী লিখছেন তাঁর 'স্ত্রী পর্বে'- 'স্বাধীনতার পর এসে পড়েছে পাঞ্জাবি উদ্বাস্তুর দল আরকিছু সিন্ধি মানুষ। দু লক্ষ হিন্দু মুসলমানের মিশ্র আর এ অমিশ্র সভ্যতা ভাষাতেই মিলে গেছে লক্ষ্য পাঞ্জাবির ভাষা সভ্যতা রীতি-নীতির জীবনযাত্রার ধরণ'। [১০]

জ্ঞানেন্দ্র পাণ্ডে বলছেন যে, হিংসা যেখানে শুরু হয়, সেখানে সমাজ বা 'কমিউনিটি' র ঘেরাটোপ শেষ হয়। অর্থাৎ হিংসা বা বিদ্বেষ (ভায়োলেন্স) ঘটতে পারে কেবলমাত্র কমিউনিটির সীমানার বাইরে। তাই পাণ্ডের মতে, যা কিছু কমিউনিটির মধ্যে ঘটছে তাকেই হিংসা আখ্যা দেওয়া যায় না।[১১] শুভরঞ্জন দাসগুপ্ত ও বলতে চাইছেন যে হিংসা বা ভায়োলেন্স সবসময় 'out there' অর্থাৎ বাইরে, তা কখনোই আমাদের মধ্যে থাকে না। অথচ এখানে দেখা যাচ্ছে যে, সুতারা তার নিজের ঘরে এবং নিজের সমাজে থেকেও হিংসার শিকার হচ্ছে। যাদের কাছ থেকে তার সুরক্ষা পাওয়ার কথা, তাদের কাছ থেকেও বঞ্চনা এবং অবহেলা পাচ্ছে যেটি একপ্রকার হিংসারই সামিল। অতএব নারী এখানে অরক্ষিত (vulnerable)।

সকিনার মাকে বলতে শোনা যায়- 'তোমাদের দেশভাগ চাই, ঝগড়া করবে কর। আমাদের মেয়েদের মান-ইজ্জত- শরীর নিয়ে এ লাঞ্ছনা কেন? এই কি তোমাদের ধর্মে বলে? কোরাণে আছে? তোমরা এতো সব শিক্ষিত- গাঁয়ের উকিল মোক্তার মাস্টার- কেউ কারো কে কিছু বলছো না কেন?'[i] কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই জাগরণ ও অভিমান কিন্তু আর এক হিন্দু মায়ের নেই। যেখানে সুতরার দাদার শাশুড়িমা, যার অবস্থান কলকাতাতেই তিনি সুতারাকে রুটি বেলতে দেখে বলে উঠেছিলেন'- এতদিন ধরে মুসলমানের ঘরে পড়েছিল এক আধদিন নয়, ছমাসের ওপর। তাতে কি আর মেয়ে মানুষের জাত-জন্ম থাকে'।[i i] সকিনার মায়ের কথাই যেন ধ্বনিত হয় পশ্চিম প্রান্তের আর এক উদ্বাস্তুর মধ্যে যেখানে লেখিকাদ্বয় রিতু মেনন ও কমলা ভাসিন কে তিনি বলেছেন- যে একজন নারীর কোনো ধর্ম নেই... নারীত্বই তার একমাত্র ধর্ম। তিনি সৃষ্টি করেন, তিনিই ভগবান, তিনিই মা... তাই মায়ের কোনো ধর্ম থাকে না হিন্দু, মুসলিম, শিখ বা খ্রিষ্টান।[i i i] তাই জয়দীপ সরকার বলছেন যে, জ্যোতির্ময়ী দেবী সুতারাকে 'নারীই- যেন- জাতি' (woman-as-nation) এই দৃষ্টান্তের তৈরি করতে চেয়েছেন। যেখানে সুতারার দৈহিক পবিত্রতার বিষয়টি তার সব রকমের দুঃখ ও লাঞ্ছনার (misery) কারণ হয় উঠেছে। সেখানে অন্য নারীরা (এ ক্ষেত্রে বিভার মা) সুতারার মতো নারীদের নিয়ন্ত্রক এর ভূমিকা নিচ্ছেন।[i v]

সুতারা যখন কলকাতা থেকে এবং তার পিতৃতান্ত্রিক আবহ থেকে বের হতে পারল, ও এক নতুন অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই প্রবেশ করতে সক্ষম হয় তখন তার সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আগত হিন্দু উদ্বাস্তু দের সঙ্গে। এখানে জয়দীপ সরকার সমাজবিজ্ঞানী নিরা ইউভাল ডেভিস ও অন্থিয়াস এর মতো করে বলতে চেয়েছেন যে সুতারার সমাজ এর সঙ্গে নব মেলবন্ধন দেখা যেতে পারে 'সীমানা / জাতীয় গোষ্ঠী গুলির পুনরুৎপাদক হিসেবে; সমষ্টির আদর্শিক পুনরুৎপাদন এবং এর সংস্কৃতির প্রেরণকারী হিসেবে কেন্দ্রীয়ভাবে অংশগ্রহণকারী হিসেবে'। ('as reproducers of the boundaries/ national groups; as participating centrally in the ideological reproduction of the collectivity and as transmitters of its culture..')[v]

সর্বশেষ পর্বে- স্ত্রী পর্বে সুতারা পূর্বজীবনের তুলনায় স্বাধীন। সে ইতিহাস এর অধ্যাপিকা হিসেবে দিল্লির একটি কলেজ এ কর্মরত। তথাপি তার একাকিত্ব কোনোমতেই কেটে যাওয়ার নয়। এই একাধারে শোকাঘাত এবং জয় যেন দেশভাগের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত নারীদের চরিত্র বৈশিষ্ট বলে মনে করেন শুভরঞ্জন দাসগুপ্ত। দেশভাগ জনিত দেশত্যাগী নারীরা একদিকে যেমন ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেতে আরম্ভ করেছিল, তেমনই অন্যদিকে ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল পূর্ব স্মৃতি ও বেদনায়। সেই কারণেই সম্ভবত রিতু মেনন ও কামলা ভাসিন বলছেন যে, এখনো কোনো শান্তি নেই বাইরে কিংবা ভেতরে - সবসময়ে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা কাজ করে।[v i]

অবশেষে সুতারার জীবনের এই অস্থিরতা মনে করিয়ে দেয় উর্বশী বুতালিয়ার বিখ্যাত গ্রন্থ যেখানে তিনি দময়ন্তী সেহগাল নাম্নী এক নারীর উত্থাপন করেছেন, যিনিও দেশভাগ এর শিকার এবং একই সঙ্গে একাকিত্বের শিকার যা কিনা সুতারা চরিত্রের সঙ্গে ভীষণ ভাবে তুলনীয়। দময়ন্তী ও তার পরিবার থেকে বিতাড়িত এবং তিনিও তাঁর জীবন সমাজসংস্কার এই নিয়োজিত করেছিলেন। এর ফলে কাল্পনিক সুতারা চরিত্রের মতো সামাজিক জীবনে প্রবেশ করতে পারেন এবং নতুন কিছু করার ব্রত নেন যা তাঁর জীবনের মান উন্নয়নে এই সাহায্য করবে।
('From her account of her life, Damyanti was one such woman…she had little or no contact with her immediate family. Nor if she is to be believed, were they particularly interested to know where she was…That very 'rejection by her family, the very real fact of her aloneness, allowed Damyanti to move into the public world and make something out of her life.')[vii] উর্বশী বুতালিয়া বলছেন যে লক্ষ্য লক্ষ্য উৎপাটিত মানুষের মধ্যে অর্ধেক ছিল মহিলা এবং এই বিষয়ে ইতিহাস অনেক খানি নীরব। স্বাধীনতার পর হাজার হাজার লাঞ্ছিত নারীদের উপর একপ্রকার বল প্রয়োগ করে 'তাদের সঠিক ঠিকানায়' (their proper homes) পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। মধ্যবিত্ত নারীদের সমস্যা ছিল এই যে বেশির ভাগ নারীদের বিবাহ হতো না এবং তারা আজীবন অবিবাহিত ও একা থাকতে বাধ্য হত। এমনই এক পরিস্থিতির সম্মুখহীন হয়েছিল মূল চরিত্র সুতারা।[viii]

মানব ইতিহাসের একটি রুঢ় সত্য হল যে জাতিগত সংঘর্ষে নারীরা, 'বৈধ লক্ষ্যবস্তু' হয়ে ওঠে যেখানে তাদের শারিরিক নির্যাতন এবং ধর্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে দাঁড়ায়। দেশভাগের সময়ে তার ব্যাতিক্রম ঘটেনি। পরবর্তী

সময়ে পূর্বপাকিস্তানে মুক্তিযুদ্ধের সময় বহু নারীর ধর্ষণ হয়েছে। অতএব, যুদ্ধ, জাতি-সংঘর্ষ বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নারীরাই হয়ে ওঠে আক্রোশের প্রধান লক্ষ্য। এটি সর্বজনীন এবং প্রায় স্বাভাবিক। শুধুমাত্র ভারত উপমহাদেশ নয়, আফ্রিকার রাওয়ান্ডা, কঙ্গো বা ইউরোপের বসনিয়াআরক সোভোর জাতি সংঘর্ষ। যেখানেই 'জাতি গত নির্মূল' অভিযান বা Ethnic Cleansing ঘটেছে, সেখানেই নারীদের ওপর প্রধান আক্রমণ নেমে এসেছে। অতএব, পরিশেষে আমরা এটা বলতে পারি যে গঙ্গার দুই পারে যা ১৯৪৭ সালে ঘটেছিল তার পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে। সুতারা দত্তের কাহিনি কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় মানব সমাজের তথা কথিত অগ্রগতির অনেক মুল্যের মধ্যে অন্যতম। ছিন্নমুল নারীদের যে তীব্র দহন এবং মানব মনের যে অবক্ষয় যা কিনা স্বাধীনতা উত্তর পর্বে ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল, তারই একটি রূপরেখা দিয়েছেন জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর উপন্যাস 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'র মধ্য দিয়ে।

---

[i] রায় চৌধুরী সুবীর সম্পাদক, জ্যোতির্ময়ী দেবী- এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন, দে' জ পাবলিশিং, ১৯৯১, পৃ :১০৫

[ii] তদেব, পৃ: ১২০

[iii] Ritu Menon and Kamla Bhasin, *Borders and Boundaries: Women in India's Partition*, New Delhi, Kali for Women 1998 p 243

[iv] Article- 'History versus (Her) Story: A Study of Jyotirmoyee Devi's Epar Ganga Opar Ganga'- Jaydip Sarkar in *Partition Literature and Cinema –A Critical Introduction*, Ed. By Jaydip Sarkar and Rupayan Mukherjee, 2020, p 148

[v] তদেব পৃ ১৪৮-১৪৯

[vi] Menon Ritu and Bhasin Kamla, *Borders and Boundaries: Women in India's Partition*, New Delhi, Kali for Women 1998 p. 219

[vii] Butalia Urvashi, *The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India,* Penguin Books India, 1998p. 112

[viii] Butalia Urvashi, Community, State and Gender: On Women's Agency during Partition, Economic and Political Weekly Vol. 28, No. 17 (Apr. 24, 1993), pp. WS12-WS21+WS24 (11pages)https://www.jstor.org/stable/pdf/4399641.pdf?refreqid=fastlydefault%3A856f916e4e5d19365045bb008e64a660&ab_segments=&initiator=recommender&acceptTC=1, Accessed 23.02.25

তথ্যসূত্র:

১। দেবী, জ্যোতির্ময়ী, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা, জ্যোতির্ময়ী দেবীর রচনা সংকলন, সম্পাদক সুবীর রায় চৌধুরী, দে' জ পাবলিশিং, ১৯৯১

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর, পলাশী থেকে পার্টিশন- আধুনিক ভারতের ইতিহাস, ওরিয়েন্ট লংম্যান ২০০৪ পৃ: ৫৩৬

৩। সরকার, সুমিত, আধুনিক ভারত *১৮৮৫-১৯৪৭*, বাগচী এন্ড কোম্পানি ১৯৯৩, পৃ: ৩৭৩

৪। দা, সুরঞ্জন, বাংলায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা: ১৯০৫-১৯৪৭, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০২৩, পৃঃ ৫৫-৫৬

৫। কলকাতায় ১৯৪৬ এর দাঙ্গার দিনেই কেন পশ্চিমবঙ্গে 'খেলা হবে দিবস': প্রশ্ন হিন্দু সন্ন্যাসীদের, অমিতাভ ভট্টশালী, বিবিসি বাংলা, ১৩ই আগস্ট, ২০২১ https://www.google.com/amp/s/www.bbc.com/bengali/news-58192226.amp , Accessed on 12.1.2025

৬। ভদ্র রায়, সোমা, এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা: নারী মক্তির রূপান্তর- Retrieve from: https://www.srishtisandhan.com/Srishtisandhan/magazine/content/ttst03pnarimukti.pdf) Accessed on 12.02.25

৭। Butalia Urvashi, The Other Side of Silence: Voices from the Partition of India, Penguin Books India, 1998

৮। Menon, Ritu and Kamla Bhasin, Borders and Boundaries: Women in India's Partition, New Delhi, Kali for Women'1998

৯। Sarkar Jaydip and Mukherjee Rupayan ed. Article- 'History versus (Her) Story: A Study of Jyotirmoyee Devi's Epar Ganga Opar Ganga'- Jaydip Sarkar in Partition Literature and Cinema –A Critical Introduction, Ed. By Routledge,2020

১০। Article- 'Communal Violence in India: A Study of Communal Disturbance in Delhi' Author(s): Gopal Krishna Source: Economic and Political Weekly , Jan. 12, 1985, Vol. 20, No. 2 (Jan. 12, 1985), pp. 61-74 Published by: Economic and Political Weekly Stable URL: https://www.jstor.org/stable/4373961)

১১। Pandey, G.1997. 'Community and Violence – Reading Partition' in Economic and Political Weekly, August 9, 1997, P 2037 from OCCASIONAL PAPER 2 EPAR GANGA OPAR GANGA — A CREATIVE STATEMENT ON DISPLACEMENT AND VIOLENCE Subhoranjan Dasgupta July 2004, pp 1-20, https://idsk.edu.in/wp-content/uploads/2015/07/OP-2.pdf, Accessed 13.02.25

১২। Article-'Community, State and Gender: On Women's Agency during Partition'- Urvashi Butalia Economic and Political Weekly Vol. 28, No. 17 (Apr. 24, 1993), pp. WS12-WS21+WS24 (11 pages) https://www.jstor.org/stable/pdf/4399641.pdf?refreqid=fastly-default%3A856f916e4e5d19365045bb008e64a660&ab_segments=&initiator=recommender&acceptTC=1, Accessed 23.02.25

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 929-936
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.086

হারাধন বৈরাগীর কাব্য ভাবনায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অনুসন্ধান

অমর্ত্য দাস, *অতিথি প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, সরকারি মহাবিদ্যালয়, পানিসাগর, উত্তর ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 18.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Tripura is a small state in Northeast India. This state of Tripura is at par with other states of India today in the race to be appointed to the best seat. However, in terms of linguistic diversity and natural beauty, Tripura is one of the states in the entire North Eastern region. Here the people of both hilly Bengali communities have been living together for years with the promise to stand by each other in happiness and sorrow. Haradhan Bairagi a permanent resident of Kanchanpur sub-division, a remote sub-division of North Tripura district of this Tripura state, is an associated name in the history of Bengali literature of Tripura. Although a forest-loving literary servant, he travelled all his life in the mountains and forests of the remote areas of Tripura, collected the spoken language of the people of each region, their food system, above all the enchanting natural beauty of the hills and forests of Tripura. This research essay attempts to discuss how Haradhan Bairagi wrote the mesmerizing beautiful environment of Tripura, a small hill state full of nature love and natural beauty, and how his writings have been absorbed by the readers. The way in which Haradhan Bairagi devoted himself to literary pursuits is truly undeniable. Haradhan Bairagi is a perfect example of how the attraction of mountains and jungles can make a common man to pursue literary pursuits.

***Key word**: Tripura, Haradhan Bairagi, Hasmati, Beauty of Nature, Hills, Jungle, Saima River, Jagabandhu, Dhalai*

সাহিত্য বরাবরই প্রেম, প্রকৃতির সৌন্দর্যায়ন, সমাজ এবং রাজনীতির বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে। সমাজকে ছেড়ে যেমন সাহিত্য রচনা প্রায় অসম্ভব, তেমনি প্রকৃতিকে ছেড়েও সাহিত্য অনেকটা দিকভ্রষ্ট হয়ে পড়ার সমান। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ছোট্ট পাহাড়ি রাজ্য এই ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চার ইতিহাসে এক অন্যতম নব্য সংযোজিত নাম হল হারাধন বৈরাগী। তার রচিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের পাহাড়ি জনজাতি মানুষদের ভাষার কথ্য ও শুদ্ধ রূপ সচেতন ও অচেতনভাবে ঢুকে গেছে। বাংলা ভাষারও কয়েকটি শব্দ এড়ানো যায়নি তার কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে। জঙ্গলপ্রেমী এই সাহিত্যিক চাকুরীজীবী হলেও গোটা জীবন ঘুরে বেড়িয়েছেন সমগ্র ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলের পাহাড়ে জঙ্গলে, আহরণ করেছেন প্রতিটি অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা, তাদের খাদ্য প্রণালী, সর্বোপরি আহার ও জঙ্গলের মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য। তবে এখানে একটি কথা বলে না রাখলে পাঠক মহল এবং লেখক উভয়ের প্রতিই একটি অন্যায় হয়ে যায় বলে আমার মনে হয়। কেননা আলোচ্য গবেষণাধর্মী নিবন্ধে যে সাহিত্যিক হারাধন বৈরাগীকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে সেই হারাধন বৈরাগী নামটি লেখক ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। সুতরাং বলে রাখা প্রয়োজন যে আমরা যে সাহিত্যিক তথা সৃজনশীল কাব্য লেখক হারাধন বৈরাগীকে নিয়ে আলোচনা করছি সেই নামটি লেখকের ছদ্মনাম। সপ্তম শ্রেণিতে পড়াকালীন সময়ে কবিতা লেখায় হারাধন বৈরাগীর হাতেখড়ি। কলেজে পড়াকালীন

'ত্রিপুরা দর্পণে' তিনি ছিলেন নিয়মিত একজন কবিতা লেখক। পরে চাকুরীতে প্রবেশের পর দীর্ঘদিন তিনি লেখালেখিতে অনিয়মিত হয়ে পড়েন। যখন ধলাই জেলায় তিনি বদলি হয়ে চলে যান তখন তিনি নতুন করে আবার কবিতা লেখা শুরু করেন এবং এখান থেকে তিনি তার হারিয়ে যাওয়া জীবনকে নতুন করে দেখতে পান। এখানে এসেই হারাধন বৈরাগীর প্রথম মুখবই প্রকাশ পায়। শুরু হয় নানা কবিতা ও গদ্য লেখা।

হারাধন বৈরাগীর রচিত প্রথম কাব্যগ্রন্থ হল 'হাসমতি ত্রিপুরা'। গ্রন্থের মধ্যে রচিত কবিতাগুলি লেখা হয়েছিল ২০১৫ সালের জুন থেকে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। গ্রন্থটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ ঘটে ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। এছাড়াও হারাধন বৈরাগীর অন্যান্য কবিতা গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে 'হৃদি চংপ্রেঙ', 'খুমপুইপাড়ায়'। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে তিনি অত্যন্ত সচেতন ও সাবলীলভাবে ভাব, ভাষা ও ছন্দ রীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। তাছাড়াও তার কবিতাগুলির মধ্যে প্রেম, প্রকৃতি ও সমাজের এক অসাধারণ প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। তিনি বাস্তব জীবনে যা প্রত্যক্ষ করেছেন এবং যে অভিজ্ঞতার শিকার হয়েছিলেন তা নিয়েই তার এই সাহিত্য রচনাকর্ম। প্রাকৃতিক মনমুগ্ধকর সৌন্দর্যের সাথে কবির প্রেম ভাবনা কিভাবে একাকার হয়ে গিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করা যায় তার প্রতিটি লেখনীর প্রতিটি শব্দে।

হারাধন বৈরাগীর সৃষ্ট কবিতাগুলিতে ত্রিপুরার মনোমুগ্ধকর পাহাড় ও তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হাতছানি দিয়েছে বারবার। হাতছানি দিয়েছে তার কবিতায় ত্রিপুরার একের পর এক নদী। ত্রিপুরার জনজীবনের অন্তরালে প্রকৃতি খুব সহজেই মিশে যায়। ট্রেনের জানালার পাশে বসে প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যায়নি এমন যাত্রী হয়তো খুব কমই আছে। তাই কবিরাও সেই হাতছানিতে মিলেমিশে একাকার হয়ে যান। ত্রিপুরার এই মনোমুগ্ধকর পাহাড় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে পটভূমিতে রেখে ত্রিপুরার সাহিত্য জগতে রচিত হয়েছে একের পর এক কবিতা। হারাধন বৈরাগীও হলেন এই ধারারই এক অন্যতম কবি লেখক। তিনিও লিখে গেছেন প্রকৃতি ও পাহাড়কে কেন্দ্র করে অজস্র কবিতা। তার সঙ্গে তিনি জুড়ে দিয়েছেন ত্রিপুরার পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসী জনজাতিদের জীবনের সংগ্রাম লড়াই এবং খাদ্য ও পোষাককে। তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হাসমতি ত্রিপুরা'র সমস্ত কবিতায় তিনি এক ভিন্ন সুর দিয়ে কবিতাগুলো রচনা করেছেন। 'খুমপুইপাড়ায়' হল তার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রতিটি কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলোতেই তিনি প্রকৃতির সঙ্গে মানব জীবনের এক অসাধারণ সমন্বয় দেখিয়েছেন। গ্রন্থের কবিতাগুলোতে পাওয়া যায় প্রেম, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সমাজের এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা। আলোচ্য গবেষণাধর্মী নিবন্ধনটিতে হারাধন বৈরাগীর রচিত কাব্যগ্রন্থ গুলির মধ্যে কবির ভাবনার আলোকে ত্রিপুরার অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের যে স্বাধীন বিকাশ ঘটেছে সেই সম্পর্কে গবেষণামূলক এক আলোচনা প্রস্তুত করার প্রয়াস মাত্র।

'হাসমতি ত্রিপুরা': হারাধন বৈরাগী তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'হাসমতি ত্রিপুরা'য় রচিত কবিতাগুলির নাম উল্লেখ করেননি, অর্থাৎ তিনি কবিতাগুলির শিরোনাম দেননি। এখানে তিনি কবিতাগুলোকে সংখ্যায় প্রকাশ করেছেন। 'হাসমতি ত্রিপুরা'য় মোট ষাটটি কবিতা রয়েছে। প্রথম কবিতা থেকে শেষ কবিতা পর্যন্ত তিনি কবিতাগুলোকে এক, দুই, তিন পর্যায়ক্রমে ক্রমাঙ্ক করে গ্রন্থটি রচনা করেছেন। গ্রন্থের নামকরণে যে হাসমতি ত্রিপুরার কথা বলা হয়েছে সেই হাসমতি ত্রিপুরা কবির প্রেয়সীর নাম। গ্রন্থটির মধ্যে কবি অসাধারণ বাকশৈলীতে প্রেম ও প্রকৃতির নানা ছবি এঁকেছেন।

'এক' কবিতায় কবি আফিমের নেশায় নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি তার নেশায় এতটাই বিভোর হয়ে পড়েছেন যে তিনি নিজেকেই আর দেখতে পাচ্ছেন না। তবে কবি নিজেকে না দেখলেও তার অবিকল কাউকে দেখতে পারছেন—

> "ধর্ম নয় তার আফিমের নেশা
> আমি নই অবিকল আমার মতো।"[১]

প্রকৃতিপ্রেমী কবি হারাধন বৈরাগী প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাইমা নদীর তীরে হেঁটে যান। তিনি নিজেকে নদীর ভাঙ্গনের সঙ্গে তুলনা করে বলছেন তার যখন নেশা ধরে যায় চাঁদকে তিনি তার কাছে চলে আসার জন্য ডাক দেন, কিন্তু চাঁদ আসেনা বরং চূড়া দুলিয়ে কোমর বেঁয়ে নেমে আসে নাবাল জমি। রাতের আঁধারে আকাশে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠা চাঁদ আর সাইমা নদীর তীরের ভাঙ্গনের অপূর্ব এক ব্যঞ্জনাময় সৌন্দর্য কবি হারাধন বৈরাগীর লেখায় রূপকতা ও সৌন্দর্যতার ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে। কবি বলছেন–

"সাইমার তীর ধরে প্রতি সন্ধ্যায়
লাউপানি অন্ধকারে হেঁটে যাই"[২]

'পাঁচ' কবিতায় কবি রাতের সাইমা নদীর সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দিয়েছেন। নদীর এপার ওপার রাতের অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। তার তীর বরাবর শ্মশানবাড়ী জেগে উঠেছে এবং অস্তাচলের চাঁদ ভাঙছে নদীর ঢেউয়ে ঢেউয়ে। আবার তিনি কবিতার মধ্যে নদীর পাড় ভেঙে ধ্বস নামার উল্লেখও করেছেন। বলছেন ধ্বস নেমে চুপি চুপি নদীকে লুকিয়ে ফেলছে। এক অসাধারণ অভিব্যক্তিতে কবি নদীর জল স্রোতে তার পাড় ভেঙ্গে তাকে লুকিয়ে ফেলার কথাকে তুলে ধরেছেন।

"চিতায় উঠেছে মেসেন্তির বিগত ঐশ্বর্য
ধুপধাপ ধ্বস নামছে
চুপি চুপি লুকিয়ে ফেলছে নদী।"[৩]

কবির চাকুরীস্থল অর্থাৎ তিনি যে জগবন্ধুপাড়ায় চাকুরী করতেন সেই জগবন্ধুপাড়ার রাতের রহস্যের কথা উঠে এসেছে একটি কবিতায়। সেখানে দেখা যায় কবি জানালা থেকে উঁকি দিয়ে বুঝতে পারেননা কোন যুবক কোন যুবতীর কাছে যায়, কোন যুবতী কোন যুবকের অপেক্ষায়। তিনি যেখানে যান অবিকল একই কথা শুনতে পান। এখানে কবি জগবন্ধু পাড়ার রাতের এক রহস্যময় কাহিনির উল্লেখ করতে গিয়েও যেন কথা বলতে পারেননি। তবে কবিতার লাইনগুলো থেকে অবশ্যই এ কথা বুঝা যায় যে জগবন্ধুপাড়ায় রাতের অন্ধকারে এক যুবক আরেক যুবতীর কাছে কিংবা এক যুবতী আরেক যুবকের কাছে চলে যায়। তাই কবি বলছেন জগবন্ধুপাড়ায় যখনই রাত নেমে আসে তখনই এক রহস্যের মোড়কে ঢেকে যায় সেই পাড়া-

"রাত নেমে এলে জগবন্ধুপাড়া
রহস্য মোড়কে ঢেকে যায়।
ব্যারাকের জানালা থেকে বুঝা যায় না।"[৪]

লেখক হারাধন বৈরাগী রাতের জগবন্ধুপাড়াকে বলেছেন বর্ণচোরা, অবয়বহীনা। তিনি যখন চারপাশে তাকান কিছুই দেখতে পান না তার কাছে সবকিছুই রহস্যের মতো মনে হতে থাকে। তিনি বুঝতে পারছেন না রাতের বর্ণচোরা রং পাল্টায় নাকি অবয়ব রং পাল্টায়। কবিপ্রিয়া হাসমতিকে জগবন্ধু পাড়ার রাতের রহস্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে তার কাছে বলছেন —

"হাসমতি, আমি এক প্রান্তিক
"জুয়াড়ি, বাঁশের ভেলায়।"[৫]

'আট' কবিতায় লেখক প্রকৃতিকে পরম প্রকৃতি বলেছেন, তাকে নিয়েই কবির সকল কবিতা রচনা। চিত্রা ছড়ার জলে আজ প্রেয়সী হাসমতি ত্রিপুরার স্নান দেখে কবির সাইমা নদীর জলে ধর্মবোনের স্নানের কথা মনে জেগে উঠেছে। এটি যেন তার প্রেমেরই এক ব্যাঞ্জনাময় কবিতা—

"পরমা প্রকৃতি,
তোমাকে নিয়েই আজকের কবিতা।
চিত্রা ছড়ার জলে উদোম
স্নান করে হাসমতি ত্রিপুরা"[৬]

হারাধন বৈরাগী স্বভাবতই একজন প্রকৃতিপ্রেমী লেখক। তার প্রত্যেক লেখনীর মধ্যে দিয়ে প্রকৃতির কথা যেমন উঠে এসেছে তেমনি উঠে এসেছে প্রেমের বার্তা। 'নয়' কবিতায় লেখক দশ দিগন্ত ঘুরে আসার কথা বলেছেন। তিনি দিগন্তের দশ দিক ঘুরে সেই হাসমতি'র কাছে এসেই থমকে দাঁড়ান। কিন্তু হাসমতি কবির কাছে চিষ্কারা রাত্রির মতো, হাসমতি কবির কাছে নিস্তব্ধ সুন্দিবন। ফলে স্বভাবতই এখানে লক্ষ্য করা যায় যে কবির প্রেয়সী হাসমতি ত্রিপুরার মধ্যেই কবি প্রকৃতির এক অপরূপ সৌন্দর্য এবং মেলবন্ধন গড়ে তুলেছেন —

"চিষ্কারা রাত্রির মতো

তুমি, অধরাই রয়ে গেছো
হাসমতি, নিস্তব্ধ সুন্দিবন।"[৭]

জগবন্ধুপাড়া কবির কাছে রহস্যময়ী। কবি নতুন চাকুরি পেয়ে জগবন্ধুপাড়ায় বদলি হয়ে গেলে চারদিকের পরিবেশ মানুষজন সবকিছুই কবির কাছে নতুন তবুও সেই জগবন্ধু পাড়ার প্রকৃতির গন্ধ তাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তার কাছে এই জগবন্ধু পাড়া এক স্বপ্নের মতো রহস্যে ঘেরা। কবি মনে করেন জগবন্ধু পাড়া রহস্যময়ী বলেই এখানে রাতের আকাশ থেকে ঝরে পড়ে রুপোর বরণ। এখানে কোন মানুষ থাকে না, শীতঘুমে চলে গেছে শ্বাপদেরা, কিন্তু সাইমা নদী গিরগিটির মতো পাহাড়ের খাদ বেয়ে চলেছে—

"রাত্রির নাম রহস্যময়ী বলে
থেকে ঝরে পড়ে রুপোর বরণ
কোন মানুষ নেই এখানে
শ্বাপদেরা চলে গেছে সব শীত ঘুমে"[৮]

তবে কবি জানেন এই জগবন্ধু পাড়ায় যদি কেউ এসে রাতের ঘ্রাণ নিতে পারে তবে সে বিদূষক হয়ে যেতে পারে। কবির মতে জগবন্ধু পাড়া যে রহস্যের মোড়কে ঢাকা আছে তাতে যে কেউ সেই রহস্যের মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

'পনেরো' কবিতায় কবি রাতের আঁধারে জম্পুই পাহাড়ের একটি কমলা গাছের নীল হয়ে জ্বলার বর্ণনা দিয়েছেন। সেই কমলা গাছকে তিনি বিষফলা বলে উল্লেখ করেছেন। বুনোফুল মেঘের মতো মন আনচান করে ওঠে, তিনি হাসমতিকে ঘিরে বাতাসে ফিসফাস গুঞ্জন আওয়াজ শুনতে পান। জম্পুই পাহাড়ে লেখক যেন এক অদৃশ্য ছায়ার অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাই বলছেন—

"হাসমতি তোমাকে ঘিরেই____
ফিশফাস গুঞ্জন বাতাসে বাতাসে।"[৯]

রাতের মায়ার চাঁদ যখন জঙ্গলের রেঞ্জে নেমে আসে কবির চোখ বেয়ে নামে তখন রাতের কুহক। রাইমা নদী কবির কাছে হয়ে ওঠে ত্রিপুরার স্বাদের জামার বোতামের মতো। 'একত্রিশ' কবিতায় আবার দেখা যায় কবির প্রেয়সী হাসমতিকে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কবি তাকে খুঁজছেন পুরাণের চারণের গানে, চন্দ্রবংশীয় রাজাদের উত্থান পতনে, জুমের বনে, মাদল চংপ্রেঙ সুমুর মূর্ছনায়। আবার কখনো কবি তাকে খুঁজেছেন খেরেংবার অর্থাৎ দোলনচাঁপা ফুলের রূপের মধ্যে। পাহাড়ি জনজাতি সম্প্রদায়ের একটি জনপ্রিয় পোশাক রিয়া এবং পাছাড়ার নকশায় এবং জনজাতিদের সংস্কৃতির অন্যতম ধারা হজাগিরি ও গড়িয়া নৃত্যের হিল্লোলে আবার কখনো বিড়িপাতা ছড়ায় কবি নিজের মধ্যেই তার প্রেয়সী হাসমতিকে খুঁজেছেন।

"তোমাকে খুঁজি গোদক লাইরুপাতায় মামিরাও গন্ধে
তোমাকে খুঁজি খুম্পুই কুতুইমণিরাগ খেরেংবার-রুপে"[১০]

প্রকৃতির প্রেমে জঙ্গলের মাদকতায় কবি যেভাবে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন তার উৎস কবির প্রাণের প্রিয় সেই জগবন্ধু পাড়া। কিন্তু 'ছেচল্লিশ' কবিতার শুরুতেই কবির কণ্ঠে শোনা যায় যেন এক হৃদয় কুণ্ঠিত শব্দ। কবিতার শুরুতেই তিনি এক ইতি টানার কথা বলেছেন —

"জগবন্ধুতেই ইতি হবে জানি
আমার সমস্ত জঙ্গল কাহিনি।"[১১]

কবি অনুভব করতে পারছেন যে এই জগবন্ধু পাড়াতেই তার সমস্ত জঙ্গলের কাহিনী শেষ হবে। সাইমার জলে তিনি যেভাবে নিজেকে পূর্ণরূপে খুঁজে পান সেই সাইমা নদীর পাড়ের ভাঙ্গা খাদে তিনি বারবার পিছলে পড়ে যান। লেখক ভয় পান, তার সাজানো বোধের কাছে তিনি নিজেই হেরে যান। তাই হারিয়ে যেতে চান নিভৃতির সংগোপনে। তার মাথার পাখায় অর্থাৎ মাথার উপর কোন এক আত্মহননকারী মায়ামথ উড়াউড়ি করছে। তাই তিনি সব ভুলে মায়া ছেড়ে মুক্তি চান। কবির মতে কোন এক অতিবিপ্লবী আজও জানে না যে চক্ররথে অবোধ্য আজও অনন্ত।

"কোনো অতি বিপ্লবী আজও জানে না
সহসা চক্ররথে অবোধ্য অনন্তে"[১২]

কবিতার মধ্যে তিনি আবার জঙ্গলের এক দৃশ্যের কথাও তুলে ধরেছেন, যেখান থেকে অনুমান করা যায় পাহাড়েও হিংসার আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। মানুষ থাকতো মানুষের ভয়ে, মানুষ দিশেহারা হয়ে খুঁজতো নতুন কোন গ্রাম। কবির কথায় সেই দৃশ্যই যেন ফুটে ওঠে। তবু তিনি আক্ষেপ করেছেন যে সেই ভয়াবহ দিনে তিনি কেন উপস্থিত হতে পারলেন না। কবি হারাধন বৈরাগী ছিলেন একজন ভ্রমণ প্রেমী মানুষ। তিনি সমগ্র ত্রিপুরার প্রত্যন্ত গ্রাম, শহর, পাহাড়, জঙ্গল চষে বেরিয়েছেন। ত্রিপুরার পাহাড় থেকে সমতল, শহর থেকে গ্রাম সবকিছুই তিনি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন। তার সমগ্র কবিতায় উঠে এসেছে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন দৃশ্যের কথা। তিনি বাস্তব জগতে যা স্বচক্ষে দেখেছিলেন তাকেই তিনি তার লেখনীর আঙিনায় স্থান দিয়েছেন। কোন কাল্পনিক ঘটনা বা কাল্পনিক বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়কে তিনি কবিতার আঙিনায় আনেননি। ত্রিপুরার একমাত্র জলপ্রপাত ডুম্বুরের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন ডুম্বুরের জল যেমন মানুষের তৃষ্ণা মেটায় তেমনি এই জলাশয় থেকে মানুষ বেঁচে থাকার উৎস খুঁজে পায়। ডুম্বুরের মৎস্য চাষের ফলে মানুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা তৈরি হয়, বেঁচে থাকে বহু মৎস্যজীবী পরিবার। ডুম্বুরের জলরাশি এতটাই স্বচ্ছ যে কবি জলের অতলে থাকা বৃক্ষদের দেখতে পান।

ত্রিপুরা একটি পাহাড়ি রাজ্য, তার চারদিক ঘেরা অনেক উঁচু উঁচু পাহাড় পর্বত দিয়ে। কখনোবা রেল চলছে সমতলে আবার কখনো চলছে পাহাড়ের মাটি খোদাই করা সুরঙ্গ দিয়ে। প্রকৃতির সুন্দর দৃশ্য কবিকে প্রতিনিয়ত আকৃষ্ট করছে। সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে রেল চলাচলকে খুবই সুন্দর উপমা দিয়েছেন লেখক হারাধন বৈরাগী। লেখক এর কাছে পাহাড়ের সুরঙ্গের মধ্যে দিয়ে যান্ত্রিক রেলের চলাচলকে বৃহৎ অজগরের মতো মনে হচ্ছে—

"মাঝেমধ্যে অজগরের মত পাহাড় ফোড়ে
বেরিয়ে যাচ্ছি।"[১৩]

রেলে যাত্রাপথে কবির মনে হচ্ছে যে রাস্তার দুপাশের জঙ্গল যেমন ঘুরছে কবিও তেমনি ঘুরছেন। কিন্তু এই যাত্রাপথে কবির কেবল মনে পড়ছে তার প্রেয়সী হাসমতির কথা। কবি হারাধন বৈরাগী তার 'হাসমতি ত্রিপুরা' কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতাতে এভাবেই তার প্রিয়সী হাসমতিকে ঘিরে প্রেম ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এক অপূর্ব বাক ভঙ্গিমায় সমস্ত কবিতাগুলি রচনা করেছেন।

'খুমপুইপাড়ায়': হারাধন বৈরাগীর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নাম হল 'খুমপুইপাড়ায়'। এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে ত্রিপুরার মনোমুগ্ধকর পাহাড় ও প্রকৃতি হাতছানি দিয়েছে বারবার। ত্রিপুরার এই মনোমুগ্ধকর পাহাড় ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে পটভূমিতে রেখে ত্রিপুরার সাহিত্য জগতে রচিত হয়েছে একের পর এক কবিতা। তার সঙ্গে হারাধন বৈরাগী তার অনন্য সৃষ্টি নির্মাণে জুড়ে দিয়েছেন ত্রিপুরার পাহাড়ে বসবাসকারী আদিবাসী জনজাতিদের জীবনের সংগ্রাম বেঁচে থাকার লড়াই এবং খাদ্য ও পোশাককে। তবে এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে তিনি প্রকৃতির সঙ্গে এক অসাধারণ সমন্বয় দেখিয়েছেন। গ্রন্থের কবিতাগুলিতে পাওয়া যায় তার প্রেম ও প্রকৃতির সম্মিলিত প্রচেষ্টা।

কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'তুমি ছারা' কবিতায় লেখক পাহাড়ি জনজাতিদের আরাধ্য দেবতা গড়িয়াকে স্মরণ করে তার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। কবি বলছেন প্রভু গড়িয়াকে ছাড়া তার কোন উদ্ধার হবে না। কবির ধ্যানে জ্ঞানে প্রভু গড়িয়া সর্বদা জাগ্রত থাকেন। তাই কবি যেখানেই যান না কেন প্রভু গড়িয়া যেন তার হৃদয়ের অন্তস্থলে জেগে থাকেন। এখানে লেখকের ধর্মের প্রতি, ঈশ্বরের প্রতি তার যে বিশ্বাস তারই প্রতিফলন দেখা যায়। তিনি ঈশ্বরের মাঝেই স্বর্গ, নরক, শ্মশান সবকিছুই দেখতে পান।

কবি প্রকৃতির প্রেমে নিজেকে এতটাই মিশিয়ে দিয়েছেন যে প্রকৃতির মাঝেই তিনি তার সকল শখ আহ্লাদ খুঁজে পান। মধুমাসে টংঘরের কোণে দাঁড়িয়ে থাকা একটি চাঁপা ফুলের গাছ আছে। কবি ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখেন সেই গাছে বিভিন্ন পাখিরা উল্লাস করছে। কবি তাতে অত্যন্ত মুগ্ধতার ছোঁয়া পেয়েছেন।

"টংঘরের কোণে দাঁড়িয়ে আছে
একটি ফুলবতি সামফারাই গাছ"[১৪]

'মধুমাস-২' কবিতায় কবির বিরহ কাতর যন্ত্রণা যেন ফুটে উঠেছে। কবি ছিলেন একজন জঙ্গলপ্রেমী মানুষ। স্বভাবতই জঙ্গলের বিনাশে কবি যে কষ্ট পাবেন না তা বলা যায় না। বসন্তে গাছের ছাল যখন উঠে যায় কিরাতের দল নামে জঙ্গলে। এর থেকে বোঝা যায় বনদস্যুদের দল যখন জঙ্গলের গাছ কেটে নিয়ে যায় সেই দৃশ্য দেখে কবি আহত হন। প্রকৃতির সাথে অগাদ প্রেম না থাকলে এই অনুভূতি আসার কথা নয়। 'সাইমা' কবিতায় সাইমা নদীর প্রতি কবির প্রেম ও ভালোবাসার পরিচয় পাওয়া যায়। কবির কাছে সাইমা নদী সারা বছরই বাসন্তী, তার শেষে উড়ে বেড়ায় বসন্ত—

"সারাবছরই তুমি বাসন্তী
শ্বাসে শ্বাসে উড়ে বসন্ত।"[১৫]

'প্রেম অমর প্রেম চিরন্তন' কালজয়ী এই সত্যটি কবি হারাধন বৈরাগীর কবিতায় যথার্থতা লাভ করেছে। কোন এক চিকলি অর্থাৎ যুবতী খুমপুই (চাঁপা ফুল) খুব ভালোবাসে তাই জুমঘরে বাস করা এক চিকলা (যুবক) তাকে ভালোবাসার প্রমান স্বরুপ তার খোঁপায় গুঁজে দেয় একগুচ্ছ চাঁপা ফুল। কিন্তু রাতে মধুপোকা এসে তার খোঁপায় হুল ফুটিয়ে দিয়ে যায়। তার চোখের মনি নড়ছে কিন্তু চোখ নড়ছে না। কবি বুঝতে পারছেন না কিছুই। কবির কাছে প্রেম চিরন্তন সেই সত্যটিই যেন বারবার উঠে এসেছে। যুবতীর দেহে নানান অলংকার থাকে, তার গলায় ফুলের মালা আছে কিন্তু বিরহ কাতর যুবতী প্রেমের ব্যর্থতায় এগিয়ে যাচ্ছে অগ্নিকুণ্ডের দিকে। পাশে বাজতে থাকে নানান বিরহ বাদ্যযন্ত্র।

কবিপ্রেয়সী হাসমতি এই প্রথম সংবাদের শিরোনামে উঠে এসেছে। কবির প্রেয়সী আজ আঘাতপ্রাপ্ত। জঙ্গলের পশু পাখিদের এই করুণ দৃশ্য দেখে বেদনাহত কবি তার কবিতার শীর্ষে প্রেয়সী হাসমতিকে রেখে 'হাসমতি তুমিও' কবিতাটি রচনা করেছেন।

"হাসমতি তাই তুমিও
ঘনঘন উঠে আসো - সংবাদ শিরোনামে।"[১৬]

পাহাড়প্রেমী ও জঙ্গলপ্রেমী কবি হারাধন বৈরাগীর জঙ্গলের প্রতি প্রেম আবারও প্রকাশ পায় 'ঘটনা দিগন্ত' কবিতায়। কবি পাহাড়কে একটি 'ঘটনা দিগন্ত' বলে মনে করেন। আর তিনি নিজে হলেন সেই দিগন্তের বনবাসী। প্রকৃতিপ্রেমী একজন কবি প্রকৃতির মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেবেন এবং সেখান থেকে আহরণ করবেন তার সুস্নিগ্ধ সুহাস এটাই স্বাভাবিক।

পাহাড়ের স্থান কাল পরিবর্তন হয়ে যায়, কিন্তু সেই জঙ্গল কবিকে এক অমোঘ বাঁধনের ফাঁসে জড়িয়ে রেখেছে। মধ্যরাতে একটি বেভুল মধুপ কোথা থেকে এসে কবির বিছানা জুড়ে নিয়েছে কবি নিজেও জানেন না। কবির গালে দিয়েছে সে চুম্বন, কবি উপমা দিয়ে বলছেন—

"জুড়ে নিল বিছানা-এক বেভুল মধুপ
ফুটিয়ে দিল গালে-রাতকানা ফুল।"[১৭]

'কুথুইমণিরাগ' এক ধরনের বুনোফুল। এখানে আবার দেখা যায় কবির হৃদয় ভাবনা ব্যর্থতা স্পর্শ করেছে। রাতের অন্ধকারে তিনি যে ফুলকে সৌন্দর্যে ভরপুর ভেবেছিলেন, সারারাত যে ফুলের সুহাসে তিনি মত্ত ছিলেন ভোরের আলোয় তিনি দেখেন সেটি একটি বুনোনফুল মাত্র।

পাহাড়ের দিগন্ত ছোঁয়া সম্ভব নয়। পাহাড়ের চূড়া থেকে খাদ আর খাদ থেকে চূড়ার সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। পাহাড়ে ভ্রমণকারী কবি হারাধন বৈরাগী 'আমার কোন নারী নেই' কবিতায় পাহাড়ের বৃত্তান্ত যেমন দিয়েছেন তেমনি তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তার সার্বিক দিক তুলে ধরেছেন।

"আমার কোনো ঘর নেই নেই কোন ঘাট
কোনো নারী নেই নেই কোন খাট।"[১৮]

পাহাড়ের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি কতটা একাত্ম হলে একজন কবি কিভাবে তাকে বর্ণনা, ভাষা প্রভৃতির দ্বারা সকলের সামনে তুলে ধরতে পারেন তা কবি হারাধন বৈরাগীর মধ্যেই পাওয়া যায়। কবিতাটিতে তিনি একজন মানুষ

বা কবি হিসেবে নয়, তিনি নিজেকে পাহাড়ের সাথে একাকার করে কথাগুলো বলেছেন। এ কথা যেন কবির কথা নয়, কথা যেন সম্পূর্ণ এক পাহাড়ের।

কবির স্তরিভূত স্বপ্নগুলো বার বার উড়ে যায়, যেমন করে উড়ে বর্ণময় প্রজাতির দল। কবির মতে একটি নেশা কবিকে সারাক্ষণ আচ্ছন্ন করে থাকে তাই তিনি স্বপ্ন পূরণের ঠিকানায় পৌঁছাতে পারেন না। অন্যদিকে কবি তার প্রেয়সী হাসমতিকে ভুলতে পারেননা। তাকে তিনি সারাক্ষণ অনুভবে জাগিয়ে রাখেন। পাহাড়ে জঙ্গলের বাজারে গেলে কবি একই রূপ দেখতে পান, প্রতিটি মানুষের একই মুখ দেখতে পান। পাহাড় জুড়া গন্ধে তিনি হাসমতির গন্ধ পান। তিনি মনে করেন এই সব কিছুই হাসমতির ফেলে যাওয়া স্মৃতি।

"ফেলে যাওয়া একই গন্ধ
হাসমতি তোমারই যেন!"[১৯]

'তুমিই আমার' কবিতায় দেখা যায় কবি হাসমতিকে ছাড়তে নারাজ। হাসমতি কবিকে ছেড়ে যেতে চাইলেও কবি তাকে ছাড়ছেন না। হাসমতি কবির কাছে খাকচান অর্থাৎ পরম শান্তির জায়গা। তাই সব কিছু তছনছ হয়ে গেলেও কবির কাছে হাসমতি তার একান্তই আপন। তিনি বলছেন হাসমতিকে দেখে কেউ চিনতে না পারলেও তিনি তাকে ঠিক চিনতে পারবেন কেননা তিনি হাসমতির মধ্যে দিয়েই নিজেকে দেখতে পান। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। তাই সবকিছু ছাড়তে পারবেন কিন্তু হাসমতিকে তিনি ছাড়তে পারবেন না।

"তুমিই আমার পিদিমবাতি
আমার খাকচান।"[২০]

'খুমপুইপাড়ায়' কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা হলো 'হাত নাড়ছে'। এই কবিতায় এসে দেখা যায় সম্পূর্ণ আলাদা এবং পৃথক একটি দৃশ্য—

"বিদায় হাত নাড়ছে, চিকলির মতো
গাইরিঙের আঙ্গিনায়।"[২১]

তাহলে কি কবির প্রিয়তমা হাসমতির থেকে কবির সত্যিই বিদায় নেওয়ার পালা ? হাসমতি এবার বিদায় নিচ্ছে চিরতরে। জুমঘরের উঠোনে যুবতীর মতো হাত নাড়ছে যেন বিদায়। আফ্রিকার ব্রু জনজাতির সতীমারী (সারথী) যেভাবে আকাশগঙ্গায় মিশে গেছে কবি ভাবছেন হাসমতিও ঠিক সেইভাবে মিশে যাচ্ছে। কবির কাছে হাসমতির বিদায় হাত নাড়ছে। তিনি বুঝতে পারছেন হাসমতি তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তার থেকে বিদায় নিচ্ছে। কবি যেন বেদনাহত, মর্মাহত হয়েই কবিতাটি লিখেছেন।

"হাসমতি-তুমি কি মিশে যাচ্ছো
সারেথির মতো-আকাশগঙ্গায়!"[২২]

ত্রিপুরার সাহিত্যের ইতিহাসের নব্য সংযোজিত লেখক হারাধন বৈরাগী, একাধারে যিনি কথাকার, গল্পকার, কবি তার লেখায় ত্রিপুরার পাহাড়, জঙ্গল, উপজাতি সমাজজীবন এবং প্রেয়সী হাসমতি ত্রিপুরাকে যেভাবে কাব্যগ্রন্থগুলির সংকলিত কবিতাগুলিতে তুলে এনেছেন তা সত্যিই পাঠক মহলকে এক অন্যতম মাত্রায় পৌঁছে দেয়। হারাধন বৈরাগীর রচিত কবিতাগুলি পড়ে অনায়াসেই ত্রিপুরার পাহাড়ি জনজাতি সম্প্রদায় সম্পর্কে, ত্রিপুরার পাহাড় জঙ্গলের বুনো গন্ধকে আপন চেতনায় আত্মস্থ করা যায়। সেই দিক দিয়ে বলাই যায় যে ত্রিপুরার সাহিত্যচর্চায় হারাধন বৈরাগী এক অন্যতম কাব্যগ্রন্থ লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ত্রিপুরার প্রত্যেকটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে এবং আহরণ করেছেন প্রত্যেকটি জায়গার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, আঞ্চলিক ভাষা, সেখানকার খাদ্য তালিকা এবং সবার আগে যে কথা বলা উচিত সেটি হল তিনি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন ঠিকই কিন্তু এই ঘুরে বেড়ানোর মধ্যে তিনি যে বাস্তবতার শিকার হয়েছিলেন তাকে হুবহু কবিতাগুলির আঙ্গিনায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। কেননা তার রচিত কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিকে ভালোভাবে আত্মস্থ করতে পারলে দেখা যায় যে তিনি কোথাও কল্পনায় বিভোর হয়ে কাল্পনিক বিষয়বস্তুকে কবিতার বিষয়বস্তু করে তুলেননি বরং নিজের চোখে দেখা এবং পাহাড় জঙ্গলের

বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হয়েই সাহিত্য সাধনার মতো কাজে মনোনিবেশ করেছেন। ফলে তার রচিত গ্রন্থগুলির প্রত্যেকটি শব্দই যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে। তিনি সমতলবাসী হলেও পাহাড়ি জনজাতি সম্প্রদায়ের মুখের কথাকে যেভাবে লেখনীতে রূপ দিয়েছেন তা এ যাবৎকালে ত্রিপুরার সাহিত্যের ইতিহাসে এক অন্যতম নজির সৃষ্টি করেছে।

তথ্যসূত্র:

১) বৈরাগী, হারাধন, হাসমতি ত্রিপুরা, স্রোত প্রকাশনা, হালাইমুড়া কুমারঘাট, ঊনকোটি ত্রিপুরা ৭৯৯২৬৪, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃষ্ঠা নং-৭
২) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৭
৩) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১১
৪) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১২
৫) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১২
৬) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১৪
৭) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১৫
৮) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১৬
৯) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ২১
১০) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৩৭
১১) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৫২
১২) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৫২
১৩) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৬৪
১৪) বৈরাগী, হারাধন, খুমপুইপাড়ায়, তুলসী পাবলিশিং হাউস, আগরতলা ত্রিপুরা, বইমেলা ২০১৮, পৃষ্ঠা নং- ১১
১৫) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ১৭
১৬) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ২০
১৭) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৪৩
১৮) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৪৪
১৯) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৬১
২০) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৬৩
২১) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৬৪
২২) তদেব, পৃষ্ঠা নং- ৬৪

গ্রন্থপঞ্জী:

১) বৈরাগী, হারাধন, হাসমতি ত্রিপুরা, স্রোত প্রকাশনা, হালাইমুড়া কুমারঘাট ঊনকোটি ত্রিপুরা ৭৯৯২৬৪, ফেব্রুয়ারি ২০১৭
২) বৈরাগী, হারাধন, খুমপুইপাড়ায়, তুলসী পাবলিশিং হাউস, আগরতলা ত্রিপুরা, বইমেলা ২০১৮

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 937-943
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.087

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতা: কবির চোখে কবি

সৌরভ মজুমদার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 21.03.2025; Accepted: 22.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Lyric poems are reflections of a poet's thought and the reader of the poem should have an understanding of poet's internal realisation of his time and his own self. Nirendranath Chakraborty, an eminent Bengali poet, started writing in the forties, before India got independence. His the then poems consisted of his thoughts and values for Indian struggle for independence, and the poems afterwards reflected some of the riots of Fifties and Sixties. With these in the background, Chakraborty's poems should have some understandings of the efforts and follies of the petty bourgeoisie class – as he was one of them. It should also contain his own misgivings and errors as a responsible human being. This article tries to understand those standpoints of the poets through discussing some of his poems.

***Keywords**: Nirendranath Chakraborty, Poem, Middle class, Intellectuals, self-reflection*

একজন কবির জন্য আত্মসচেতন ও সময়সচেতন হওয়া প্রয়োজন কিনা তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিতর্কিত বিষয়। প্লেটো তাঁর 'রিপাবলিক' গ্রন্থে কবিদের রাষ্ট্র থেকে বিতাড়িত করার নিদান দিয়েছিলেন তার কারণ শুধু এইমাত্র নয় যে, কবিরা অনুকরণের অনুকরণ করেন অর্থাৎ সত্যের থেকে তিনধাপ দূরত্বে থাকেন—সে নির্বাসনের কারণ এটিও যে, কবিরা তাঁদের কাব্যে যে আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটান, তা অনেকক্ষেত্রেই তথাকথিত 'রাষ্ট্রবিধান'-এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয় না এবং পাঠক তথা উপভোক্তার মনে রাষ্ট্রবিরোধী ধ্যানধারণার জন্ম দিতে পারে। এছাড়া, তাঁরা তাঁদের কাব্যে দেবতাদের দোষ-ত্রুটি চিহ্নিত করেন—যা দেবতাদের প্রতি নাগরিকদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাকে বিনষ্ট করতে পারে। স্পষ্টতই, প্লেটো স্বীকার করেছেন কবিদের জনমতকে প্রভাবিত করার বিপুল ক্ষমতাকে। কবিতাকে কবি যদি ব্যবহার করেন দর্পণের মতো—যেখানে প্রতিবিম্বিত হবে সমাজমানসে ও সামাজিক ব্যবহারে নিহিত নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধহীনতা, অমানবিকতা ও আদর্শচ্যুতির ক্ষেত্রগুলি, তবে তা হয়তো প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে মানুষকে প্রভাবিত করতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে, কবি কি নিজে সমাজের থেকে, 'জনসাধারণ'-এর থেকে পৃথক কোনো সত্তা? হতে পারেন তিনি 'দ্রষ্টা', কিন্তু বাস্তব জীবনে কি তাঁকেও রাষ্ট্র ও সমাজের নির্ধারিত সীমার মধ্যেই অবস্থান করতে হয় না? জনতার অথবা শাসকের দোষত্রুটির অংশীদার কি তিনিও নন? নিজের বিচ্যুতির ক্ষেত্রগুলি যদি চিহ্নিত করতে পারেন তিনি, তবেই তো তার থেকে মুক্তির উপায় নির্ধারণ করা সম্ভব হবে! আত্মসচেতনতা ও সময়সচেতনতায় সুগঠিত ও জনমানসকে প্রভাবিত করার ক্ষমতাসম্পন্ন এই কবিতাকে প্লেটোর মতো রাষ্ট্রনীতিকেরা চিরকালই ভয় পেয়েছেন—তাই তাঁদের প্রচেষ্টা থেকেছে কবি ও কবিতাকে বস্তুপৃথিবীর সংসর্গরহিত করে গগনচারী সত্তার কণ্ঠনিঃসৃত স্বর্গীয় সংগীতে পর্যবসিত করার। 'বিশুদ্ধ কল্পনা'-র উপজাত বস্তু হিসেবে কবিতার আর্থ-সামাজিক তাৎপর্যহীনতাকে সোচ্চারে উপস্থাপন করেছেন তাঁরা। বাংলা লিরিক কবিতার বিবর্তনরেখা অনুসরণ করলে দেখা যাবে, বিহারীলাল

থেকে রবীন্দ্রনাথ হয়ে রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের কবিতা মূলত এই প্রকল্পেরই ফসল। জীবনানন্দের ভাবনায় প্রথম কবিতার বায়বীয় ধূম্রাবয়বের মধ্যে অস্থি-মাংসের স্পষ্টতা চিহ্নিত হয়, তিনি জানান: "কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।"[১] বিশ শতকের চারের দশকে বাঙালি বুদ্ধিজীবী মহলে মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাওয়ায় কবিতার বিষয়বস্তুতে উক্ত মতাদর্শের অনুরণন পরিলক্ষিত হয় এবং তার আঙ্গিকে সারল্যের মাত্রা বর্ধিত হয় শ্রমজীবী জনসাধারণের অধিকতর বোধগম্যতার প্রয়াসে। কিন্তু সমর সেন বিশুদ্ধতাবাদী ও বিশেষ-আদর্শের-ধ্বজাবাহী দুইপ্রকার কবিতাকেই প্রত্যাখ্যান করছেন, কারণ বাঙালি কবি মুখ্যত 'শিক্ষিত' মধ্যবিত্ত-শ্রেণিভুক্ত হওয়ায় তার প্রলেতারিয়েত জনতার যাপন ও মানস সম্পর্কে অজ্ঞতা কবিতাকে প্রকৃতই শ্রেণিসংগ্রামের হাতিয়ার করে তোলার পরিবর্তে আবেগসর্বস্ব ও নীরক্ত করে তুলেছে। এই প্রেক্ষাপটে, যে মধ্যবিত্ত পেটি বুর্জোয়া শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেন কবি নিজে, যারা দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কহীন ও প্রাকৃতজন-বিচ্ছিন্ন হওয়ায় একান্ত নিঃসঙ্গ—তাদের যাপনে নিহিত একেঘেয়েমি, ভয়াবহতা, গ্লানি ও বহুমুখী ব্যর্থতাকে কবিতায় তুলে আনার পক্ষে সওয়াল করেন সমর সেন, কারণ—

> রিয়ালিটির থেকে নিষ্কৃতির চেষ্টা পরাজয়ের দুর্বল ভঙ্গি, প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীক স্বর্গ। অন্যদিকে সাংসারিক সচেতনতা আধুনিক বাঙালি কবিদের সাহায্য করতে পারে, কারণ সচেতনতা, এমনকী নিজেদের সামাজিক ব্যর্থতার সচেতনতাও, ক্ষমতা ও সংযম আনে। কালক্রমে যখন তাঁদের বিষয়বস্তুতে আসন্ন পরিবর্তনের ভাঙন ধরবে তখন অন্তত তাদের সচেতন দৃষ্টিভঙ্গির জন্য পরবর্তী যুগের কবি এবং পাঠকেরা কৃতজ্ঞ থাকবেন।[২]

সমসাময়িক কাব্যভাবনার এই পটভূমিকায় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কীভাবে তাঁর কবিতায় নিজশ্রেণি ও নিজেকে উপস্থাপন করেছেন তার আলোচনাই বর্তমান নিবন্ধের উদ্দিষ্ট।

নীরেন্দ্রনাথ বিশ শতকের চারের দশকের সূচনাপর্ব থেকে আধুনিক বাংলা কবিতাচর্চার স্রোতোধারাটির অংশভাক্। একদিকে ভারতে গান্ধিজীর নেতৃত্বে ভারতছাড়ো আন্দোলন ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের তীব্র উত্তেজনা, অন্যদিকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রশক্তির উত্তুঙ্গ রণরোলের বিপক্ষে মার্কসবাদী-চেতনায় উদ্দীপ্ত তরুণদলের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অবস্থান এইসময়ের কাব্যপ্রযত্নের পশ্চাদ্‌পটটি নির্মাণ করেছে, যার অনুরণন শোনা গেছে নীরেন্দ্রনাথের কবিতাতেও।

আবার আকাশ লাল, শোণিতের প্রগাঢ় শপথ;
নিস্তব্ধ সুপ্তির রাত্রে ক্ষুধার্ত হাওয়ার হাহাকার;
দুরন্ত প্রাণের বন্যা প্রতিরোধ ভেঙেছে আবার।
শতাব্দী-পুঞ্জিত লজ্জা, কলঙ্কলাঞ্ছিত দাসখত
অসহ্য বেদনা হানে, উন্মুক্ত প্রতিজ্ঞা শোনো তার।

... ...

ক্ষুধার্ত বিদীর্ণ প্রাণে প্লাবনের মহান আস্বাদ,
গলিত বর্বর গর্ব ভূলুণ্ঠিত হয়েছে নিমিখে।
স্তম্ভ ভাঙে সাম্রাজ্যবাদের,
বঞ্চিত বলিষ্ঠ বাহু মৃত্যুর সংকল্প নেয় লিখে
('বিয়াল্লিশের পর'/ অগ্রন্থিত কবিতা)[৩]

কিংবা "এখনও অবশ আলো ভেসে আসে বাঁকা চাঁদের,/ দুশো বছরের লাঞ্ছনা আর মায়া-ফাঁদের/ নেশায় ঘুমায় বন্ধুরা, ঘুম ভাঙো তাদের"[৪]('শহিদ রামেশ্বর'/ঐ) ইত্যাদি পঙ্‌ক্তিগুচ্ছে কবির মার্কসবাদ-মনস্ক সংগ্রামী 'মিছিল-মন'টির অবয়ব প্রকট হয়ে উঠেছে—যা সমসময়ের শ্লোগানধর্মী কাব্যধারাটিকে ঘনিষ্ঠভাবেই অনুসরণ করেছে। কিছু কবিতায় শোনা গেছে আত্মজাগরণের আহ্বান, যেমন—"হে কুমার, তুমি জীবনকে চলো জানতে।... / যারা হেরে যায়, যারা নিবে যায়,/ মলিন যারা, বিমর্ষ,/ রাজপথ থেকে ডেকেছে তোমায়/ চূড়ান্ত শেল হানতে।"[৫] ('কুমারকে'/ঐ), যেখানে সর্বহারার একনায়কত্বের জন্য আত্মসর্বস্বতাকে বিসর্জনের মার্কসীয় প্রকল্পের পরিকাঠামোটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বস্তুত এই সময়পর্বের কবিতা থেকেই নীরেন্দ্রনাথ বারেবারেই উল্লেখ করেছেন তাঁর নিজশ্রেণির 'মায়াঘুমে' আচ্ছন্নতার কথা, তুলে ধরতে চেয়েছেন তাদের সংকীর্ণ, যত্নলালিত অন্ধ-যাপনের নিহিত অন্তঃসারশূন্যতাকে নিজের কাব্যকাঠামোতে। একটি উদাহরণ—

গভীর ঘুমের ঘোরে অচেতন আমরা সকলে।
বাতাসের তহবিল থেকে
মুমূর্ষুর শেষবার-ধার-করা জীবনের মতো
চেতনার আঁচলেতে শেষবার পাক খেয়ে-খেয়ে
ক্লেদাক্ত মূর্ছার মতো আমাদের স্নায়ুর অসাড়।[৬] ('যাত্রা'/ঐ)

মধ্যবিত্ত-শ্রেণির এই স্নায়বিক অসাড়তা নীরেন্দ্রনাথের পরবর্তী-পর্যায়ের কাব্যপ্রয়াসে আরও প্রকটভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ১৯৪৩-এ রচিত পূর্বোদ্ধৃত কবিতাটির শেষাংশে মার্কসবাদে সুগভীর প্রত্যয়-জাত যে সুনিশ্চিত উত্তরণের আশ্বাস পরিলক্ষিত হয়("বেনামী বন্দরে আজ শেষ হল বিভীষিকা-রাত।/ বন্ধু, তোমার হাতে রেখেছি আমার এই হাত"[৭], ঐ), স্বাধীনতা-পরবর্তী পর্যায়ে রচিত কবিতাগুলিতে সে নিশ্চয়তার অভাব, এমনকী অনুত্তরণের সংশয়-জাত নৈরাশ্য প্রবল হয়ে উঠেছে ক্রমশ। বস্তুত, খণ্ডিত স্বাধীনতা-প্রাপ্তির হতাশায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়' স্লোগান তুলে নিষিদ্ধ ঘোষিত হলে বিভ্রান্ত ও নবলব্ধ স্বাধীনতায় প্রলুব্ধ বাঙালি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় মার্কসবাদ থেকে তথা প্রত্যক্ষ শ্রেণিসংগ্রামের আদর্শ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়—যার ফলশ্রুতি শ্রেণিগত ও মানসিক নিশ্চলতা। একদিকে পুঁজিবাদের ক্রমবর্ধমান প্রলোভন ও অন্যদিকে দেশীয় ঐতিহ্য-বিচ্যুতির ফলস্বরূপ এই অবক্ষয়ী শ্রেণিচেতনা ক্রমশ উত্তরণের আশ্বাস হারিয়ে আত্মনাভি-কণ্ডূয়নরত হয়ে পড়ে, যার নিদর্শন উঠে এসেছে নীরেন্দ্রনাথের কবিতায়।

পারিপার্শ্বিকের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করে কবি দেখেছেন, তপ্ত সময়ের মরুঝড় মানবজমিন অনুর্বর করে তুলছে—প্রেম-প্রীতি-করুণার সজলতা লুপ্তপ্রায় আজ হৃদয়মৃত্তিকায়, নেই দুঃখময় জীবনে আলোকিত ভোর আনার কোনো উদ্যমও। প্রকৃত কাম্যবস্তুর পরিবর্তে ঝুটো বিশ্বাসের আঙরাখায় এরা ঢেকে রাখে চোখ—"এরা কোথায় যায় জটিল জমকালো/ পোশাকে মুখ লুকিয়ে, দ্যাখো কত না সাবধানে/ আঁচলে কাঁচ বাঁধে সবাই, চেনে না কেউ সোনা"[৮] ('ঢেউ'/ নীলনির্জন)। ঐতিহ্য আর মূল্যবোধে সুগঠিত জীবনের ভিত্তিনির্মাণের পরিবর্তে সামূহিক দায়হীনতা ও আরামপ্রিয়তায় নিজেকে ক্রমশ বিকিয়ে দিয়েছে মানুষ। রামপ্রসাদী গানের অনুষঙ্গে কবি বলে যান সেই অনুর্বরতার প্রতীকী বিবরণ—"যে-মাঠে সোনা ফলানো যায়, আগাছা জমে ওঠে সেখানে"[৯] (ঐ)। আসলে কবি অনুধাবন করেছেন, বিশ্বযুদ্ধোত্তর এই পৃথিবীতে নির্বিকার ধ্বংস-সাধনে মানুষের যে দক্ষতা—সৃজনী-সংরাগে নেই ততোখানি প্রযত্ন। পরস্পরের প্রতি সহমর্মিতা, অনুকম্পার অভাব মানুষকে নবনির্মাণে অক্ষম করে ফেলেছে, তৈরি করেছে কেবল মানবতাহীন ঊষর এক ক্রমক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার নিরালোক দিবসশর্বরী।

নিতান্ত বোতাম টিপে সহস্র যোজন দূরে কোনো
গৃহস্থের সচ্ছল সংসার
ধ্বংস করা যায়। যায় না কি?
যায় না নিরন্ন প্রতিবেশীর ক্ষুধায়
অন্ন দেওয়া, পিপাসার্ত মাঠে
জল দেওয়া, অন্ধকার ভয়ের আকাশে আলো দেওয়া।
যায় না, যায় না।
কেননা, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল দিতে হলে,
অন্ধকারে আলো দিতে হলে
আরও কিছু দিতে হয়।
প্রেম দিতে হয়।[১০]
('মানব-সংসারে'/ অন্ধকার বারান্দা)

তীব্রভাবে আত্মকেন্দ্রিক, ঐতিহ্যবিচ্যুত, সমাজ ও পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন এই যে যাপনের বিন্যাস—তার সঙ্গে পূর্ববর্তী প্রজন্মের ঐক্যবদ্ধ, পারস্পরিক সহানুভূতিময় যাপনের কোনো মিল পান নি কবি। রক্তে মিশে থাকা পূর্বপুরুষের স্মৃতির কাছে আত্মসমর্পণেও কোনো আলো দেখতে পান না কবি, কারণ "আকাশের, হৃদয়ের যাবতীয় বিখ্যাত নীলিমা/ আপাতত কোনো-এক স্থির অন্ধকারে শুয়ে আছে"[১১] ('মৌলিক নিষাদ'/ঐ)। সময়ের পর্দাজুড়ে কেউ যেন অন্ধকার ছিটিয়ে দিয়ে গেছে—বিচ্ছিন্নতার দুশ্চিকিৎস্য রোগে আক্রান্ত আজ মানুষ। আর প্রাত্যহিকতার অন্তরতম কোষে পৌঁছে গেছে সেই কালিমা—"আমি ভিতরে বাহিরে/ যেদিকে তাকাই, আমি স্বদেশে বিদেশে/ যেখানে তাকাই—শুধু অন্ধকার, শুধু অন্ধকার।"[১২] (ঐ) সময়ের সংজ্ঞা তাই আজ 'নিষ্ঠুর'।

পিতামহ, আমি এক আশ্চর্য সময়ে বেঁচে আছি।
যখন আকাশে আলো নেই,
যখন মাটিতে আলো নেই,
যখন সন্দেহ জাগে, যাবতীয় আলোকিত ইচ্ছার উপরে
রেখেছে নিষ্ঠুর হাত পৃথিবীর মৌলিক নিষাদ—এই ভয়।[১৩] (ঐ)

কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ বা বিশ্বাসের আধারে ধৃত উদ্‌বর্তনের আশা না থাকায় অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি তীব্র ভীতি সৃষ্টি হয় মানুষের মনে—যে ভীতি যাবতীয় জিজীবিষার মূলোচ্ছেদ করে। পঞ্চাশ ও ষাটের উত্তাল দিনগুলিতে একের পর এক আন্দোলনে—খাদ্য আন্দোলন, ট্রামভাড়া বৃদ্ধি-বিরোধী আন্দোলন, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন আন্দোলনে নেমে আসা রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসও স্বাধীনতা-লাভের আপাত-উল্লাসকে বিপন্নতায় রূপান্তরিত করে। কিন্তু এই ভীতির বাতাবরণেও পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি তাদের নিস্তরঙ্গ যাপনের খোলশ ছিঁড়ে বেরোতে পারে না। কবির কলমে ফুটে ওঠে মধ্যবিত্তের যাপনের অন্তঃকরণে নিহিত অকর্মণ্যতার রূপরেখা—

তবু কিছু শান্তি, এই দুর্দিনের মেঘের আড়ালে
সুবর্ণ-সূর্যের ছটা ঝিলিমিলি আশ্বাসে হঠাৎ
ভেসে ওঠে। মনে হয়, এই অন্ধ ভয়ে-ভরা রাত
সমস্ত দুঃস্বপ্ন নিয়ে মুছে যাবে।
... ...
অথচ এ শুধু আশা। বৈশাখের শুভ্র স্বপ্ন যত
প্রত্যহ রক্তাক্ত হবে জানি আমি, ভয়ত্রস্ত প্রাণে
আবার নামবে রাত্রি তা-ও জানি, সবুজ ময়দানে
ছিঁড়ে যাবে ঘাসের জাজিম, তীব্র বেদনার শীতে
হৃদয় হলুদ হবে।...
তবু এই মুহূর্তে অন্তত
স্মৃতির বিবর্ণ ঝাঁপি ভরে রাখি রবীন্দ্রসংগীতে।[১৪]
('সঙ্গী-সংগীত'/ নীলনির্জন)

মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী জানে সময়ের ভিতরকণিকায় নিহিত বিপর্যয়ের স্বরূপ, কিন্তু সে তার মোকাবিলার কোনো উদ্যোগ নেয় না, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রচেষ্টায় কোনো প্রতিবাদে মুখর হয় না সে। কেবল চোখবুজে বিপদের প্রতি বিমুখ হয়ে সাময়িক আনন্দ খুঁজে নেওয়ার চেষ্টাতেই তার দিনানুদৈনিকের কর্মপ্রয়াস সম্পন্ন হয়ে যায়।

কবি নিজেও এই মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণিরই অন্তর্ভুক্ত, তাই তিনি নিজেও অনুভব করেছেন ক্রমশ ঘিরে আসা অন্ধকারের নিদারুণ অস্তিত্বকে। কখনো নিজের চারপাশের বিযুক্তি ও অসংবেদনার কঠিন দেওয়াল বিচূর্ণ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন, আঘাত করেছেন নিষ্ফল প্রয়াসে—"চেনা আলোর বিন্দুগুলি/ হারিয়ে গেল হঠাৎ—/ এখন আমি অন্ধকারে, একা।/ যতই রাত্রি দীর্ণ করি দারুণ আর্তরবে,/ এই নীরন্ধ্র নিকষ কালোর কঠিন অবয়বে/ যতই করি আঘাত, মিলবে না আর,/ মিলবে না তার দেখা"[১৫] ('দেয়াল'/ অন্ধকার বারান্দা)। এই অন্ধকারের স্বরূপ অনুভব করেছেন

তিনি—বুঝেছেন, অন্ধকারের মধ্যে আলোর ইছা লালন করলেও, এ তামসতা তাঁর, তথা তাঁদের শ্রেণিভুক্ত মানুষেরই চেতনাজাত—

যদিও আমারই রক্ত এই অন্ধকারের শরীরে
প্রবাহিত। যদিও আমার সহোদর
এই অন্ধকার।
এই তিক্ত আত্মসুখসর্বস্ব তরল অন্ধকার[১৬]
('অন্ধকার নয়'/ ঐ)

ক্রমশ কবি অনুভব করেন, প্রকৃত বাস্তবে তাঁর অবস্থান নয়, জনবিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি তাঁর চারপাশে গড়ে তুলেছেন আত্মকেন্দ্রিকতার চার-দেয়াল। সমাজবিশ্লিষ্ট হয়ে কবি বস্তুত হারাতে থাকেন তাঁর দৃষ্টিমানতা—"চারদিকে চার-দেয়াল, চোখের দৃষ্টি নিবে আসে,/ শিউরে উঠি অন্ধকারের কঠিন পরিহাসে;"[১৭]('দেয়াল'/ঐ), প্রতিকারে ভেঙে ফেলতে চান 'মায়াবী কপাট', কিন্তু পালাতে পারেন না—"কোথায় পালাব? ধবল ছায়াছায়া ভয়/ নেমে আসে, আর ম্লান চোখ নিয়ে চেয়ে থাকে মন"[১৮]('পূর্বরাগ'/ নীলনির্জন)। এ ভয় আসলে গভীরতায় অন্তর্ভুক্তির ভয়, কারণ কবির যাবতীয় অংশগ্রহণ সবই ভীষণ উপরিতলিক—"আমি তো রয়েছি নিজেকে নিয়েই মুগ্ধ, যাইনি/ কোনোখানে, আমি বাড়াইনি হাত"[১৯](ঐ)। অস্তিত্ববাদী ভাবুকের মতো তিনি কখনো দলবদ্ধতার অন্তর্গত 'সহস্রফণা উপরন্তু একইসঙ্গে এমন বিষাক্ত-মনোরম উল্লাসের'[২০]('আমার ভিতরে কোনো দল নেই'/ আজ সকালে) মূর্তি দেখে গুটিয়ে নিয়েছেন নিজেকে—

সভ্যতার ভিতরে যে খোঁজে
অন্য চরিতার্থতা, সে অন্য পথে যায়।
দলবদ্ধতার ঘটাপটা
দুই পায়ে মাড়িয়ে তাকে একবার নিজের মধ্যে উঁকি
দিয়ে কথা বলতে হয় নিজের ভাষায়,
একবার দাঁড়াতে হয় নিজস্ব ইচ্ছার মুখোমুখি।[২১] (ঐ)

আবার কখনো বা 'পুরনো বিশ্বাসগুলি ধুঁকে মরছে,/ পুরনো ঘরবাড়িগুলি মুহুর্মুহু ধসে পড়ছে"[২২] ('পাগলা ঘন্টি'/ পাগলা ঘন্টি) দেখে একত্র প্রয়াসে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের হাল ফেরানোর জন্য সচেষ্ট হন, কিন্তু নিজের ভিতরে আর খুঁজে পান না উদ্যম। দেখতে থাকেন কবিতা আর প্রত্যাশা থেকে নয়, তৈরি হচ্ছে 'প্রত্যাশার প্রতি নিক্ষিপ্ত বিদ্রুপ' থেকে। তাঁর আত্মবীক্ষণ প্রকাশিত এইভাবে—

এই-যে প্রথম সূর্যের সাড়া, উদাস দুপুর,
বিকেলের মধুমালঞ্চমায়া, রাত্রির থরোথরো শিহরন,
ছায়াছায়া ভয়, ঝরোঝরো-শাখা ঝাউয়ের শিয়রে
বাতাসের ছড়ে টেনে-যাওয়া ম্লান কান্নার সুর,—
বলো, এ কি শুধু নিজেকে লুকিয়ে
শুধু চোখে দেখা দেখে যাব, আমি সকালের মন, দুপুরের মন,
রাত্রির মন খুঁজে দেখবো না? শুধু ফাঁকি দিয়ে
চোখে ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে যাব সব?
তা হলে আমি কি
কেউ নই? আমি সকালের নই, দুপুরের নই,
রাত্রিরও নই? তা হলে, তা হলে
এই যে আকাশে প্রগাঢ় সূর্য সারাদিন জ্বলে,
এই-যে রাত্রে লক্ষ হিরার চোখ-ঝিকিমিকি—
আমি তো এদের চিনি না। তা হলে

আরও কত কাল এভাবে কলম ঠেলতে বলো,
আরও কত কাল সন্ধ্যাসকাল লেখা-লেখা খেলা খেলতে বলো?[২৩]

('পূর্বরাগ'/ নীলনির্জন)

বস্তুত, কবি নিজের দাঁড়াবার জায়গাটি খুঁজে নিতে চাইছেন—পেতে চাইছেন এমন কোনো স্থিরবিন্দু, যেখান থেকে তিনি নিজেকে ও নিজের কবিতাকে সমাজের পক্ষে উপযুক্ত করে তুলতে পারবেন। প্রকৃতি ও মানুষকে তাদের প্রকৃত বাস্তবতায় চিনে, বুঝে, প্রত্যক্ষতায় উপলব্ধি করে 'লেখা-লেখা খেলা'-র পরিবর্তে খাঁটি কবিতা লিখতে চাইছেন এখন কবি। তাই প্রশ্ন উঠছে—"কবিতার অর্থ কী? কবিতা/ বলতে কি এখনও আমি কল্পনালতার ছবি দেখে যাব?"[২৪]('কবিতা কল্পনালতা'/ নক্ষত্রজয়ের জন্য)। এক ধূমল কুয়াশার আড়ালে ব্যক্তিমানুষ পৃথক হয়ে আছে মনে ও মগজে—বাকিদের মতো কবিও 'অচিরে কুয়াশা কাটবে এই নাবালক প্রতীক্ষায়' থাকবেন না আর, বরং বুঝতে চাইবেন এই কুয়াশার স্বরূপ—"কবিতা মানে কি এই কুয়াশার ভিতরে একবার/ বাঘ সিংহ হায়েনা ইত্যাদি/ পশুর দাঁতের শক্তি বুঝে নেওয়া নয়?"[২৫](ঐ) আজ আর কবি 'সাময়িক সমস্ত দৌরাত্ম্য দেখা'-য় নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছেন না, আজ তাঁকে নেমে পড়তেই হবে অ্যাম্ফিথিয়েটারের রিঙের ভিতরে, কেননা—

কল্পনালতার ফুল কুয়াশা কাটলেও কেউ দেখতে পাবে না
কেননা কুয়াশা আজ প্রত্যেকের মগজে ঢুকেছে। তাই
কবিতাকে ভালবেসে, ক্রমাগত ভালবেসে-বেসে
তোমাকে আমাকে আজ অন্তত একবার
ভিতরে-বাহিরে ব্যাপ্ত এই অন্তহীন কুয়াশায়
আলাপে-উৎসুক ধূর্ত বাঘের খাঁচার মধ্যে হেঁটে যেতে হবে।[২৬] (ঐ)

ভয়ের যে কাঁটাতার কবিকে আটকে রেখেছিল চার-দেয়ালের মধ্যে— আজ কবি নিজেই তার সম্মুখীন হয়েছেন, আর দেখেছেন, ভয়ের মূলে ছিল লোভ। তিনি জানেন, "কবি যদি লোভী হয়,/ তা হলে সে কবি নয়,/ তা হলে সে পথের কাঙাল।"[২৭]('কবি যদি'/ ভালোবাসা মন্দবাসা)। তাই সেই লোভকে—কবিখ্যাতির লোভকে, সামাজিক সম্মানলাভের লোভকে, ক্ষমতাসীন হওয়ার লোভকে যেই তিনি পদদলিত করে বলতে পেরেছেন—"কিছুই আমি চাই না,"[২৮]('জোড়া খুন'/ উলঙ্গ রাজা), তখনি ভয়ও তাঁর পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়েছে। হয়তো এইবার তিনি প্রকৃত স্বাধীনতার বোধ অনুভব করতে পারবেন; 'নিয়ন-মণ্ডলে, অন্ধকারে' বন্দী যে প্রৌঢ় পালোয়ানের 'হবি' ছিল 'দিবারাত্রি কবিতা লেখা', অথচ যে অন্ধকারে নিজের মুখ-দেখতে চেয়েও আয়নার সম্মুখীন হওয়ার পরিবর্তে কবিতা-প্রসব করতো, যেখানে থাকতো নিজের প্রতিবিম্ব-দর্শনের চিরন্তন আকুতি—" 'অন্ধকারে কোথায় অশ্রুর/ ধারা বহে যায়।/ কে যেন নিজের মুখ চিরকাল দেখতে চেয়েছে/ নিয়ন-মণ্ডলে, অন্ধকারে!' "[২৯]('নিয়ন -মণ্ডলে, অন্ধকারে'/ নীরক্ত করবী) — হয়তো কবি এবার সেই মিথ্যা বিশ্বাস (mauvaise foi)-এর ফাঁদ থেকে মুক্তি পেয়ে আয়নায় নিজের প্রকৃত স্বরূপ দেখতে পাবেন।

তাই " 'আমি শুধু কবি, দোষ নেই কিছু আর' "[৩০] ('সিনা দ্য পোয়ট'/ জলের জেলখানা থেকে) বলে পালিয়ে বেড়ানো কবিতালেখক-কে নীরেন্দ্রনাথ আর 'কবি' বলতেই রাজি নন—সে কেবল এক 'মিল মেলানো পদ্যকার', আর তার লেখাও নিতান্ত 'ফলাফলহীন'—"বন্যা, প্লাবন, দেশজোড়া আঁধিয়ার,/ কিছুতেই কিছু শেখা/ না তার লক্ষ্য, না তার অভিপ্রেত।/ তাই তাকে দাও ছেড়ে।"[৩১](ঐ) শুধু নিজের নয়, হয়তো কবিতারও প্রকৃত স্বরূপ এখন তাঁর কাছে ধরা দেবে। সে মূর্তি কিন্তু খুব সুশ্রী-সুমধুর নয়—কবিকে স্বর্গলোকে পৌঁছে দিতে পারতো যে 'সুলক্ষণ' শব্দগুলি, তারা হয় এখন 'হাড্ডিসার, রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিড়ি ফোঁকে'[৩২]('নক্ষত্রজয়ের জন্য'/ নক্ষত্রজয়ের জন্য), নইলে লোভের কঠিন আঙুলে আটকে পড়ে 'ইঁদুরের মতো কিচকিচ' করে। বস্তুত, কবি এখন 'শুধুই লোভের ধূর্ত মার্কামারা মুখ ভিন্ন অন্য-কোনো মুখ দেখতে'[৩৩](ঐ) পান না। তাই মেঘের মিনারে পা ঝুলিয়ে জ্যোৎস্নায় কুলকুচো করার মতো শব্দের সন্ধান না পেয়ে কবি এখন খোঁজেন 'বুলেটের মতো একটা শব্দ'— যেটার আঘাত ভেঙে দেবে আত্ম-অহংকারের নকল বুঁদির কেল্লা, আর কবি 'ফাটা কপালের রক্ত মুছে হেসে'[৩৪](ঐ) উঠবেন। অর্থাৎ কবিতা এখন আর গগনবিহারী হয়ে আপনাতে

আপনি মগ্ন থাকবে না—তা হয়ে উঠবে আয়নার বিকল্প, হয়ে উঠবে অস্ত্রের প্রতিস্পর্ধী, হয়ে উঠবে রক্ত-মাংসের মানুষের যাপনের এক অকৃত্রিম অংশ।

তথ্যসূত্র:

১. দাশ, জীবনানন্দ, উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য, ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত, সমগ্র প্রবন্ধ, কলকাতা, প্রতিক্ষণ, জানুয়ারি ২০১৮,পৃ. ৩৮
২. সেন, সমর, বাংলা কবিতা, সব্যসাচী দেব ও সোমেশ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত, সংকলিত সমর সেন, কলকাতা, ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১৩৫৭, পৃ. ৬১
৩. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতা-সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯,পৃ.২৬২
৪. ঐ, পৃ. ২৫৫
৫. ঐ, পৃ. ২৬০-৬১
৬. ঐ, পৃ. ২৪৪
৭. ঐ
৮. ঐ, পৃ. ১১
৯. ঐ
১০. ঐ, পৃ. ৭১
১১. ঐ, পৃ. ৯০
১২. ঐ
১৩. ঐ
১৪. ঐ, পৃ. ১৯
১৫. ঐ, পৃ. ৫১
১৬. ঐ, পৃ. ৯২
১৭. ঐ, পৃ. ৫১
১৮. ঐ, পৃ. ২১
১৯. ঐ
২০. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টাদশ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৮,পৃ. ১৫৩
২১. ঐ
২২. ঐ, পৃ. ১৬০
২৩. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, কবিতা-সমগ্র ১, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৯,পৃ.২১
২৪. চক্রবর্তী, নীরেন্দ্রনাথ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, অষ্টাদশ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০১৮, পৃ. ৯০
২৫. ঐ
২৬. ঐ
২৭. ঐ, পৃ. ২২৮
২৮. ঐ, পৃ. ১২৫
২৯. ঐ, পৃ. ৮৫
৩০. ঐ, পৃ. ২১৩
৩১. ঐ, পৃ. ৯৬
৩২. ঐ
৩৩. ঐ
৩৪. ঐ

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No.944-950
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.088

আশরাফ সিদ্দিকীর লোকসাহিত্যে প্রবাদ: দর্পণে সমাজ জীবন

রাকেশ দেবনাথ, *অতিথি অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়, ত্রিপুরা, ভারত*

Received: 18.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Proverbs are an important branch of folklore that emerge from traditional life. They are the product of human wisdom and long-standing experience. Proverbs are enriched with brevity of expression and the essence of human experience. They encapsulate the deep emotions of rural life as well as the distilled wisdom of long-lived traditions. Proverbs form a highly developed category of folklore, deeply rooted in cultural traditions. They originate from the collective experiences of ordinary people. Over time, communities have created proverbs in harmony with their ways of life. Though proverbs were originally crafted by people of the past, they have now found a place in refined modern literature.

The creation of every proverb is rooted in long-standing social experience and specific events. Rural people may not have scientific knowledge, but they possess deep understanding of nature's moods, storms and rain, tides, trees and plants, rivers and mountains, animals, and their surroundings. They keenly observe human nature, social customs, the struggles of daily life, selfishness, and other aspects of human behaviour. It is from this awareness that proverbs emerge. Proverbs play a significant role even in the smallest family units. Many proverbs have originated based on household relationships and domestic life.

Nearly every country in the world has proverbs. A proverb is a universal art. The structure, meaning, and usage of proverbs are nearly the same everywhere. However, due to geographical and cultural differences, variations exist. That is, similar proverbs take different forms and imagery in different places. Proverbs are a crucial element of folklore, and they remain deeply relevant to contemporary life. In modern times, proverbs appear in various forms of literature, including poetry, novels, essays, newspapers, dramas, speeches, advertisements, and even daily conversations. Proverbs are the shortest form of folklore, yet they are rich in meaning. No matter how brief a proverb is, it carries significant depth. Proverbs are primarily the product of practical human experience rather than mere emotions. They have the ability to express profound meaning in just a few words. They can be compared to tightly crystallized structures – just as crystals are formed through a scientific process, proverbs emerge from the practical knowledge and experiences of society. Within these proverbs, the reflection of society itself can be observed.

Key words: *Folk culture, real-life experiences, historical events, legends, agriculture, water and air, and social customs.*

প্রবাদ শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল বিশেষ কোন উক্তি বা কথন। 'প্র' পূর্বক 'বাদ' (বাদ+অ) হচ্ছে প্রবাদ। অর্থাৎ, যে উক্তি লোক পরম্পরায় জনশ্রুতিমূলক ভাবে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে তাই হল প্রবাদ। প্রবাদ নুড়ি পাথরের মত

সমাজ মানুষে জন্ম নিয়ে জীবন স্রোতের অনেক পথপরিক্রমা করে একটি নিটোল রূপ লাভ করে। এরপর তার আর কোন পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ তা আর ভাঙ্গে না বা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। গাথার কথা বলতে গিয়ে বিখ্যাত লোকবিজ্ঞানী Cecil Sharp যা বলেছিলেন, প্রবাদ সম্বন্ধেও তা সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য:

> "The method of oral transmission is not merely one— during its journey down the ages its individual angles and irregularities are rubbed and smoothed away , just as the pebble on the sea – shore has been rounded by the action of the waves"[১]

প্রবাদের দুটি অর্থ আছে-একটি আক্ষরিক অর্থ (Literary meaning) অপরটি ব্যঞ্জনার্থ (Inner meaning) আক্ষরিক বা বাহ্যিক অর্থে প্রবাদের প্রয়োগ খুব কম। ব্যঞ্জনার্থেই প্রবাদ বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন 'সাপের পাঁচ পা দেখা' বাহ্যিক অর্থে সাপের পাঁচ পা নেই তা অবাস্তব। কিন্তু এর গোড়ার অর্থ হল অবশ্যয় স্পর্ধিত হওয়া। অর্থাৎ প্রবাদে একটি প্রতীক বা রূপক ধর্ম আছে। প্রবাদ সম্বন্ধে **ড.আশরাফ সিদ্দিকী** তার 'লোক-সাহিত্য'গ্রন্থে যে কথাটি বলেছেন:

> "বিগত শতাব্দীতে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলি থেকে অসংখ্য প্রবাদ সংগৃহীত হবার পর আমরা এই সিদ্ধান্তেই এসেছি যে ধাঁধা, ছড়া ইত্যাদির মত প্রবাদ ও তার ব্যবহারও একটি আন্তর্জাতিক রীতি- 'an international art।"[২]

প্রবাদ সম্বন্ধে খ্যাতনামা রাজনীতিবিদ Disraeli বলেছিলেন :

> "They were anterior to books and formed the wisdom of the vulgar and in the earlier ages were the unwritten laws of the morality, they sprang from an unknown source, increased in volumes as they rolled on and were adopted by all as unconsciously as they have sprung into existence."[৩]

বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রবাদের শ্রেণিবিভাগ করলে সমাজ, জীবন ও জগতের সব চিত্রই দেখা যায়। প্রবাদের শরীর তথা দেহ নির্মাণে প্রবাদ নির্মাতা 'জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ' পর্যন্ত এমন কোন বিষয় নেই যা তারা গ্রহণ করেননি। অর্থাৎ উচ্চ থেকে উচ্চ বিষয়ে এবং তুচ্ছ থেকে অতি তুচ্ছ বিষয় পর্যন্ত সবকিছু তার মাথায় চিন্তায় ও কল্পনায় ছাপ ফেলেছে। বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিকগণ তাদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রবাদের শ্রেণিবিভাগ করেছেন।
ড.আশরাফ সিদ্দিকী তার 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে প্রবাদের নিম্নোক্ত শ্রেণিবিভাগ গুলির কথা বলেছেন। যথা:

(১) কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা
(২) কোন ঐতিহাসিক ঘটনা
(৩) কিংবদন্তি
(৪) চাষ-বাস-জল-বায়ু
(৫) সামাজিক রীতিনীতি
(৬) লোকো ওষুধ, ইত্যাদি।

বাংলা লোকসাহিত্যের ধাঁধা, প্রবাদ, ছড়া, গান, লোককথা প্রভৃতি সকল বিভাগেরই যথেষ্ট সমৃদ্ধি কিন্তু তারপরেও লোকসাহিত্য চর্চার প্রথম যুগে বিশেষভাবে প্রবাদ চর্চার প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপিত হতে দেখা গেছে। এর মূল কারণ বাঙালির প্রত্যহিত জীবনে লোকসাহিত্যের অন্তর্গত অপরাপর বিভাগগুলির তুলনায় প্রবাদের ব্যবহারিক গুরুত্বেই রয়েছে নিহিত। প্রবাদের মধ্যে একটি নিত্যতা আছে। প্রবাদ যে বহু বৈচিত্র্যময় তার প্রমাণ রয়েছে। প্রবাদের বিষয় বিভাজনে। প্রবাদের মধ্যেই সমাজের গতি বিধির সবকিছু ধরা পড়ে। পারিবারিক, সামাজিক সম্পর্ক, কৃষি জীবন, শুভ-অশুভ বোধ, খনার বচন, বিবাহ, চিকিৎসা, রাজনীতি, পৌরাণিক প্রসঙ্গ সবকিছুই প্রবাদে প্রকাশ পায়। তবে সব চেয়ে বড় কথা প্রবাদ নারী কণ্ঠে সৃষ্টি, গ্রাম্য নারীরাই এর ধারক ও বাহক।

এখন আমরা আশরাফ সিদ্দিকীর 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে সংকলিত প্রবাদগুলির ব্যাখ্যা করতে পারি:

> "পিঠা বল মিঠা বল ভাতের মত নাই।
> খালা বল ফুফু বল মায়ের মত নাই।।"[৪]

ব্যাখ্যা: পরিবারে নারীর অবস্থান বিবিধ। নারী কখনো মা, কখনো শাশুড়ি, কখনো স্ত্রী, সতীন, কন্যা, পুত্রবধূ, ননদ, বোন, কখনো আবার মাসি পিসি কিংবা খালা ফুপু। নারীর এইসব রূপের শুভ অশুভ দিক, দ্বন্দ্ব কলহ, বিদ্বেষ-হিংসা,

উত্তেজনা, অবসাদ, দৈন্য, সংকীর্ণতা অক্ষমতা, অসহিষ্ণুতা প্রভৃতি প্রবাদে ফুটে উঠে। 'মা' বাঙালির ঘরের প্রধান নারী চরিত্র। তাই মায়ের তুলনায় মাসি পিসি কিংবা খালা ফুফুর সঙ্গে হয় না। একমাত্র 'মা'ই আছেন যে আমাদের নিঃস্বার্থভাবে ভালোবাসেন। চিড়ে মুড়ির সঙ্গে যেমন ভাতের তুলনা হয় না তেমনি পিসি-মাসির সঙ্গেও মায়ের তুলনা হয় না মায়ের এই অতুলনীয় তাই প্রবাদে চিড়ে মুড়ি কিংবা পিঠার সাথে যেমন ভাতের তুলনা হয় না ঠিক তেমনি মাসিক পিসি কিংবা খালা ফুফুর সঙ্গে দরদী মায়ের তুলনা হয় না। মা অতুলনীয়। মায়ের কোন অন্যরূপ সংসারে নেই।

"বাড়ির শোভা বাগ্ বাগিচা ঘরের শোভা ওসারা।
দাঁতের শোভা মাজন মিশি চোখের শোবা ইশারা।।"[৫]

ব্যাখ্যা: সৌন্দর্যতা বুঝাতে এই প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়। এই প্রবাদটি আমাদের গ্রামেও এখনো প্রচলিত আছে। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে বাড়ির শোভা অর্থাৎ সৌন্দর্য ফুলের গাছ বা গাছপালা আর ঘরের শোভা ওসারা। ওসারা কথার অর্থ ঘরের পীরা বা ধাইর। কোন ঘরের পীরা বা ধাইর না থাকলে সেই ঘর দেখতে সুন্দর লাগে না, এই কথাটাই বলা হয়েছে এখানে। প্রবাদটিতে আরো বলা হয়েছে মানুষের দাঁতের সৌন্দর্য মাজন আর চোখের সৌন্দর্য ইসারায় কথা বলা।

"আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ"[৬]

ব্যাখ্যা: হঠাৎ পরিবর্তন অর্থে রূপক এর আশ্রয়ে গ্রামবাংলায় এই প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়। কোন ব্যক্তি যখন অর্থনৈতিকভাবে হঠাৎ করে ফুলে ফেঁপে উঠে তখন ব্যবহৃত হয় এই ধরনের প্রবাদ। অনেক প্রবাদ লোকসমাজ থেকে সাহিত্যে স্থান করে নেয় । আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি ত্রিপুরার কোথাকার অরুণোদয় সাহার 'পদ্মপাতায় জল' উপন্যাসে দিবাকর যখন শরণার্থী শিবিরে ঘর তৈরি করার কাজ শুরু করে অল্প দিনের মধ্যে সরকারের টাকা নয় ছয় করে অনেক টাকার মালিক হয়ে যায় তখন কোথাকার এই প্রবাদটির ব্যবহার করেছেন। এই বিষয়টি নিয়ে একটি প্রচলিত বাংলা লোকগানও আছে।

"সূচ কয় চালনীরে, তোর নিচে কেন ছেঁদা।"[৭]

ব্যাখ্যা: পরনিন্দা বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। মানুষ যখন নিজের অবস্থা ভুলে অন্যকে নিয়ে সমালোচনা করে তখন এই ধরনের প্রবাদ গ্রামবাংলায় ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। সূচের বৈশিষ্ট্য হল তার উপরের অংশ সূচালো এবং নিচের অংশে সুতো আটকানোর জন্য একটি ছিদ্র থাকে। আর চালনীর বৈশিষ্ট্য হল গোলাকার তার সারা দেহে সহস্র ছিদ্র। এখানে সূচেরও ছিদ্র আছে আবার চালনিরও ছিদ্র আছে। এখানে সূচ নিজের গঠন বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে চালনিকে বলছে উপরোক্ত কথাটি। গভীর ভাবে দেখলেই সূচ ও চালনী দুটোই জড়বস্তু। জড়বস্তু কথা বলতে পারে না। তাই এই প্রবাদ বাক্যটি সমাজেরি মানুষের পরনিন্দা বুঝায়।

"তেলা মাথায় তেল দেওয়া"[৮]

ব্যাখ্যা: নিজের দুর্বলতা বা দারিদ্রতা প্রসঙ্গে এই প্রবাদটি বলা হয়। এই প্রবাদটির প্রধান অর্থ দাঁড়ায় এমন, যার যা কিছু আছে তাকে আরো দেওয়া। কিন্তু যার নেই যে জিনিসগুলি তার দরকার সে কিছুই পায় না। তখন সে অভিমানে এই সমস্ত প্রবাদ গুলি উচ্চারণ করে। বলা হয়েছে তেলা মাথায় তেল দেওয়া অর্থাৎ যার মাথায় তেল আছে তার মাথায় আরো তেল দেওয়া। আসলে এখানে তেল দেওয়াটা প্রতীক মাত্র বা রূপক হিসেবে ব্যবহার করেছেন প্রবাদ স্রষ্টা।

"অকালে বাড়ে সকালে মরতে।"[৯]

ব্যাখ্যা: কথায় আছে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়, উপরোক্ত প্রবাদে এই কথাই বোঝানো হয়েছে যে, যে উপযুক্ত সময়ের আগে শঠতা করে সাফল্যের পর সাফল্য পেয়ে অনেক উপরে উঠে যায়, সে ততো তাড়াতাড়িই উচুঁ থেকে আছাড় খেয়ে মাটিতে ঝড়ে পরে। তাই কখনো শঠতা বা প্রবঞ্চনা করে সাফল্য পেতে নেই কারণ সেই সাফল্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় না। অকালে বাড়ে অর্থাৎ সময়ের আগে বেড়ে যাওয়া বা বড় হয়ে যাওয়া সকালে মরতে অর্থাৎ অসময়ে নষ্ট হয়ে যাওয়ার। আলোচ্য প্রবাদটি এসব বোঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়।

"অভাবের স্বভাব নষ্ট
মুখ নষ্ট বরণে।
ঝড়ায় ক্ষেত নষ্ট
শ্রী নষ্ট মারনে।।"[১০]

ব্যাখ্যা: 'অভাবে স্বভাব নষ্ট' অর্থাৎ মানুষ অভাবে পড়লে তার অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে যা কিছু করে বশে। অর্থনৈতিক অভাবে মানুষ চুরির পথ ও বেছে নেই। আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বলতে পারি ১৩৫০ মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে লেখা প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ফ্যান' কবিতার কথা। সেখানে আমরা দেখতে পাই একটু ফ্যানের জন্য মানুষের হাহাকার। একটু খাবারের জন্য মানুষ ডাস্টবিনে কুকুরের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। এই যে মানুষ খাবারের অভাবে তার স্বভাব অর্থাৎ স্বাচ্ছন্দ জীবন যাপন ভুলে গিয়ে ডাস্টবিনে খাবার সংগ্রহ করছে। তাই উপরোক্ত বাক্যের প্রথম চরণে বলা হয়েছে 'অভাবে স্বভাব নষ্ট'। 'মুখ নষ্ট বরণে' আমাদের শরীরের সব থেকে সুন্দর অংশ মুখমণ্ডল। এই মুখমণ্ডলে দেখা দেয় বরণ। যা পরবর্তী সময়ে ভালো হয়ে গেলেও তার কিছু ছাপ বা দাগ রেখে যায়। তার জন্য মানুষের মুখের সৌন্দর্য কমে যায়। তাই বলা হয়েছে 'মুখ নষ্ট বরণ'। ঝড় বৃষ্টির সময় খেতে পাকা ধান থাকলে তা নষ্ট হয়ে যায় কিংবা বন্যা হলে সকল ধরনের শস্যজাতীয় ফসল এবং অন্যান্য ফসল ঝরায় নষ্ট হয়ে যায়। তাই বলা হয়েছে 'ঝড়ায় ক্ষেত নষ্ট'। অতিরিক্ত শাসন করলে যেমন ছেলেমেয়েরা হাতের বাইরে চলে যায় তেমনি ঘরের স্ত্রী কেউ অতিরিক্ত শাসন তথা মারতে নেই। স্ত্রীর প্রতি অতিরিক্ত শাসন দেখিয়ে স্ত্রীকে মারলে স্ত্রী নষ্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ সে স্বামীর কথা গুরুত্ব নাও দিতে পারে। তাই বলা হয়েছে 'স্ত্রী নষ্ট মারনে'

"বিপদে বন্ধুর পরিচয়।"[১২]

ব্যাখ্যা: বন্ধুত্ব সম্পর্কে এই প্রবাদটি বলা হয়। আমাদের সমাজে কত ধরনের মানুষই না আছে। তাদের কারো কারো সাথে আমাদের বন্ধুত্ব হয় কিন্তু প্রকৃত বন্ধু কে? যে বা যারা আমার সুখে-দুখে সব সময় পাশে থাকে তাকে প্রকৃত বন্ধু বা প্রিয় সখা বলা হয়। আর যে তোমার বিপদের দিনে বা দুঃখের দিনে পাশে থাকে না, কোন অজুহাতে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয় সে তোমার প্রকৃত বন্ধু নয়। তাই আলোচ্য প্রবাদে বলা হয়েছে 'বিপদে বন্ধুর পরিচয়।'

"আক্কেলে সকল বন্দী ,জলে বন্দী মাছ।
স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী, সালে বন্দী গাছ।।"[১২]

ব্যাখ্যা: বিবেকবোধ বুঝাতে প্রবাদটি ব্যবহার করা হয়। আমরা সবাই বিবেকের অর্থাৎ আক্কেলের কাছে বন্দী বা বাঁধা। জলে বন্দী থাকে মাছ । মাছ ডাঙ্গায় বাস করতে পারেনা। তাই সে জলে বন্দি। পুরুষ জাতির সাফল্যের মূলে থাকে কোন না কোন নারী সে নারী তার মা, স্ত্রী কিংবা অন্য কেউ। তাই বলা হয়েছে স্ত্রীর কাছে পুরুষ বন্দী। গাছ ছাল ছাড়া বাঁচতে পারেনা গাছের শিকড় থেকে একেবারে মগ ডাল পর্যন্ত সালে অর্থাৎ বাকলে মোড়ানো থাকে। তাই বলা হয়েছে সালে বন্দী গাছ।

"ইচ্ছা আছে যার,
উপায় আছে তার।"[১৩]

ব্যাখ্যা: মনোবল বাড়াতে এ ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে যে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। কোনো ব্যাক্তি যদি মন প্রাণ দিয়ে কোনো জিনিস চায় তাহলে সেই ওই জিনিস টি যে কোনো প্রকারেই সে জিনিসটি পাবেই। কেউ যদি মনে অদম্য ইচ্ছে নিয়ে কোনো কাজ করতে যায়,তাহলে সেই কাজ যতই দুঃসাধ্য হোক না কেনো সে সফল হবেই। তাই সবসময় মনে সৎ ইচ্ছে রাখতেই হয়।

"নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।"[১৪]

ব্যাখ্যা: সম্বলহীনা বোঝাতে এই ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। শুধু যে মামা নেই এই বিষয়টি বুঝাতেই প্রবাদটি ব্যবহৃত হয় এমনটা নয়। অন্যান্য অর্থেও এই প্রবাদটি ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি প্রবাদের একটি বৈশিষ্ট্য। নাই মামা অর্থাৎ যার মামা নেই তার কাছে কানা মামা অর্থাৎ দৃষ্টিহীন মামাই ভাল।

"দুই সতীনের ঘর। খোদায় রক্ষা কর।
আন সতীনে নাড়ে চাড়ে। বোন সতীনে পুড়িয়ে মারে।
অশথ কেটে বসত করি সতীন কেটে আলতা পরি।।"[১৫]

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত প্রবাদটি অনেকটা ছোড়ার মত। প্রবাদটিতে সমাজ ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। প্রবাদটির মধ্যে সমাজের 'সতীন প্রথার' দিকটি ফুটে উঠেছে। সমাজে কিছুকাল পূর্বেও যেই সমস্যাটি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল সেটি ছিল সতীন সমস্যা। ঘরে দুই সতীন থাকলে দুজনের মধ্যেই আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ক থাকতো। কেউ

কারোর ভালো দেখতে পারত না। এইসব সমস্যাগুলির মধ্য থেকেই উপরোক্ত প্রবাদটির সৃষ্টি হয়েছে। আমরা ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যেও ভবানন্দ মজুমদারের দুই দুই স্ত্রী এর কীর্তিকলাপ দেখতে পাই।

"ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।"[১৬]

ব্যাখ্যা: সামাজিক অবস্থান বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ গুলি ব্যবহার করা হয়। এই প্রবাদে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি কাজের সে যে কোন জায়গায় যে কোনো পরিস্থিতিতে কাজ করবে। সে কখনো অজুহাত দেখিয়ে কাজ এড়িয়ে যাবে না। আবার প্রবাদটির ব্যাখ্যা এমনও হতে পারে যার প্রথম জীবন দুঃখের ছিল পরবর্তী জীবন ও দুঃখ কষ্টেরই হয় তখন এই ধরনের প্রবাদগুলি বলা হয়। কোন নারী যখন ছোটবেলায় বাবার বাড়িতে কষ্টে দিন কাটায় এবং পরবর্তী সময়ে স্বামীর ঘরেও কষ্টে দিন কাটাতে হয় তখন সে এই ধরনের প্রবাদ বলে।

"সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস—অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।"[১৭]

ব্যাখ্যা: পারিপার্শ্বিক অবস্থা বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে সৎসঙ্গে অর্থাৎ ভালো মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করলে ভালো মানুষ হওয়া যায় ভালো জায়গায় যাওয়া যায়। অর্থাৎ ভালো জায়গাকে এখানে স্বর্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অসৎ সঙ্গ অর্থাৎ খারাপ মানুষের সঙ্গে চলাফেরা করলে নিজেও খারাপ হয়ে যায়। আর নিজের সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে। বর্তমান ভাবনাগুলি বুঝাতেই এই ধরনের প্রবাদ গুলি ব্যবহার করা হয়।

"ভাবিয়া করিও কাজ করিয়া ভাবিও না।"[১৮]

ব্যাখ্যা: কোনো কাজ করার আগে বা কোন ভুল কাজ করার পর গ্রামবাংলায় এ ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করতে দেখা যায়। এ প্রবাদটি আমাদের গ্রামেও প্রচলিত আছে। আমরা যে কাজটি করব তার সম্পর্কে ভেবে কাজটি করা উচিত, পরবর্তী সময়ে যাতে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে না হয।

"সাপ, শালা, জমিদার। তিন নয় আপনার।"[১৯]

ব্যাখ্যা: সম্পর্ক বুঝাতে এই ধরনের প্রবাদগুলি ব্যবহার করা হয। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে সাপ কোনদিন মানুষের পোষা প্রাণী বা গৃহপালিত প্রাণী হতে পারে না। আর আত্মীয়র মধ্যে শালা কখনো আপন হয় না। জমিদার বা মহাজন তোমার সাথে যতই ভালো ব্যবহার করুক না কেন সে কখনোই তোমার আপন হয় না। অনুরূপ আরেকটি প্রবাদ হলো 'কুটুমের মধ্যে শালা, গয়নার মধ্যে বালা, সাজের মধ্যে মালা, বাসনের মধ্যে থালা।'

"কার আগুনে কেবা মরে আমি জাতে কলু।
মা আমার কি পুণ্যবতী বলছে দে উলু।"[২০]

ব্যাখ্যা: প্রবাদটিতে 'সতীদাহ প্রথার' বিষয়টি স্পষ্ট। এদেশে যখন সতীদাহ প্রথা প্রচলন ছিল তখন কোন এক হতভাগিনী প্রজ্বলিত চিতা-শয্যা থেকে পালিয়ে গেলে নদী পাড়ে জল ভরতে উদ্যাত এক কলুর বউকে অগত্যা নিয়ে চিতায় তুলে দেওয়া হয়। প্রবাদটিতে সেই ইতিহাসের ইঙ্গিত বিদ্যমান।

"মোগল পাঠান হদ্দ হল ফরাসি পড়ে তাঁতী।"[২১]

ব্যাখ্যা: স্পষ্ট মনে হয় প্রবাদটি তুর্কি বিজয়ের পর (১২০৪ খ্রীঃ) কোন এক সময় রচিত হয়। বেশ বুঝা যায় কোন এক তাঁতি ফরাসি পড়তে গিয়েছিল কিন্তু দুঃখের বিষয় তার বিদ্যা বেশি দূর পর্যন্ত অগ্রগতি হয়নি।

"টিপ বুঝে না- টাপ বুঝে না- সেইবা কেমন মেয়ে।
নিম তেতো নিশিন্দা তেতো আরো তেতো খ'র।"[২২]

ব্যাখ্যা: স্পষ্ট তো বুঝা যায় যে প্রবাদটিতে 'সতীন সমস্যার' কথা বলা হয়েছে। যেই ঘরে সতীন আছে সেখানে পান থেকে চুন খসলেই শুরু হয় তুলকালাম। আলোচ্য প্রবাদটিতে নীম, নিসিন্দার তেতোর সঙ্গে সতীনের সাথে ঘর করার অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন।

"পহেলা কুত্তা কুত্তা বোল, দুসরা কুত্তা ঘর ঘর বোলে।
তিসরা কুত্তা জরুকা ভাই, চৌথা কুত্তা ঘরজামাই।
যা ছিল আমানি পান্তা মায়ে ঝিয়ে খেলাম।
ঘরজামাই রামের তরে, ধান শুকোতে দিলাম।।"[২৩]

ব্যাখ্যা: স্পষ্ট বুঝা যায় প্রবাদটিতে ঘরজামাই এর কথা বলা হয়েছে। যে ছেলে ঘর জামাই থাকে তাকে কুকুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে এবং তাকে দিয়ে কাজ করানোর কথাও উঠে এসেছে। প্রবাদটির মাধ্যমে। এই প্রবাদটি ও অনেকটা ছড়ার মত।

"আম খেয়ে খায় পানি, খোদা বলে আমি না জানি।"[২৪]

ব্যাখ্যা: প্রবাদটির শব্দ গঠন দেখে বোঝা যায় প্রবাদটি মুসলিম সমাজে সৃষ্টি। ফলের রাজা আম খেয়ে যে পানি অর্থাৎ জল খায় তার পেটের অসুখ হতে পারে। তাই খোদা বা ভগবান বলছেন আমি না জানি।

"অন্ন বিনা ছন্ন ছাড়া।"[২৫]

ব্যাখ্যা: প্রবাদটিতে অনাহারের দৃশ্য ফুটে ওঠে। অন্ন বিনা অর্থাৎ ভাত ছাড়া মানুষ ছন্নছাড়া অর্থাৎ ছন্দহীনা হয়ে যায়। যার দৃশ্য আমরা ১৩৫০ এর মন্বন্তরের সময়কার বাংলা সাহিত্য গুলিতে দেখতে পাই।

"অন্ন দেখে দেবে ঘি, পাত্র দেখে দেবে ঝি।
যেমন কন্যা রেবতী, তেমন পাত্র গদা হাতী।"[২৬]

ব্যাখ্যা: প্রবাদটিতে পরিস্থিতি সচেতনতার বার্তা রয়েছে। খাবার সময় থালায় অন্ন অর্থাৎ ভাত দেখে ঘি এর পরিমাণ দেওয়া এবং পাত্র অর্থাৎ ছেলে দেখে ঝি বা মেয়ে বিয়ে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

"কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা।
মধ্যে মধ্যে দিচ্ছি বা।
বলগে চাষরে বাঁধতে আল।
আজ না হয় জল হবে কাল।"[২৭]

ব্যাখ্যা: কোদাল ও কুড়ুল দিয়ে কোপালে যে রূপ হয়, যখন মেঘগুলি সেই রূপ ছিন্ন ভিন্ন হয় এবং তখন যদি মাঝে মাঝে হওয়া দেয়, তবে বৃষ্টি আসন্ন বুঝতে হবে, সুতরাং তখনই চাষাদের বৃষ্টির জল ধরার জন্য খেতে আল বেঁধে রাখা উচিৎ।

"মেঘ করে রাতে আর দিনে হয় জল।
তবে জেনো মাঠে যাওয়াই বিফল।"[২৮]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য প্রবাদটিতে বলা হয়েছে যদি রাতে আকাশে মেঘ করে। আর দিনে বৃষ্টি হয়। তাহলে ধানের পুষ্টি তেমন একটা হয় না। তাই প্রবাদ টিতে বলা হয়েছে সে সময়ে মাঠে যাওয়াই বিফল।

"ডাক ছেড়ে বলে রাবণ।
কলা রোবে আসার শ্রাবণ।
তিনশত ঝাড় কলা রুয়ে।
থাক দিহি ঘরে শুয়ে।"[২৯]

ব্যাখ্যা: এই প্রবাদটিও কৃষি বিষয়ক। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে আষাঢ়-শ্রাবণ মাসে কলা গাছ লাগানোর জন্য। তিনশটি ঝাড় কলা গাছ লাগিয়ে গৃহিণীকে ঘরে শুয়ে থাকার কথা বলা হয়েছে। কলা এমন একটি ফল যেই গাছকে কোন কৃত্রিম ঔষধ দিতে হয় না। তাই একবার রোপণ করলেই বারবার ফল দেয়।

"এক ঝিকরে মাছ বেঁধে না, সেই বা কেমন বড়শি।
এক ডাকেতে সাড়া দেয় না, সেই বা কেমন পড়শী।
হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে। পাড়া পড়শী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে।।"[২৮]

ব্যাখ্যা: পাড়াপড়শী সম্পর্কে এই ধরনের প্রবাদটি বলা হয়। আলোচ্য প্রবাদটিতে বলা হয়েছে এক টানে যে বড়শিতে মাছ ওঠে না সে আবার কেমন বড়শি। আবার এক ডাকে যে সাড়া দেয় না সে কেমন পাড়া-প্রতিবেশী। হলুদকে গুঁড়ো করা হয় শিলনোড়ায় আর বউকে জব্দ করতে হয় পিটে। পাড়াপড়শিকে জব্দ করতে হয় চোখে আঙ্গুল দিয়ে।

"বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ হলুদ রোও।
দাবা পাশা ফেলিয়ে থোও।।"[২৯]

ব্যাখ্যা: আলোচ্য প্রবাদটি কৃষি বিষয়ক। প্রবাদটিতে বলা হয়েছে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ দুই মাস হলুদ রোপণ করার জন্য। সে সময়ে দাবা পাশা ইত্যাদি খেলা বাদ দিয়ে মাঠে কাজ করার জন্য বলা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১. সিদ্দিকী, আশরাফ, লোকসাহিত্য, দ্বিতীয় খন্ড, সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা ৭০০০৬৭, পৃষ্ঠা-২৯
২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৫
৩.তদেব, পৃষ্ঠা-২৫
৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২২
৫.তদেব, পৃষ্ঠা-২২
৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬
৮. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-২২
১০.তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
১১.তদেব, পৃষ্ঠা-২৭
১২.তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২৮
১৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
১৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০
২০. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০
২১. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০
২২. তদেব, পৃষ্ঠা-৩১
২৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩
২৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
২৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
২৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
২৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
২৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২
২৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৩২

আকর গ্রন্থ

১. সিদ্দিকী, আশরাফ, লোকসাহিত্য, দ্বিতীয় খন্ড, সারদা প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা ৭০০০৬৭

সহায়ক গ্রন্থ

১. সরকার, পবিত্র, লোক ভাষা লোকসংস্কৃতি, তৃতীয় পরিবর্তিত সংস্করণ, চিরায়ত প্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা ৭০০০৭৩।
২. দাশ, নির্মল, লোকসংস্কৃতি তত্ত্ব পরিক্রমা, অক্ষর পাবলিকেশনস্, জগন্নাথ বাড়ি রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা।
৩. চক্রবর্তী, কুমার বরুণ, বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, পুস্তক বিপন, কলকাতা-৯।
৪. আহমদ, ওয়াকিল, লোককলা প্রবন্ধবলি, দ্বিতীয় প্রকাশ, গতিধারা, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০।
৫. চট্টোপাধ্যায়, তুষার, লোকসাহিত্য পাঠের ভূমিকা, প্রথম প্রকাশ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 951-957
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.089

অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি ও লোকাচার

বিশ্বজিত দেবনাথ, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ওয়াই. বি.এন ইউনিভার্সিটি, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত*

Received: 20.03.2025; Send for Revised: 21.03.2025; Revised Received: 22.03.2025; Accepted: 30.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

One of the hill states of Tripura. Although the state is currently divided into eight districts. Earlier there were four districts. One of them is undivided South Tripura. The folk culture of the Hindu Bengali public life here therein lies their tradition. Starting with the ethos here analysing proverbs and folk song rhymes shows that, it is rich and steeped in tradition.

Keyword: Folk culture, undivided, south Tripura, Ethos, Hindu, proverbs, Vow of Ashwin, flower bishu, Chaitra porab.

অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা বলতে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের গোমতী জেলা ও দক্ষিণ জেলাকে যুগ্মভাবে বলা হচ্ছে। পূর্বে এই উভয় জেলা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ ত্রিপুরার সীমানা ছিল একান্ন পিঠের এক পিঠ ত্রিপুরা সুন্দরী মন্দির তথা উদয়পুর থেকে ধরে কিল্লা-অম্পি-অমরপুর-করবুক-রুপাইছড়ি-সাতচান্দ-ঋষ্যমুখ রাজনগর-কাক রাবন হয়ে আবার উদয়পুর। প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে এই সীমানা তথা দক্ষিণ জেলাকে দুটি জেলায় রূপান্তরিত করা হয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের দ্বারা বিভিন্ন সরকারী পরিষেবা জনগনের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য ২০১১ সালে পূর্ববর্তী দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলাটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, বিলোনিয়া এবং গোমতী জেলা, উদয়পুর গঠিত হয়। দক্ষিণ জেলার মোট ভৌগোলিক এলাকা ১৫১৪.৩২২ বর্গ কিলোমিটার। ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুসারে জেলার মোট জনসংখ্যা ৪,৩০,৪৯৯ জন। এই জেলায় তিনটি মহকুমা, আটটি ব্লক, দুইটি পৌরসভা পরিষদ, একটি নগর পঞ্চায়েত রয়েছে। দক্ষিণ জেলার ২০৪.৪৮৭ কিলোমিটার জুড়ে বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তর্জাতিক সীমানা রয়েছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক এখানে বাস করে। হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-পাহাড়ি এখানে ভাই ভাই। এখানকার মানুষ বাংলা-ককবরক ও বিভিন্ন স্থানীয় ভাষায় কথা বলে। কৃষিকাজ প্রধান পেশা হলেও অন্যান্য পেশার সঙ্গেও যুক্ত রয়েছে। এখানকার বাঙালি হিন্দু জনগণ ভারতবর্ষভূক্ত এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়কালে বাংলা দেশের বৃহত্তর নোয়াখালী জেলা লক্ষীপুর ফেনীথে কেউ উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল। এরাই বর্তমানে দক্ষিণ ত্রিপুরায় আদিবাসী ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীকে ছাপিয়ে প্রধান জাতিগোষ্ঠী হয়ে উঠেছে। এই বৃহত্তর হিন্দু জনগোষ্ঠীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে থাকা লোক সংস্কৃতির প্রাসঙ্গিকতাই আমার আলোচনার বিষয়।

উদয়পুরে সদর দপ্তরের সাথে গোমতী জেলাটি ২০১২ সালে নির্মিত হয়েছিল। অক্টোবর ২০১২ সালে প্রশাসনিক পুনগঠনের অংশ হিসেবে উদয়পুর, অমরপুর এবং নবগঠিত করবুক মহকুমা সহ গোমতী জেলাটি পূর্ব-দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার একটি বিচ্ছিন্ন সংস্করণ হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। এই গোমতী জেলার জনজীবন গোমতী নদীর জলস্রোতের মতোই প্রবহমান। এখানে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করলে ও অধিকাংশ হিন্দু।

এখানকার পাহাড়িরা ও হিন্দু ধর্মীয় আচার আচরণকে আকড়ে ধরে জীবন অতিবাহিত করেন। বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী লোক-সংস্কৃতির নিদর্শন এখানকার প্রতিদিন কার জীবনের অঙ্গ। পাহাড়ের আকা বাকা অরণ্বেষ্টিত গোমতী জেলার প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠতে পারে লোক-সংস্কৃতি কেন্দ্রিক জীবন যাত্রাটি। সেই লক্ষ্য মাত্রাকে সামনে রেখেই আমার ত্রিপুরা রাজ্যের আমার গোমতী জেলা ও পাশ্ববর্তী দক্ষিণ জেলা তথা অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার বাঙালি হিন্দু জনজীবনের লোক-সংস্কৃতি চর্চায় এগিয়ে আসা।

লোকাচার:

লোক-সংস্কৃতি ও লোকাচার হল লোকসাধারণের কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যগত কিছু আচার। এগুলো তারা বংশ পরম্পরায় পালন করে থাকে। অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার জনজীবনে প্রচলিত রয়েছে এমন বহু লোকাচার যেগুলোর মধ্যে দিয়ে তাদের বিশ্বাস-আশ্বাস, জীবন ধারণ ও ধরন ফুটে উঠে। যেমন আশ্বিনের ব্রত। কথিত আছে স্বর্গের চিকিৎসকদ্বয় অশ্বিনীদ্বয়। সবার ধারণা এদের ব্রত রোগ ব্যধি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে। এই ব্রত আশ্বিন মাসের শেষ তারিখে হয়। মজার ব্যাপার এই ব্রতের প্রসাদ খাওয়া হয় পরদিন তথা কার্তিক মাসের পহেলা তারিখে । তাই প্রচলিত রয়েছে:

"আশ্বিনে রান্দে কার্তিকে খায়,
যে বড় মাগে সেই বর পায়।"[১]

আশ্বিনের শেষ তারিখে দুইটি মাটির পাতিলে আতব চাল বা খাসা চালের ভাত রান্না করা হয়। রাতের বেলায় সেই পাতিল দুটোতে জল দিয়ে তুলসী পাতা দেওয়া হয়। পরিবারের সকলের বিঘত মেপে পাটের শোলা ভাতের মধ্যে সমানভাবে পুঁতে দেওয়া হয়। তাতে নাকি ভাগ্য পরীক্ষা করা হয়। কার্তিক মাসের প্রথম দিন সকালবেলায় যার যারটা পরীক্ষা করে দেখে। যার শোলা যত বেশি লম্বা হয় তারা নাকি তত ভাগ্যবান। তারপর গুড় কলা নারকেল দুধ মেখে সে ভাত সবাই খায়। পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয়-স্বজনদেরকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। কেউ কেউ পরিবারের সদস্য যতজন তত পাতিল রান্না করেন।

আরেকটি লোকাচার হলফুল বিশু বা হার বিহু। ফুল বিহু হল চৈত্র পর্বের বা চৈত্র সংক্রান্তির আগের দিন। দক্ষিণ জেলার হিন্দু বাঙালি এই দিন পর্বের জন্য খুব ভোরবেলা থেকেই ফুলতলা শুরু করে। এই ফুল তোলার দিনকে ফুল বিশু বলে। ফুল তুলে নানা রকমের মালা গাথা হয়। সন্ধ্যার সময় শুকনো বিষকাডালি বিশল্যকরণী ঔষধি পোড়ানো হয়। সাথে সাথে উচ্চস্বরে বলে ওঠে জাগোরে জাগো, টাকা পয়সা ধনসম্পদ সুখ-শান্তি জাগো। আবার গোমতী জেলাতে দেখা যায় এখানকার হিন্দু বাঙালিরা সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়ার আগেই লতাপাতার শাকের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে। চোখের সামনে যেসব লতা পাতা দেখতে পায় বিশেষ করে নিমপাতা, ডিমাই শাকের মিশ্রণে তৈরি করেন এক ধরনের রস। বাড়ির ছোট থেকে বড় সকলকেই মুখ ধোয়ার আগেই এই রস খেতে দেন। তাদের বিশ্বাস এটা খেলে আগামী বছরটি তারা বিনা রোগে কাটাতে পারবেন।

এমনই আরেকটি লোকাচারের কথা আমরা উল্লেখ করতে পারি। সেটি হল চৈত্রপরব বা চৈত্র সংক্রান্তি। চৈত্র মাসের শেষ দিন পরব সংক্রান্তি। এই দিনটি বাঙালিদের বড় খুশির দিন। এই দিনটির জন্য অনেকদিন আগে থেকেই চিড়া খৈ মুড়ি ও নাড়ু ঘরে ঘরে বানিয়ে রাখা হয়। পরের দিন সকাল বেলা বাড়ির চারদিকে চার টুকরি মাটি ও উঠানের মাঝখানে এক টুকরি মাটি দেওয়া হয়। মহিলারা উঠুন বাড়ি পরিষ্কার করে গোবর দিয়ে বাড়ির দরজায় বাদ দিয়ে ফুল সাজিয়ে দেয়। তারা সবাই স্নান সেরে নতুন পোশাক পড়েন। যদি নতুন পোশাক কিনতে না পারে তবে সবাই একটি করে নতুন তাগা বা কাইতন পড়ে নেয়। পুরুষেরা কাঁচি দিয়ে বাড়ির বাইরে মাটি একে খই ছিটিয়ে দাগ কাটে। একে বলে হত্তর কাটা। মানে শত্রুকে কাটা। মহিলারা ফুল ও ফুলের মালা দিয়ে সব ঘরের দরজা সাজিয়ে নেয়। তারপর বসে পাচন তৈরি করার কাজে লেগে যায়। নানা রকমের সবজি কাটে। কাঁঠালের ইচর, পাচন ঝোল রান্না করে। তাদের বিশ্বাস এই পাচন ঝুল খেলে নানা রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তারপর সবাই মিলে মুড়ি নাড়ু খেয়ে পাচন খায়। চৈত্র সংক্রান্তির দিন বিকাল বেলায় সবাই যায় ঐতিহ্যবাহী চড়ক মেলায়। এমন আরো অনেক ব্রত বিশ্বাস লোকাচার প্রচলিত রয়েছে অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার হিন্দু বাঙালি জনজীবনে।

প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচন:

অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার হিন্দু বাঙালি জনজীবনে প্রচলিত প্রবাদ-প্রবচনের মধ্যে দিয়ে তাদের সংস্কৃতির দিকটি প্রতীকায়িত হয়ে উঠেছে। ত্রিপুরার জনজীবনে প্রবাদ প্রবচনের স্বতন্ত্রতা রয়েছে। অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রবাদ-প্রবচনে বাংলাদেশের অঞ্চল ভিত্তিক প্রভাব থাকলেও রয়েছে নিজস্ব আঞ্চলিক ভাষার প্রবাদ। এই প্রবাদের মাধ্যমে এখানকার হিন্দু বাঙালি জাতির সভ্যতা ও সমাজ সংস্কৃতি আবিষ্কার করা যায়। কারণ প্রবাদ হল লোক পরম্পরাগত বিশেষ এক ধরনের উক্তি যা এখানকার মানুষ নিত্য নৈমিত্তিক চলার পথে ব্যবহার করে। দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতায় অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরায় হিন্দু বাঙালি জনজীবনে প্রচলিত প্রবাদ প্রবচন গুলি সম্মৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। নিম্নে সেরকম কিছু প্রবাদ প্রবচনের তাৎপর্য তুলে ধরলাম।

"আইল্লার আল জাইল্লার জাল"[২]

আইল্লা এখানকার আঞ্চলিক শব্দ। আইল্লা শব্দের অর্থ যিনি হাল চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করেন অথাৎ চাষি বা কৃষক। আর আল শব্দের অর্থ এখানে হাল বা লাঙল যেটির সাহায্যে জমিকে চাষের উপযোগী করা হয়। জাইল্লা হলেন তিনি যিনি জাল ফেলে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। জাল বলতে মাছ ধরার জন্য ব্যবহৃত জাল টি। তাৎপর্য হল এই যে, কৃষকের কাছে লাঙ্গল যেমন মূল্যবান তেমনি জেলের কাছে তার জালটিও মূল্যবান।

"নাইচ্তো ন জাইনলে উডান বেঁয়া"[৩]

নাইচ্তো বলতে এখানে নাচ। ন জাইনলে অথাৎ নাচতে না জানলে। উডান হল উঠোন বা আঙ্গিনা। বেঁয়া হল বাঁকা। অর্থাৎ নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা। তাৎপর্য হল নিজের অক্ষমতা প্রকাশ না করে কোনো বাহানা ধরে বা অপরকে দোষারোপ করে নিজের অসফলতার জন্য অন্যের ঘারে দোষ চাপিয়ে নিজের সম্মান বজায় রাখতে চায়।

"পোলা নষ্ট আঁডে-বউ নষ্ট ঘাটে"[৪]

পোলা হল ছেলে সন্তান। আঁডে বলতে হাটে বা বাজারে, পুরুষ মানুষ রা যেখানে বেশি যায় । ঘাটে হল পুকুর বা নদীর ঘাট, যেখানে মেয়ে মানুষ বেশি যায়। তাৎপর্য হল ছেলেমেয়ে সবসময় বাজারে গেলে কিছু না কিছু খারাপের সম্ভাবনা থাকে। কারন এখানে হরেক রকমের মানুষ আসে। ঠিক সেরকম পুকুর বা নদীর ঘাটে নানা মহিলা আসে। সেখানে বউদের কেউ না কেউ তাকে কুপরামর্শ দিতে পারে।

"মজা মাইচ্ছে গুজা হুতে
টর হাইবা আডাই নিতে"[৫]

এখানে মজা মাইচ্ছে বলতে মজা মেরেছে বা জিতেছে। গুজা হল কুব্জ যার কোমড় ভাঙা। হুতে বলতে পুত্রে। টের হাইবা ব্যবহৃত হল বুঝতে পারা অর্থে। আডাই নিতে অর্থাৎ হারিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়। তাৎপর্য হল কাউকে ঠকাতে গেলে নিজেও ঠকতে হয়। চতুর ঘটকের দ্বারা এক কুব্জ ছেলের সাথে এক পঙ্গু মেয়ের বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। তখন ছেলের বাবা বলছে তার কুব্জ ছেলে জিতে গেছে। তখন মেয়ের বাবা বলে বুঝতে পারবে হাটিয়ে নিয়ে যাওয়ার সময়। এমন বহু প্রবাদ প্রবচনের সন্ধান পাওয়া যায় অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার হিন্দু বাঙালি জনজীবনে যেগুলোর মধ্য দিয়ে তাদের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক তথা সার্বিক চেতনার বহিপ্রকাশ ঘটেছে।

ব্যবহৃত লোকশিল্প:

অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার লোকসমাজ নিজেদের সংস্কৃতি অনুযায়ী পেশা আর আমোদ-প্রমোদের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যবহার করে বহু লোকশিল্প। এই শিল্পগুলির মধ্যে দিয়ে তাদের আচার-আচরণ, বিশ্বাস-সংস্কার, রুচিবোধ সব কিছুরই পরিচয় পাওয়া যায়। লোকশিল্পের সৃজন ভাবনায় সম্পৃক্ত থাকে লোক লোকধর্মও। লোক শিল্প লোক বৃত্তের অন্তর্গত। লোক শিল্পীরা আনুষ্ঠানিক ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত নয়। তারা সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঐতিহ্যকে অনুসরণ করে সর্বোপরি অশিক্ষিত পটুত্ব দিয়েই তাদের এই সৃষ্টি প্রয়াস চালিয়ে যায়। জন্ম বিবাহ মৃত্যু সহ সব অনুষ্ঠানে লোক শিল্পীদের সৃজন প্রতিভার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। লোক শিল্প ঐতিহ্যগত ভাবে প্রজন্ম পরম্পরায় হস্তান্তরিত হয়।

আলপনা:

বছরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা আলপনা শিল্পের ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায়। এর উপকরণ নিতান্ত সামান্য। চাল গুড়ি করে পিটালি তৈরি করে, তাতে ন্যাকড়া ভিজিয়ে শুধুমাত্র আঙুলের টানে আঁকা হয় আলপনা। চালগুড়ি ছাড়াও

পোড়া তুষ, ডালের গুঁড়ো আলপনা আঁকার কাজে ব্যবহৃত হয়। আলপনা হল ব্রতের আনুষ্ঠানিক অলংকরণ। আলপনাতে শিল্পীর শিল্পী কথার প্রকাশ যেমন রয়েছে, তেমনি এখানে চাওয়া-পাওয়ার ইচ্ছা ও প্রকাশ পায়। অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে তাদের বাড়ি ঘরের দেওয়ালেও আলপনা দেখতে পাওয়া যায়। এমনকি কিছু গ্রাম রয়েছে যেগুলো ছবি গ্রাম, শিল্পী গ্রাম, দেবী গ্রাম নামে নামাঙ্কিত হয়েছে শুধু মাত্র এই আলপনা শিল্পের কারণে।

কাঠ খোদাই শিল্প:

পার্বত্য রাজ্য ত্রিপুরা। এখানে লোক জীবনে কাঠ খোদাই শিল্পের অনেক কদর রয়েছে। বাড়ির আসবাব পত্র থেকে শুরু করে দেব মন্দির পর্যন্ত কাঠ এখানকার অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের ত্রিপুরা যখন স্বাধীন রাজ্য ছিল সেই রাজ আমল থেকে এখানে কাঠ শিল্পের প্রচলন চলে এসেছে। এখনো সেই কাঠ শিল্পের কদর রয়েছে সমান মাত্রায়। বাড়ি ঘরের দরজা জানালা থেকে শুরু করে প্রতিদিনের ব্যবহার সামগ্রিতে কাঠশিল্প এখানকার লোকজীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করে রেখেছে।

কুষ্ঠী নির্মাণ:

এখানকার লোক সাধারণের লোক বিশ্বাসের ক্ষেত্রে কুষ্ঠী নির্মাণ একটি গুরুত্ব পূর্ণ লোকশিল্প। শিশুর জন্মের পর তার ভাগ্যে কি রয়েছে তা জেনে নেবার আগ্রহ বা কৌতূহল থাকে সকল মানুষের। হস্তরেখা গণনা করে ভাগ্য জানার ইচ্ছাতো সারা পৃথিবীর মানুষের মধ্যে রয়েছে। লিখিত ভাবে ভাগ্য জানার জন্য কুষ্টি তৈরি করানো হয়। ভাগ্যকে জেনে নেওয়া মানুষের জীবনে গ্রহ নক্ষত্র কতখানি প্রভাব ফেলছে তা জানার জন্য অতীতেও আগ্রহ ছিল। যা আমরা জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে জানি। যারা জ্যোতিষবিদ্যা জানেন তাদেরকে দিয়েই এখানকার লোক সাধারণরা তৈরি করেন কুষ্ঠী। এই কুষ্ঠীর মধ্যে আঁকা থাকে একটি ভাগ্যচক্র। কুষ্ঠীপত্রটিতে যে নকশা সেই নকশা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা সম্পন্ন লোকশিল্প বলে মনে করতে পারি।

পাখাশিল্প:

ত্রিপুরা রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চলে বিভিন্ন জিনিসের সাহায্যে তৈরি পাখা ব্যবহার দেখা যায়। যেমন তাল পাতার পাখা, বাঁশের পাখা, সুপারি আশের পাখা, গমের ডাঁটার পাখা, সুতার পাখা, উলের পাখা, ময়ূরের পালকের পাখা। এককালে বিশালাকৃতির তাল পাতার পাখায় রাজা জমিদাররা হাওয়া খেতেন। তবে ছোট আকারের তাল পাতার পাখাই বহুল ব্যবহৃত হয়। এগুলোকে হাত পাখা বলে। আগে বৃহদাকৃতির তাল পাতাটিকে হাত পাখার আকারে ছাটাই করে নেওয়া হয়। তারপর সেটিকে জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। ভিজিয়ে রাখার ফলে এটি নরম হয়। একটি পাতা দিয়ে দুটি পাখা হয়। পাখার উপযোগী করে পাতা এবং ডাটা ছেটে নেওয়া হয়। তাল পাতার উভয় পিঠে গোল করে বেতের বেষ্টনী দিয়ে সুতা দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। পাখাটির দুই পিঠে নকশা ও আঁকা হয়। ফলে এটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়। পাখাটির চারদিকে কাপড়ের ঝালু লাগানো হয়। আবার রংতুলির সাহায্যে ভাজ পাখাতে ছবি ও আঁকা হয়। বাঁশের বেত দিয়ে তৈরি নকশাযুক্ত পাখা আকারে চারকোণ বিশিষ্ট হয়। বাঁশ থেকে বেত তৈরির উপর পাখা সৌন্দর্য অনেকখানি নির্ভর করে। বেত তোলা হয় কচিবাঁশ আর পাতলা দায়ের সাহায্যে তারপর আড়াআড়ি রাখা বেতের এমন ভাবে ভাঁজতোলা হয় যাতে একধরনের নকশা ফুটে ওঠে। বেতের শেষপ্রান্ত মোরে দেওয়া হয় বা কেটে ফেলা হয়। আবার গোলাকার বাঁশ চতুষ্কোণে ভিন্ন ধরনের বেত দিয়ে মাথা মুড়ে দেওয়া হয়। একপ্রান্তে একটি হাত যুক্ত করা হয়। হাতলটি মোলায়েম ও নানা কারুকার্য থাকে। তবে এমন করে বানানো হয় যে একটি চোঙার মাঝখান দিয়ে সেটির তলটিকে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়। চোঙা ধরে ঘোড়ালেই পাখাটি ঘুরবে আর শীতল বাতাস প্রদান করবে।

সুপারি আশের পাখাটি ও খুব গুরুত্বপূর্ণ এখানকার জনজীবনে। সুপারি গাছের খোল জলে ভিজিয়ে রেখে নরম করা হয়। তারপর তা থেকে আঁশ তোলা হয়। কাজটি খুব কষ্ট সাধ্য। আশ বের করার পর সেটির উপর সুতার কাজ করে পাখা তৈরি করা হয়। সুপারির আশের উপর কখনো কখনো রঙের প্রলেপ দেওয়া হয় আবার কখনো রং দিয়ে নানা লতা পাতা বা ছবি আঁকা হয়। গম কাটা হয়ে গেলে শুকনো ডাটা গুলো সংগ্রহ করা হয়। সেগুলো পরিষ্কার করে নেওয়া হয়। এই ডাঁটাগুলোকে সলার মত করে নেওয়া হয়। সেগুলো সুতো দিয়ে মোটামুটি ভাবে গেঁথে নিয়ে গমের

ডাটার পাখা তৈরি করা হয়। সুতা দিয়ে বাউল দিয়ে নির্মিত নানা নকশায় সজ্জিত হয় সুতার পাখা বাউলের পাখা। ময়ূরের পালক পরপর সাজিয়ে তৈরি করা হয় ময়ূরের পালকের পাখা।

লোক বিশ্বাস বোধ:

লোকসংস্কৃতির আলোচনায় মনঃসমীক্ষণ তত্ত্বের গুরুত্ব রয়েছে। লোক সাধারণের মনস্তাত্ত্বিকতার দিকটি লোকাচার ও লোক সংস্কার বিশ্বাসের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কারণ মানুষের চিন্তাধারায় যে সংস্কারগুলি আজও প্রবহমান তার মূলে মননের সমর্থন রয়েছে। এই লোকবিশ্বাস এক কথায় লোকমানুষের সামাজিক বিজ্ঞান। দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে এগুলি লোকসমাজের আইন হয়ে উঠেছে। পূর্বপুরুষ থেকেই এগুলি লালিত হয়ে আসছে। এই অলিখিত আইন বা নিয়ম লোকমানুষরা অস্বীকার বা বিরোধিতা করতে চায় না। যদিও আধুনিক প্রযুক্তি ও নাগরিক সংস্কৃতির কারণে ক্রমশ লোক বিশ্বাস সংস্কার গুলি কোনঠাসা হয়ে আসছে। কিন্তু এটা অস্বীকারের উপায় নেই যে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিটি পর্যায় বিভিন্ন লোক বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে এবং আজও হচ্ছে। লোক বিশ্বাস গুলির অভ্যন্তরে কখনো কখনো বৈজ্ঞানিক যুক্তিও অনুধাবিত হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ক্ষুদ্র রাজ্য ত্রিপুরা। এখানকার প্রাত্যহিক জীবনে নানা লোক বিশ্বাসের দ্বারা লোক সাধারণরা নিজেদের পরিচালিত করে। উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বহু বিশ্বাস ও সংস্কার বহন করে নিয়ে চলছে। নিম্নে সেরকমই কিছু লোকবিশ্বাস ও সংস্কার তুলে ধরা হলো:

ভোজন বিষয়ক লোক বিশ্বাস:

১) "খাওয়ার সময় পাত নড়লে অমঙ্গল হয়"। জীবনে কোন কিছুর স্থায়িত্ব থাকে না। মন সবসময় চঞ্চলময় থাকে। নির্দিষ্ট একটি কাজে মনোনিবেশ সম্ভব হয়ে ওঠে না। লক্ষ্যের অভিমুখে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য স্থির থাকে না। বৈজ্ঞানিক যুক্তি আবিষ্কার করলে দাঁড়ায় খাওয়ার ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, নানা শারীরিক সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।
২) অন্ধকারে কোনো খাবার খেতে নেই।
৩) অমাবস্যার দিন আমিষ খাবার খাওয়া নিষেধ।
৪) অম্বুবাচীর সময় আম ও দুধ খেতে হয়।
৫) আমের পোকা খাওয়া ভালো।
৬) আশার পঞ্চমীতে ঢেঁড়স খেতে নেই।

বিবাহ বিষয়ক লোকাচার:

১) আশীর্বাদের পর থেকে বিবাহ পর্যন্ত শারীরিক কাঁটা চিরা অমঙ্গল।
২) দধিমঙ্গল হয়ে গেলে খালি পায়ে হাঁটা চলা এবং একা চলা অমঙ্গল।
৩) বিবাহের দিন সড়া দিয়ে যত জল মাপা হয় ততই নাকি বৈবাহিক জীবন সুখের হয়।
৪) পাশা খেলার সময় করি নড়ার শব্দ হলে সংসারে ঝগড়াঝাটি বেশি হয়।
৫) বিবাহের পরের দিন কাল রাত্রিতে স্বামী স্ত্রী পরস্পরের মুখ দেখলে অমঙ্গল হয়।
৬) বিবাহের পরের দিন স্বামীর ঘরে যাওয়ার আগে স্ত্রীর ভাই গিয়ে সেই ঘরের চালে বেতের বাঁধ দিতে হয়। তাতে নাকি বোনের উপর ভাইয়ের নিরাপত্তা থাকে।
৭) বিবাহের দিন বউয়ের প্রস্রাব ভেজানো সলতে পুড়িয়ে কালি তুলে সেই কালি বরের কপালে ফোঁটা দিলে বর বউয়ের কথা মত চলে।

দৈনন্দিনের লোক বিশ্বাস:

১) এক ডাক দেওয়া কিংবা এক ডাকে উত্তর দেওয়া অমঙ্গল।
২) ব্যাঙের সঙ্গে ব্যাঙের বিয়ে দিলে বৃষ্টি হয়।
৩) একমাত্র কন্যার মাথায় চালনি দিয়ে তার উপর জল ঢাললে বৃষ্টি হয়।
৪) ঝড় বৃষ্টির সময় এক শ্বাসে ঘরের কোনায় দা দিয়ে কোপ মারলে ঝড় বৃষ্টি থেমে যায়।

৫) বৃষ্টির সময় বসার পিড়ি উল্টিয়ে বাইরে ফেললে বৃষ্টি বন্ধ হয়।
৬) রাতের বেলায় ঘরের নোংরা বাইরে ফেলতে নেই।
৭) আত্মীয়ের বাড়িতে উচ্ছে করলা নিয়ে গেলে সম্পর্ক নষ্ট হয়। লংকা দিলে সম্পর্ক জ্বালাময় হয়।
৮) নতুন সম্পর্ক তৈরি সময় টক জাতীয় খাবার খেলে সম্পর্কের মাধুর্য থাকে না।
৯) আমের পোকা বা পিঁপড়ে খেলে সাঁতার শেখা যায়।
১০) একবার খেলে জলে পড়ে মৃত্যু হয়।

ইত্যাদি বহু বিশ্বাস সংস্কার অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার লোক জনজীবনে বয়ে আসছে।

লোকগান:

অবিভক্ত দক্ষিণ ত্রিপুরার জনজীবনে প্রচলিত গানগুলিকে এককথায় বলা যায় নারীদের নিজস্ব সম্পদ। নানা লোকাচারের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই গানগুলি গীতহয়। বিশেষ করে এখানকার বিবাহের গানগুলি বেশ আকর্ষণীয়। এগুলোকে যথার্থ অর্থে মেয়েলি গান বলা যায়। এসব সংগীত যতখানিনা কোন সংগীত রচয়িতা কর্তৃক রচিত তার থেকেও বেশি হল এসব গান একেবারেই নিজেদের রচনা। এগুলোকে সমাজের দর্পণও বলা যায়। নারীরা তাদের আনন্দ-বেদনা, দেশাচার-লোকাচার, সামাজিকরীতি-নীতি ঐতিহ্যগত নানান দিকগুলোকে গানের সাহায্যে ব্যক্ত করে। গানগুলোর উপস্থাপনায় কোন কৃত্রিমতা নেই। অত্যন্ত সহজ সরলভাবে গানগুলো পরিবেশিত হয়। গ্রামীণ নারীরা তাদের স্বাভাবিক কণ্ঠে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে আন্তরিকতার সঙ্গে গানগুলি পরিবেশন করেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো গানগুলিতে পারিবারিক বন্ধনের উপরেই বেশি জোর দেওয়া হয়। এসব গানের অধিকাংশই অলিখিত। ঐতিহ্য পরম্পরায় বেঁচে থাকে গানগুলো। তাই এগুলোকে বলা যায় সমষ্টিগত সামাজিক সৃষ্টি। গানগুলোতে সমষ্টি মননের চেতনা অনুভূতির প্রকাশ ঘটে। বিবাহের গান ছাড়াও ব্রতের গান অন্যান্য পূজার গান মেয়েলি গান এখানে শুনতে পাওয়ার যায়। বিভিন্ন ধরনের গান আমরা এখানে শুনতে পাই সংস্কারমূলকগান, বিবাহ বিষয়ক গান,জামাই আগমনের গান, পূর্বরাগের গান, বধু জীবনের গান, সুখ-দুঃখের গান, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের গানসহ বহুগান এখানকার লোকসাধারনের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। যেমন কন্যা বিদায়কালীন একটি গান:

"মঙ্গল ঘট ও সারিসারি শুভ যাত্রা হরগৌরী
যাইত গৌরী কৈলাশ ভুবন গো মেনকা য়ে কান্দে।
ঘরে আছে পঞ্চবধূ তারা রইল সরমধু,
দিলা আনি য়া গৌরীর ও হাতে
অনেক দূরে কৈলাস পুরী ক্ষুধায় আকুল গৌরী
যাইতো গৌরী শ্বশুরের ও দেশে-
শশুরের দেশে গিয়া শশুরকে প্রণাম করিয়া
শাশুড়ি য়ে কোলে লইলা।"[৬]

তথ্যসূত্র:

১. তথ্যদাতা- নাম: শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা বালা পাল, বয়স:৭৫, লিঙ্গ-মহিলা, পেশা: গৃহিণী, ঠিকানা: উদয়পুর, গোয়ালগা, গোমতী ত্রিপুর, সংগ্রহের তারিখ-০৪/০৬/২০২৩
২. তথ্যদাতা- নাম: মতিলাল দেবনাথ, বয়স:৭২, লিঙ্গ- পুরুষ, পেশা: শ্রমিক, ঠিকানা: বিলোনিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা, সংগ্রহের তারিখ-০২/০৮/২০২৩
৩.তথ্যদাতা- নাম: রাখাল দাস, বয়স:৬২, লিঙ্গ- পুরুষ, পেশা: শ্রমিক, ঠিকানা: শিলাছরি, করবুক, গোমতী ত্রিপুরা, সংগ্রহের তারিখ-০৭/১১/২০২৩
৪. তথ্যদাতা- নাম: শংকর রবিদাস, বয়স: ৬৭, লিঙ্গ- পুরুষ, পেশা: শ্রমিক, ঠিকানা: মহারানী, উদয়পুর, গোমতী ত্রিপুরা, সংগ্রহের তারিখ-১২/১২/২০২৩
৫. তথ্যদাতা- নাম: মল্লিকা দে, বয়স:৭৯, লিঙ্গ- মহিলা, পেশা: গৃহিণী, ঠিকানা: অমরপুর, রাঙ্গামাটি, গোমতী ত্রিপুর, সংগ্রহের তারিখ-২১/১২/২০২৩

৬.তথ্যদাতা- নাম: স্বপন বর্মন, বয়স: ৬৭, লিঙ্গ- পুরুষ, পেশা: শ্রমিক, ঠিকানা: শান্তিরবাজার , দক্ষিণ ত্রিপুরা, সংগ্রহের তারিখ-০৯/০২/২০২৪

গ্রন্থপঞ্জী:

(১) দাশ, ড. নির্মল, লোকসংস্কৃতি প্রবন্ধ মালা, স্রোত প্রকাশনা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭ খ্রি:।
(২) চক্রবর্তী, ড. দুলাল চন্দ্র, দক্ষিণ ত্রিপুরার লোকসাহিত্য ও ভাষা, নিউ পুথি ঘর, প্রথম প্রকাশ ২০১৫ খ্রি:।
(৩) সরকার, রঘুনাথ, ত্রিপুরার আদিবাসী লোককথা, ত্রিপুরা বাণী, প্রথম প্রকাশ:২০০৬ খ্রি:
(৪) দেবনাথ, হরিহর, লোকসংস্কৃতি ফেনী থেকে গোমতী, বই বাড়ি, প্রথম প্রকাশ ২০১৫খ্রি:।
(৫) দাস, জহর লাল, ত্রিপুরার লোকসংস্কৃতি বিষয়ক ও অন্যান্য প্রবন্ধ, জ্ঞান বীক্ষণ, প্রথম প্রকাশ: ২০১৭ খ্রি:।

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 958-964
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.090

গ্রন্থচিত্রে অনন্য: দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ‘ঠাকুরমার ঝুলি’

ড. কাজল গাঙ্গুলী, *সহকারী অধ্যাপক, চাপড়া বাঙ্গালঝি মহাবিদ্যালয়, নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2025; Send for Revised: 21.03.2025; Revised Received: 25.03.2025; Accepted: 28.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

By illustration, we generally understand the type of a picture drawn following a text. The writer expresses the thoughts of the mind in language, words are his medium. In the other ways the painter visualizes that thought in paint, brush, and line movement. Literature and painting are two mediums of art, they are different in nature, and their expression is also unique. Despite being two different temperaments, they often take refuge in each other and become fellow travelers in illustrated books. In this way, we witness the close proximity of the two art forms in an illustrated book. The connection between book illustrations and children's literature is inseparable and very close. This interdependent activity of reading books and looking at pictures began in the early 19th century. The printing of books according to the influence and style of European illustration gradually became a habit. In 1907, ‘Thakumar Jhuli’ was published by Bhattacharya & Sons at the initiative of Dinesh Chandra Sen. Dakshinaranjan himself never studied painting. Self-taught, Dakshinaranjan was skilled in pencil sketches and woodcuts. He used to draw the illustrations for his books himself. The book has a total of 84 images, both large and small. There is a three-color image on the frontispiece. Below the images, there are references to the sentences or sometimes phrases of the story based on the images. The book 'Thakumar Jhuli' is still appreciated in every Bengali household even after a century due to the combined artistic qualities of the story and the images.

গ্রন্থচিত্র (Illustration) বলতে আমরা সাধারণভাবে সেই ধরনের ছবিকে বুঝি যা সেই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অন্বিষ্ট। অর্থাৎ কোনও লেখার অনুসরণে আঁকা ছবি। সাহিত্যিকের কাজ মনের ভাবকে ভাষায় রূপদান, শব্দ তার মাধ্যম, চিত্রকর সেই ভাবেরই দৃশ্যায়ন ঘটান রং-তুলিতে, রেখার চলনে। গ্রন্থচিত্রী সাহিত্যকে আশ্রয় করে ছবি আঁকেন, উদ্দিষ্ট সাহিত্যই তাঁর মনোলোকে সৃষ্টির প্রাথমিক উৎস। এই উৎসের সন্ধান পান তিনি একজন সহৃদয় পাঠক হিসেবে। সেইদিক থেকে দেখতে গেলে সাহিত্য গ্রন্থরূপ পাওয়ার আগেই পৌঁছে যায় অন্য এক ‘শিল্পী’ পাঠকের দরবারে। যেখানে শিল্পী শুধুমাত্র সাহিত্যের রসাস্বাদনই করেন না, পাশাপাশি তাঁর মনোজগতে চলে নবসৃষ্টির জন্য এক অন্বেষণ। একদিকে গ্রন্থপাঠ অন্যদিকে সেই পাঠকে দৃশ্যায়িত করার জন্য রসদ সংগ্রহ— শিল্পীমনের যুগপৎ সক্রিয় চলনে সাহিত্য সচিত্র হয়ে ওঠে। এইভাবে দুটি শিল্পমাধ্যম কাছাকাছি আসে এবং পরস্পরের পোষকতা করে।

সাহিত্য ও গ্রন্থচিত্র:

সাহিত্য ও চিত্রকলা— শিল্পকলার দুই মাধ্যম, এরা স্বভাবে ভিন্ন, প্রকাশরীতিও স্বতন্ত্র। দুই ভিন্ন মেজাজের হয়েও অনেকসময় তারা পরস্পরকে আশ্রয় করে একটি সচিত্র গ্রন্থে সহযাত্রিক হয়ে ওঠে। সাহিত্যকে বিষয় হিসেবে গ্রহণ করে চিত্রকর যেমন নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ ঘটান, অন্যদিকে একটি ছবি কখনও কখনও লেখকের কাছে প্রেরণার মূর্তরূপ হয়ে দেখা দেয়। এইভাবে একটি সচিত্র গ্রন্থের মধ্যে আমরা দুই শিল্পরূপের নিবিড় সান্নিধ্য প্রত্যক্ষ করি।

সাহিত্যের মূলগত ভাবকে গ্রন্থচিত্রী আরেক রূপ দেন। গ্রন্থচিত্র কখনোই সাহিত্যের পরিপূরক নয়, রচনার ফাঁক পূরণ করা এর কাজও নয়। একটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থচিত্র বরং লেখাকে ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। গ্রন্থচিত্র সাহিত্যের অনুসারী হয়েও প্রকাশে স্বাধীন। সাহিত্যের সমগ্রতা গ্রন্থচিত্রে সম্পূর্ণ প্রকাশ পাবে এমন দাবিও অসঙ্গত। কারণ লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিল্পী ছবির ভাব এবং কাঠামোটি গড়ে তোলেন ঠিকই কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর একটা দায়বদ্ধতা থাকে সমান্তরালভাবে শিল্পরস সৃষ্টি করার যাতে লেখাটির একটি নান্দনিক দৃশ্যকল্প বা ভিস্যুয়াল তৈরি করে পাঠকের কাছে লেখাটির আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা যায়। রচনার ভাবটিকে ছবির মাধ্যমে রূপ দিয়ে গ্রন্থচিত্রী পাঠককে এক নতুন রসলোকের সন্ধান দেন। জার্মান লেখক টমাস মান Death in Venice-এর Illustrator উলফগং বর্ণকে তাঁর গ্রন্থচিত্র সম্পর্কে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন:

> "It has given me great pleasure to study your graphic fantasies on my story Death in Venice. For the writer it is flattering and moving experience to have a product of his mind taken up, reproduced, celebrated, glorified by an art that appeals more directly to the senses— graphic art or the theatre, say. In this case, however your illustration seems in fact to have produced a spiritualization of the subject, or at any rate a strong emphasis on and summoning up of its spiritual elements— which surely is the happiest thing that can be said about an illustrative work or a theatrical performance... what I like best about your lithographs is that they remove the novella entirely from the naturalistic sphere, purging it of pathological and sensational elements and leaving only the poetic quality."[১]

এক শিল্পের অন্য শিল্পমাধ্যমে রূপান্তর, যা প্রাথমিক মাধ্যমটিকে গৌরবান্বিত করে, পাঠকের অনুভূতির আরও কাছাকাছি পৌঁছে দেয়— মানের কাছে এ এক অনন্য অভিজ্ঞতা। শুধু তাই নয় বর্ণের ছবিগুলি এক্ষেত্রে যা ঘটিয়েছে তাকে বলা যায়— 'Spiritualsation of the subjects'। টমাস মান তাঁর লেখা এই চিঠিটিতে গ্রন্থচিত্রের এক অসীম সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত দিলেন। এই চিঠিতেই শিল্পী বর্ণ সম্পর্কে লিখলেন— 'But since you, the artist, hit on the secret behind my words...'। গ্রন্থচিত্র বিষয়গত দিক থেকে সাহিত্যে একটি অন্যমাত্রা যোগ করে। পাঠকমনে সাহিত্য আরও সংবেদী হয়ে উঠতে পারে গ্রন্থচিত্র সহযোগে। এরকমই একটি চিঠির সন্ধান পাওয়া যায়, রবীন্দ্রনাথ লিখছেন নন্দলাল বসুকে:

> "তুমি আমাকে যে ছাগলের ছবি পাঠিয়েছ এ উর্বশীর সহোদর ভাই নয় কিন্তু এর বাসা অমরাবতীতে। এর থেকে প্রমাণ হয়, আর্টে সুন্দর হবার জন্য সুন্দর হবার কোন দরকারই হয় না। আর্টের কাজ মন টানা মন ভোলানো নয়।"[২]

রবীন্দ্রনাথ যখন এই চিঠি লিখছেন তখন তিনি নন্দলালের বেশ কিছু পোস্টকার্ডের উপর আঁকা ছবি অবলম্বনে 'ছড়ার ছবি' রচনায় মগ্ন। এখানে লক্ষ্য করার বিষয়, উদ্ধৃত চিঠি দুটি লিখছেন দুজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক, যাঁদের লিখছেন তাঁরা বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। দুটি চিঠিতেই ছবি সম্পর্কে তাঁদের মহত্তর ধারণা প্রকাশিত। শুধুমাত্র চিঠি দুটির প্রেক্ষাপট ভিন্ন। প্রথমটিতে সাহিত্য অবলম্বনে আঁকা হয়েছে ছবি, দ্বিতীয়টিতে ছবির রূপলোক থেকে মূর্ত হয়ে উঠেছে সাহিত্য। দেখা যাচ্ছে, দুটি শিল্পমাধ্যম স্বভাবে স্বতন্ত্র হয়েও এক থেকে অন্যে তাদের ভাব সঞ্চারিত করে দেয় অনায়াসে। ভাবের এই চলাচল অবাধ এবং তা পরিপূর্ণতারই দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে লেখক ও শিল্পীকে।

গ্রন্থচিত্রণের প্রকৃত উদ্দেশ্য শুধুমাত্র একটি পৃষ্ঠাকে শোভিত করা নয়, তাকে হতে হবে লেখকের বিষয়-অন্বিষ্ট, এমনটাই মনে করতেন জার্মান মহাকবি গ্যেটে। তাঁর মতে 'The artist must think out to the end the poet's idea.'[৩]

বিষয়-সম্পৃক্ত হয়েও গ্রন্থচিত্রকে হয়ে উঠতে হয় বিষয়াতিরিক্ত। তার আবেদন পাঠকের দৃষ্টিগ্রাহ্যবোধ ও বোধির কাছে। অন্বিষ্ট বিষয়ের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে অন্য এক রেখ্যভাষা নির্মাণের উপরই তার সার্থকতা নির্ভর করে। একটি উচ্চমানের গ্রন্থচিত্রণ কখনোই কবিতা বা গল্পের যে কাহিনি তার চিত্রানুবাদ নয়, অতিরিক্ত কিছু ব্যঞ্জনা সে যোগ করে। শিল্পী একটি সাহিত্যগ্রন্থকে চিত্রায়িত করে তোলার সময় নিরাসক্ত থাকেন। তাঁর দায়বদ্ধতা একদিকে যেমন থাকে সাহিত্যের ভাবের প্রতি অন্যদিকে তাঁর মন ক্রিয়াশীল থাকে নিজ শিল্পসৃষ্টির প্রতি। গ্রন্থচিত্রণের মাধ্যমে তিনি নিজের শিল্পীসত্তার প্রকাশ করেন ঠিকই, কিন্তু কখনোই লেখককে ছাপিয়ে নিজেকে বড়ো করে দেখানোর প্রতিযোগিতায় অংশ নেন না। যেমনটা দেখা যায় মধ্যযুগীয় গ্রন্থগুলিতে, ঐস্লামিক সংস্কৃতিতে গ্রন্থচিত্রণ এতই উচ্চমানের যে সেখানে লেখকের সৃষ্টি হয়ে পড়েছে গৌণ। আবার গ্রন্থচিত্রী নিছক অলংকরণও করে তুলতে চান না তার গ্রন্থচিত্রণকে। গ্রন্থচিত্রণেও প্রকাশ পাবে তাঁর শিল্পিত মনের নান্দনিকবোধ। উচ্চমানের গ্রন্থচিত্রণে থাকে লেখার সঙ্গে আঁকার এক ভারসাম্য। একটি লেখায় কবি বা লেখক গড়ে তোলেন যে শ্রব্যপ্রতিমা, শিল্পী তাঁর রঙে ও রেখায় তাকে রূপান্তরিত করেন দৃশ্যপ্রতিমায়। লেখার অন্তলীন যে ভাবগত নির্যাস, তা শিল্পীকে উদ্দীপিত করে দৃশ্যপ্রতিমা সৃষ্টিতে। যে দৃশ্যপ্রতিমা লেখার ভাব সাপেক্ষ হয়েও স্বাধীন সত্তা বিশিষ্ট। লেখক ও শিল্পী সৃষ্ট দুই প্রতিমার স্বাধীন ক্ষেত্র থেকে তাদের যে পারস্পরিক আদানপ্রদান ও টানাপোড়েন তাতেই সৃষ্টি হয় এক সমন্বিত শিল্পপ্রতিমার রূপ। এই সমন্বিত প্রতিমা সৃষ্টিই আধুনিক গ্রন্থচিত্রণের মূলকথা।

গ্রন্থচিত্র যখন শিশুকল্পনার দোসর:

শিশুসাহিত্যে গ্রন্থচিত্রণের আদৌ কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা— এ প্রশ্ন উঠলে প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা চলে, শিশুসাহিত্য এমন এক বিষয় যেখানে ছবি ছাড়া বইয়ের শিশুমনে কোনো স্থান নেই। এ প্রসঙ্গে লুইস ক্যারলের 'Alice's Adventure in Wonderland' গল্পের শুরুটা মনে পড়ে। একদিন অ্যালিস নদীর পাড়ে তার বোনের সঙ্গে অলস সময় কাটাচ্ছিল। তার পাশে বসা বোনের হাতে খোলা একটি বইয়ের পৃষ্ঠায় সে উঁকি দেয়। কিন্তু সেই বইয়ে কোনও ছবি না থাকায় হতাশ অ্যালিস মনে মনে ভাবে: "and what is the use of a book without pictures…?" অ্যালিসের মতো সব কালের সব দেশের শিশুমন কল্পনাবিলাসী। শিশুমনের কল্পনা ডানা মেলতে চায় লেখার পাশাপাশি বইয়ের ছবিকে সঙ্গী করে। লেখকের পক্ষে শিশুমন জয় করা অনেক সহজ হয়ে যায় যদি তার লেখাটি হয় সচিত্র। রূপকথার গল্পে তেপান্তরের মাঠ, দৈত্যদানোর চেহারা, রাজপ্রাসাদ, রাজারানি, রাজপুত্রের পোশাক— এসব কেমন দেখতে? তাদের মনের মধ্যে ভিড় করে আসা এরকম অজস্র প্রশ্নের উত্তর খোঁজে শিশুরা কথা-সংলগ্ন ছবির কাছে। এ প্রসঙ্গে শিশুসাহিত্যের বিশিষ্ট গ্রন্থচিত্রী কৃষ্ণেন্দু চাকীর উপলব্ধি:

> "ছোটদের ছোট ভেবে নিশ্চিন্ত হওয়ার আগে মনে রাখা ভাল তাদের মত কঠোর সমালোচক কিন্তু খুব কমই হয়।… তাদের কোনও ছবি ভালো লাগলে সে থেকে তারা ঠিক কী ধরনের আনন্দ পাচ্ছে সেটা গুছিয়ে বলার মত দক্ষতা তাদের থাকে না, তাই ছোটদের উপভোগের জগতটা সবসময়ই কিছুটা রহস্যময়।"[৪]

বাংলা শিশুসাহিত্যের রত্নভান্ডার অনেক বিশিষ্ট শিল্পীদের হাতে রঞ্জিত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল। তাই শিশুসাহিত্যের সঙ্গে গ্রন্থচিত্রের যোগ অবিচ্ছেদ্য ও অত্যন্ত নিবিড়।

গ্রন্থচিত্রে স্বদেশিয়ানা:

বইপড়ার পাশাপাশি ছবি দেখা, এই পরস্পর নির্ভর ক্রিয়াকর্মের শুরু উনিশ শতকের প্রথম দিক থেকেই। গোটা উনিশশতক জুড়েই তাই নানা ধরনের বইয়ে কাঠখোদাই, ধাতুখোদাই, লিথোগ্রাফ প্রভৃতি মাধ্যমে মুদ্রিত হতে থাকে অজস্র সব ছবি। ইউরোপীয় চিত্রাদর্শের প্রভাব ও রীতি মেনে বই ছাপানো ক্রমশ একটা কেতা হয়ে উঠতে থাকে। গ্রন্থচিত্রের করণকৌশল ও বিষয় অভিমুখ ইউরোপীয় চিন্তাচেতনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে দেখা যায়। বাংলার গ্রন্থচিত্রকরদের কাছে উনিশ শতকের শেষের কয়েকটি দশক বেশ বিভ্রান্তির। এই

সময় বাংলা ভাষায় চিত্রিত গ্রন্থগুলি ইউরোপীয় গ্রন্থসজ্জাকে অন্ধের মতো অনুসরণ করে চলছিল। গ্রন্থচিত্রকর কৃষ্ণেন্দু চাকীর ভাষায়:

> "বইয়ের অলংকরণ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে তখনো চলে আসছিল ইউরোপের বহু ব্যবহৃত জরাজীর্ণ মধ্যযুগীয় সব নকশা। যেগুলো বাংলা বইয়ে ব্যবহার করার না আছে কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ না আছে বাংলার মাটি বা বাঙালির সঙ্গে সেগুলোর কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক।"[৫]

বিশ শতকের শুরু থেকেই বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থচিত্রে ইউরোপীয় প্রভাব মুক্তির একটা চেষ্টা শুরু হয় জোর কদমে। উপেন্দ্রকিশোরের হাফটোন ব্লকের ছবি কিংবা যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সচিত্র বইগুলিতে বাংলার নিজস্ব চরিত্র রূপ পেতে শুরু করে ও সেই সব ছবি বাঙালি সংস্কৃতির চিহ্নবহ হয়ে ওঠে। এঁদের হাত ধরে বাংলা গ্রন্থচিত্রের স্বতন্ত্র পথ অন্বেষণের একটা চেষ্টা শুরু হয, তাতে যোগ্য সঙ্গত দেন দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনের উৎসাহ ও প্রেরণায় মাঠে ঘাটে ছড়িয়ে থাকা রূপকথাগুলি সংগ্রহের কাজে আত্মনিয়োগ করেন দক্ষিণারঞ্জন। তিনি এই গল্পগুলি সংগ্রহ করেছিলেন তৎকালীন বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে। দক্ষিণারঞ্জনের লেখনীর গুণে এই সংগৃহীত গল্পগুলি হয়ে ওঠে শিশু মনোরঞ্জক। গ্রাম বাংলার পল্লীজীবনে দৈনদিন অভাব অনটনের মধ্যে এই গল্পগুলি ছিল দুঃখমোচনের একমাত্র বীজমন্ত্র। বাস্তবে যা অধরা, রূপকথার কল্পিত জগতে অনায়াসে তার নাগাল পাওয়া যায়, শ্রোতা ও বক্তার মানসিক দৈন্য কিছুটা হলেও পূরণ হয়। স্বপ্নে সাধ মেটে। ক্লান্তিকর একঘঁয়ে দিনযাপনের মধ্যে রূপকথাগুলি হয়ে ওঠে ইচ্ছাপূরণের চাবিকাঠি। গল্পের পরিণামে দুর্বলের জয় ঘোষিত হতে দেখা যায়। বাস্তব আর কল্পনার ভেদরেখা মুছে গিয়ে কথন ও শ্রবণের পারস্পরিক ক্রিয়ায় কথক আর শ্রোতা— দুজনের মনের মধ্যেই জন্ম নেয় এমন এক অসম্ভবের রাজ্য যেখানে সব সম্ভব। এ এক সব পেয়েছির দেশ। সেখানে মৃত্যুকেও তুচ্ছ জ্ঞান করতে ভয় পায় না রাজপুত্র। নিত্যদিনের হতাশা কাটিয়ে অসহায় জীবন সেখানে স্পর্ধায় মাথা তুলে দাঁড়ায়।

'ঠাকুমার ঝুলি' সচিত্র রূপকথা:

১৯০৭ সালে দীনেশচন্দ্র সেনের উদ্যোগে ভট্টাচার্য্য এন্ড সন্স থেকে প্রকাশিত হয় 'ঠাকুরমার ঝুলি'। ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ এ কাজের প্রশংসা করে লেখেন, "ঠাকুরমার ঝুলিটির মত এত বড় স্বদেশী জিনিস আমাদের দেশে আর কি আছে ?" দক্ষিণারঞ্জন শুধু রূপকথাগুলি সংগ্রহ করেই তার নটে গাছটি মুড়োতে দেন নি। সেগুলির শিল্পিত পরিবেশনে পাশাপাশি জুড়ে দিয়েছিলেন নিজের হাতে আঁকা সব ছবি। দক্ষিণারঞ্জন নিজে চিত্রবিদ্যা শিক্ষাগ্রহণ করেননি কোনদিন। স্বশিক্ষিত দক্ষিণারঞ্জন পেন্সিল স্কেচে দক্ষ ছিলেন। পাশাপাশি কাঠের শিল্পকর্মে ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। নিজের বইয়ের ছবি তিনি নিজেই আঁকতেন। এরপর ছাপার প্রয়োজনে সেই সব ছবি কাঠখোদাইয়ের জন্য তিনি এনগ্রেভারদের সাহায্য নিতেন। 'ঠাকুমার ঝুলি'র আখ্যাপত্রে সেইসময়ের প্রসিদ্ধ খোদাইশিল্পীদের নাম উল্লেখ আছে। তাঁরা হলেন প্রিয়গোপাল দাস, অরবিন্দ দাস, কুঞ্জবিহারী পাল, হেমচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়। এঁরা প্রত্যেকেই খোদাইশিল্পী হিসেবে স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। বইটিতে ছোটবড় মিলিয়ে মোট ৮৪টি ছবি আছে। মুখপত্রে আছে তিন রঙের একটি রঙিন ছবি। আছে ছবিগুলির নীচে ছবি-আশ্রিত গল্পের বাক্য বা কখনো বাক্যাংশের উল্লেখ।

'ঠাকুমার ঝুলি'র ছবিগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর কাঠখোদাই চিত্রিত। ছবিগুলির মধ্যে বাঙালিয়ানার স্পর্শ আছে। আছে লৌকিক সহজ সরল ভাষা ও ভাবের অনবদ্য চিত্ররূপ। আখ্যান অনুসারী একরঙা ছবিগুলির কারণে গল্পগুলির পাঠযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয় না। চৌকো ফ্রেমবন্দি ছবিগুলি গল্পকথার বিশেষ অংশকে দৃশ্যায়িত করে তোলে। সহজ ভাষা ও নির্ভার ছবির যুগপৎ চলনে সক্রিয় গল্পপাঠ দ্রুত এগিয়ে চলে। এই ছবিগুলি ছোটদের পড়ার আনন্দকে বাড়িয়ে তোলে, কল্পনাকে খানিক উস্কে দেয়। গল্পের পরিপূরক

ছবিগুলির বিশেষত্ব এই, দক্ষিণারঞ্জনের আঁকা রাক্ষস খোক্ষসের ছবিগুলি মোটেই বীভৎস নয়, শিশুদের তারা ভয় দেখায় না বরং যেন হাসির খোরাক জোগায়। হিউমারধর্মী ছবিগুলি গল্পপাঠে অন্য মাত্রা যোগ করে। 'ঠাকুমার ঝুলি'র ছবিগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর কাঠখোদাই চিত্রিত। ছবিগুলির মধ্যে বাঙালিয়ানার স্পর্শ আছে। আছে লৌকিক সহজ সরল ভাষা ও ভাবের অনবদ্য চিত্ররূপ। আখ্যান অনুসারী একরঙা ছবিগুলির কারণে গল্পগুলির পাঠযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয় না। চৌকো ফ্রেমবন্দি ছবিগুলি গল্পকথার বিশেষ অংশকে দৃশ্যায়িত করে তোলে।

'নীলকমল আর লালকমল' গল্পে ছবিতে রাক্ষসদের লোমশ চেহারা 'বাঁপ রেঁ— নাঁ জাঁনি সেঁ কিঁ রেঁ' (চিত্র ১) দেখলেই হাসি পায়। শিশুদের ভয় দেখানো তাঁর উদ্দেশ্য নয়, এই ছবিগুলির মাধ্যমে তিনি সরলমতি শিশুদের হাসাতেই চেয়েছিলেন। গ্রন্থকারের নিবেদন-এ তিনি লিখেছেন সেকথা: "অবশেষে বসিয়া বসিয়া ছবিগুলি আঁকিয়াছি। যাঁদের কাছে দিতেছি তাহারা ছবি দেখিয়া হাসিলে, জানিলাম, আঁকা ঠিক হইয়াছে।" এই ছবিগুলির মধ্য দিয়ে হাস্যরস সৃষ্টিই ছিল তাঁর মূল উদ্দেশ্য। ছবিতে তরোয়াল হাতে রাক্ষস হত্যা আছে কিন্তু রক্তপাত নেই। এসব ছবি হিংসার নয়। "সকলের বড় খোক্কসটা নীলকমলের হাতে পড়িয়া যেন গিরগিটির ছা!" এই বর্ণনায় যেমন নিষ্ঠুরতা নেই, প্রাসঙ্গিক ছবিতেও (চিত্র ২) তেমনি কোনও ক্রূরতা নেই। শুধু আছে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলার নির্মল আনন্দ।

'চ্যাং-ব্যাং'-পর্বের মুখপাতের ছবিটিতে আজগুবি কল্পনা ও এলোমেলো ভাবনার এক আশ্চর্য সমাবেশ। "কোথায় এত থলের ভিতর চিঁচিঁমিঁচিঁ রব?—/ চ্যাং-ব্যাং-এর বাসার মাঝে লুকিয়ে ছিল সব।" (চিত্র ৩) শিয়ালপন্ডিত, বুড়ো বামুন-বাম্নী, কাঠুরে বউ, কামার বুড়ো— এদের নিয়ে অভাবিত গল্পকথার এক মায়াবী জগত। 'শিয়াল পন্ডিত' গল্পে শিয়ালের পাঠশালায় পড়ে কুমিরের সাতটি ছেলে। অভিভাবক কুমির টোপর মাথায় দিয়ে চলেছে ছেলেদের বিদ্যাবুদ্ধির খোঁজ নিতে। এই মুহূর্তের ছবিটি (চিত্র ৪) বেশ মজাদার। চ্যাং-ব্যাং-এর ছবিগুলির উদ্ভট মেজাজে পরবর্তীকালে সুকুমারের 'অসম্ভবের ছন্দ'- এর ছায়া, গ্রন্থচিত্রের অনিবার্য ভবিষ্যৎ যেন!

'কিরণমালা' গল্পে দুই দাদা অরুণ আর বরুণকে উদ্ধারের জন্য কিরণমালা মায়া পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। "যায়,-- যায়,-- কিরণমালা আগুনের মত উঠে, বাতাসের আগে ছুটে; কে দেখে, কে না-দেখে! দিনরাত্রি, পাহাড় জঙ্গল, রোদ বান সকল লুটাপুটি গেল; ঝড় থমকাইয়া বিদ্যুৎ চমকাইয়া তের রাত্রি তেত্রিশ দিনে কিরণমালা পাহাড়ে গিয়ে উঠিলেন। অমনি চারিদিক দিয়া দৈত্য, দানা, বাঘ, ভালুক, হাতী, সিংহ, মোষ, ভূত পেত্নীতে আসিয়া কিরণমালাকে ঘিরিয়া ধরিল।" অপ্রাকৃত মায়াপাহাড়ের বর্ণনা শুধু ভাষায় নয় তার ছবিও দক্ষিণারঞ্জন এঁকেছেন পৃষ্ঠা জুড়ে। "পায়ের নীচে কত পাহাড় টলে গেল, কত পাথর গলে গেল।" এই ছবিটিতে (চিত্র ৫) হাতে তলোয়ার, আত্মপ্রত্যয়ে দীপ্ত মুখে কিরণমালা নির্ভয় এগিয়ে চলেছে শত বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে। কিরণমালা রাজকন্যা, এই গল্পের নায়ক। বীরত্বে রাজপুত্রদের চেয়ে কোন অংশে সে কম নয়। সোনাঝারি থেকে জল ছিটিয়ে দিতেই পাথরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে শত শত যুগের রাজপুত্ররা। তাদের সে মুক্ত করে। রাজপুত্ররা জীবন ফিরে পেয়ে কিরণমালাকে প্রণাম করে, 'সাত যুগের ধন্য বীর'। এই দ্বিতীয় ছবিটিতে (চিত্র ৬) কিরণমালার মুখে স্নেহের ভাব লক্ষণীয়। এখন আর সে শুধু অরুণ-বরুণ-এর বোন নয়, সে একইসঙ্গে বীরাঙ্গনা আবার জীবনদাত্রী। মা-ঠাকুমার মুখে রূপকথার গল্প শুনতে শুনতে শিশুর দু চোখে ঘুম নেমে আসে। শিশুর ঘুমের দেশ অবচেতনের স্বপ্নপুরী। কল্পরাজ্যে তার তখন অবাধ আনন্দভ্রমণ। ঘুমিয়ে পড়া খোকার ছবি 'আমসন্দেশ'-এর মুখপাতে (চিত্র ৭)। ছবিটির রেখার টানটোন অত্যন্ত নিখুঁত, উচ্চমানের কাঠখোদাইয়ের নিদর্শন। ঠাকুমার ঝুলির ছবিগুলির বিষয়ে উচ্ছ্বসিত ভাব প্রকাশ করে কমলকুমার মজুমদার লিখেছেন:

> "ঠাকুরমার ঝুলি যে একটি কত বড় কাজ, যে ইহা একটি সভ্যতা! কি ভাবে ইহারে পাদ্য অর্ঘ্য দেওয়া যায় তাহা আমাদের ভাবনাতে আসে না, আমরা শুধু আদেখিল্লার মতন ইহা স্পর্শ করি, আমরা চেতনা ফিরিয়া পাই। বঙ্গীয় ধারার প্রতি নিষ্ঠার ঐ শেষ নিদর্শন!... ছবির দিক দিয়া যাহা আমার মনে ধরিয়াছে, যেমন, এখানে অভিব্যক্তি, বাঙলা, প্রগ্রেসিভ যাত্রা নহে, আদত যাত্রাতে দেখা যায়!... ঠাকুরমার ঝুলিতে ছবিতে নাটক আছে। ঠাকুমার ঝুলির অন্যান্য বিকট উদ্ভট ছবিও এক সৃষ্টি। এখানে স্থাপত্য পশুপাখি বড় অভিনব! অভিব্যক্তি ছাড়া, এতাবৎ অনুসৃত ধরন আর নাই তবু ইহা বাঙলারই।"[৬]

উনিশ শতকের শেষের দিকেই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর হাত ধরে ছাপার জগতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত হয়। ছাপাছবিতে প্রবেশ ঘটে হাফটোন পদ্ধতির। এতদিন ছবিতে যে দ্বিমাত্রিক পদ্ধতিতে ত্রিমাত্রিকতার আভাস দেওয়ার চেষ্টা ছিল তার পরিবর্তন ঘটে। আসে আধুনিকতা, আসে সূক্ষ্মতা। কিন্তু দক্ষিণারঞ্জন 'ঠাকুমার ঝুলি' প্রকাশের সময় সে পথে হাঁটলেন না। তিনি ছবি ছাপার মাধ্যম হিসেবে কাঠখোদাইকেই বেছে নিলেন। কাঠখোদাই মাধ্যমটির প্রতি তাঁর বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এই গ্রন্থে যে চারজন খোদাইশিল্পী কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে সেইসময় বিখ্যাত ছিলেন প্রিয়গোপাল দাস। নিজের আগ্রহে, ভালোবাসায় ও জীবিকার তাগিদে তিনি কাঠখোদাই চিত্রে অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। হাফটোন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বেশ কয়েকটি দশক জুড়ে ছাপার জগতে তাঁর হাতের কাজের নমুনা ছড়িয়ে আছে। প্রিয়গোপালের কাছ থেকে ভালো কাজ পাওয়ার জন্য দিনের পর দিন লেখক, প্রকাশক ও অন্যান্য ব্যবসায়ীরা অপেক্ষা করে থাকতেন। দক্ষিণারঞ্জন দিনের পর দিন তাঁর কাছে বসে থেকে কাজ করিয়ে নিতেন। দক্ষিণারঞ্জনের অন্যান্য বইগুলোতেও প্রিয়গোপালের কাঠখোদাইয়ের নিদর্শন আছে। প্রিয়গোপালের কাজের মাধুর্য স্বতন্ত্রতা দাবি করে। গল্প আর ছবির যৌথ শিল্পগুণে 'ঠাকুরমার ঝুলি' বইটি শতবর্ষ পেরিয়ে এসে আজও বাঙালির ঘরে ঘরে সমাদৃত।

চিত্রসূচী:

প্রচ্ছদ: মিত্র ও ঘোষ, ১৪১২

চিত্র ১

চিত্র ২

চিত্র ৩

চিত্র ৪

চিত্র ৫

চিত্র ৬

চিত্র ৭

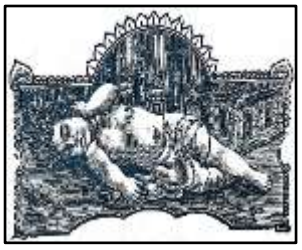

তথ্যসূত্র:

১. Maan, Thomas, Letters of Thomas Maan, 1889-1955 By, Selected and Translated by Richard & Clara Winston, University of California Press Barkeley, Los Angeles 1970

২. দে, অভীককুমার, রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১৯৯২

৩. দে, অভীককুমার, রবীন্দ্রসৃষ্টির অলংকরণ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ১ম প্রকাশ, ১৯৯২

৪. চাকী, কৃষ্ণেন্দু, ছবির বইয়ের আকর্ষণ চিরকালীন, এই সময় (দৈনিক), সম্পাদক সুমন চট্টোপাধ্যায়, রবিবার, ১০ নভেম্বর ২০১৩

৫. চাকী, কৃষ্ণেন্দু, বাংলার গ্রন্থচিত্র, নবপত্রিকা, একদিন (দৈনিক), সম্পাদক সুমন চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা, ১মে ২০১১

৬. মজুমদার, কমলকুমার, বঙ্গীয় গ্রন্থচিত্রণ, উনিশ শতকে বাংলা গ্রন্থচিত্রণ, সংকলন ও বিন্যাস: অশোক উপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, ২০১১।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 965-972
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.091

প্রমিত বাংলার সংকট ও ঔপনিবেশিক ভাষানীতি: একটি পর্যালোচনা

ইয়াসমিন প্রামানিক, *বাংলা বিভাগ, পান্ডবেশ্বর কলেজ, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.02.2025; Accepted: 25.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The debate over the standardized form of the Bengali language has persisted for a long time. In the 19th century, under colonial rule, the accepted form of Bengali prose remained confined to a specific social group. This study examines how colonial language policies, along with the dominance of Sanskrit and English, influenced the shaping of Bengali prose.

During the 19th century, Bengali prose was based on the rigid "Sadhubhasha" style, which was disconnected from the spoken language of the common people. According to Pradyumna Bhattacharya, this division was not merely literary but also reflected social class distinctions. While English prose was being written in a simple and accessible manner, Bengali prose remained rigid and elitist.

By the late 19th century, the conflict between "Sadhubhasha" and "Cholitobhasha" intensified. Rabindranath Tagore and the emerging grammarians of the time emphasized the evolving nature of language and advocated for the necessity of the colloquial form. Tagore believed that the standardized form of a language is not artificially imposed but naturally changes over time. He argued in favor of simplifying Bengali prose and attempted to break the rigid structure of "Sadhubhasha."

Due to colonial language policies, Bengali prose became divided into two streams – formal literary language and the vernacular language of the masses. The development of the printing industry, the popularity of "Bat-tala" publications, and the separation of literary language fueled new debates about standardized Bengali.

Mohitlal Majumdar and Sushil Kumar, De opposed Tagore's views on language. Mohitlal argued that "Sadhubhasha" was the language of Bengali national culture, elevated above rural dialects. On the other hand, Sushil Kumar believed that the strength of the Bengali language stemmed entirely from Sanskrit.

This study concludes that the debate over standardized Bengali is deeply intertwined with the nature of language, colonial rule, social divisions, and literary structures. Although Tagore's linguistic ideas played a crucial role in transforming Bengali prose, the controversy over the true form of the language remains ongoing.

বাংলা ভাষা তার বহুমাত্রিক প্রকৃতি ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের কারণে বিভিন্ন সময় বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে থেকেছে। বিশেষত প্রমিত বাংলার গঠন ও তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। কলকাতা ও ঢাকার মতো দুটি পৃথক ভাষাকেন্দ্র এবং বহুভাষিক বাস্তবতায় বাংলা ভাষার রূপ নির্ধারণ আরও জটিল হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক যুগে বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃত ও ইংরেজির একচেটিয়া আধিপত্য বাংলা গদ্যকে এক বিশেষ রূপে প্রাতিষ্ঠানিক করেছে, যা পরবর্তী সময়ে প্রমিত বাংলার সংজ্ঞা নির্ধারণে প্রভাব বিস্তার করেছে।

ঔপনিবেশিক পরিসরে বাংলা গদ্য ও তার সংকট:

উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তার অভিজাতকেন্দ্রিক প্রকৃতি। এটি জনসাধারণের মুখের ভাষার পরিবর্তে কঠোর সাধুরীতির কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়েছিল। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্যের মতে, গদ্য ভাষা সামাজিক শ্রেণি বিভাজনের প্রতিফলন ছিল। ইংরেজি গদ্য যেখানে সর্বসাধারণের ভাষার কাছাকাছি চলে এসেছিল, বাংলা গদ্য সেখানে নিজেকে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। প্রদ্যুম্ন ভট্টাচার্য ব্যাখ্যা করেছেন:

> "আমি মনে করি, এই বিভাজনকে শুধু সাহিত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যার জন্য সাহিত্যিক গণ্ডির বাইরে গিয়েও অনুসন্ধান করতে হবে। কেননা গদ্য, ভাষার মতোই একটি সামাজিক উপাদান। উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের স্ববিরোধিতাগুলো সেই সময়কার সমাজের দ্বন্দ্বের প্রতিফলন—গদ্য যখন শ্রমিক, কৃষক ও সাধারণ মানুষের ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল, তখনই নবগঠিত নাগরিক ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয়ের সংকট দেখা দিয়েছিল।" (Bhattacharya 1975: 223)

ঔপনিবেশিক বাংলা গদ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল জনসাধারণ থেকে তার বিচ্ছিন্নতা। সপ্তদশ শতকের শেষভাগে আধুনিক ইংরেজি গদ্যরীতি বিকশিত হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় ইংরেজি গদ্য সাধারণ মানুষের ভাষার কাছাকাছি চলে আসে। 'পিউরিটান বা প্রোটেস্টান্ট চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক প্রচারক, সাংবাদিক, বিজ্ঞানী এমনকি রয়েল সোসাইটিও শিল্পী, প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও ব্যবসায়ীদের ভাষাকে গ্রহণ করেছিল' (Bhattacharya 1975: 223-24)। কিন্তু ঔপনিবেশিক বাংলা গদ্যের ধারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি জনমানুষের মুখের ভাষার পরিবর্তে সাধুরীতির অনড় কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়েছিল।

ঔপনিবেশিক সমাজের গঠন কাঠামোর মধ্যেই বাংলা গদ্যের সংকোচন নীতির কারণ নিহিত ছিল। জাতীয় ভাষার প্রতিষ্ঠার কোনো সুসংগঠিত প্রয়াস না থাকায়, ভদ্র সমাজের একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী ভাষাই মান্যরূপ হয়ে উঠেছিল। সমসাময়িক বাংলা ভাষাচর্চার তথাকথিত 'অভদ্র' ধারার কথা বিবেচনা করলে, ঔপনিবেশিক গদ্যের অভিজাত গোষ্ঠী কেন্দ্রিক প্রকৃতি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সাধু ও চলিত ভাষার দ্বন্দ্ব:

বাংলা গদ্যের ভাষা নিয়ে বিতর্ক প্রধানত সাধু ও চলিত ভাষার দ্বন্দ্বে পরিণত হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অন্যান্য নব্য ব্যাকরণবিদরা এই দ্বন্দ্বের গভীরে গিয়ে ভাষার পরিবর্তনশীল প্রকৃতির কথা তুলে ধরেন। রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় দেখিয়েছেন, ভাষার প্রমিত রূপ নির্ধারণে ব্যাকরণ, উচ্চারণ, পাঠ্যপুস্তক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। উনিশ শতকের সর্বাধিক জনপ্রিয় মুদ্রিত সাহিত্যকর্ম ছিল ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' (Kamal 1977: 190)। এটি প্রমাণ করে যে, বাংলা ভাষার কথ্যরূপ ও সাহিত্যের অভিজাত রূপের মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিন ধরে চলমান ছিল, যা আজও মান বাংলা প্রসঙ্গে আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে।

পরবর্তী বাংলার সাহিত্যর তুলনায় এই সাহিত্য উৎকৃষ্ট না নিম্নমানের সে প্রসঙ্গ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। এঁদের অনেকেই সমকালেই জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয়, বাংলা ভাষার পুনর্গঠনের ঔপনিবেশিক প্রচেষ্টায় এই লেখকদের কাউকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। গ্রন্থ মুদ্রণ ও পাঠের প্রসঙ্গও এখানে প্রাসঙ্গিক। ১৮১৬ সালে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ছেপে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য মুদ্রণ জগতে এক নবযুগের সূচনা করেন (অনিন্দিতা ২০১১: ১০)। ওই একই বছরে 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত'-ও মুদ্রিত হয় (Kamal 1977: 11)। এই গ্রন্থসমূহ বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। উনিশ শতকের শেষ দিকেও 'বটতলার বই' নামে পরিচিত গ্রন্থসমূহের জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি, বরং বেড়েছে; এবং শিক্ষিত অভিজাত সমাজও এসব গ্রন্থের আগ্রহী পাঠক ছিল (গৌতম ২০১১; অনিন্দিতা ২০১১)। এই বহুলপঠিত ভাষা সামগ্রিকভাবে পরবর্তী গদ্যসাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে। তবে পরিকল্পিতভাবে নির্মিত প্রভাবশালী ভাষাশৈলীতে এর স্থান হয়নি। 'ভাষার সংস্কৃতায়ন, কথ্যভাষার সঙ্গে ব্যবধান সৃষ্টি করা এবং 'অশ্লীলতা'-র দোষযুক্ত যাবতীয় সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বর্জনের প্রবণতার মাধ্যমে উনিশ শতকের শিক্ষিত বঙ্গসমাজ তাদের

আদর্শ সাহিত্যরীতি গড়ে তোলে' (অনিন্দিতা ২০১১: ৪)। অন্তত 'বিদ্যাসাগরীয় গদ্য' পর্যন্ত এই প্রচলিত 'সাহিত্যিক' ভাষার কোনো স্পর্শ যে টিকে ছিল না, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উনিশ শতকের সর্বাধিক জনপ্রিয় মুদ্রিত গ্রন্থ ছিল ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' (Kamal 1977: 190)।

১. কে বলে শরৎ চাঁদ সে মুখের তুলনা।
পদনখে পড়ি তার আছে কত গুণা।
কি ছার মিছার কাম ধনুরাগে ফুলে।
ভুরুর সমান কোথা ভ্রূভঙ্গে ভুলে।
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়নের খেলায়।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ হরিণকে বুকে লয়ে। (বিদ্যার সৌন্দর্যবর্ণনা)
২. বিদ্যা করেছিল প্রতিজ্ঞা বিদ্যা করেছিল দৃঢ় সংকল্প।
সে পতিকে বিচার করবে যেই জন ॥
প্রতিজ্ঞায় জাতি কে চায় প্রতিজ্ঞায় জাতি কে চায়।
প্রতিশ্রুতিতে যে জয়ী হয় সেই নিয়ে যায়।
দেখ পুরাণ প্রসঙ্গ দেখ পুরাণ কাহিনি।
যেখানে যেখানে প্রতিজ্ঞা সেখানে সেখানে এই খেলা। (রাজার নিকট চোরের স্বীকারোক্তি)

প্রথম অংশে তৎসম শব্দের আধিক্য লক্ষণীয়। পুরনো বাংলা সাহিত্যের তৎসমবহুল রচনাশৈলীর সঙ্গে এর সংযোগ বিদ্যমান, যা আলাওল বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখায় পাওয়া যায়। তবে এই তৎসম শব্দগুলো একান্তভাবেই সংস্কৃত নয়, বরং বাংলা ভাষায় এখনও প্রচলিত। যৌগিক শব্দসমূহ দুটি পৃথক পদ নিয়ে গঠিত, যা আধুনিক বাংলা ভাষার গঠনবৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সর্বোপরি, ক্রিয়াপদের স্বাভাবিকতা ও উচ্চারণশৈলীর স্পষ্ট রেখাপাত বাক্যের কাঠামোতে কবিত্বের উপস্থিতি বজায় রেখেও কোনো কৃত্রিমতা সৃষ্টি করেনি।

দ্বিতীয় অংশ ভারতচন্দ্রের অনন্য বাকচাতুর্যের নিদর্শন। তবে সে প্রসঙ্গে না গিয়েও যদি শব্দতালিকা ও উচ্চারণপদ্ধতি বিশ্লেষণ করা হয়, তবে স্পষ্ট বোঝা যাবে যে এর ভাষার সঙ্গে আধুনিক বাংলা ভাষার খুব বেশি পার্থক্য নেই। গ্রন্থটির অসাধারণ জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ যে এর ভাষার স্বাভাবিকতা, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

ঔপনিবেশিক ভাষানীতি ও বাংলা গদ্যের রূপান্তর:

ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থা বাংলা গদ্যের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নির্ধারণে ভূমিকা রেখেছিল। শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে প্রমিত ভাষা নির্ধারিত হলেও, তা জনসাধারণের ভাষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ছিল না। সাহিত্যিক ভাষা এবং সাধারণ ভাষার মধ্যে পার্থক্য বজায় থাকায়, বাংলা ভাষার বিবর্তন মূলত দুটি পৃথক ধারায় প্রবাহিত হয়—একটি প্রাতিষ্ঠানিক ভাষা এবং অপরটি লোকজ ভাষা। প্রিন্ট সংস্কৃতির প্রসঙ্গও এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

১৮১৬ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' ছেপে বাংলা মুদ্রণ জগতে নতুন দিগন্তের সূচনা করেন (অনিন্দিতা ২০১১: ১০)। একই সময়ে রামায়ণ ও মহাভারতও মুদ্রিত হয় (Kamal 1977: 11)। এই গ্রন্থগুলো অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। উনিশ শতকের শেষার্ধেও তথাকথিত 'বটতলার বই' পাঠকদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয় ছিল এবং শিক্ষিত অভিজাতগোষ্ঠীও এগুলোর প্রতি আগ্রহী ছিল (গৌতম ২০১১; অনিন্দিতা ২০১১)।

জনপ্রিয় এই ভাষাশৈলী নিঃসন্দেহে পরবর্তী গদ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ভাষার নির্মাণে এই ধারার কোনো স্বীকৃতি ছিল না। উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালি সমাজ 'ভাষার সংস্কৃতায়ন, কথ্যরূপ থেকে দূরত্ব বজায় রাখা এবং তথাকথিত 'অশ্লীল' সাহিত্য ও লোকধারাকে বর্জনের মাধ্যমে' তাঁদের আদর্শ সাহিত্যভাষার রূপ নির্মাণ করেছিল (অনিন্দিতা ২০১১: ৪)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষার পরিবর্তনশীলতা ও ব্যবহারিক দিককে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার মতে, ভাষার প্রমিত রূপ শুধু ব্যাকরণ ও নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং সমাজ ও সময়ের সঙ্গে তা পরিবর্তিত হতে থাকে। তিনি সাধু ও

চলিত ভাষার বিভাজনকে অপ্রয়োজনীয় মনে করতেন এবং বাংলা গদ্যের সহজ, প্রাণবন্ত ও কথ্যরূপকেই গুরুত্ব দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন।

উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলা ভাষাচর্চার একটি সুসংগঠিত ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এতে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। অনেকে এঁদের 'নব্য ব্যাকরণবিদ' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ঔপনিবেশিক পরিসরে বাংলা ভাষার ওপর সংস্কৃত ও ইংরেজির একচেটিয়া আধিপত্য গড়ে উঠেছিল, যার থেকে তাঁরা মুক্তি চেয়েছিলেন। তাঁরা বাংলা ভাষার স্বাতন্ত্র্য ও আত্মনির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করেছেন। ফলে মান বাংলা সংক্রান্ত আলোচনায় তাঁদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষার সহজতা ও গদ্যশৈলী :

রবীন্দ্রনাথ তার রচনায় দেখিয়েছেন, কীভাবে ভাষার গঠন প্রাকৃতিকভাবে পরিবর্তিত হয়। তার মতে, সাধু গদ্য ছিল কৃত্রিম এবং তা জনসাধারণের ব্যবহারের উপযোগী ছিল না। উনিশ শতকের বাংলা গদ্যের ভাষা সংস্কৃত-আশ্রিত হলেও, রবীন্দ্রনাথ এটিকে সরলীকরণের পক্ষে ছিলেন। আঠারো শতকের শেষভাগ ও উনিশ শতকের সূচনায়, যদিও তথাকথিত মানসম্মত সাহিত্যকর্ম গড়ে ওঠেনি, তথাপি কবিওয়ালা, যাত্রাকার, কথাকার ও পাঁচালিকারেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলা ভাষায় লেখালেখি করছিলেন। এঁদের ভাষার স্বরূপ সম্পর্কে সুশীলকুমার দে লিখেছেন:

> "একদিকে কিছুটা সংস্কৃতঘেঁষা, অন্যদিকে কিছুটা ফারসি-প্রভাবিত, এই ভাষা স্বকীয় ভারসাম্য বজায় রেখেছিল এবং এর শক্তি ও প্রাণশক্তি ছিল দেশীয় মাটির গভীরে প্রোথিত। এটি যেমন সরলতায় স্বচ্ছ, তেমনই কথ্যভাষার সহজ স্বতঃস্ফূর্ততায় গৌরবান্বিত এবং এমন নিখুঁতভাবে স্বাভাবিক যে, এটি সর্বদা মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল।" (De 1962: 258)

সাহিত্যিক গদ্যের চলনকে সাধু-চলিত দ্বন্দ্বের সরলীকৃত দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ফলে ভাষা সংক্রান্ত আলোচনায় এক ধরনের অস্পষ্টতা এসেছে। রবীন্দ্রনাথের মতামতের প্রভাবের ফলে সাধু-চলিত তুলনামূলক পাঠের ক্ষেত্রে জটিলতা এড়িয়ে সরলীকরণ ঘটেছে। তবে, যদি তাঁর ভাষা-বিষয়ক পর্যালোচনার প্রেক্ষাপট বিবেচনা করা হয়, তাহলে বোঝা যাবে যে, তাঁর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসলে এত সরল ছিল না। বাংলা ভাষার উপনিবেশায়নের জটিলতা সম্পর্কে অসচেতনতার ফলেই রবীন্দ্রনাথের নির্দিষ্ট কয়েকটি উক্তি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে, অথচ তাঁর সামগ্রিক অবস্থান হয়তো এতটা একরৈখিক ছিল না।

মোহিতলাল মজুমদার এবং সুশীলকুমার দে-র মতামতও এই বিতর্কে গুরুত্বপূর্ণ। মোহিতলাল লিখেছেন, "এই সাধু ভাষাই বাঙালির জাতীয় সংস্কৃতির ভাষা। যদি এটি বাঙালি না খুঁজে পেত, তবে তার ভাষা আজও একেবারে গ্রাম্য রয়ে যেত। যদি এটি খাঁটি বাংলা না হয়ে সংস্কৃতের অনুসারী হয়, তবে বলতে হবে যে, জন্মগতভাবে বাঙালি এক জাতি হলেও চিন্তা ও সংস্কৃতির দিক থেকে সে দ্বিজত্ব লাভ করেছে" (মোহিতলাল ২০০৫: ১২২)।

অন্যদিকে, সুশীলকুমার দে মনে করেন, "বাংলার প্রকৃত ভাষা সাধু বা চলিত কিছুই নয়; বরং তার সহজাত গতি ও ঐতিহাসিক বিকাশের স্বাভাবিক ফল" (সুশীল ১৯৫৪: ৩৬)। তাঁর মতে, "বাংলা ভাষার সব শক্তি ও সৌন্দর্য সংস্কৃত থেকেই এসেছে; সংস্কৃত ছাড়া বাংলা দুর্বল হয়ে যাবে" (সুশীল ১৯৫৪: ৩৯)। অন্যদিকে, নতুন বাংলা গদ্য প্রসঙ্গে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন: "যে ভাষাকে বাংলা বলে প্রচার করা হচ্ছে, তা পুঁথির ভাষা নয়, আবার সেটি প্রকৃত বাঙালির ভাষাও নয়" (সুশীল ১৯৫৪: ৩৫)।

এই আলোচনার মাধ্যমে বোঝা যায় যে, মোহিতলাল এবং সুশীলকুমার ভাষার প্রকৃতি ও বিকাশ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করেছেন এবং তা স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সাধু গদ্যের আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন এবং ভবিষ্যতে বাংলা গদ্যে এই পরিবর্তন ঘটবে বলেই তাঁর বিশ্বাস ছিল।

রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তার প্রভাব:

রবীন্দ্রনাথের ভাষাচিন্তা পরবর্তী বাংলা গদ্যের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। তার ভাষাশৈলী বাংলা সাহিত্যে চলিত রীতির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করেছে এবং বাংলা ভাষার গতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রেখেছে। ভাষার প্রকৃতিগত পরিবর্তন ও সাহিত্যিক গদ্যের বিবর্তন:

শুধু আমদানিকৃত অপ্রয়োজনীয় সংস্কৃত শব্দের পরিমাণ কমানোই যথেষ্ট নয়; এতদিন ব্যবহৃত হয়নি এমন বহু শব্দকে আবার প্রচলনে আনতে হবে। কারণ, কথ্য ভাষার শব্দ যদি ব্যবহারের বাইরে চলে যায়, তাহলে তা সাহিত্যিক ভাষার জন্যও ক্ষতিকর হয়ে ওঠে। প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন: "আমরা নিত্যদিন যে সমস্ত শব্দ ভদ্রসমাজে ব্যবহার করি, যা কোনোভাবেই নীচু স্তরের বলে গণ্য নয়, সেই শব্দগুলোকে যদি সাহিত্য থেকে বাদ দেওয়া হয়, তবে তার ক্ষতি একান্তভাবেই সাহিত্যিক" (প্রমথ ২০০৯: ২৬২)। 'কথার কথা' নিবন্ধে শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রীর মতবিরোধে প্রবৃত্ত হয়ে প্রমথ চৌধুরী সাধু গদ্যের অসুবিধাগুলো গভীরভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর বক্তব্য সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১) পণ্ডিত শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় মনে করতেন, লেখায় যত বেশি সংস্কৃত শব্দ সংযোজন করা হবে, ততই বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ঘটবে। তবে, আমার বিশ্বাস, বাংলা সাহিত্য বাংলা ভাষাতেই রচিত হওয়া উচিত (প্রমথ ২০০৯: ২৫৩)।

২) যে ভাষা আমরা সকলেই বুঝতে পারি, যার মাধ্যমে বহুদিন ধরে আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করেছি এবং ভবিষ্যতেও করব, সেটিই প্রকৃত বাংলা ভাষা। বাংলার অস্তিত্ব কোনো অভিধানের পৃষ্ঠায় নয়, বরং বাঙালির মুখের ভাষায় (প্রমথ ২০০৯: ২৫৪)।

৩) শাস্ত্রী মহাশয়ের ধারণা, বাংলা ভাষাকে যদি সংস্কৃতঘেঁষা করা যায়, তাহলে আসামি, হিন্দি ভাষাভাষীদের পক্ষে বাংলা শেখা সহজ হবে। তদুপরি, বাংলার বিশেষ সুবিধা এই যে, সংস্কৃত শব্দ যোগ করলেও বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারায় না। অর্থাৎ, যাঁরা বাংলা জানেন না, তাঁদের বোঝার সুবিধার্থে সাধারণ বাঙালির জন্য সাহিত্যিক ভাষাকে দুর্বোধ্য করে তুলতে হবে (প্রমথ ২০০৯: ২৫৬)।

৪) ভাষার ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত কথ্য ও লেখার মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা, বিভেদ সৃষ্টি করা নয়। ভাষা কলমের মাধ্যমে মুখে আসে, উল্টোটা হলে তা আর কার্যকর থাকে না। ইংরেজি ভাবনা, সংস্কৃত শব্দ এবং বাংলা ব্যাকরণ মিশিয়ে আমরা এক ধরনের খিচুড়ি ভাষা তৈরি করেছি, যা প্রকৃত বাংলা সাহিত্য নয়। ইংরেজি না জানলে ভাব বোঝা যায় না, সংস্কৃত না জানলে ভাষা বোঝা যায় না। এতে মনে হয়, বাংলা সাহিত্য যেন বিদেশি ভাবধারার ও পুরাতন ভাষার মাঝে বন্দি হয়ে আছে (প্রমথ ২০০৯: ২৫৭)।

প্রমথ চৌধুরীর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায় যে, তিনি উনিশ শতকে গড়ে ওঠা সাহিত্যিক গদ্যের ত্রুটি তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো তিনি সরাসরি বিষয়টি উল্লেখ করেননি, তবে ঔপনিবেশিক প্রভাবে গঠিত বাংলা গদ্যের প্রকৃতি মনে রেখেই সমালোচনা করেছেন। এ কারণে, তাঁর দৃষ্টিতে ইংরেজি ভাবধারার আধিক্য এবং সংস্কৃতনির্ভর ভাষা প্রায় সমানভাবে সমস্যাসঙ্কুল ছিল। তিনি সাহিত্যিক ভাষার আদর্শ কোনো নির্দিষ্ট কাঠামোর পক্ষে ছিলেন না; বরং জীবন্ত ভাষার প্রতি তাঁর আস্থা ছিল। লক্ষণীয়, তিনি চলিতরীতির বিশেষ কোনো ধরনকে অগ্রাধিকার দেননি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে তাঁর ভাবনার মিল রয়েছে। বাংলার ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন, "সংস্কৃত ও ইংরেজি সাহিত্য অধ্যয়নের মাধ্যমেই আমরা সে শক্তি ও দক্ষতা অর্জন করব, যা আমাদের সাহিত্যকে স্বাধীনতার দিকে নিয়ে যাবে" (প্রমথ ২০০৯: ১৩৮)। অর্থাৎ, অন্য ভাষা নির্ভর করা এবং অন্য ভাষার সাহায্য গ্রহণের মধ্যে পার্থক্য বোঝা গুরুত্বপূর্ণ।

প্রমিত বাংলার বর্তমান সংকট:বহুভাষিক বাস্তবতা ও প্রমিত বাংলার পরিবর্তন:

আধুনিক বিশ্বে ভাষার সংমিশ্রণ ও বহুভাষিক বাস্তবতা প্রমিত বাংলার ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে। ইংরেজি ও হিন্দির মতো ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষার শব্দভাণ্ডার, উচ্চারণ ও ব্যাকরণে পরিবর্তন আনছে।

প্রমিত বা মানক বাংলা নিয়ে বিতর্ক দীর্ঘদিনের। আধুনিক কালে এ বিষয়ে বিতর্কের মূল কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলা ভাষাচর্চার ভৌগোলিক বাস্তবতা, যেখানে ভাষার দুটি কেন্দ্র—কলকাতা ও ঢাকা—দুই ভিন্ন রাষ্ট্রে অবস্থিত। ফলে অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাংলার ভাষিক অবস্থান বিশেষভাবে স্বতন্ত্র ও জটিল। ভাষার পরিবর্তনশীল প্রকৃতি ও পুরনো প্রমিত রূপের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের চ্যালেঞ্জও এই জটিলতা বাড়িয়েছে। তদুপরি, বর্তমান বিশ্বে বহুভাষিক বাস্তবতা, যেখানে ইংরেজি ও হিন্দির মতো আন্তর্জাতিক ভাষার প্রভাব এবং নিজস্ব বিভিন্ন উপভাষার প্রসার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাও বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। এসব বহিরাগত ও অভ্যন্তরীণ ভাষিক

প্রভাবের সাথে প্রমিত বাংলা কীভাবে নিজেকে মানিয়ে নেবে, তা নির্ধারণের জন্য ঐতিহাসিক ও তাত্ত্বিক পর্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন।

নতুন গদ্যের জন্য সমকালীন গদ্যসাহিত্য বাদ দিয়ে পুরোনো কাব্যের ভাষার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। নতুন গদ্যের সংস্কৃত-আধিক্যের সাপেক্ষে সাধারণত পুরোনো কাব্যের সংস্কৃতায়িত ভাষার উদাহরণ উপস্থাপন করা হয়। এই দুটি তাত্ত্বিকভাবে সঠিক হলেও বাস্তবে কৃত্রিম উচ্চারণরীতির যে নতুন গদ্য উৎকৃষ্ট গদ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাতে পুরোনো কবিতারও কোনো প্রতিফলন ছিল না। এ বিষয়ে গ্রিয়ারসনের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক:

> "তাঁদের ভাষা (চণ্ডীদাস, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র) বর্তমান শতাব্দীর পণ্ডিত-নির্ভর ভাষার বিপরীত। তাঁরা লিখেছেন প্রকৃত, সজীব বাংলা ভাষায়, এবং তাঁদের ব্যাপক জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে যে, আধুনিক লেখকদের এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক যে বাংলা ভাষা শুধু বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারের সাহায্য ছাড়া উচ্চস্তরের ভাব প্রকাশ করতে পারে না।" (Grierson 1903: 16)

এ লেখায় প্রতিপাদিত হয়েছে যে, মান বাংলার সংকট মূলত ঔপনিবেশিক পরিসরে বাংলা ভাষার সংকটেরই প্রতিফলন। একপর্যায়ে এই আলোচনা সাধু ও চলিত ভাষার দ্বন্দ্বে পরিণত হয় এবং শেষ পর্যন্ত চলিত রীতিই প্রমিত রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কিন্তু এই পরিবর্তনকালে অনেক তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক দিক আড়াল থেকে গেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিষয়ক আলোচনা এই সংকটকে গভীরভাবে চিহ্নিত করেছে, কারণ তিনি ভাষার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি ব্যবহারিক বাস্তবতাকেও গুরুত্ব দিয়েছেন। ভাষার প্রমিত রূপ গঠনের সাথে ব্যাকরণ রচনা, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, উচ্চারণবিধি, শিক্ষা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মতো বিষয় ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। এই লেখায় যুক্তি প্রদান করা হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথের ভাষাবিষয়ক বিশ্লেষণ এই সমস্ত ক্ষেত্রে দিকনির্দেশক ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

পরবর্তী বাংলা সাহিত্য তুলনামূলকভাবে উন্নত কি না, তা এখানে গৌণ বিষয়। অনেকেই তখনই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু লক্ষণীয়, ঔপনিবেশিক শাসনকালে বাংলা ভাষার প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের অংশ হিসেবে এই লেখকদের কখনও স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি।

পুরোনো কবিতা ব্যতীত গদ্য ও পদ্য আকারে উনিশ শতকের সর্বত্র রচনা ও পাঠের প্রচলন অব্যাহত ছিল। বটতলার বিপুল পরিমাণ প্রকাশনাই তার অন্যতম নিদর্শন। এখানে ভাষার যেমন একপ্রকার ঐক্য বজায় ছিল, তেমনি জনসংস্কৃতিতেও ছিল ধারাবাহিকতা। যেমন, যাকে পরবর্তী সময়ে 'দোভাষী পুথি' বা 'মুসলমানি বাংলা' বলা হয়েছে, তা উনিশ শতকজুড়েই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপকভাবে চর্চিত ও পাঠযোগ্য ছিল। 'গোল-ই-বকাওলি', 'ইছফ জোলেখা', 'লায়লি মজনু', 'সাহানামা' প্রভৃতি জনপ্রিয় গ্রন্থের অনুবাদক, প্রকাশক ও পাঠকের মধ্যে হিন্দু সমাজের অংশগ্রহণও উল্লেখযোগ্য ছিল (গৌতম ২০১১: ২২৫-৩০; সুমন্ত ২০১১: ১১৮)।

সর্বোপরি, কবিগান, পাঁচালি, যাত্রাপালা থেকে শুরু করে মুসলমানি পুথি পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে বোঝা যায়, অভিজাত সমাজের সংস্কৃতপনা ও ইংরেজি-অনুরাগের বাইরে একটি শক্তিশালী লোকসংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল, যেখানে ভাষা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণ অধিকতর পরিলক্ষিত হয়, বিরোধিতার চেয়ে ঐক্যই বেশি প্রকট ছিল। এ ধারা অভিজাত গৃহেও বহুবার প্রবেশ করেছে। কিন্তু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন শিক্ষিত সম্প্রদায় নতুন সংস্কৃতি বা নতুন গদ্যরূপ থেকে প্রাণরস সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে। ভাষা সমাজের রীতি মেনেই বিকশিত হয়েছে।

নতুন সাহিত্যিক গদ্যকে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (2002:134) 'দ্বিগুণ কৃত্রিম ভাষা' (doubly artificial language) বলে অভিহিত করেছেন। এই সৃষ্ট গদ্যের প্রধান সংকট ছিল, নতুন শিক্ষাধারায় অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছে তা পৌঁছতে ব্যর্থ হওয়া। এমনকি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটি অংশের কাছেও এই গদ্য বিশেষভাবে উপভোগ্য ছিল না, যার প্রমাণ রাজনারায়ণ বসুর পর্যবেক্ষণে পাওয়া যায় (রাজনারায়ণ ১৪০২: ৩১৪)। এর কারণ, কেবলমাত্র সাধারণ জনগণের ভাষা নয়, এই গদ্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কথ্য ভাষা থেকেও পৃথক ছিল।

উপভাষার প্রসার ও প্রমিত রূপের চ্যালেঞ্জ:

বাংলা ভাষার বিভিন্ন উপভাষা ক্রমাগত প্রসার লাভ করছে, যা প্রমিত বাংলার সংজ্ঞাকে আরও অস্পষ্ট করে তুলছে। আঞ্চলিক ভাষার জনপ্রিয়তা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ভূমিকা এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও প্রমিত বাংলার স্বীকৃত কাঠামোর ওপর প্রভাব ফেলছে।

সর্বজনীন ভাষার ধারণা ও মান ভাষার প্রস্তাবনা:

'মান ভাষা' বা 'প্রমিত ভাষা' শব্দবন্ধ রবীন্দ্রনাথ নিজে ব্যবহার করেননি, তবে তাঁর বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়, তিনি বাংলা ভাষার একটি সর্বজনীন রূপ গঠনের পক্ষে ছিলেন। এই ধারণার প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় (১৯৯০)। পবিত্র সরকারের মতে, এটি ছিল "সাহিত্যের ভাষা হিসেবে চলতি বাংলাকে গ্রহণ করার প্রথম সুস্পষ্ট প্রস্তাব" (পবিত্র ১৯৯৯: ১০)। শ্যামাচরণ মূলত শিক্ষিত বাঙালির মুখের ভাষাকে লেখার ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। তিনি ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা টেনে এনে দেখান যে, সেখানকার উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদের ভাষা সাধারণ মানুষের ভাষার কাছাকাছি থাকে (Ganguli 1990: 25)।

শ্যামাচরণ কেবল কলকাতার ভদ্র সমাজের ভাষাকে নয়, বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষিত মানুষের মুখের ভাষাকেও বিবেচনায় এনেছিলেন (Ganguli 1990: 27)। তিনি মনে করতেন, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় মুখের ভাষার ব্যবহার করলে বাংলা ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর সর্বোত্তম উপকার হবে। তাঁর মতে, সর্বজনীন বোধগম্যতা অর্জন করাই ভাষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।

উপসংহার:

বাংলা ভাষার প্রমিত রূপ নির্ধারণ এক বহুমাত্রিক এবং বিতর্কিত বিষয়। ঔপনিবেশিক প্রভাব, সমাজের শ্রেণিভিত্তিক বিভাজন, ভাষার পরিবর্তনশীলতা এবং বহুভাষিক বাস্তবতা এই সংকটকে গভীরতর করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাষার সহজতা ও ব্যবহারিক দিককে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, যা বাংলা গদ্যের চলিত রীতির প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হয়েছিল। আধুনিক সময়ে বহুভাষিক চ্যালেঞ্জ ও প্রযুক্তির প্রভাব বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ রূপ নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বাংলা ভাষার প্রমিত রূপের সংজ্ঞা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন, যাতে তা পরিবর্তনশীল বাস্তবতার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ থাকে এবং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষারূপকে অন্তর্ভুক্ত করে।

গ্রন্থপঞ্জী:

বাংলা উৎসসমূহ :

১. ঘোষ, অনিন্দিতা, বটতলার বইবাজার ও তার সামাজিক ইতিহাস বটতলা বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদনা: অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, বর্ষ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১১, কলকাতা।
২. ভদ্র, গৌতম, ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার? ছাতিম বুস্, ২০১১, কলকাতা।
৩. সরকার, পবিত্র. ভাষামনন: বাঙালি মনীষা ২য় সংস্করণ, পুনশ্চ, ১৯৯৯, কলকাতা।
৪. চৌধুরী, প্রমথ, প্রবন্ধসংগ্রহ ৩য় মুদ্রণ, সুচয়নী পাবলিশার্স, ২০০৯, ঢাকা।
৫. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র রচনাবলী সম্পাদনা প্রফুল্লকুমার পাত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, পাত্র'জ পাবলিকেশন, ১৯৮৯, কলকাতা।
৬. মজুমদার, মোহিতলাল, রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ ভবন, ২০০৫, কলকাতা।
৭. নাথ, মৃণাল, বাঙালীর ভাষাচিন্তায় চলিত-সাধুর দ্বন্দ্ব, বাঙালীর বাঙলাভাষা চিন্তা, সম্পাদনা: মনসুর মুসা, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ১৯৯৪, ঢাকা।
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী, (আঠার খণ্ড) ৩য় মুদ্রণ, ঐতিহ্য, ২০০৬, ঢাকা।
৯. বাংলা শব্দতত্ত্ব তৃতীয় স্বতন্ত্র সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ১৪০২, কলকাতা।
১০. বসু, রাজনারায়ণ, সে কাল আর এ কাল নির্বাচিত বাংলা রচনা সংগ্রহ, সম্পাদনা: বারিদবরণ ঘোষ, কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন, ১৪০২, কলকাতা।
১১. বসু, রাজশেখর, সাধু ও চলিত ভাষা, বাঙলা ভাষা, সম্পাদনা: হুমায়ুন আজাদ, ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ, আগামী প্রকাশনী, ২০০১, ঢাকা।
১২. দাশ, শিশিরকুমার, মোদের গরব মোদের আশা, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৯, কলকাতা।
১৩. সেন, সুকুমার , ভাষার ইতিবৃত্ত ৬ষ্ঠ মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮, কলকাতা।
১৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সুমন্ত, বটতলার 'দোভাষী' সাহিত্য সেকাল ও একাল , বটতলা বিশেষ সংখ্যা, সম্পাদনা: অনিল আচার্য, অনুষ্টুপ, বর্ষ ৪৫, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১১, কলকাতা।

১৫. দে, সুশীলকুমার, নানা নিবন্ধ, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৫৪, কলকাতা।
১৬. শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ, রচনা-সংগ্রহ, চতুর্থ খণ্ড, সম্পাদনা সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ১৯৮৯, কলকাতা।
১৭. রচনা-সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় মুদ্রণ, সম্পাদনা সত্যজিৎ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত ও সুমিত্রা ভট্টাচার্য, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০০।
১৮. দত্ত, হীরেন্দ্রনাথ, বাংলা গদ্যের ক্রমবিকাশ, আকাদেমি পত্রিকা, ১, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৮৮, কলকাতা।
১৯. আজাদ, হুমায়ুন, সম্পাদক বাঙলা ভাষা, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, ২য় মুদ্রণ, আগামী প্রকাশনী, ২০০২, ঢাকা।

ইংরেজি উৎসসমূহ:

1. Anderson, Benedict, Imagined Communities, Verso, 1983, London.
2. Bhattacharya, Pradyumna, Rammohun Roy and Bengali Prose, Rammohun Roy and the Process of Modernization in India, edited by V. C. Joshi, Vikas Publishing House Pvt Ltd, 1975, Delhi.
3. Chatterji, Suniti Kumar, The Origin and Development of the Bengali Language, 3rd impression, Rupa & Co, 2002, New Delhi.
4. De, Sushil Kumar, Bengali Literature in the Nineteenth Century (1757-1857), 2nd edition, Firma K. L. Mukhopadhyay, 1962, Calcutta.
5. Ganguli, Syamacharan, Bengali Spoken and Written, Akademi Potrika, vol. 3, Poshcimbongo Bangla Akademi, 1990, Calcutta.
6. Grierson, G. A., editor, Linguistic Survey of India, Vol. V, Indo-Aryan Family, Eastern Group, Part I, Motilal Banarsidass, 1903, Delhi, Varanasi, Patna.
7. Grierson, Sir George, The Indian Empire, 1912, Calcutta.
8. Hussain, A. T. M. Azfar, The Point is to (ex) change it: Toward a Political Economy of Land, Labour, Language, and the Body.' PhD dissertation, Washington State University, Department of English, 2003, Manuscript microfilmed by UMI.
9. Kamal, Abu Hena Mustafa, The Bengali Press and Literary Writing, University Press Limited, 1977, Dhaka.
10. Philipson, Robert., Linguistic Imperialism, 6th impression, Oxford University Press, 2003.
11. Qayyum, Muhammad Abdul, A Critical Study of the Early Bengali Grammar, The Asiatic Society of Bangladesh, 1982, Dhaka.
12. Walder, Dennis, Post-Colonial Literature in English: History, Language, Theory, Blackwell Publisher, 1998.

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 973-978
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.092

রবীন্দ্র দর্শনে মানুষের ধারণা: একটি সমীক্ষা

রনজয় খাঁ, *সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ,বড়জোড়া কলেজ, বড়জোড়া, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত***

Received: 11.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Human beings are a unique creation of nature. The essence of humanity lies in their intrinsic quality, which is humanity itself. This is what sets humans apart from all other living beings. According to Rabindranath Tagore, humanity fundamentally means creativity. In his writings, he has portrayed the true essence of humans, their potential, their spiritual desires, and their eternal nature, reflecting these through an inner lens. Tagore observed two dimensions within humans: the finite self the and the infinite. The finite self represents humans as mere biological beings, confined within their individual existence. This self is driven by self-interest, focusing only on personal needs, and struggles to rise above biological instincts. It is deeply tied to ego and individuality. In contrast, the infinite self transcends individual boundaries and connects with all of humanity. This higher self inspires people to engage in noble acts for the greater good.

***Key word*:** *Humans, Creativity, Infinite self, Finite self, Biological*

প্রকৃতির এক অনন্য সৃষ্টি হল মানুষ। মানুষের সাধারণ ধর্ম হল মনুষ্যত্ব। এই সাধারণ ধর্মটিই মানুষকে অন্যান্য সকল প্রকার প্রাণীদের থেকে পৃথক করে। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাই আমরা 'মনুষ্যত্ব' বলতে বুঝি সৃজনশীলতা। মানুষ সৃজনশীলতাকে জন্মগতভাবে পেলেও তার প্রকাশ পাই মানুষের আচরণে। বুদ্ধিমত্তা, আচরণ প্রভৃতি মানুষকে অন্যান্য প্রাণীর থেকে আলাদা করে। মানব সত্তার চরিত্র অনেক জটিল। এই মানব সত্তার সঙ্গে জড়িত নানা বৃত্তি, নানা আকুতি। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি, হৃদয়বৃত্তি ও ইচ্ছাবৃত্তি এই তিনটি বৃত্তি নিয়ে মানুষ জীবনের পথে এগিয়ে চলে। রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনাতে প্রকাশিত হয়েছে মানুষের স্বরূপ, মানুষের সম্ভাবনার কথা, আত্মিক চাওয়া পাওয়ার কথা, মানুষের এই সব মৃত্যুঞ্জয়ী স্বরূপের কথা ব্যক্ত হয়েছে অন্তরের নিরিখে।

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে দুটি সত্তা লক্ষ্য করেছেন। একটি তার জীবসত্তা বা সমীম সত্তা বা ছোটো আমি এবং অপরটি হল অসীম সত্তা বা বড় আমি।

জীবসত্তা হিসেবে মানুষ একটি জীবমাত্র এবং তার নিজস্ব সত্তার উপস্থিতিকে বেঁধে রাখতে চায়। সত্তাটি সব সময় নিজের মধ্যে থাকতে চায়, নিজের প্রয়োজন ব্যাতিত অন্য কিছু ভাবে না, মানুষ এই সময় তার জীববৃত্তিকে অন্য অবস্থা থেকে পৃথক করতে পারে না। নিজের অহংবোধ সব সময় প্রকাশিত হয়। দেহের প্রয়োজনই তাদের জীবন। অন্যান্য প্রাণীর মত তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, হ্রাস-বৃদ্ধি, সংগ্রাম, আত্মরক্ষা ইত্যাদি আছে। অন্যান্য জীব বা মানুষ এক্ষেত্রে তার প্রতিপক্ষ। তার ভোগসামগ্রমী অন্য কাউকে দিতে রাজি নয়। কাজেই দেখা যায় দ্বন্দ্ব, বলপ্রয়োগ, হানাহানি, মারামারি। কারণ, মানুষই তার দেহের এই ধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু এই জীব এক জায়গায় থেমে থাকে না। জীবকোষের বৃদ্ধির একটা সীমা আছে, দেহ গণ্ডিতে আবদ্ধ মানুষের এই জীবসত্তা ক্ষুধা, তৃষ্ণা নিবারণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, সেক্ষেত্রে অন্যান্য জীবের সঙ্গে মানুষের পার্থক্য থাকত না।

রবীন্দ্রনাথ সসীম সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, যে দিকটাতে আমি, কেবলমাত্র আমি, সকল অবস্থাতেই শুধুই আমি যেমন, কেবল আমার সুখ, দুঃখ, আমার আরাম, আমার প্রয়োজন, আমার ইচ্ছা, যে দিকটাতে আমি সবাইকে বাদ দিয়ে আপনাকে একান্ত করে পেতে চাই, সেই দিকটিতে আমার চেয়ে ছোটো আর কেউ নয়। এই দিক দিয়ে দেখলে আমরা সকলেই খুব ছোটো। আমোদ, প্রমোদ, প্রয়োজন এই সব ক্ষেত্রে সকলকে বাদ দিয়ে শুধু নিজেকে দেখতে চাই। এখানে আমি একটি বিন্দুর সমান। এখানে আমার থেকে ছোটো আর কেউ নেই। এই জগতে মানুষের একটি অস্তিত্ব আছে। যদিও মানুষের অস্তিত্ব সীমিত। তিনি বলেছেন আমরা সকলেই একই প্রকারের বিশেষ আমি। 'আমিত্ব' বলে বস্তুটিই আমাদের পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে আলাদা করে রাখে। আমি যখন ভাবচ্ছি যে আমি আছি তখন এই ভাবটি পৃথিবীর সীমাহীন উপস্থিতির মাঝে আমি শুধু 'একা'। এই 'আমি ভাবটাই' সমস্ত বিশ্বজগৎ থেকে আমাকে আলাদা করে দিচ্ছে। এখানে তিনি বদ্ধ, ক্ষুদ্র, স্বার্থপর আমির কথাই বলেছেন। এই 'আমি' 'পরমআমি'র থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন। এক বিশেষ সময়ে মানুষ চতুস্পদ প্রাণী হিসাবে বেঁচে থাকতে অস্বীকার করেছিল। প্রকৃতির পরিকল্পনা অনুযায়ী তৃণভোজী প্রাণীদের দুটি পা, একটি শুঁড় এবং শুঁড়ের সঙ্গে সাদৃশ্য রেখে মাথা দেওয়া হয়। মানুষ কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম মেনে নেয় নি। দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও কষ্ট করে দু'পায়ের উপর ভর করে দাঁড়াতে শিখেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন–

> "নীচের দিকে ঝুকে পড়ে জন্তু দেখতে পায় খণ্ড খণ্ড বস্তুকে। তার দেখার সঙ্গে তার ঘ্রাণ দেয় যোগ। চোখের দেখাটা অপেক্ষাকৃত অনাসক্ত, জ্ঞানের রাজ্যে তার প্রভাব বেশি। ঘ্রাণের অনুভুতি দেহ বৃত্তির সংকীর্ণ সীমায়। দেখা ও ঘ্রাণ নিয়ে জন্তুরা বস্তুর যে পরিচয় পায় সে পরিচয় বিশেষভাবে আশু প্রয়োজনের। উপরে মাথা তুলে মানুষ দেখলে কেবল বস্তুকে নয়, দেখলে দৃশ্যকে অর্থাৎ বিচিত্র বস্তুর ঐক্যকে।"[১]

এইভাবে মানুষ জীব সত্তাকে অতিক্রম করে তার আধ্যাত্মিক সত্তায় উপনীত হয়।

রবীন্দ্রনাথ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে মানব প্রকৃতির দিকটি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যখনই আমরা ভালো কিছু করতে চাই এবং তার জন্য অনেক কষ্ট ভোগও করি এবং তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি থাকি তখন আমরা এই সত্তার অনুভূতি টের পায়। মানুষ এই সত্তাটিকে ক্রমাগত নিজের ব্যক্তিগত সীমানাকে অতিক্রম করতে চাই। বিশ্বের সকল মানুষকে একাত্ব রূপে দেখতে চাই। এই অসীম সত্তাতেই মানুষের পূর্ণতা। এমন কোন কাজ নেই যা মানুষের পক্ষে অসম্ভব। সে বারবার চেষ্টা করে, বিফল হয়। এই বিফলতায় সেই কাজ কে পুনরায় করার প্রেরণা দেয়। অতিরিক্ত জীবনী শক্তি মানুষের উদ্যম। এই অতিরিক্ত জীবন শক্তি নিজেদের সাধারণ সত্তার ঊর্ধ্বে উঠতে সাহায্য করে। অসীম সত্তার জন্য মানুষের মুক্তি এবং অমরতা লাভের জন্য হয়ে ওঠে ব্যাকুল। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও মানুষের চেতনায় মানুষকে অমরতা লাভের জন্য চালিত করে। অসীমতার চেতনায় মানুষকে অমরতার দিকে ধাবিত করে এবং বিশ্বচরাচরকে আপন ভাবতে সাহায্য করে। মানুষের জীব সত্তা যেখানে বাঁধা অসীম সত্তা সেখান থেকে উত্তীর্ণ হয়ে মুক্ত আকাশের অভিসারী হয়। জন্তুদের মতো নিম্নগামী জীবন কাটাতে পারে না মানুষ। দূরের দিকে চক্ষু উন্মিলিত করতে হয়। সেই পথ বড় বন্ধুর মত। এই পথে বিশ্রাম নেই, আরাম নেই, এই সত্তা পথকে কেবলই অশান্ত করেছে, করেছে উন্মুক্ত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন;

> "দুর্দিনের অশ্রুজলধারা
> মস্তকে পড়িবে ঝরি, তারি মাঝে যাব অভিসারে
> তার কাছে জীবনসর্বস্বধন অর্পিয়াছি যারে
> জন্ম জন্ম ধরি। কে সে? জানিনা কে। চিনি না তারে-
> শুধু এটুকু জানি-তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
> চলছে মানব যাত্রী যুগ হত যুগান্তরে-পানে
> ঝড়-ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে, জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
> অন্তরপ্রদীপখানি। শুধু জানি, যে শুনছে কানে
> তাহার আহ্বানগীত ছুটেছে সে নির্ভীক পরানে
> সংকট-আবর্তমাঝে, দিয়েছে সে বিশ্ব বিসর্জন,

নির্যাতন লয়েছে সে পক্ষপাতী; মৃত্যুর গর্জন
শুনেছে সে সঙ্গীতের মতো।"[২]

অসীম সত্তা ব্যক্তি মানুষের মন অতিক্রম করে সকল মানুষের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এই সত্তার কাজ হল সকল ব্যক্তি মানুষের জন্য অবস্থান করে মহৎ কর্মে প্রেরণা দেওয়া। বহু চেষ্টা করে মানুষ খুঁজে পেয়েছে সেই অন্তরের সত্তাকে, যে সত্তা বাস্তব সত্তার চেয়ে মহৎ। যার সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে অচিন পাখি অন্তরে আসা-যাওয়া করে। এই সত্তায় মানুষকে মনে করিয়ে দেয় বাস্তব পরিচয়ের উপরেও আর একটি বড় পরিচয় আছে।

অসীম সত্তা বা আধ্যাত্মিকতার মধ্যেই সৃষ্টির ক্রিয়া-কলাপ চলতে থাকে। এই অসীম সত্তা হল মানুষের উদ্বৃত্তের পরিচালক। ব্যক্তি সত্তার সীমানা ছাড়িয়ে মানুষ যেখানে নিখিল ভুবনে পদার্পণ করে, সেখানেই সৃষ্টির ক্ষেত্র। এটিই হল মানুষের উদ্বৃত্ত সত্তা। এই উদ্বৃত্ত সত্তাটি তিনি অথর্ববেদ থেকে গ্রহণ করেছেন। অথর্ববেদে বলা হয়েছে-

"ঋতং সত্যং তপো রাষ্ট্রং শ্রমো ধর্মশ্চ কর্ম চ
ভূতং ভবিষ্যদুচ্ছিষ্টে বীর্যং লক্ষ্মীর্বলং বলে।"

"ঋতসত্য, তপস্যা, রাষ্ট্র, শ্রম, ধর্ম, ভূত-ভবিষ্যৎ, বীর্য, সম্পদ, বল সবকিছুই উচ্ছিষ্টে বা উদ্বৃত্তে আছে। অর্থাৎ মানবধর্ম বলতে আমরা যা বুঝি প্রকৃতির প্রয়োজন সে পেরিয়ে, সে আসছে অতিরিক্ততা থেকে। জীব জগতে মানুষের বাড়তি ভাগ। প্রকৃতির বেড়ার মধ্যে তাকে কুলোল না। ইতিপূর্বে জীবানুকোষের সঙ্গে সমগ্র দেহের সম্বন্ধ আলোচনা করেছিলুম। অথর্ববেদের ভাষায় বলা যেতে পারে, প্রত্যেক জীবকোষ তার অতিরিক্তের মধ্যে বাস করে। সেই অতিরিক্ততাতেই উৎপন্ন হচ্ছে স্বাস্থ্য আনন্দ শক্তি, সেই অতিরিক্ততাকেই অধিকার করে আছে সৌন্দর্য, সেই অতিরিক্ততাতেই প্রসারিত হয় ভূত-ভবিষ্যৎ। জীবকোষ এই সমগ্র দেহগত বিভূতি উপলব্ধি করে না। কিন্তু, মানুষ প্রকৃতি নির্দিষ্ট আপন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যকে পেরিয়ে যায়; পেরিয়ে গিয়ে যে আত্মিক সম্পদকে উপলব্ধি করে অথর্ববেদে তাকেই বলেছেন, ঋতং সত্যম।"[৩]

এই উদ্বৃত্ত সত্তাতে সত্য, সুন্দর, তপস্যা ও মঙ্গল এইসব গুণগুলি দেখা যায় এবং এই গুণগুলির যখন প্রকাশ ঘটে তখন মানুষ নিজের পরমাত্মাকে সত্তাকে উপলব্ধি করে।

রবীন্দ্রনাথের মতে অসীম সত্তা উদ্বৃত্তের নামান্তর। অসীম প্রকৃতির সব থেকে বড় দিকটি হল আনন্দের উপলব্ধি। এই উপলব্ধি আত্মার মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই উপলব্ধি মানুষকে দেহের উর্ধ্বে নিয়ে যায়। এপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন

"দেহের দিক থেকে মানুষ যেমন ঊর্ধ্বশিরে নিজেকে টেনে তুলেছে খন্ডভূমি থেকে বিশ্বভূমির দিকে, নিজের জানাশোনাকেও তেমনি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে জৈবিক প্রয়োজন থেকে, ব্যক্তিগত অভিরুচি থেকে। জ্ঞানের এই সম্মানে মানুষের বৈষয়িক লাভ হোক বা না হোক, আনন্দ লাভ হল। এতেই বিস্ময়ের কথা। পেট না ভরিয়েও কেন হয় আনন্দ। বিষয়কে বড়ো করে পাই বলে আনন্দ নয়, আপনাকেই বড়ো করে, সত্য করে পাই বলে আনন্দ। মানবজীবনের যে বিভাগ অহেতুক অনুরাগের অর্থাৎ আপনার বাহিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ যোগের তার পুরস্কার আপনারই মধ্যে। কারণ, সেই যোগের প্রসারেই আত্মার সত্য।"[৪]

অসীম সত্তার গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সে নিজের ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতাকে ছাড়িয়ে যায়। যেখানে মানুষ সাধারণ জীব মাত্র সেখানে সে জৈবিক কাজকর্মের অধীন। এখানে মানুষ প্রয়োজনের দাস। যেখানে মানুষ মুক্ত সেখানেই সৃজনশীলতার ক্ষেত্র। মানুষের শক্তি কাজের জগতে প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়োজিত থাকে। জৈবতার ক্ষেত্রে মানুষের শক্তি নিঃশেষিত নয় এবং বাইরে আছে উদ্বৃত্তের শক্তি, যা শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতের ক্ষেত্রে নিয়োজিত। অধ্যাপক হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টিকে একটি উপমার সাহায্যে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলছেন,

"ব্যক্তির সঙ্গে একটি রাজনৈতিক অর্থে জাতির তুলনা করা যেতে পারে। বহু ব্যক্তি একটি ভৌগলিক খন্ড অধিকার করে একটি জাতি গড়ে তোলে। ব্যক্তির যেমন নিজের স্বার্থের গন্ডির মধ্যে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল, তেমন জাতির ক্ষেত্রে জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের সহায়ক

নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা ক্রিয়াশীল হয়। ওই জাতির অবস্থিতি এক বিশেষ ভূখণ্ডে নয়, সেই ভূখন্ডে যে মানুষগুলি বাস করে তাদের মনের মধ্যেই। জাতিবোধরূপে তা জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অবস্থিত এবং ব্যক্তি মানুষকে অবলম্বন করেই তা ক্রিয়াশীল। জাতি গড়ে তোলবার এবং জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন হল আত্মত্যাগ করবার প্রেরণা জাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির মনে উদয় হয় তাকে তার ক্ষুদ্র স্বার্থের গন্ডি ডিঙিয়ে বৃহত্তর কল্যাণ কর্মে প্রণোদিত করে।"[৫]

রবীন্দ্রনাথ মানুষের মধ্যে উদ্বৃত্ত বা অতিরিক্তের কথা বলেছেন, এই উদ্বৃত্ত হল মানুষের ঐশ্বর্য। এই অতিরিক্তের প্রকাশ ঘটলেই ব্যক্তি স্বরূপের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। শিল্প সাহিত্য ও সংগীত ইত্যাদিতে মানুষের এই অতিরিক্ত প্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশেই মানুষের যত আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন গোপণে বসবাসকারী সত্তাটি মানুষকে মহৎ কর্মের প্রেরণা দেয়। মানুষের সকল কীর্তিময় কর্মের ফলশ্রুতি এই সত্তাটি। তিনি ব্যক্তি মানুষকে শিল্পী করেন। তিনি মানুষের মধ্যে থাকেন এবং সকল মানুষকে ব্যাপ্ত করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথ অসীম বা আধ্যাত্মিক সত্তাটিকে বোঝার জন্য নানা শব্দের ব্যবহার করেছেন। তিনি 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে 'বড়ো আমি' আবার 'The Religion of Man' গ্রন্থে Man The Eternal আবার 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে 'মানবব্রহ্ম' বলে অভিহিত করেছেন। কখন 'প্রাণের মানুষ', 'মহামানব' আবার কখন বা 'অন্তর্যামী' নামেও অভিহিত করেছেন। আবার তিনি এই মহান সত্ত্বাটিকে বিশ্ব মানব বলে চিহ্নিত করেছেন। একটি গানের মধ্য দিয়ে সেই ভাবটি ফুটে উঠেছে-

"পেয়েছি সন্ধান তব অন্তর্যামী, অন্তরে আমি দেখেছি তোমারে
চকিতে চপল আলোকে, হৃদয় শতদল মাঝে,
হেরিনু একি অপরূপ রূপ।।"[৬]

বিশ্বমানব সত্তার কাজ হল সকল ব্যক্তি মানুষের মধ্যে অবস্থান করে মহৎ কার্যে প্রেরণা দেওয়া। এই সত্তার মধ্যেই সৃষ্টির কার্যকলাপ চলতে থাকে। বিশ্বমানবসত্তা হল মানুষের উদ্বৃত্তের পরিচালক। আমরা উপলব্ধির দ্বারা অসীমসত্তা বা বিশ্বমানবসত্তার স্বরূপকে জানতে পারি, কিন্তু উপলব্ধির মূল বাধা হল অহংভাব। মানুষ পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এই অহং ভাবের জন্য। নিজের সঙ্গে বিশ্বজগতের সম্পর্ক আপাত বিরোধের সম্পর্ক। এই সম্পর্কের অবসান ঘটলেই বিশ্বজগতের সঙ্গে নিজেকে এক করে ফেলি, তখন অপরের সুখ-দুঃখ, প্রীতি, প্রেমকে উপলব্ধি করতে পারি। এইরকম উপলব্ধি 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে লক্ষ্য করি –

"...দেখিয়া আমার চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া আসিল। তখন, সে যে একজন কাবুলিওয়ালা আর আমি একজন বাঙালি সম্ভ্রান্তবংশীয় তা ভুলিয়া গেলাম... তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে, সেও পিতা আমিও পিতা।"[৭]

আমরা যখনই ভালো কিছু করতে যাই এবং তার জন্য অনেক কষ্ট ভোগও করি এবং তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতেও রাজি থাকি তখন আমরা এই সত্তার অনুভূতির টের পাই। মানুষের এই সত্তাটি ক্রমাগত নিজের ব্যক্তিগত সীমানাকে অতিক্রম করতে চাই। বিশ্বের সকল মানুষকে একাত্তরূপে দেখতে চাই। এই অসীম সত্তাতেই মানুষের পূর্ণতা।

সকল মানুষের মধ্যে এমন একটি সত্তা রয়েছে যা মানুষের মধ্যে অবস্থান করে মানুষকে অসীমের পথে চালিত করে। এই সত্তাকে তিনি পরমসত্তা বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি এই পরমসত্তাকে উপলব্ধি করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারলেন না, তিনি পরমসত্ত্বাকে পেতে চাইলেন। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন সমস্ত বন্ধন অতিক্রম করে সেই পরমসত্তার কাছে যেতে হবে। জগতে সর্বত্র পরমসত্তার রূপটি উদ্ভাসিত হয়ে আছে। এই পরমসত্তাই পৃথিবীর পালনকর্তা, আর পরমসত্তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনই হল মানুষের ধর্মবোধ। কেউ তাকে জ্ঞানশক্তি প্রয়োগ করে পেতে চেয়েছেন, কেউ তাকে কর্মের মাধ্যমে আবার কেউ তাকে ভক্তির মাধ্যমে পেতে চেয়েছেন।

মানুষের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে এই পরমসত্তা। একেই রবীন্দ্রনাথ অনেক জায়গায় 'জীবনদেবতা' বলে চিহ্নিত করেছেন। তিনি 'জীবনদেবতাকে' জীবনের কর্ণধার বলে মনে করতেন। এই জীবনদেবতা মানুষের মধ্যেই অবস্থান করেন।

মানুষের সঙ্গে তার সম্পর্কটি হল পরিচালক ও অভিনেতার মত। পরিচালক ও অভিনেতা দুজনেই ব্যক্তিরূপীসত্তা দুজনের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক। পরিচালক অভিনয় করেন না, অভিনেতাকে দিয়ে অভিনয় করান। অভিনেতা ভালো অভিনয় করলে পরিচালক তৃপ্তি পান। আনন্দ পান আবার খারাপ অভিনয় করলে বেদনা পান। অভিনেতার ভিতর দিয়ে নিজের তৃপ্তি খোঁজেন না। অনুরূপভাবে জীবনদেবতা জীবনের অভিনয়েও আছেন এবং বাহিরেও আছেন। তিনি ব্যক্তি মানুষকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে নিজের ইচ্ছা পূরণের চেষ্টা করেন। আমরা ভালো কাজ করলে তিনি আনন্দ পান খারাপ কাজ করলে তিনি দুঃখ পান, আমাদের আনন্দে তিনি আনন্দিত হন দুঃখে দুঃখী হন। এই 'জীবনদেবতা' রূপী পরমসত্তাটি ব্যক্তিরূপী ঈশ্বর হয়ে তার হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করে আছেন। ইনি জগতের সৃষ্টিকর্তা, ইনি ভক্তদের সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান। ভক্তের জীবন সার্থক হলেই তাঁর নিজের সার্থকতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

"তাই তোমার আনন্দ আমার পর
তুমি তাই এসেছো নিচে
আমায় নইলে ত্রিভুবনেরশ্বর,
তোমার প্রেম হতো যে মিছে"।[৮]

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় এই হল সীমার মাঝে অসীম লীলা। এখানে ঈশ্বর ও ভক্ত উভয়ে মিলে ভক্তের জীবনকে পরিস্ফুট করেছেন।

অহং ও আত্মার মধ্যে দ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ এই অহং ও আত্মার দ্বন্দ্ব ব্যাখ্যা করেছেন এই রকম করে। তিনি বলেছে–

> "শত্রুহননের সহজ প্রবৃত্তি মানুষের জীবনধর্মে, তাকে উত্তীর্ণ হয়ে মানুষ অদ্ভুত কথা বললে 'শত্রুকে ক্ষমা কর' এই কথাটা জীবনধর্মের হানিকর, কিন্তু মানবধর্মের উৎকর্ষলক্ষণ।"[৯]

এই আমি ক্ষুদ্র স্বার্থ সংস্কারবদ্ধ, এই আমিত্ববোধ অন্য সব কিছু থেকে আমাকে আলাদা করে দিচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন –

> "এই যে আমিত্ব বলে একটা জিনিস, এর দ্বারাই জগতের অন্য সমস্ত কিছু হতেই আমি স্বতন্ত্র। আমি জানছি যে আমি আছি, এই জানাটি যেখানে জাগছে সেখানে অস্তিত্বের সীমাহীন জনতার মধ্যে আমি একেবারে একমাত্র। আমি হচ্ছি আমি, এই জানাটুকুর অতি তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা এই কণামাত্র আমি অবশিষ্ট ব্রহ্মাণ্ডকে নিজের থেকে একেবারে চিরবিচ্ছিন্ন করে নিয়েছে, নিখিল-চরাচর কে আমি এবং আমি-না এই দুই ভাগে বিভক্ত করে ফেলেছে।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য' নামক প্রবন্ধে মানুষ ও ব্রহ্মের তিনটি স্বরূপের পার্থক্য করেছেন। ব্রহ্মের মতো মানুষেরও তিনটি স্বরূপ - যেমন 'আমি আছি', 'আমি জানি' ও 'আমি প্রকাশ করি'। প্রথমটি হল মানুষের প্রবৃত্তির দিক এখানে মানুষ নিজেকে রক্ষা করে, বংশ রক্ষা করে ইত্যাদি। দ্বিতীয়টি মানুষের জ্ঞানের দিক, জ্ঞান মানুষের আত্মরক্ষার ক্ষেত্রেও প্রয়োজন। তৃতীয়টি অন্যের সঙ্গে মিলনের জন্য মানুষ নানাভাবে নিজেকে প্রকাশ করে। 'আমি আছি' এটি ব্রহ্মের সত্যস্বরূপের অন্তর্গত 'আমি জানি' এটি ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপের অন্তর্গত এবং 'আমি প্রকাশ করি' - এক্ষেত্রে মানুষ প্রাচুর্যকে নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে না। এটি হল মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত, যা মানুষের আনন্দের দিক। আবার এটিকে উদ্বৃত্তের দিক ও বলা যায়। 'আমি আছি' - এই বোধের মধ্যে দিয়ে মানুষ নিজেকে চেনে ও জানে। এই জানার মধ্য দিয়েই মানুষের আত্ম উপলব্ধি ঘটে।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মানবসত্তা এক চলমান সত্তা। এই সত্তা নিয়ত প্রগতিশীল, এই প্রগতি ব্যাপকতার দিক থেকে প্রগতি। মানুষ নিরন্তর নিজেকে অতিক্রম করে চলেছে, নিজেকে অতিক্রম করার অর্থ হল সীমিত গণ্ডীর বাইরে যাওয়া। মানবসত্তার এই যে স্বরূপ তার দ্বারা সে ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর এবং ব্যাপকতর থেকে ব্যাপকতমের দিকে ধাবমান। এই ব্যাপকতম সত্তা মানবসত্তা প্রকৃতিসত্তা ও পরমসত্তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। সুতরাং যথার্থ মানবসত্তা কোন বিছিন্ন সত্তা নয়।

তথ্যসূত্র:

১) মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৬২৩।
২) এবার ফিরাও মোরে, (চিত্রা কাব্যগ্রন্থ) রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৬৩২।
৩) মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৬৩২।
৪) মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৬২৪।
৫) উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, হিরণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, নবপত্র, কলকাতা, পৃষ্ঠা, ১৫৬।
৬) গীতবিতান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পতিতপাবন পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা, ১৯৫।
৭) কাবুলিওয়ালা, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, নবম খন্ড, পৃষ্ঠা, ৬৩২।
৮) গীতাঞ্জলি, ১২১ নং কবিতা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৮১।
৯) মানুষের ধর্ম, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৬৩৯।
১০) জাগরণ, শান্তিনিকেতন, রবীন্দ্র রচনাবলী, অষ্টম খন্ড, বিশ্বভারতী, পৃষ্ঠা, ৫৮৪।

গ্রন্থপঞ্জী:

১) রবীন্দ্র রচনাবলী, (দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, দশম খন্ড), বিশ্বভারতী, পুনর্মুদ্রণ পৌষ, ১৪১৭।
২) চক্রবর্তী, বসুধা, মানবতাবাদ, দীপায়ন, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭।
৩) নিয়গী, গৌতম, রবীন্দ্রনাথ ও মানুষের ধর্ম, অভিযান পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, ১৪২০।
৪) পদ্দার, অরবিন্দ, মানবধর্ম ও বাংলা কাব্য মধ্যযুগ, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, ১৯৯৯।
৫) ঘোষ, পীযূষকান্তি, মানবধর্ম, ব্যানার্জি পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১০ই জুন, ২০০২-০৩।
৬) বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২৫ শে জানুয়ারী, ১৯৯৫।
৭) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, পতিতপাবন পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০২১।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 979-984
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.093

অদ্বৈতবেদান্তের আলোকে জগতের কারণতা উপপাদন: একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

প্রশান্ত মাঝি, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 17.03.2025; Send for Revised: 18.03.2025; Revised Received: 20.03.2025; Accepted: 22.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This world is another widely studied subject of philosophy like matter, life, mind, sense-organs, soul and Supreme Soul. Although the nine philosophical school in Indian Philosophy like the nine Planets in the sky is discussed about the world, the exceptional thinking of Advaita Vedanta Philosophy regarding the world is a novel matter. Because Advaita Vedantas holds the opinion that Brahman is true, the world is false and the soul and Brahman are identical. In view of such a conclusion of Advaita Vedanta, the questions that arise in our mind are - if everything is Brahman and if Brahman is the only true object, then what is this constantly changing world? And what is the cause of this visible world? Since in the world of philosophical thought, everything is bound by the chain of cause and effect. In the present article, an attempt will be made to establish that Brahman is both the efficient cause and material cause of the world thorough analysis of the doctrine of Advaita Vedanta, with the help of various core texts.

Keyword: *Brahma, Jagat̲, Upadana karaṇa, Nimitta karaṇa, Sat̲karyabada, Asat̲karyabada, Pariṇamabada, Bibartabada*

দর্শনের একটি বহুল চর্চিত বিষয় হলো জগৎ। তবে জগতের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনা এটি অদ্বৈতবেদান্ত দর্শনের একটি অভিনব বিষয়। জীব ও পরম ব্রহ্মের অভেদ সাক্ষাৎকার বা অদ্বয় ভাবনা, যা মুক্তির উপায় বলে অদ্বৈতবেদান্তে বর্ণিত হয়েছে তা কেবল তখনই সম্ভব হয় যখন ভোক্তা জীব এই ভোগ্য এবং জগৎ প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা বলে দৃঢ় নিশ্চয় হয়। অদ্বৈতবেদান্তীদের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য জগত মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। অদ্বৈতবেদান্তীদের এরূপ সিদ্ধান্ত পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে প্রশ্ন হয় সবকিছুই যদি ব্রহ্মময় হয় এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্যবস্তু হয় তাহলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল জগত কী? বা দৃশ্যমান জগতের কারণ কী? এরূপ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক কেননা দার্শনিক চিন্তার জগতে সমস্ত কিছুই কার্য-কারণ শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত। উক্ত প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন,জগতকে মিথ্যা বলা হলেও জগতকে অসৎ বলা হয় না কারণ তাহলে সর্বজনসিদ্ধ লোকব্যবহার ব্যাখ্যা করা যাবে না। তাই জগতের পারমার্থিক বা শাশ্বত সত্তা স্বীকার না করলেও তার ব্যবহারিক সত্তা স্বীকার করা হয়। অদ্বৈতবেদান্ত মতে জগৎ হল ভ্রমীয় বিষয়। বস্তুতঃ অদ্বৈতবেদান্তমতে ভ্রমীয় বিষয় বাধিত বা মিথ্যা। বাধিত বিষয়ক জ্ঞান হওয়ায় ভ্রম জ্ঞানকে অদ্বৈতরা মিথ্যা বা অনির্বচনীয় বলেন। অদ্বৈতবেদান্তমতে জগত মুক্তি কালে বাধিত হয় বলে জগত এবং জগৎ বিষয়ক জ্ঞানও মিথ্যা। আর কোন সৎ পদার্থ থেকে এইরূপ জ্ঞান ও তার বিষয়ের উৎপত্তি অসম্ভব বলে এদের উপাদান কারণ রূপে অদ্বৈতবেদান্তরা অজ্ঞান নামক একটি মিথ্যা পদার্থ স্বীকার করেন। যেহেতু মিথ্যা উপাদান ব্যতিরেকে মিথ্যা জগতের উৎপত্তি সম্ভব নয় তাই অদ্বৈতবেদান্তরা অজ্ঞানকে জগতের মূল উপাদান কারণ বলে থাকেন। এখন প্রশ্ন হবে অজ্ঞান কি জগতের উপাদান কারণ আর ব্রহ্ম কি নিমিত্ত কারণ? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তিরা বলেন, অজ্ঞান

জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্ম উপাদান কারণও নিমিত্ত কারণও উভয় হয়। এ প্রসঙ্গে আমরা বেদান্ত-পরিভাষায় দেখতে পাই ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র বলেন,অবিদ্যা বা অজ্ঞান যখন ব্রহ্মকে আশ্রয় ও বিষয় করে তখনই ব্রহ্ম বিলাসের দ্বারা বা ইক্ষণ রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা ভূত- ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় হয়। জগতের এই সৃষ্টি,স্থিতি এবং লয় কর্তৃত্ব হল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অদ্বৈতবেদান্তমতে উপাদান কারণ দ্বিবিধ। যথা-পরিণামী উপাদান কারণ এবং বির্বত উপাদান কারণ। বস্তুর তত্ত্বতঃ অন্যরূপে যে প্রকাশ তা হল বিকার বা পরিণাম। আর বাস্তবিক অন্য প্রকার না হয়েও যে অন্যরূপে প্রকাশ তাকে বিবর্ত বলে। যেমন- রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ক্ষেত্রে সর্পের উপাদান কারণ রজ্জু ও রজ্জুর অজ্ঞান উভয়ই। তবে রজ্জুতে সর্পের বিবর্ত উপাদান কারণতা এবং রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞানে সর্পের পরিণামি উপাদান কারণতা বিদ্যমান, অনুরূপভাবে ব্রহ্মে জগতের বিবর্ত উপাদান কারণতা ও ব্রহ্ম বিষয়ক অজ্ঞানে জগতের পরিণামি উপাদান কারণতা বিদ্যমান। এইভাবে বর্তমান প্রবন্ধে উপপাদনের চেষ্টা করা হবে যে, ব্রহ্মই হল জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

অদ্বৈতবেদান্তে মুক্তির উপায় হিসেবে জীব ও পরমব্রহ্মের অভেদ সাক্ষাৎকার বা অদ্বয়ভাবনা বর্ণিত হলেও, তা কেবল তখনই সম্ভব হয় কেবল-যদি ভোক্তা জীবের এই ভোগ্য এবং জগত প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা বলে দৃঢ় নিশ্চয় হয়। অদ্বৈতবেদান্ত মতে, 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা, জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এটাই অদ্বৈতবেদান্তিদের সিদ্ধান্ত। অদ্বৈতবেদান্তীদের এরূপ সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে সবকিছুই যদি ব্রহ্মময় এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু হয়, তাহলে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল জগত কী? বা দৃশ্যমান জগতের কারণ কী? আর এরূপ প্রশ্ন হওয়া স্বাভাবিক কেননা, দার্শনিক চিন্তার জগতে সমস্ত কিছুই কার্য-কারণ শৃঙ্খল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

ভারতীয় দর্শনে আমরা কার্য-কারণ বিষয়ে মূলত দুটি দিকের উল্লেখ পাই, যথা- সৎকার্যবাদ ও অসৎকার্যবাদ। সৎকার্যবাদ অনুসারে, কার্য সৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে। অসৎকার্যবাদ অনুসারে, কার্য অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্বে কার্য কারণে বিদ্যমান থাকে না। সৎকার্যবাদের আবার দুটি দিক আছে। যথা-পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। এখন আমরা সৎকার্যবাদের উভয় দিককে জানার প্রতি মনযোগী হব।

সৎকার্যবাদের দুটি দিকের মধ্যে পরিণামবাদ অনুসারে, কারণের পরিণাম হচ্ছে কার্য এবং কারণ প্রকৃতই কার্যে পরিণত হয়। কারণে যা অব্যক্ত রূপে বর্তমান কার্যে তা ব্যক্তরূপে প্রকাশ পায়। কারণে যা সুক্ষ্মরূপে থাকে কার্যে তারই স্থূলতা প্রাপ্তি হয় মাত্র। যেমন- মৃত্তিকা হল কারণ এবং ঘট হল কার্য। মৃত্তিকা যথার্থই ঘটে পরিণত হয়। তেমনি তন্তু থেকে যখন পট উৎপন্ন হয় তখন তন্তু প্রকৃতই পটে পরিণত হয়। এই পরিণামবাদের সমর্থক দর্শন সম্প্রদায় হল সাংখ্য, যোগ ও রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। সৎকার্যবাদ-ই পরিণামবাদের ভিত্তি। কার্যবর্গ এইমতে উপাদান কারণেরই পরিণাম মাত্র।

অদ্বৈতবাদীরা পরিণামবাদের মূলসূত্র গ্রহণ করলেও সাংখ্যোক্ত সৎকার্যবাদ অথবা বৈষ্ণববেদান্তীদের পরিণামবাদ অনুমোদন করেন নাই। তিনি সৎকার্যবাদের পরিবর্তে সদবিবর্তনবাদ বা সৎকারণবাদ সমর্থন করেছেন এবং কার্যবর্গকে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করেছেন। ব্রহ্ম পরিণামবাদী বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায় বলেন, পরমব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ এবং দৃশ্যমান জগৎ হল ব্রহ্মের পরিণাম। মাটি যেমন ঘটরূপে পরিণত হয়, দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, পরমব্রহ্ম ও সেইরূপ জগৎরূপে পরিণত হয়। এবিষয়ে প্রমাণ স্বরূপ 'যতো বা ইমানি ভূতানি জয়ন্তে' ইত্যাদি শ্রুতি এবং এই শ্রুতির ভিত্তিতে রচিত - "জন্মাদ্যস্য যতঃ"[১] প্রভৃতির উল্লেখ করা যায়। এই ব্রহ্মসূত্রেও জগতের উপাদান ব্রহ্মের এইরূপে জগদাকারে পরিণামের কথা বলা হয়েছে। অদ্বৈতবেদান্তী আচার্য শঙ্কর ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে ব্রহ্মের জগৎ উপাদানত্ব প্রকারন্তরে সমর্থন করেছেন এবং তারপক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, মাটি যেমন ঘটরূপে পরিণত হয়, সোনা যেমন স্বর্ণময় ভূষণে পরিণত হয় প্রভৃতির উল্লেখ করেন। তবে বিবর্তবাদী শঙ্করাচার্যের মতে, উক্ত পরিণাম সকল সত্য নয়, মিথ্যা । কারণই সত্য, কার্য মিথ্যা; মাটিই সত্য, ঘট মিথ্যা; ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা। এ বিষয়ে বলা হয় -

'বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'

ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ও জাগতিক ঘট প্রমুখ বস্তুসকল মিথ্যা এবং তাদের উপাদান মাটি প্রভৃতি সত্য, এরূপ ব্যক্ত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে, ঘট প্রভৃতি মৃন্ময় বস্তুর উপাদান মাটি, এই উপাদানরূপ মাটি, শরা প্রভৃতি রূপে রূপায়িত হয়ে বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ করে। আবার সোনার বিশেষ বিশেষ আকারকে কখনও হার বলি, কখনও বালা প্রভৃতি নামে অভিহিত করে থাকি কিন্তু এই সমস্ত বস্তুর উপাদান হল সোনা। উপাদানরূপ সোনা বা মাটিকে বাদ দিয়ে স্বতন্ত্রভাবে ঘট বা বালা সত্য নয়। কজেই বিশেষ বিশেষ বস্তুকে সত্য বলতে হলে তাদের উপাদানকে আগে সত্য বলতে হবে। আবার যেখানে বলা হয়, কাপড় সূতোর এক প্রকার বিশেষ অবস্থা সেখানে সৎকার্যবাদীরা ভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কাপড়ের উপাদান সূতাকেও যেমন সত্য বলা হয়েছে, তেমনি লজ্জানিবারণকারী বস্ত্রকেও সেরূপ সত্য বলেছেন। তবে এইরূপ অদ্বৈতবেদান্তীরা স্বীকার করেন না। এ প্রসঙ্গে অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন, যখন কাপড়ের উপাদান সূতোগুলি বিশেষ এক প্রকার সংযোগ সূত্রে গ্রোথিত হলে, তখন সূতো গুলিকে আমরা কাপড় বলে থাকি। তবে পরস্পরের গ্রথিত সূতোগুলি খুলে নিলে, কাপড়কে তার উপাদান অর্থাৎ সূতোর মতো সত্য বলতে হবে এরূপ যুক্তি নেই অদ্বৈতবেদান্তীদের কাছে এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত স্বরূপ যখন দড়িকে সাপ রূপে দেখে লোকে চিৎকার করে ভয়ে কাঁপতে থাকে, প্রভৃতি এইজন্য রজ্জুসর্পকে সত্য বলা যায় কি? কাজেই দেখা যায় যে কোনো প্রকার কার্যকারিতা থাকলেই তাকে সত্য বলা যায় না। তবে মিথ্যা রূপ রজ্জুতে সর্প প্রভৃতির কার্যকারিতাকেও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সত্য বলতে বস্তুর অপরিবর্তনশীল ধর্মকে বোঝায়। আর এইরূপ সত্যতা কেবল উপাদানেরই আছে। ফলে অদ্বৈতবেদান্তীরা উপাদানকেই কেবল সত্য বলেন, উপাদেয় হল মিথ্যা। কাজেই উক্ত দৃষ্টান্তানুযায়ী মাটিই সত্য, ঘট প্রভৃতি সত্য নয়। তবে ঘট প্রভৃতিকে সত্য বলতে হলে তাদের উপাদান মাটি রূপেই তা সত্য হয়ে থাকে ঘট প্রভৃতি কার্যরূপে সত্য নয়। এক্ষেত্রে দেখা গেল যে অদ্বৈতবেদান্তীরা 'কার্য কারণেরই অবস্থান্তর' এই মূলসূত্র অনুসরণ করে সৎকারণবাদ বা কার্যমিথ্যাত্ববাদকে সমর্থন করেন।

অদ্বৈতবেদান্তোক্ত সৎকারণবাদের কথা আমরা ব্রহ্মসূত্রে পায় –

'তদনন্যত্বমারম্ভন শব্দাদিভ্যঃ'। ব্রঃ সূঃ ২।১।১৪ ।

আবার এই আরম্ভণাধিকরণের উল্লেখ আমরা শাঙ্করাভাষ্য ভামতী প্রভৃতিতে দেখা যায়। অদ্বৈতবেদান্তোক্ত অনন্য পদটির ব্যাখ্যায় বাচস্পতিমিশ্র তার ভামতীতে বলেন –

'ন খল্বনন্যত্বমিত্যভেদং ব্রূমঃ,
কিন্তু ভেদং ব্যাসেধামঃ' । ব্রঃ সূঃ ভামতী – ২।১।১

উক্ত অনন্য শব্দটির অর্থ এখানে আমরা কার্য ও কারণের অভেদকে না বুঝে তাদের ভেদের নিষধকে বুঝব। আর এই উভয়ের ভেদের নিষেধের দ্বারা অদ্বৈতীরা বলতে চান যে, কারণের সত্যতা ব্যতীত কার্যের কোনো নিজস্ব সত্যতা নেই। এরূপ অবস্থায় কার্যকে কার্যরূপে সত্য বলার অর্থ নেই।

আবার আমরা ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখতে পায় –

'বাচারম্ভনং বিকারো নামধেয়ম্ মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'। ছান্দোগ্য, উপ, ৬।১।১

উক্ত শ্রুতির ব্যাখ্যায় অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন, 'মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' মাটিই কেবল সত্য, এরূপ কথার দ্বারা এটাই বোঝানো হয় যে, কার্য সকল বিভিন্ন নামে এবং বিভিন্ন রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হলে ও ঐ নাম রূপময় কার্যবর্গ সত্য নয়, মিথ্যা, এদের মাটি রূপ উপাদানই কেবল সত্য।

উক্ত আলোচনার দ্বারা বোঝা গেল ঘটাদি রূপ পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চ কার্যবিশেষ। আর যেহেতু তারা কার্য তাই তাদের কারণ অবশ্য বর্তমান। যেমন ঘট রূপ কার্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ঘটার্থী কুম্ভকার মৃত্তিকা, দন্ড, চক্র প্রভৃতির সাহায্যে কম্বুগ্রীবাদিমান্ ঘটাখ্য একটি মৃণ্ময় দ্রব্য নির্মাণ করে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, কার্যমাত্রই একাধিক কারণ থেকে উৎপন্ন হয়ে থাকে। যা কার্যের নিয়ত পূর্ববতী এবং যা অন্যথাসিদ্ধ নয় তাকেই নৈয়ায়িকরা কারণ বলেন, আবার সাংখ্য দর্শনে কারণতা বিশিষ্ট বস্তুকে নিমিত্ত এবং উপাদান ভেদে দ্বিবিধ বলা হয়। যে কারণে কার্যটি উৎপন্ন হয়ে আশ্রিত থাকে তাকে উপাদান এবং তদ্ভিন্ন কারণকে নিমিত্ত কারণ বলা হয়। নিমিত্ত কারণই কারণকে নিয়ন্ত্রিত করে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় ঘটের ক্ষেত্রে কুম্ভকারই নিমিত্তকারণ ও মৃত্তিকা উপাদান কারণ। এরূপ জানার তার স্বাভাবিক ভাবে মনে প্রশ্ন হয় তাহলে এই বিশ্বপ্রপঞ্চের নিমিত্ত কারণে কে? বা উপাদান কারণ কে? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে আচার্য সদানন্দযোগীন্দ্র বলেন –

"অজ্ঞানোপহিতনং চৈতন্যং স্বপ্রধানতয়া নিমিত্তং স্বোপাধিপ্রধানতয়া উপাদানং চভবতি"[২]

অর্থাৎ অজ্ঞানের দ্বারা উপহিত চৈতন্য স্বপ্রধান বা চৈতন্যপ্রধানরূপে নিমিত্তকারণ হন এবং নিজের উপাধি বা অজ্ঞানরূপে শরীরপ্রধানরূপে উপাদানকারণ হন। কিন্তু নৈয়ায়িকরা এখানে আপত্তি করতে পারেন যে, নিমিত্ত ও উপাদানকে তো সর্বত্র আলদা করেই পাওয়া যায়, তাছাড়া চেতন কি করে কার্যের সাক্ষাৎ উপাদান হবেন? জড়ের উপাদনত্ব তো প্রসিদ্ধ। সাংখ্যমতে যা পরিণামী তাই উপাদান। অপরিণামীর অধিকারী চৈতন্য জগতের উপাদান হবে কোন যুক্তিতে? তাই সাংখ্য দর্শন প্রকৃতিকে জগতের উপাদান বলে। 'ব্রহ্মসূত্রনম্' গ্রন্থে এ বিষয়ে বলা হয়-

"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ"

উক্তসূত্রের ব্যাখ্যায় বলা হয় ব্রহ্ম জগতের কেবল প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারন নয়, তিনি জগতের নিমিত্ত কারণও। উক্ত সূত্রের পূর্বপক্ষের মত আচার্য শঙ্কর বলেন –

"তত্র নিমিত্তকারণম্ এব তাবৎ কেবলং স্যাৎ ইতি প্রতিভাতি। কস্মাৎ? ইক্ষাপূর্বক কতৃত্বশ্রবনাৎ।
...ইক্ষাপূর্বকং চ কর্তৃত্বং নিমিত্তকারণেষু এব কুলালাদিষু দৃষ্টম্" ।[৩]

অর্থাৎ পূর্বপক্ষীর মত হল ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণই শুধু হতে পারেন, উপাদান কারণ নয়। ঈশ্বর বা ব্রহ্মের এই জগৎ কর্তৃত্ব বিষয়ে বিভিন্ন শ্রুতির সমর্থনও পাওয়া যায় যেমন "স ইক্ষাং চক্রে" (প্রশ্নঃ উঃ ৬.৩), "সঃ প্রণাম অসৃজত" (ঐ ৬.৪) ইত্যাদি। আর ঈক্ষণ পূর্বক মানে কোন বিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করে যে কর্তৃত্ব। যেমন ঘটাদি কার্যের প্রক্ষিতে ইক্ষণপূর্বক কর্তৃত্বটি ঘটাদির প্রতি কুম্ভকার প্রভৃতি নিমিত্তকারণসমূহে দেখতে পাওয়া যায়। আচার্য সদানন্দযোগীন্দ্র উক্ত নৈয়ায়িক মত মানেন না, তিনি বলেছেন যে, ঘটাদি কার্যের ক্ষেত্রে নিমিত্ত এবং উপাদান পরস্পর ভিন্ন, এটা সত্য। কিন্তু তাই বলে এরূপ কোন নিয়ম করা যায় না যে, সবসময় কার্যের উপাদান থেকে নিমিত্ত কারণটি ভিন্নই হবে। একই বস্তু যে নিমিত্ত এবং উপাদান থেকে পারে তা লূতা অর্থাৎ মাকড়সার দৃষ্টান্তে প্রতিপন্ন হয়। মাকড়সা যে জাল তৈরী করে তার প্রতি মাকড়সাই নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়কারণ হয়ে থাকে। সে বহিঃতত্ত্ব বা তুরী বেমা প্রভৃতি নিমিত্তান্তরের সাহায্য ছাড়াই কেবল স্বশরীর-পরিণাম লালাকে আতানবিতানক্রমে গ্রথিত করে সুদৃশ্য জাল রচনা করে থাকে। অতএব, অন্যসহায়হীন মাকড়সাকেই জালের অভিন্ননিমিত্তোপাদান বলতে হয়। এস্থলে এটাও নিরূপিত হয় যে, যেস্থলে কর্তা কার্য-সম্পাদনে বহির্বস্তুর সাহায্য গ্রহণ করে সেখানেই নিমিত্ত (কর্তা) এবং উপাদান পরস্পর ভিন্ন হয়; তদ্ভিন্নস্থলে উক্ত কারণদ্বয় অভিন্নই হয়। যেমন, লুতা সেরূপ ঈশ্বর জগদ্রচনায় বহির্বস্তুর অপেক্ষা করেন না। যথা - 'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ'-শ্রুতি থেকে জানা যায় যে, সৃষ্টির পূর্বে এক সদাখ্যা দেবতাই বিদ্যমান ছিলেন, ফলে জগৎসর্জনে বস্তুন্তরের গ্রহণ সম্ভবই হয় না। অতএব ঈশ্বর ছাড়া আর কে উপাদান হবে? যদি আশঙ্কা করা হয় যে, চেতন ঈশ্বর কি প্রকারে জগদাকার প্রাপ্ত হলেন? নিরবয়ব চৈতন্যের তো কখনো পরিণাম দেখা যায় না, তা মুক্তিতঃ প্রাপ্তও হওয়া যায় না?- তার উত্তরে সদানন্দ যোগীন্দ্র বলেছেন যে, ঈশ্বর স্বশরীর সমষ্ট্যজ্ঞান-সহায়ে জগদাকারে পরিণত হয়েছেন। অর্থাৎ পূর্বে ঈশ্বরের যে স্বরূপ বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, ঈশ্বরের দুইটি অংশ-চৈতন্য এবং অজ্ঞান। চৈতন্যাংশ অবিকারী থাকিলেও অজ্ঞান-অংশ জগদাকারে পরিণত হতে পারে। অতএব, পরিণামের প্রতি শরীরই প্রধান; কিন্তু শরীরী ছাড়া কেবল শরীরের পরিণাম হয় না। এজন্য ঈশ্বরকে শরীর-প্রধানরূপে উপাদান বলা হইয়াছে। আর কার্যানুকূল যে জ্ঞান তাহা চৈতন্যেরই ধর্ম; কিন্তু তাহা শরীর-নিরপেক্ষ চৈতন্যে সম্ভব হয় না। এজন্য কার্যানুকূলজ্ঞানবত্ত্বরূপ যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব তার প্রতি চৈতন্যকেই প্রধান কারণ বলা হয়েছে। তিনি করণহীন হয়েও কর্তা 'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা স পশ্যত্যচক্ষুঃ শৃণোত্যকর্ণঃ' শ্রুতিতে তার জ্ঞানে করণাদিসাপেক্ষতা প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। নৈয়ায়িক প্রভৃতি যে ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্তকারণ বলেছেন তা শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুতি ব্রহ্মকে কেবল জগন্নিমিত্ত বলেনি, 'তজ্জলান্' ইত্যাদিবাক্যে ব্রহ্মকে তদুপাদানও বলা হয়েছে। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলা হয়েছে, যা থেকে ভূতসমূহ জন্মে, জন্মিয়া যাতে অবস্থান করে, এবং বিনাশকালে যাতে উপসংহৃত হয়, তাকে জানো, তিনিই ব্রহ্ম। উর্ণনাভি যেরূপ (নিজের দ্বারা) জাল বয়ন করে, আবার প্রয়োজন ফুরাইয়া গেলে তা নিজ মধ্যে সংহৃত করে, যেমনভাবে পৃথিবীতে ওষধিসকল আবির্ভূত হয়, অথবা যেরূপে চেতন পুরুষ থেকে অচেতন কেশলোমাদি উদ্ভুত হয়, সেরূপভাবেই অক্ষর পুরুষ থেকে এই বিচিত্র জগৎ প্রাদুর্ভূত হয়েছে। 'তথাহক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্'। 'জনিকর্তৃঃ প্রকৃতিঃ'-সূত্রের বৃত্তিতে দীক্ষিত বলেছেন, জায়মানের যেটি হেতু সেটি অপাদান, তাতে পঞ্চমী হয়। অতএব 'অক্ষরাৎ' শব্দে যে পঞ্চমী তা তার প্রকৃতিত্ববোধক। ভাষ্যকারও বলেছেন,- 'যদ্ধি যস্মাৎ প্রভবতি যস্মিংশ প্রলীয়তে তৎ তস্য উপাদানং প্রসিদ্ধম্। 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' ইত্যাদি শ্রুতিতে কর্তৃত্ব-কর্মত্বের একাশ্রয়ত্ব স্বীকৃত হয়েছে। 'সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ' 'নিরুক্তম্

অনিরুক্তং চ' প্রভৃতিশ্রুতিও ব্রহ্মের উপাদানত্ববোধক। 'কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্'-শ্রুতিস্থ 'যোনি' পদ ঈশ্বরের উপাদানত্বকে স্পষ্টতঃ প্রতিপাদন করেছে। এই ঈশ্বর অনুমানলভ্যও নহে; কিন্তু নির্দোষ, অপৌরুষেয় আগম-প্রতিপাদ্য। আর সেই আগম যখন ঈশ্বর থেকে জগতের উৎপত্তি এবং ঈশ্বরেই প্রলয় বর্ণনা করেছেন তখন তাকে অবশ্যই যুগপৎ নিমিত্ত এবং উপাদান স্বীকার করতে হবে। অন্যদিকে মিস্ত্রিমশাই যখন টেবিল তৈরী করেন তখন নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে নেন। তাই বলা চলে যে, যে স্থলে কর্তা কার্য সম্পাদনের জন্য বর্হিবস্তুর সাহায্যে নেন সে স্থলে তিনি নিমিত্তর্কতা। এরকম ক্ষেত্রেই নিমিত্ত এবং উপাদান পরস্পর আলদা হয়ে থাকে, কিন্তু এছাড়া অন্যস্থলে নিমিত্ত উপাদান অভিন্ন হতে কোন অসুবিধা নেই।

বেদান্ত দর্শনে ঈশ্বরের স্বরূপ বিশ্লেষণের দ্বারা জানা যায় যে, ঈশ্বরের দুটি অংশ আছে। যথা চৈতন্য ও অজ্ঞান। কাজেই ঈশ্বরের চৈতন্যাংশ যদি অধিকারী থাকে তবু ও অজ্ঞান অংশ জগৎ আকারে পরিণত হতে পারে। তাই আশঙ্কা হতে পারে যে, নিরাবয়ব চৈতন্যের তো কোথাও পরিণাম দেখা যায় না, তাহলে চেতন ঈশ্বর কি করে জগদাকার প্রাপ্ত হবে? উত্তরে বলা হয় বেদান্তদর্শনে ঈশ্বরকে শরীর প্রধানরূপে উপাদান বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আরও বলা হয় যে কার্যানুকূল যে জ্ঞান তা চৈতন্যেরই ধর্ম; কিন্তু সেটাও শরীর নিরপেক্ষ চৈতন্য সম্ভাবিত হয় না। এজন্য কার্যানুকূলজ্ঞানবত্বরূপ যে ঈশ্বরের কর্তৃত্ব তার প্রতি চৈতন্যকেই বলা হয় প্রধান কারণ।

নৈয়ায়িকরা ঈশ্বরকে কেবল নিমিত্ত কারণ বলেন কিন্তু বেদান্তী মতে, নৈয়ায়িকের এরূপ মত শ্রুতি বিরুদ্ধ বলে প্রত্যাখ্যান করেন; কারণ শ্রুতি ব্রহ্মকে নিমিত্তকারণ বলেছেন। তেমনি 'তজ্জলান্' ইত্যাদি বাক্যে উপাদান কারণ ও বলেছেন। পূর্বে ঈশ্বরকে শরীর প্রধানরূপে যে উপাদান বলা হল যে, অজ্ঞান যাঁর শরীর সেই ঈশ্বরের চৈতন্য পরম্পরা সম্বন্ধে উপাদান। আচার্য শঙ্কর ঈশ্বরকেই অভিন্ন নিমিত্ত উপাদান বলেছেন, আচার্য সদানন্দ যোগীন্দ্র তার বেদান্তসার গ্রন্থে সেই মতই অনুসরন করেন। মধুসূদন সরস্বতী এ প্রসঙ্গে বলেন, ব্রহ্ম অজ্ঞানের আশ্রয়রূপে পরম্পরায় উপাদান হলেও বির্বতাধিনিষ্ঠরূপে সাক্ষাৎ উপাদান।

এখন প্রশ্ন হবে অজ্ঞান কী জগতের উপাদান কারণ আর ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে অদ্বৈতবেদান্তীরা বলেন, অজ্ঞান জগতের উপাদান কারণ, ব্রহ্ম উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ উভয়ই। এ প্রসঙ্গে আমরা বেদান্তপরিভাষায় দেখতে পাই ধর্মরাজাধ্বরীন্দ্র মঙ্গল শ্লোকে বলেছেন –

"যদ্যাবিদ্যাবিলাসেন ভূত-ভৌতিক সৃষ্টয়ঃ।
তং নোমি পরমাত্মানং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম"।।[৪]

অর্থাৎ অবিদ্যা বা অজ্ঞান যখন ব্রহ্মকে আশ্রয় ও বিষয় করে তখনই ব্রহ্ম বিলাসের দ্বারা বা ঈক্ষণ রূপ অপরোক্ষ জ্ঞানের দ্বারা ভূত-ভৌতিক পদার্থের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় হয়। জগতের এই সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় কতৃক হল ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ হল সেই লক্ষণ যা লক্ষ্য বস্তু যতকাল থাকে তাতে ততদিন না থেকে ও লক্ষ্য বস্তুকে তদভিন্ন বস্তু থেকে পৃথক করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে অদ্বৈতবেদান্তমতে উপাদান কারণ দ্বিবিধ যথা পরিণামী উপাদান কারণ এবং বির্বত উপাদান কারণ। 'সতত্ত্বতোহন্যথাপ্রথা' কে বিকার বা পরিণাম বলে। আর 'অতত্ত্বতোহন্যথাপ্রথাকে' বিবর্ত বলে। অর্থাৎ বস্তুর তত্ত্বতঃ অন্যরূপে যে প্রকাশ তাহল বিকার বা পরিণাম। আর বাস্তবিক অন্যপ্রকার না হয়েও যে অন্যরূপে প্রকাশ তাকে বিবর্ত বলে। যেমন– রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ক্ষেত্রে সর্পের উপাদান কারণ রজ্জু ও রজ্জুর অজ্ঞান উভয়ই। তবে রজ্জুতে সর্পের বিবর্ত উপাদান কারণতা এবং রজ্জু বিষয়ক অজ্ঞান সর্পের পরিণামী উপাদান কারণতা বিদ্যমান অনুরূপভাবে, ব্রহ্মে জগতের বিবর্ত উপাদান কারণতা ও ব্রহ্ম বিষয়ক অজ্ঞানে জগতের পরিণামী উপাদান কারণতা বিদ্যমান। সুতরাং ব্রহ্মই হল জগতের অভিন্ন নিমিত্ত ও উপাদান কারণ।

তথ্যসূত্র:

১. বাদরায়ণ, '*ব্রহ্মসূত্র*', চিদঘনানন্দ পুরী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা- ৯৬।
২. সদানন্দ, যোগীন্দ্র, '*বেদান্তসার*', বিপদজ্জনক পাল সম্পাদিত, পৃষ্ঠা- ১১৬।
৩. সদানন্দ, যোগীন্দ্র, '*বেদান্তসার*', লোকনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, পৃষ্ঠা- ১২৮।
৪. অধরীন্দ্র, ধর্মরাজ, '*বেদান্ত-পরিভাষা*', পঞ্চানন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রত্যক্ষ-পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা- ১।

গ্রন্থপঞ্জী:

1. অধরীন্দ্র, ধর্মরাজ, *বেদান্ত-পরিভাষা*, পঞ্চানন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দ।
2. গোস্বামী, শ্রী নারায়ণ চন্দ্র, *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০১৬।
3. বাদরায়ণ, *ব্রহ্মসূত্র*, চিদঘনানন্দ পুরী সম্পাদিত, কলিকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯১৯।
4. যোগীন্দ্র, সদানন্দ, *বেদান্তসার*, বিপদজ্জনক পাল সম্পাদিত, কলিকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ১৯৮২।
5. যোগীন্দ্র, সদানন্দ, *বেদান্তসার*, লোকনাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১।
6. সন্তোষানন্দ, স্বামী *উপনিষৎ-সংকলন*, কলকাতা: রামকৃষ্ণ মিশন কলিকাতা বিদ্যার্থী আশ্রম, ২০১৬।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 985-990
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.094

নব্য-ন্যায়ের দৃষ্টিতে পদশক্তি: একটি দার্শনিক সমীক্ষা

সৌরভ মজুমদার, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2025; Accepted: 25.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The discussion of Pada and padartha is an important topic of Neo-Nyaya philosophy. Although we can get the etymological idea of Pada and padartha from the level of grammar, the explanation of how a Pada can refer to a specific padartha and why any Pada cannot refer to any padartha remains a foggy one. But in Indian philosophy, especially in Neo-Nyaya philosophy, following all the rules of grammar, a complete and evaluative discussion of this can be found. However, the power by which a particular Pada can refer to a specific padartha will be the refuge of the byakti? Or the jati? Or the akrti? Or the jatyakrtibisistabyakti? Different sects hold different opinions on this matter in Indian philosophy. However, although all these opposing opinions are mentioned, without prolonging the subject by discussing them in detail, the present article has mainly presented the opinion of the jatisaktibadi Mandan Mishra as the purbapaksi and the opinions of the Neo-Nyaya Jagadish Tarkalankar and Vishwanath Nyayapanchanan as the sid'dhantapaksoi.

Key Words: *Pada, padartha, Aptabakya, Vrtti, sakti, saktigraha, byakti, jati, jatyakrtibisiṣṭabyakt.*

ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তিকাল সঠিক ভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব না হলেও বেদ ও উপনিষদকে কেন্দ্র করেই যে ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারার প্রথম উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছিল, এই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। বেদ ভারতের প্রাচীন এবং কারা বেদ রচনা করেছেন-সেই বিষয়টি নির্ধারণ করা সম্ভবপর হয়নি। বেদকে সকল সময়ই শাশ্বত এবং অপৌরুষেয় বলেই বিশ্বাস করা হয়েছে। বস্তুতঃ, ভারতীয়দের বিশ্বাস, কোন মানুষ বেদে রচনা করেনি, বেদ স্বয়ং ব্রহ্মের বাণী। তাই বেদের প্রামাণ্য স্বীকারের ভিত্তিতেই ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলিকে প্রধানত দুটি শ্রেনিতে ভাগ করা হয়, যথা- আস্তিক এবং নাস্তিক। উল্লেখ্য যে, 'আস্তিক' এবং 'নাস্তিক'-এই শব্দ দুটিকে এখানে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। আস্তিক বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং নাস্তিক বলতে বুঝি যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। কিন্তু এক্ষেত্রে আস্তিক বলা হয়েছে তাদের যারা বেদের কর্তৃত্ব বা প্রাধান্য স্বীকার করে এবং বেদের সিদ্ধান্তকে প্রামাণ্য ও অভ্রান্ত বলে গ্রহণ করে। সুতরাং কোন দর্শন ঈশ্বরে অবিশ্বাসী হয়ে যদি বেদে বিশ্বাসী হয় তাকে আস্তিক বলা হবে। অপরদিকে, ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে সেগুলিই নাস্তিক যেগুলি করে না। এই বিভাগ অনুসারে সাংখ্য এবং মীমাংসা দর্শন যদিও জগতের সৃষ্টিকর্তারূপে কোন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয়, তবু এই উভয় দর্শনকে আস্তিক বলা হয়, যেহেতু উভয় দর্শনই বেদে বিশ্বাসী এবং বেদের প্রাধান্য স্বীকার করে নেয়। আর এই আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অন্যতম একটি হল ন্যায় দর্শন। এই ন্যায় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হলেন মহর্ষি গৌতম। ন্যায় দর্শন প্রধানতঃ যথাযথ জ্ঞান লাভের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ কি উপায়ে বা কোন্ কোন্ বিধি অনুসরণ করে যুক্তিতর্ক করলে আমরা যথাযথ জ্ঞান লাভ করতে পারি, ন্যায় দর্শন প্রধানতঃ তারই আলোচনা করে। এই ন্যায় দর্শনে জ্ঞানকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে-'প্রমা' বা যথার্থ জ্ঞান এবং 'অপ্রমা' বা অযথার্থ জ্ঞান। প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান বলতে

বোঝায় বিষয়ের যথার্থ অনুভব। কোন বিষয়ের যে গুণ, সেই গুণ জ্ঞাত বিষয়ের মধ্যে যথাযথ আছে, এইরূপ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। যখন আমরা কোন ঘট প্রত্যক্ষ করি এবং জানি যে বস্তুতঃ ঘটের মধ্যে ঘটত্ব বর্তমান, তখন আমাদের জ্ঞান যথার্থ জ্ঞান। কিন্তু কোন বস্তুর মধ্যে যে গুণের অস্তিত্ব প্রকৃতপক্ষে নেই, কোন বস্তুতে সেই গুণ যখন আমরা জানি, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ। যখন আমরা রজ্জুতে সর্পের গুণ উপলব্ধি করি, যা প্রকৃতপক্ষে রজ্জুতে নেই, তখন আমাদের জ্ঞান অযথার্থ জ্ঞান।

নৈয়ায়িকদের মতে প্রমাণ চার প্রকার প্রত্যক্ষ (Perception), অনুমান (Inference), উপমান (Comparison) এবং শব্দ (Testimony)। প্রত্যক্ষ হ'ল বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষজনিত বিষয়ের নিশ্চিত এবং যথার্থ জ্ঞান। কোন কোন নৈয়ায়িকের মতে প্রত্যক্ষ হল সাক্ষাৎ জ্ঞান। প্রত্যক্ষকে নানাভাবে শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। যথা-লৌকিক (Ordinary) ও অলৌকিক (Extra-ordinary)। লৌকিক প্রত্যক্ষ আবার দু'প্রকার; যথা- বাহ্য এবং মানস। অলৌকিক প্রত্যক্ষ তিন প্রকার; যথা-সামান্যলক্ষণ, জ্ঞানলক্ষণ ও যোগজ। চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যে প্রত্যক্ষ তাকেই লৌকিক প্রত্যক্ষ বলে। আত্মা মন রূপ অন্তরিন্দ্রিয়ের মাধ্যমে, মানসিক অবস্থার সাক্ষাৎ জ্ঞান লাভ করে, একে বলা হয় মানসপ্রত্যক্ষ। লৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের লৌকিক সন্নিকর্ষ ঘটে।

ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত চারটি প্রমাণের মধ্যে চতুর্থ প্রমাণ হল শব্দ প্রমাণ। নৈয়ায়িকদের মতে, শব্দ হ'ল বিশ্বাসযোগ্য ব্যক্তির বচন বা আপ্তবাক্য। শব্দের প্রকৃত অর্থ যিনি অবহিত, যিনি জ্ঞানী, সত্যবাদী এবং বিশ্বাসযোগ্য-তিনিই শব্দতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তিনিই আপ্ত। অন্নংভট্টের মতে, শব্দ প্রমাণের লক্ষণ হল –

"আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ"[১]

অর্থাৎ আপ্তব্যাক্তির উপদেশ বা বাক্যকে বলা হয় শব্দ প্রমাণ। এখন প্রশ্ন আপ্তব্যক্তি কে হবেন? এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"আপ্তঃ তু যথার্থ বক্তা।"[২]

অর্থাৎ যিনি যথার্থ বক্তা তিনি-ই হলেন আপ্তব্যক্তি। যথার্থ বক্তা বলতে বোঝায় সেই ব্যক্তিকে যিনি ভ্রম(একটি বস্তু যেরূপ তাকে অন্যরূপে জানা), প্রমাদ(অসাবধানতা), বিপ্রলিপ্সা(বঞ্চনা করার ইচ্ছা) ও করণাপাটব(ইন্দ্রিয় ত্রুটি) এই চারটি দোষ শূন্য। এখন প্রশ্ন হল বাক্য বলতে কী বোঝায়? এর উত্তরে ন্যায় দর্শনে বলা হয়েছে-

"বাক্যং পদসমূহ"[৩]

অর্থাৎ বাক্য হল কতকগুলি পদের সমষ্টি। যেমন- 'ঘট' এবং 'আন' -এই দুটি হল পদ এবং এই দুটি পদের সমন্বয়ে গঠিত 'ঘটটি আন" হল একটি বাক্য। পুনরায় প্রশ্ন হয়, পদ কী? এর উত্তরে বলা হয়-

"শক্তং পদম্।"[৪]

অর্থাৎ যা শক্তিবিশিষ্ট তা-ই হল পদ। এই পদ হল পদার্থ নির্দেশক। অর্থাৎ একটি পদ থেকে ঐ পদ নির্দেশিত একটি পদার্থের জ্ঞান হয়। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব শব্দ শ্রবণ করি সেই সব শব্দ থেকে কিন্তু আমাদের শাব্দবোধ হয় না। বরং একটি নির্দিষ্ট শব্দ থেকে একটি নির্দিষ্ট অর্থের-ই বোধ হয়। উল্লেখ্য যে, একটি শব্দ থেকে একটি অর্থের বোধ হলেও যেকোন শব্দ থেকে কিন্তু যেকোন অর্থের বোধ হয় না। যেমন- ঘট, পট প্রভৃতি শব্দ নিজ নিজ একটি নির্দিষ্ট বিশেষ বিশেষ অর্থকেই বোঝায়। 'ঘট' থেকে পট-পদার্থ এবং 'পট' থেকে ঘট-পদার্থ একজন সুস্থ মস্তিস্কের মানুষ কখনও বোঝে না। বিশেষ বিশেষ পদ যখন বিশেষ বিশেষ অর্থকেই বোঝাতে সক্ষম, তখন নিশ্চয় এর পিছনে কোন না কোন কারণ নিহিত আছে। এই কারণ অনুসন্ধান করলে জানা যায় পদের সঙ্গে পদার্থের একটি সম্বন্ধ আছে যা পদের দ্বারা পদার্থের বোধকে নিয়ন্ত্রন করে। পদ ও পদার্থের মধ্যে বিদ্যমান এই সম্বন্ধকে বলা হয় বৃত্তি। এই বৃত্তিরূপ সম্বন্ধ দুই প্রকার, এর মধ্যে অন্যতম একটি প্রকার হল শক্তি। এই শক্তির স্বরূপ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

"শক্তিশ্চ পদেনসহ পদার্থস্য সম্বন্ধঃ।"[৫]

অর্থাৎ শক্তি হল সাধারণ ভাবে পদের সাথে পদার্থের সম্বন্ধ বা শাব্দ বোধের অনুকূল পদ-পদার্থের সম্বন্ধ। সহজ কথায়, বিশেষ বিশেষ পদের সাথে বিশেষ বিশেষ পদার্থের যে সম্বন্ধ তা-ই হল শক্তি। শক্তির স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীগদাধর ভট্টাচার্য বলেন, 'এই পদ এই অর্থ বোধের জনক হোক' অথবা ' এই পদ হতে এরূপ অর্থের বোধ হোক' -এইরূপ

ইচ্ছা-ই হল সংকেত রূপ বৃত্তি বা শক্তি বৃত্তি। প্রাচীন ন্যায় মতে, এই শক্তি হল ঈশ্বরেচ্ছা। কিন্তু নব্যন্যায় মতে, শক্তি হল ইচ্ছা মাত্র। কিন্তু প্রশ্ন হল, পদ জ্ঞান থেকে পদার্থের জ্ঞান লাভের মাধ্যম যে শক্তি জ্ঞান, সেই শক্তি জ্ঞান কীভাবে হয়? এর উত্তরে বলা হয়েছে-

"শক্তিগ্রহং ব্যাকরণোপমানকোষাপ্তবাক্যাদ্ ব্যবহারতশ্চ।
বাক্যস্য শেষাদ্ বিবৃতের্বদন্তি সান্নিধ্যতঃ সিদ্ধপদস্য বৃদ্ধাঃ"।।[৬]

অর্থাৎ পণ্ডিতগণের মতে, ব্যাকরণ, উপমান, কোষ, আপ্তবাক্য, বৃদ্ধব্যবহার, বাক্যশেষ, বিবৃতি এবং প্রসিদ্ধপদেরসান্নিধ্য -এই আটটি উপায়ে একটি পদের শক্তিজ্ঞান হয়। যেমন- 'ভূ-সত্তায়াম' ব্যাকরণের এই সূত্র থেকে 'ভূ' ধাতুর সত্তা অর্থে শক্তিগ্রহ হয়। দুটি বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে সাদৃশ্য প্রত্যক্ষ করে একটি বস্তু বা প্রাণীর অতিদেশ বাক্যার্থের স্মরণের মাধ্যমে উপমান প্রমাণ দ্বারা সম্মুখস্থ অপর বস্তু বা প্রাণীর জ্ঞান হয়। কোষ বা অভিধান থেকে একদন্ত, হেরম্ব, লম্বোদর, গজানন প্রভৃতি শব্দের 'গণেশ' অর্থে শক্তি জ্ঞান হয়। আপ্তবাক্য থেকে 'পিক' শব্দের দ্বারা 'কোকিল' অর্থে শক্তিজ্ঞান হয়। বৃদ্ধব্যবহার থেকে পদ বিশেষের আবাপ ও উদ্বাপের দ্বারা 'গো' পদ থেকে গরু অর্থে শক্তিজ্ঞান হয়। বাক্যশেষের দ্বারা 'যব' পদের দীর্ঘশূকবিশিষ্ট শস্যে শক্তিজ্ঞান হয়। আবার বিবরণের ফলে 'ঘট' পদের কলশে শক্তিজ্ঞান হয়। আর পদের সান্নিধ্যবশতঃ শক্তিজ্ঞান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

"ইহা সহকারতরৌ মধুরং পিকো রৌতীত্যাদৌ
পিকশব্দস্য কোকিলে শক্তিগ্রহ ইতি"।[৭]

অর্থাৎ 'ইহা সহকারতরৌ মধুরং পিকো রৌতি' -এই বাক্যের 'সহকারতরু', 'মধুর', 'ডাকা' -এই তিনটি প্রসদ্ধি পদের সান্নিধ্যবশতঃ অপ্রসিদ্ধ 'পিক' পদের কোকিলে শক্তিজ্ঞান হয়। সুতরাং দেখা গেল যে উক্ত আটটি উপায়ের দ্বারা পদ-পদার্থের সম্বন্ধাত্মক শক্তিগ্রহ হয়।

এখন প্রশ্ন হল, এই পদ শক্তিটি কার? অর্থাৎ শক্তির আশ্রয় কোথায়? উল্লেখ্য যে, 'শক্তির আশ্রয়' বলতে এখানে কোন পদার্থের সেই নির্দিষ্ট অংশ বা আশ্রয়কে বোঝানো হচ্ছে যা ঐ শক্তির দ্বারা বোধব্য। জাতিশক্তিবাদী মীমাংসক মতে, জাতিই একমাত্র পদের শক্যার্থ, ব্যাক্তি বা আকৃতি নয়-

"জাতাবেব শক্তিগ্রহঃ।"[৮]

অর্থাৎ, মীমাংসক মতে, ঘট পদের দ্বারা 'ঘটত্ব' জাতি অভিহিত হয়। কেননা জাতি ভিন্ন ব্যক্তির অনুভব হতে পারে না। আর মীমাংসক মতে, ব্যক্তির অনুভবের পূর্বে জাতির অনুভব আবশ্যক। কেননা বিশেষন-জ্ঞান না থাকলে বিশিষ্টের জ্ঞান হতে পারে না। অতএব জাতিশক্তিবাদী মীমাংসক মতে, জাতিই পদের শক্যার্থ। এই প্রসঙ্গে জাতিশক্তিবাদী মীমাংসক বলেন, একমাত্র জাতিই পদের শক্যার্থ, ব্যক্তি নয়। অথাৎ তাঁর মতে, গো পদের শক্যার্থ গোত্বজাতি, গো-ব্যক্তি নয়। কেননা তাঁর মতে, ব্যক্তি অসংখ্য হওয়ায় যে বিশেষ ব্যক্তিতে 'গো' পদের শক্তি থাকবে কেবল সেই গো ব্যক্তিই ঐ শক্তি দ্বারা উপস্থিত হবে, আর যে সব ব্যক্তিতে 'গো' পদের শক্তি নেই সেইসব গো-ব্যক্তি ঐ শক্তি দ্বারা উপস্থাপিত হবে না। আর যদি পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করা হয় তাহলে গো ব্যক্তি অনন্ত হওয়ায় অনন্ত গো ব্যক্তিতে অনন্ত শক্তি কল্পনা করতে হবে। ফলে মহাগৌরব দোষ হবে। কিন্তু যদি গোত্ব জাতিতে গো পদের শক্তি কল্পনা করা হয় তাহলে উক্ত আপত্তির নিরশন ঘটে। কেননা অনন্ত গো ব্যক্তিতে একটিই গোত্ব জাতি স্বীকৃত হয়ে থাকে। তাই তাঁর মতে, 'গো' পদের শক্যার্থ গোত্বজাতি, গো ব্যক্তি নয়। মণ্ডন মিশ্রের মতে, 'গো' পদের শক্তি গোত্ব জাতিতে স্বীকৃত হলেও 'গোত্ব শক্তং গোপদম' এই আকারে গোত্ব শক্তি প্রকারক গো-পদজ্ঞান থেকে গোত্বমাত্রের উপস্থিতি হওয়ায় 'গোর্জায়তে' অথাৎ উৎপত্তির আশ্রয় 'গো' এবং 'গৌর্নশ্যতি' অথাৎ ধ্বংসের প্রতিযোগী 'গো' এই সকল স্থানে গোত্বের উৎপত্তির বোধক তিবন্ত জন-ধাতুর সহিত এবং বিনাশের বোধক তিবন্ত নাশ-ধাতুর সহিত যখন সাকাক্ষা গো পদের প্রয়োগ করা হয় তখন গো পদের শক্যার্থ যে গোত্ব জাতি তাতে উৎপত্তির আশ্রয়ত্বরূপ 'তে' প্রত্যয়ান্ত জনধাতুর অর্থ এবং নাশ প্রতিযগিত্বরূপ 'তিবন্ত' নাশ ধাতুর অর্থ বাধিত হওয়ায় আন্বয় হতে পারে না। আর এই আন্বয়ের আনুপপত্তির জন্যি জাতিবিশিষষ্ট 'গো' ব্যক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করা উছিত। কিন্তু প্রশ্ন হল, শাব্দবোধে ব্যক্তির ভান তো সর্বসম্মত অথচ ব্যক্তিতে শক্তি নেই-এটি কীভাবে সম্ভব হতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরে মণ্ডন মিশ্র ব্লেন,অন্য কোন উপায়ে শব্দের অর্থ উপস্থিত না হলে অর্থের উপস্থিতির দ্বারা শাব্দবোধে উক্ত আর্থ শক্তি স্বীকার করা

হয়। অর্থাৎ তাঁর মতে, 'গো' প্রভৃতি পদের স্থলে গো পদার্থের উপস্থিতির জন্য ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকারের কোন প্রয়োজন নেই, কারণ ব্যক্তির বোধ লক্ষনার দ্বারাও হতে পারে। কিন্তু গোত্বাদি জাতির বোধ অন্য কোন উপায়ে হয় না বলে গোত্বাদি জাতিতে শক্তি স্বীকার করতে হয়। পুনরায় প্রশ্ন হল, 'গোর্জায়তে', 'গৌর্নশ্যতি' প্রভৃতি স্থলে অন্বয়ের অনুপপত্তি বশতঃ লক্ষণা স্বীকার করলেও 'গাং পশ্যতি' প্রভৃতি স্থলে দর্শন ক্রিয়ার বিষয়তা গো-ব্যক্তির ন্যায় গোত্ব-জাতিতে থাকায় গোত্ববিষয়ক দর্শনাদি ক্রিয়ার যথার্থ শাব্দবোধ হতে পারে। কাজেই এইরূপ স্থলে গো-ব্যক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করার প্রয়োজন কী? উত্তরে মণ্ডন মিশ্র বলেন, 'যষ্টিঃ প্রবেশয়' প্রভৃতি স্থলে অন্বয়ের অনুপপত্তি না থাকলেও তাৎপর্যের অনুপপত্তিকে লক্ষণার বীজ স্বীকার করে লক্ষণার দ্বারা যেভাবে 'যষ্টি' পদ দ্বারা যষ্টিধারীরা বোধিত হয়, অনুরূপভাবে 'গাং পশ্যতি' প্রভৃতি স্থলেও গো-ব্যক্তির দর্শনাদি তাৎপর্যেই এইরূপ বাক্য প্রযুক্ত হয়েছে। অতএব সর্বত্রই গো-পদের গোত্ব জাতিতে শক্তি এবং গোত্ববিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করতে হবে।

নব্য-নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার জাতি অবয়বসংস্থানরূপ আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে গো-পদের একই শক্তি স্বীকার করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা হল-

> "পরস্পর বিরুদ্ধ চন্দ্রত্ব সূর্যত্ব উভয় ধর্ম পুরস্কারে যেভাবে 'পুষ্পবন্ত' পদের একটি শক্তি স্বীকৃত হয়, সেভাবে 'গো' প্রভৃতি পদ হতে গবাদিব্যক্তিতে ও গোত্বজাতি এবং সাস্নাদি অবয়বসংযোগবিশেষরূপ আকৃতি -এই উভয় ধর্মাবচ্ছিন্ন একটি শক্তি স্বীকৃত হবে।"[৯]

তাই তিনি মণ্ডনাচার্যের মত খণ্ডন প্রসঙ্গে বলেন, গো-ব্যক্তিকে বর্জন করে কেবল গোত্ব জাতিতে 'গো' পদের মুখ্য প্রয়োগ হতে পারে না। আর যেহেতু গো-ব্যক্তি ব্যতিরেকে কেবল গোত্ব জাতিতে 'গো' পদের মুখ্য প্রয়োগ হয় না, সেহেতু গোত্বজাতিমাত্রে 'গো' পদের শক্তি কল্পনা করা যায় না। কাজেই কেবল গোত্বজাতি 'গো' পদের শক্য একথা বলা যায় না। আর যদি গোত্বজাতি 'গো' পদের শক্য না হয় তাহলে গোত্ববিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে লক্ষণাও স্বীকৃত হতে পারে না। কেননা ন্যায় মতে,

> "শক্য-সম্বন্ধঃ লক্ষণা"[১০]

অর্থাৎ, লক্ষণা হল শক্যসম্বন্ধ। সুতরাং একমাত্র জাতিই পদের শক্যার্থ জাতিশক্তিবাদী মীমাংসক মণ্ডন মিশ্রের এরূপ মত যথার্থ নয়।

নব্য-নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চাননের মতে, জাত্যাকৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিতে পদের শক্তি স্বীকৃত হবে। তাঁর মতে, যদি জাতিতে পদের শক্তি স্বীকার করা হয় তাহলে মীমাংসকদের আরও অধিক গৌরব দোষ স্বীকার করতে হয়। কেননা 'গো' পদের শক্যার্থ যদি 'গোত্ব' জাতি হয় তাহলে শক্যতাবচ্ছেদক হবে গোত্বত্ব। আর এই গোত্বত্ব হল 'গবেতরাসমবেতত্বের সমানাধিকরণ সকল গোসমবেতত্ব' অর্থাৎ গোত্ব গবেতরপ্রাণীতে অসমবেত, কিন্তু সকল গো-ব্যক্তিতে সমবেত। আর গোত্ব-জাতি যেহেতু গো-ভিন্নে অসমবেত অথচ সকল গো-তে সমবেত হয় সেহেতু তার ধর্ম হল গো-ভিন্নে অসমবেতত্ব ও সকল গোসমবেতত্বরূপ গোত্বত্ব। আর এরূপ শক্যতাবচ্ছেদকরূপ গোত্বত্ব সকলগোব্যক্তিঘটিত হওয়ায় জাতিশক্তিবাদী মীমাংসকদের আরও অধিক গৌরব দোষ স্বীকার করতে হয়। তাই *সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী* টীকায় বলেছেন-

> "তস্মাত্ তত্তজ্জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট তত্তদ্ব্যক্তিবোধানুপপত্ত্যা কল্প্যমানা
> শক্তির্জাত্যাকৃতিবিশিষ্টব্যক্তৌ বিশ্রাম্যতীতি"।[১১]

অর্থাৎ, সেই কারণে অর্থাৎ জাতিতে শক্তি স্বীকার করলে, ব্যক্তিতে শক্তি অস্বীকার করলে, এমনটি যদি করা হয় তাহলে সেই জাতি ও আকৃতি অর্থাৎ গলকম্বলাদিরূপ অবয়বসংস্থান -এই দুই বিশিষ্ট সেই সেই ব্যক্তি সম্পর্কিত এই বোধের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। আর এই জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তি সম্পর্কিত বোধের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য কল্প্যমান শক্তি জাতি ও আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই বিশ্রান্ত হয়। তাঁর মতে, লক্ষণার দ্বারা ব্যক্তির ভান সম্ভব -মীমাংসক মণ্ডন মিশ্রের এরূপ মত সঙ্গত নয়। কারণ তাঁর মতে, অন্বয় বা তাৎপর্যের অনুপপত্তিরজ্ঞান না হয়েও ব্যক্তির জ্ঞান হতে পারে। যেমন- 'গাম্ আনয়' প্রভৃতি স্থলে গোত্ব জাতির আনয়ন সম্ভব হয় না। আর এই স্থলে গোত্ব জাতির আনয়ন সম্ভব না হওয়ায় অনুপপত্তিবশতঃ গো-পদের গোত্ববিশিষ্টে লক্ষণা স্বীকার করতে হয়। কিন্তু এ স্থলে গোত্ব জাতির আনয়ন

সম্ভব না হওয়ায় অনুপপত্তিবশতঃ গো-পদের গোত্ববিশিষ্টে লক্ষণা স্বীকার করলেও 'গৌরস্তি, তাং পশ্য' অর্থাৎ গরু আছে, তাকে দেখ প্রভৃতি বাক্য থেকে শাব্দবোধ কালে গোত্ব জাতিতে অস্তিত্ব এবং দর্শনকর্মত্বের অন্বয় হতে পারে, যেহেতু গোত্ব জাতি অস্তিত্বের আশ্রয় এবং দর্শনের বিষয় হতে পারে। ফলে এ স্থলে অন্বয়ানুপপত্তিরূপ লক্ষণার বীজ থাকে না। আর এ স্থলে অন্বয়ানুপপত্তিরূপ লক্ষণার বীজ না থাকায় জাতিশক্তিবাদী মীমাংসকের মতানুযায়ী গোত্ববিশিষ্ট গো-ব্যক্তিতে লক্ষণা স্বীকার করা যায় না। আবার ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করলে ব্যক্তি অনন্ত হওয়ায় অনন্ত শক্তি কল্পনায় গৌরব দোষ হবে -মীমাংসকের এরূপ অনুযোগও সঙ্গত নয়। কারণ ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হলেও ঈশ্বরেচ্ছারূপ শক্তি এক ও ব্যক্তিভেদে অভিন্ন এবং তা জাত্যাবচ্ছিন্নে থাকায় তা প্রতি ব্যক্তিতেও থাকে। ফলে এ স্থলে আর গৌরব হয় না। আবার বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে-

> "ইহাতে অননুগমও অর্থাৎ অনুগত প্রবৃত্তিনিমিত্তের অভাবও হয় নাই, কারণ গোত্ব প্রভৃতিই অনুগমক আছে"।[১২]

তাই বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চাননের মতে, পদের শক্তি জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে।

উপরিক্ত আলোচনায় দেখলাম যে, প্রায় সব নৈয়ায়িক-ই মহর্ষি গৌতমের 'জাতি, ব্যক্তি ও আকৃতি -এই তিনটিই পদার্থ' এই মত স্বীকার করেছেন। তাই আমরাও মহর্ষি গৌতমের *"ব্যক্ত্যাকৃতিজাতয়স্তু পদার্থাঃ"*[১৩] এই মতকে অবনত মস্তকে স্বীকার করে নিয়ে পরিশেষে বলতে পারি জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই পদের শক্তি স্বীকার করতে হয়।

তথ্যসূত্র:

১ গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, অন্নংভট্ট বিরচিত, *তর্কসংগ্রহ, অধ্যাপনাসহিত,* , পৃষ্ঠা- ৪৪৪।

২. অন্নংভট্ট বিরচিতঃ *তর্কসংগ্রহঃ ও দীপিকাটীকা* বাংলা অনুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, দীপক কুমার বাগচি, পৃষ্ঠা- ১৪৮।

৩. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*, অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত, পৃষ্ঠা- ২৫২।

৪. অন্নংভট্ট বিরচিতঃ *তর্কসংগ্রহঃ অধ্যাপনাসহিতঃ* নারায়ণচন্দ্র গোস্বামী, পৃষ্ঠা- ৪৪৫।

৫. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*, অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত, পৃষ্ঠা- ২৩৭।

৬. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*, অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত পৃষ্ঠা- ২৩৮।

৭. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*, অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত, পৃষ্ঠা- ২৪৮।

৮. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*, অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত, পৃষ্ঠা- ২৪৯।

৯. কর,শ্রী গঙ্গাধর, *শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা*, পৃষ্ঠা- ৩০১।

১০. অন্নংভট্ট-কৃত তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ-দীপিকা, ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, পৃষ্ঠা ২৩৪।

১১. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী,* পঞ্চানন শাস্ত্রী কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা- ৪৩৮।

১২. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *সিদ্ধান্তমুক্তাবলী,* পঞ্চানন শাস্ত্রী কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা- ৪৩৭-৪৩৮।

১৩. ন্যায়পঞ্চানন, বিশ্বনাথ বিরচিত *ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*, অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক অনুবাদিত, পৃষ্ঠা- ২৫১।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. কর, গঙ্গাধর, '*শব্দার্থসম্বন্ধসমীক্ষা*', সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, ২০০৩।

২. গোস্বামী, নারায়ণচন্দ্র, 'অন্নংভট্ট বিরচিত: *তর্কসংগ্রহ:অধ্যাপনাসহিত:*', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ১৪১৩।

৩. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, '*ভারতীয় দর্শন*', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১০।

৪. তর্কবাগীশ ফণিভূষণ, '*ন্যায়র্শন(গৌতমসূত্র) ও বাৎস্যায়ন ভাষ্য* (বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত)', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৪।

৫. ভট্টাচার্য্য, করুণা, '*ন্যায়-বৈশেষিক দর্শন*', পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২০১৩।

৬. ভট্টাচার্য্য, শ্রীমোহন ও শাস্ত্রী শ্রীদীনেশচন্দ্র, '*ভারতীয় দর্শনকোষ*', সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, ১৯৫৮।

৭. মুখোপাধ্যায়, ইন্দিরা কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, 'অন্নংভট্ট-কৃত *তর্কসংগ্রহ ও তর্কসংগ্রহ-দীপিকা*', প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৬।

৮. মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র তর্কতীর্থ, আচার্য শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত '*ভাষাপরিচ্ছেদ* (কারিকাবলী ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর সবিশদ বঙ্গানুবাদ)', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮০।

৯. রায় চৌধুরী, অনামিকা কর্তৃক অনুবাদিত, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন বিরচিত '*ভাষাপরিচ্ছেদঃ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহিত*', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, ২০০৪।

১০. শাস্ত্রী, পঞ্চানন কৃত বঙ্গানুবাদসহ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন: '*ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলীসহ*', সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৩৭৪।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 991-997
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.095

প্রমাণ প্রসঙ্গে নাগার্জুন: একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

প্রিয়াঙ্কা মুখার্জী, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2025; Send for Revised: 24.03.2025; Revised Received: 29.03.2025; Accepted: 30.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Indian Philosophy, 'pramāṇa' refers to 'means of valid knowledge'. Most of the schools admit Pramāṇa to demonstrate the reality of mundane or transmundane object. In Gautama's 'Nyāyasūtra' knowledge is considered as something that leads to attain the highest good, i.e. liberation. It proves that how far the concept of pramāṇa is precise to the Naiyāyikas. On the other hand, Nāgārjuna, the founder of Mādhyamika school, advances arguments to dismantle the Nyāya concept of pramāṇa after the philosophical treatise like Vigrahavyāvartanī and Mūlamadhyamakakārikā. For him, if we accept that pramāṇas are required to establish prameyas, the justificatory grounds of pramāṇas should be established first. This paper is a humble attempt to show how does Nāgārjuna using logical analysis try to prove the Nyāya concept of Pramāṇa 'non-sensical'. It is also equal interesting to examine the replies deployed by the cognitivists' standpoint to the sceptic approach.

Keywords: *Nyāyasūtra, Vigrahavyāvartanī, Naiyāyika, Mādhyamika, Pramāṇa, Prameya, Śūnyavāda.*

জাগতিক বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান লাভের ইচ্ছা মানুষের মধ্যে আজন্মকাল বর্তমান। ভারতীয় দার্শনিক সম্প্রদায়গুলিও তার ব্যতিক্রম নয়। অন্যান্য দার্শনিক সম্প্রদায়গুলি জ্ঞান নিয়ে অল্পবিস্তর আলোচনা করলেও ন্যায় দর্শনে আমরা জ্ঞান সম্পর্কিত সুবিন্যস্ত ব্যাখ্যা পেয়ে থাকি। ন্যায়মতে জ্ঞান বা বুদ্ধি হল বিষয়ের উপলব্ধি বা অনুভব। জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয় স্বতন্ত্র। জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিষয় প্রকাশিত হয়। জ্ঞান মূলত দুই প্রকার – প্রমা ও অপ্রমা। যথার্থ অনুভব প্রমা। বিষয়টি যেমন, তাকে ঠিক সেইরূপে জানা হলে তা প্রমা বলে গণ্য হবে। এইরূপ যথার্থ জ্ঞান লাভের প্রণালীকে বলা হয় প্রমাণ। নৈয়ায়িকগণের সহিত বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতপার্থক্য বর্তমান। ন্যায় দার্শনিকরা আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাসী, বিপক্ষে বৌদ্ধগণ অনাত্মবাদী। নৈয়ায়িকগণ বস্তুর স্থায়িত্বে বিশ্বাসী, পক্ষান্তরে বৌদ্ধগণ বস্তুর ক্ষণিকত্ব স্বীকার করে। ন্যায় দার্শনিকরা সকলেই বস্তুবাদের সমর্থক, কিন্তু বৌদ্ধ দার্শনিকদের কিছু অংশ ভাববাদী সম্প্রদায়ভুক্ত। মাধ্যমিক সম্প্রদায়ভুক্ত নাগার্জুনের মতে, ভাবপদার্থগুলি শূন্য এই অর্থে যে সেগুলি তাদের উৎপত্তির জন্য হেতু ও প্রত্যয়ের উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ হেতু ও প্রত্যয় নিরপেক্ষভাবে ভাবপদার্থগুলি উৎপন্ন হতে অক্ষম; ফলতঃ শূন্য। নাগার্জুন শূন্যতা এবং প্রতীত্যসমুৎপাদকে সমার্থক বলে মনে করেন। 'অস্তি-নাস্তি'র চরম মতাদর্শ অন্তর্বিরোধপূর্ণ। তাই মধ্যম পন্থা হল সকল প্রকার আন্দাজ নির্ভর (mere speculative) পরাতাত্ত্বিক মতের জাল থেকে মুক্ত হয়ে শূন্যতত্ত্ব উপলব্ধি করা। প্রমাণ, প্রমেয়সহ সকল ভাববস্তু তাই নাগার্জুনের মতে চতুষ্কোটি বিনির্মুক্ত বা শূন্য।

প্রমাণ আদৌ স্বীকার্য কি না এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে নাগার্জুন প্রথমে বস্তুবাদী পূর্বপক্ষীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শূন্যবাদী সিদ্ধান্ত 'সর্বে ভাবাঃ শূন্যাঃ' খণ্ডন করতে উদ্যত হয়েছেন। অতঃপর প্রত্যক্ষ প্রমাণের ন্যায় অন্যান্য প্রমাণ সম্পর্কেও তিনি একই কথা বলেছেন। কেননা, প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিষেধের দ্বারা অনুমান, উপমান, শব্দ প্রভৃতি অন্যান্য প্রমাণের অসাড়তা প্রতিপন্ন হয়। শূন্যবাদী সিদ্ধান্ত খণ্ডন প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, প্রত্যক্ষের দ্বারা সকল ভাব পদার্থের উপলব্ধি হয়। তাই সকল ভাব পদার্থের নিবৃত্তি ঘটাতে হলে বলতে হবে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই। সুতরাং, সকল ভাব পদার্থের উপলব্ধি সম্ভব নয়। সকল ভাব পদার্থের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রমাণ অন্যতম; তাই শূন্য। যে ব্যক্তি ভাব পদার্থের জ্ঞান উপলব্ধি করে তাকেও শূন্য বলতে হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞান ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ হওয়ায় তা পরোক্ষভাবে ব্যক্তির মাধ্যমে লব্ধ। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব না। তাহলে যার উপলব্ধি হয় না তার নিষেধ স্বীকার্য না হওয়ায় মাধ্যমিকগণের সিদ্ধান্ত 'সকল ভাবপদার্থ শূন্য' স্বীকার করা যায় না। প্রমাণ বলে যা স্বীকৃত তা শূন্য হলে সেই প্রমাণের দ্বারা মাধ্যমিক মত প্রতিষ্ঠিত করা কীভাবে সম্ভব?

পূর্বপক্ষী আরও বলেন, ভাবপদার্থের স্বভাব আছে এটি প্রত্যক্ষ অনুমান প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু প্রমাণের দ্বারা সকল কিছু প্রতিষ্ঠিত তাই সকল বস্তু নিঃস্বভাব একথা কি করে বলা যায়? নাগার্জুনের মতে এমন বক্তব্য স্বীকার্য নয়। নাগার্জুন পুনরায় প্রশ্ন তোলেন – সত্যিই কি আমরা প্রমাণকে স্বীকার করতে পারি? নাগার্জুনের সিদ্ধান্তকে খণ্ডন করার পশ্চাতে পূর্বপক্ষীর মত হল, কোন বিষয় সম্পর্কিত বিধেয়কে আমরা স্বীকার বা অস্বীকার করতে পারি যদি ওই বস্তুটিকে কোন বর্ণনার দ্বারা উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এইরূপ উপলব্ধির জন্য মাধ্যম হিসেবে প্রমাণের উপস্থিতি আবশ্যক। তবে মাধ্যমিক মতে প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকৃত না হওয়ায় তাদের প্রতিস্থাপ্য সিদ্ধান্তটি স্বীকার করা যায় না।

পূর্বপক্ষীর এইরূপ যুক্তি ও পুনর্যুক্তির প্রেক্ষিতে প্রমাণের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার্য কি না নাগার্জুন সে বিষয়ে সরাসরি আলোকপাত করেন নি। বরং প্রমাণের প্রতিষ্ঠা কিভাবে সম্ভব এবং তার প্রামাণ্যই বা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় সেই বিষয়ে তিনি দৃষ্টিনিক্ষেপ করেছেন। নৈয়ায়িকগণ বস্তুবাদী দার্শনিক হওয়ায় প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকারের ক্ষেত্রে তারা যুক্তি দেন– 'প্রমাণতশ্চার্থপ্রতিপত্তেঃ'। অর্থাৎ, প্রমাণের থেকে অর্থের প্রতিপত্তি হওয়ায় প্রমাণের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য। যারা বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন তারা একথা মানেন যে, বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার্য কারণ তা প্রমাণসাপেক্ষ। যে বিষয় আমাদের সাধারণ জ্ঞানে ধরা পড়ে সেই বিষয় সম্বন্ধেই প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি হয়ে থাকে। প্রত্যক্ষ, অনুমান ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা যদি অর্থগ্রহণ করা হয় সেই প্রমাণ সাপেক্ষেই ওই বস্তুটিকে গ্রহণ বা বর্জন সম্ভব। নাগার্জুন এক্ষেত্রে বলেছেন, 'তদ অভাবাৎ' অর্থাৎ এই প্রমাণটি স্বীকৃত নয়। বলা হয় যে, প্রত্যক্ষের দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়। যে বিষয় প্রত্যক্ষের অগোচর সেরূপ বস্তু সম্পর্কে অনুমান করা যায়। এই সকল ক্ষেত্রে প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়কে প্রতিষ্ঠা করা হলেও মূল বিষয়টি প্রমাণ। প্রশ্ন হয় প্রমাণকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়? তাই বস্তুবাদসম্মত মতের বিরুদ্ধে নাগার্জুন বলেছেন – যদি ধরে নেওয়া হয়, প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের বিষয় অর্থাৎ প্রমেয়র সিদ্ধি হয়, প্রশ্ন হয় প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চতুঃপ্রমাণের সিদ্ধি কি করে হবে?

"যদি চ প্রমাণতস্তেষাং তেষাং প্রসিদ্ধিরর্থানাম্।
তেষাং পুনঃ প্রসিদ্ধিং ব্রূহি কথং তে প্রমাণানাম্।।"[১]

সাধারণত দুইভাবে প্রমাণকে প্রতিষ্ঠা করা যায় – অন্য প্রমাণের দ্বারা এবং অপরটি হল অন্য প্রমাণ নিরপেক্ষরূপে স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রতিষ্ঠিত। একটি প্রমাণ অন্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একথা মানলে সেই প্রমাণটিকে আবার অন্য একটি প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। ফলস্বরূপ অনবস্থা দোষ দেখা দেবে। মনে হতে পারে যে, এইরূপ অনবস্থা দোষ দেখা দিলে কি অসুবিধা হবে? উত্তরস্বরূপ নাগার্জুন বলেছেন, এইরকম হলে আদি, মধ্য বা অন্ত প্রমাণ বলে কিছুই থাকবে না। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে কোন্ প্রমাণ কোন্ প্রমাণটিকে প্রতিষ্ঠা করছে অথবা কোন্ প্রমাণটির দ্বারা কোন্ প্রমাণটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে।

"অন্যৈর্যদি প্রমাণৈঃ প্রমাণসিদ্ধির্ভবত্যনবস্থা।
নাদেঃ সিদ্ধিস্তত্রাস্তি নৈব মধ্যস্য নান্তস্য।।"[২]

একটি প্রমাণকে অপর একটি প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে হলে সেই প্রমাণটিকে অন্য একটি প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এইভাবে কোন প্রমাণকেই আর আদি প্রমাণ বলা যাবে না। আর আদি প্রমাণ না থাকলে সেই প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে অপর প্রমাণকে মধ্য বা অন্ত বলে শনাক্ত করা সম্ভব হবে না। সুতরাং অনবস্থা দোষ জনিত এই বিকল্পটি গ্রহণযোগ্য নয়।

যদি প্রমাণের মাধ্যমে আমরা এমন একটি পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার কল্পনা করি যেখানে প্রমাণের সাহায্যে প্রমেয়কে প্রতিষ্ঠা করা যাবে, কিন্তু প্রমাণকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য অন্য কিছুর প্রয়োজন হবে না; এমনটা কল্পনাতীত। কারণ এক্ষেত্রে প্রমাণের স্থাপক বলে আর কিছু থাকছে না। প্রমাণের দ্বারা বিশেষ বিশেষ বস্তুর সিদ্ধি সম্ভব। তাই প্রমাণের সিদ্ধির জন্য অন্য বস্তু স্বীকার করলে তা আর প্রমাণ থাকবে না প্রমেয়তে পরিণত হবে। তাই বলতে হয়, প্রমাণের সিদ্ধির জন্য অন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। এই অর্থে প্রমাণের সিদ্ধি অন্য প্রমাণ নিরপেক্ষ হওয়ায় নিষ্প্রমান। কিন্তু এক্ষেত্রে মূলত দুটি অসুবিধা হয়।

> "তেষামথ প্রমাণৈর্বিনা প্রসিদ্ধির্বিহীয়তে বাদঃ।
> বৈষমিকত্বং তস্মিন্ বিশেষনহেতুশ্চ বক্তব্যঃ।।"[৩]

যে প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়কে সৃষ্টি করা হয় সেটি কার দ্বারা সিদ্ধ তা সঠিকভাবে বলা যায় না। এখানে যে দোষ দেখা দেয় তা হল 'বিহীয়তে বাদঃ।' এর দ্বারা পূর্বপক্ষীর মত অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তু কোন প্রমাণ সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠিত, তা বর্জন করা হয়। এই সম্ভাবনা স্বীকার করলে পূর্বপক্ষীর প্রতিজ্ঞাবাক্য প্রমাণের থেকেই সকল পদার্থের প্রসিদ্ধি সম্ভব, তার হানি ঘটবে। কারণ প্রমাণরূপ পদার্থ বা বিষয়টি আর প্রমাণজন্য থাকছে না। দ্বিতীয় অসুবিধা হল – যদি বলা হয়, এটি প্রমেয় তাই এটি বিশেষ। প্রমেয় অন্য সকল জাগতিক বস্তুর মত নয়। তাহলে প্রশ্ন হয়, কি কারণের জন্য এটি বিশেষ? এটি অন্য বস্তুর সাথে সমগোত্রীয় নয় কেন? এর বিশেষ হেতুটিই বা কি?

এক্ষেত্রে পূর্বপক্ষী অর্থাৎ প্রমাণের অস্তিত্ব স্বীকারবাদী এই অসুবিধা দূর করতে প্রমাণকে প্রদীপ বা বহ্নির সাথে তুলনা করেছেন। তারা বলেন, প্রদীপ তার প্রকাশকালে কেবল অন্ধকারকে দূর করে আলোকে প্রকাশ করে তাই নয় সাথে সাথে নিজেকেও প্রকাশ করে। এক্ষেত্রে প্রদীপের অস্তিত্ব প্রকাশ করার জন্য দ্বিতীয় কোন প্রদীপের প্রয়োজন হয় না। একইভাবে প্রমাণ যে কেবল প্রমেয়কে সিদ্ধ করে এমন নয় বরং তা নিজেকেও প্রতিষ্ঠিত করে। সুতরাং প্রমাণকে সিদ্ধ করার জন্য অপর কোন প্রমাণ স্বীকার অপ্রয়োজনীয়। এই কথা স্বীকার করলে প্রমাণসিদ্ধির ক্ষেত্রে উপরের আপত্তিগুলি আর প্রযোজ্য হবে না।

তবে এইরূপ স্বপ্রকাশত্বের কথা গ্রহণীয় নয়। নাগার্জুনের মতে পূর্বপক্ষীর এই যুক্তি সঠিক নয়। পূর্বপক্ষী যে দৃষ্টান্তটিকে কেন্দ্র করে যুক্তি দিয়েছেন তা দোষদুষ্ট। পূর্বপক্ষীর যুক্তি অনুযায়ী আগুন নিজেকে প্রকাশ করে। কিন্তু অগ্নি বা আলো আসলে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না। কোন বস্তু (ঘট, পট) অন্ধকারে আবৃত থাকলে কেবল তখনই আলো তাকে প্রকাশ করতে পারে। এক্ষেত্রে বস্তুটি আগুনের দ্বারা প্রকাশিত হওয়ার আগে অপ্রকাশিত থাকে, তার কোনো প্রকার উপলব্ধি সম্ভব হয় না। যদি বলতে হয় আগুন ঘটকে প্রকাশ করার ন্যায় একইভাবে নিজেকে প্রকাশ করে তাহলে একথা স্বীকার্য যে আলোর দ্বারা প্রকাশিত হওয়ার আগে আলো অন্ধকারে ছিল। পরবর্তী সময় সেই আলো প্রকাশিত হয়েছে। এই কথা স্ববিরোধী, কারণ আলো এক মুহূর্তের জন্য অন্ধকারে থাকতে পারে না। তাই এমন সম্ভব নয় যে আগুন অন্ধকারে থাকাকালীন সময় অপ্রকাশিত অবস্থায় ছিল। এক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে আলোর নিজেকে প্রকাশ করার বিষয়টি বিশেষ তাহলে পূর্বের ন্যায় কেন এটি বিশেষ তার হেতু দর্শাতে হবে।

পূর্বপক্ষীর যুক্তির অপর একটি সমস্যার কথা নাগার্জুন উল্লেখ করেছেন। ধরা যাক, অগ্নির স্বরূপ অনুযায়ী অপরাপর বস্তুর প্রতি অগ্নি যে আচরণ করে নিজের প্রতিও সেই একই আচরণ প্রয়োগ করে থাকে। তবে বলতে হয় সেই স্বরূপ কেবলমাত্র প্রকাশিকা শক্তির ক্ষেত্রে নয় অগ্নির দাহিকা শক্তির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। সুতরাং বলতে হবে, অগ্নি যেমন অপরাপর বস্তুকে দগ্ধ করে একইভাবে নিজেকেও দগ্ধ করতে সক্ষম হবে। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হয়না। তাহলে বলতে হয় আগুনের স্ব-স্বভাবে দহন করার বৈশিষ্ট্যটি নেই। কারণ তাহলে সে নিজেকে দহন করতে পারত। সুতরাং প্রমাণের স্বপ্রকাশত্ব মতবাদটি সঠিক নয়।

নাগার্জুন বলেন,

"নাস্তি তমশ্চ জ্বলনে যত্র চ তিষ্ঠটি সদাত্মনি জ্বলনঃ।
কুরুতে কথং প্রকাশং স হি প্রকাশোহন্ধকারবধঃ।।"[৪]

অগ্নিকে যদি একইসাথে অপরপ্রকাশক ও স্বপ্রকাশক বলা হয় তবে অন্ধকারকেও অপর আবৃতক হওয়ার সাথে স্ব-আবৃতক হতে হবে। অন্ধকারকে বিনাশ করার মাধ্যমেই অগ্নির প্রকাশ সম্ভব। কিন্তু প্রদীপে অন্ধকার না থাকায় এই শর্ত পূরণ করা প্রদীপের পক্ষে অসম্ভব। পূর্বপক্ষী এখানে বলেন, আগুনে অন্ধকার না থাকলেও একথা বলা সম্ভব যে আগুন নিজেকে এবং অপরকে প্রকাশ করে। কারণ যে অগ্নি উৎপন্ন হচ্ছে তার দ্বারা অন্ধকার দূর হয়ে থাকে। তাহলে বলতে হয় আলো উৎপন্ন হওয়ার সাথে সাথে অন্ধকারকে নাশ করে নিজেকে প্রকাশ করে। যে মুহূর্তে অগ্নি উৎপন্ন হয় সেই সময় অগ্নি এবং অন্ধকার সহাবস্থান করে। অর্থাৎ একই সাথে একই আশ্রয়ে আলো এবং অন্ধকার থাকে। দ্বিতীয় ক্ষণে আলো অন্ধকারকে প্রতিরুদ্ধ করে এবং অন্ধকার নিবৃত্ত হয়। নাগার্জুন পূর্বপক্ষীর এই মত স্বীকার করেননি। এই মত মানলে তিনটি ক্ষণের কার্য স্বীকার করতে হবে। প্রথম ক্ষণে আলো উৎপন্ন হয়, দ্বিতীয় ক্ষণে আলো অন্ধকারের সাথে অবস্থান করে এবং তৃতীয় ক্ষণে আলো অন্ধকারকে বিনাশ করে নিজেকে প্রকাশ করবে।

"উৎপদ্যমান এব প্রকাশয়ত্যগ্নিরিত্যসদ্বাদঃ।
উৎপদ্যমান এব প্রাপ্নোতি তমো হি হুতাশঃ।।"[৫]

উৎপত্তিক্ষণে অগ্নি ও অন্ধকার যদি সহাবস্থান করে তবে সেই অগ্নি কিভাবে অন্ধকারকে বিনাশ করবে তা ব্যাখ্যা করা দুরূহ হয়ে ওঠে। কারণ উৎপত্তিক্ষণের ন্যায় দ্বিতীয় ক্ষণেও আলো এবং অন্ধকারের একসাথে থাকার কথা। কিন্তু আলো এবং অন্ধকার একসাথে থাকতে পারে না। এটি স্ববিরোধী; অতএব প্রমাণ আলোর মত নয়। এছাড়া দ্বিতীয় ক্ষণে কেন এরা সহাবস্থান করবে না তাও বিশ্লেষণ করা যায় না।

এক্ষেত্রে নাগার্জুনের বিরুদ্ধে গিয়ে পূর্বপক্ষী বলেছেন, অন্ধকারের সাথে সংঘবদ্ধ না হয়েই আলো অন্ধকারকে প্রতিহত করতে পারে। পূর্বপক্ষীর মূল যুক্তি হল, দুটি বস্তু পরস্পর অসম্বন্ধ হলেও একে অপরের উপর ক্রিয়াশীল হতে পারে। তাহলে বলতে হয়, যে কোনো এক স্থানের অগ্নি অপর স্থানের অন্ধকারকে সহজেই প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। কারণ দূরস্থিত অগ্নির সাথে তো নিকটস্থ অন্ধকারের কোন সম্বন্ধ নেই। কিন্তু বাস্তবে তা প্রমাণিত হয় না। নাগার্জুন বলেছেন,

"অপ্রাপ্তোহপি জ্বলনো যদি বা পুনরন্ধকারমুপহন্যা।
সর্বেষু লোকধাতুষু তমোহয়ম্ ইহসংস্থিত উপহন্যাৎ।।"[৬]

কোন ঘরে অগ্নি প্রজ্জ্বলন করলে তা কেবল সেই ঘরের অন্ধকারকেই দূর করতে সক্ষম হয়। অন্য বাড়ির অন্ধকারকে তা দূর করতে পারে না। কারণ একটি বাড়িতে আলো জ্বালানো হলে অন্য বাড়ির অন্ধকারের সাথে তার সম্বন্ধ থাকে না। সম্বন্ধহীন হয়ে অগ্নি অন্ধকারকে দূর করতে পারলে এই ঘরের অগ্নি সহজেই অন্য ঘরের অন্ধকারকে দূর করতে পারতো। সুতরাং, একটি ঘরে আলো জ্বললে অন্য ঘরেও অন্ধকার দূর হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। অতএব, অগ্নির স্বপ্রকাশত্ব কোনভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই অগ্নির সদৃশ ভেবে প্রমাণকে স্বপ্রকাশ বলা হলে তা যথার্থ হবে না।

নাগার্জুন পরবর্তীতে বলেছেন, স্বতন্ত্রভাবেও প্রমাণগুলিকে স্বতঃসিদ্ধ বলা যায় না। স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ যা অন্যের উপর নির্ভরশীল নয়। প্রমাণ প্রমেয়বিষয় নিরপেক্ষভাবে সিদ্ধ একথা বললে অসুবিধা সৃষ্টি হয়। বিষয় ছাড়া প্রমাণ নিজেকে প্রকাশ করলে তাকে আর প্রমাণ বলা যাবে না। প্রমেয় বিষয় ছাড়া প্রমাণের প্রকাশ হলে তাকে কার প্রমাণ বলব! প্রমাণ সর্বদা কারো উপর নির্ভর করার কারণেই তা প্রমাণ হিসেবে গণ্য। তাই প্রমাণের স্বতঃসিদ্ধতা প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই বলতে হয়, প্রমেয় বিষয়ের মাধ্যমেই প্রমাণ সিদ্ধ হয়। তাই প্রমাণ সিদ্ধি স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু নাগার্জুনের মতে এই বিকল্পটিও দোষমুক্ত নয়। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন –

"অথ মতমপেক্ষ্য সিদ্ধিস্তেষামিত্যত্র কো দোষঃ।
সিদ্ধস্য সাধনং স্যান্নাসিদ্ধোহপেক্ষতে হ্যন্যৎ।।"[৭]

প্রমেয়র উপর নির্ভর করে প্রমাণের প্রসিদ্ধি হয় এই কথার অর্থ প্রমাণের সিদ্ধি প্রমেয় নির্ভর। যেমন – যদি বলা হয়, বর্না তাঁর পড়াশোনার জন্য আমার উপর নির্ভরশীল তবে সেক্ষেত্রে আগে বর্নাকে অস্তিত্বশীল হতে হবে তারপর

তাঁর নির্ভরশীলতার প্রশ্ন উঠবে। অনুরূপভাবে, প্রমাণের সিদ্ধি প্রমেয় নির্ভর বললে আগে যদি প্রমাণই সিদ্ধ না হয় তা কি করে প্রমেয়র উপর নির্ভরশীল হবে? ফলে যে প্রমাণচতুষ্টয় পূর্বে অসিদ্ধ তার সাধন প্রসঙ্গ এসে পড়ায় সিদ্ধসাধন দোষ হবে।

এই মতের ক্ষেত্রে অপর একটি অসুবিধা বিদ্যমান। সকল সময় প্রমাণ যদি প্রমেয়র মাধ্যমে সিদ্ধ হয়ে থাকে তবে প্রমাণের উপর নির্ভর করে প্রমেয়র সিদ্ধি ঘটে একথা স্বীকার করা যাবে না। অথচ একথা সর্বজনবিদিত যে প্রমাণের দ্বারা প্রমেয় সিদ্ধি হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রমাণ সাধন আর প্রমেয় সাধ্য বস্তু। সাধ্য কোনভাবেই সাধনকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। তাই প্রমেয়র উপর নির্ভর করে প্রমাণ সিদ্ধ হয় একথা স্বীকার্য নয়। তাই নাগার্জুন বলেছেন –

"সিধ্যন্তি হি প্রমেয়াণ্যপেক্ষ্য যদি সর্বথা প্রমাণানি।
ভবতি প্রমেয়সিদ্ধিরনপেক্ষৈব প্রমাণানি।।"[৮]

বলা যায়, স্বতন্ত্রভাবে প্রমাণের উপর নির্ভর না করে প্রমেয়র সিদ্ধি সম্ভব। তবে এক্ষেত্রে প্রমাণ সিদ্ধির প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সন্দেহর অবকাশ আছে। প্রমেয় সিদ্ধি নিরপেক্ষভাবে প্রমাণগুলি প্রতিষ্ঠিত হলে বলতে হয় প্রমাণ ছাড়াই প্রমেয় সিদ্ধ বা প্রকাশিত হয়। তাই প্রশ্ন হয়, প্রমাণ স্বীকারের কি প্রয়োজন? তাই পুনরায় বলতে হয় প্রমেয়র উপরে নির্ভর করেই প্রমাণের সিদ্ধি সম্ভব। সেক্ষেত্রে প্রমাণ প্রমেয়র কার্যাবলী স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। নাগার্জুনের ভাষায় –

"অথ তু প্রমাণসিদ্ধির্ভবত্যপেক্ষ্যৈব তে প্রমেয়াণি।
ব্যত্যয় এবং সতি তে ধ্রুবং প্রমাণপ্রমেয়াণাম্।।"[৯]

আমরা জানি যে, প্রমাণ সর্বদা কোন কিছুকে সাধন করে আর যা সিদ্ধ হয় তা প্রমেয়। কিন্তু এই দৃষ্টান্ততে দেখা যায় প্রমাণের সিদ্ধি প্রমেয় নির্ভর। তাহলে প্রমেয় পদার্থটি প্রমাণ হয়ে পড়ছে। ফলতঃ প্রমাণ প্রমেয়তে পরিণত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রমাণ হয়ে গেল সিদ্ধ আর প্রমেয় তার সাধক। তাই প্রমাণের কার্য প্রমেয় সম্পন্ন করছে আর প্রমেয়র কার্য প্রমাণ। এই সকল সমস্যা থেকে রেহাই পেতে বলা যায়, প্রমাণের দ্বারা যেমন প্রমেয়ের সিদ্ধি হয় একইভাবে প্রমেয়ের দ্বারাও প্রমাণের সিদ্ধি হয়। কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা হবে যে প্রমাণ বা প্রমেয় কোনটিই সঠিকভাবে সিদ্ধ হতে পারবে না।

"সিধ্যন্তি হি প্রমাণৈর্যাদি প্রমেয়ানি তানি তৈরেব।
সাধ্যানি চ প্রমেয়ৈস্তানি কথং সাধয়িষ্যন্তি।।"[১০]

প্রমেয়র সিদ্ধ হওয়া যদি প্রমাণের উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে সকল প্রমেয়ই সেই প্রমাণকে সাধিত করতে পারবে। তবে প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হওয়ার আগে তা প্রমেয় হিসেবে গণ্য না হওয়ায় অসিদ্ধ প্রমেয় কারণ হয়ে উঠতে পারে না। সেক্ষেত্রে প্রমেয়টিকে প্রমাণগুলির সাধক বলা যাবে না। আবার যদি বলা হয় প্রমেয়র উপর নির্ভর করে প্রমাণগুলি সিদ্ধ তাহলে প্রমাণগুলিকে প্রমেয়র দ্বারা সাধিত হতে হবে। এক্ষেত্রে প্রমেয়র দ্বারা আগে সিদ্ধ না হলে অসিদ্ধ প্রমাণ কিছুতেই প্রমেয়র সাধক হতে পারবে না। তাই প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়র সিদ্ধি হয় আবার প্রমাণ প্রমেয়ের উপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয় এমন বললে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটবে; ফলতঃ কোনোটিই সিদ্ধ হতে পারবে না।

প্রমাণ ও প্রমেয়ের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য পিতা ও পুত্রের সম্পর্কের দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। পুত্র তার জন্মের জন্য পিতার উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ পিতার দ্বারা পুত্রের সৃষ্টি হয়। আবার সন্তানহীন ব্যক্তিকে পিতা বলা যায় না। সেই অর্থে পুত্রের দ্বারা পিতার উৎপত্তি হয়। অর্থাৎ পিতা ও পুত্রের উৎপত্তি পরস্পর সাপেক্ষ। একইভাবে প্রমাণ প্রমেয়র দ্বারা এবং প্রমেয় প্রমাণের দ্বারা সাধিত হয় বললেও অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটবে না। তবে এইরূপ দোষ না ঘটলেও প্রশ্ন হয় এই সিদ্ধান্তে কে কার দ্বারা উৎপন্ন?

"পিত্রা যদ্যুৎপাদ্যঃ পুত্রো যদি তেন চৈব পুত্রেণ।
উৎপাদ্যঃ স যদি পিতা বদ তত্রোৎপাদয়তি কঃ কম্।।"[১১]

নাগার্জুন বলেছেন – পিতার দ্বারা পুত্র এবং পুত্রের দ্বারা পিতা উৎপন্ন হলে এই সম্পর্কের সাপেক্ষতা সদৃশ নয়। পিতার দ্বারা পুত্রের উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে পিতার অস্তিত্বের উপর পুত্রের অস্তিত্ব নির্ভর করে (biological relation)।

কিন্তু পুত্রের দ্বারা পিতা উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে বিষয়টি অস্তিত্ব নির্ভর নয়। এক্ষেত্রে পুত্র অনস্তিত্বশীল হলেও পিতা অস্তিত্বশীল হতে পারে। এই বিষয়টি ধারণাসাপেক্ষ (conceptual)। পিতার ধারণা পুত্রের ধারণার মাধ্যমেই উপলব্ধি করা সম্ভব। প্রমাণ ও প্রমেয়ের ক্ষেত্রে সাপেক্ষতার বিষয়টি অনুরূপ নয়। প্রমেয় যদি না থাকে তাহলে প্রমাণগুলি কোন জৈবিক প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হতে পারবে না। প্রমাণ ও প্রমেয়র ক্ষেত্রে প্রমেয় প্রমাণের উপর ধারণাগত দিক থেকেও নির্ভরশীল। কোন বস্তু প্রমাণের বিষয় না হলে তাকে প্রমেয় বলা যাবে না। তাই প্রমেয়র ধারণা সর্বদা প্রমাণের ধারণা সাপেক্ষ। প্রমেয় ও প্রমাণের এই সাপেক্ষতা অস্তিত্ব ও ধারণাগত দুইদিক থেকে প্রতিফলিত হওয়ায় একে পিতা পুত্রের সম্পর্কের সাথে তুলনাকালীন সময় নির্দেশ করা প্রয়োজন যে প্রমাণ ও প্রমেয়র মধ্যে কে পিতা ও কেই বা পুত্র? কিভাবে এই সম্পর্ক সম্ভব? কোনটি আসলে কাকে উৎপন্ন করছে - প্রমাণ প্রমেয়কে না কি প্রমেয় প্রমাণকে? উভয়ের সম্পর্কের এই জটিলতার নিস্পত্তি ব্যতিরেকে প্রমাণচতুষ্টয় প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই প্রমাণচতুষ্টয়ের খন্ডনে উদ্যত হয়ে নাগার্জুন সর্বশেষে বলেছেন -

"নৈব স্বতঃপ্রসিদ্ধির্ন পরস্পরতঃ প্রমার্ণৈবা।
ভবতি ন চ প্রমেয়ৈর্ন চাপ্যকস্মাৎ প্রমাণানাম্।।"[১২]

প্রমাণের সিদ্ধি স্বতঃই নয়। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান বা আগম এদের কোনটিই নিজের দ্বারা সিদ্ধ হতে পারে না। আবার অন্য প্রমাণের দ্বারা এদের সিদ্ধি সম্ভব নয়। প্রত্যক্ষ অনুমান দ্বারা, অনুমান উপমান দ্বারাও সিদ্ধ হতে পারে না। প্রমেয়র দ্বারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় না একথা বলা হয়েছে। প্রমাণ ও প্রমেয় পরস্পর সাপেক্ষ হয়েও প্রতিষ্ঠিত হয় না। আবার হঠাৎ করে কোন কিছুর উপর নির্ভর না করে প্রমাণ সিদ্ধ হচ্ছে এমনও বলা যায় না। তাই কোনোভাবেই প্রমাণের সিদ্ধি হয় না। প্রমাণ ছাড়া প্রমাণের মাধ্যমে প্রাপ্ত প্রমেয়কে স্বীকারের প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং, নৈয়ায়িকগণ স্বীকৃত প্রমাণ প্রমেয় সকল তত্ত্বই শেষাবধি প্রত্যাখ্যাত হয়। বস্তুবাদী মতবাদে বিশ্বাসী নৈয়ায়িকগণ বস্তুর মন-নিরপেক্ষ অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং সেই বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভের জন্যই প্রমাণের প্রয়োজন। নাগার্জুন বাহ্য জগতের বস্তুগুলিকে শূন্য বলেছেন তাই সেই সকল বস্তু সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনাকেও তিনি যুক্তিদ্বারা নস্যাৎ করেছেন। এইরূপ যৌক্তিক জাল বিস্তারের মাধ্যমে ভারতীয় দর্শনে স্বীকৃত প্রমাণতত্ত্ব খন্ডনের মধ্যে দিয়ে নাগার্জুনের যে যৌক্তিক মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তা অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে।

তথ্যসুত্র:

১. নাগার্জুন, বিগ্রহব্যাবর্তনী, কারিকা ৩১
২. ঐ, কারিকা, ৩২
৩. ঐ, কারিকা, ৩৩
৪. ঐ, কারিকা, ৩৭
৫. ঐ, কারিকা, ৩৮
৬. ঐ, কারিকা, ৩৯
৭. ঐ, কারিকা, ৪২
৮. ঐ, কারিকা, ৪৩
৯. ঐ, কারিকা, ৪৫
১০. ঐ, কারিকা, ৪৭
১১. ঐ, কারিকা, ৪৯
১২. ঐ, কারিকা, ৫১

গ্রন্থপঞ্জী:

1. *Akṣapāda Gautama (Gotama), Nyāyasūtra with Vātsyāyana's Nyāyabhāṣya titled Nyāya Darśana, (Tr. Bengali) by Phanibhushan Tarkabagis, Vol 1-5, West Bengal State Book Board, 1988 edition.*
2. *Matilal,Bimal Krishna, Perception: An Essay on Classical Indian Theories of Knowledge, Clarendon Press, Oxford, 1986.*
3. *Burton,David, Emptiness Appraized: A Critical Study of Nāgārjuna's Philosophy, Motilal Banarsidass Publication Pvt Ltd, Delhi, 1st Indian ed. 2001.*
4. *Mohanta, Dilip Kumar, Madhyamika Darshaner Ruparekha O Nagarjunakrita Savrittivigrahavyavartani (In Bengali), Maha Bodhi Book Agency, Kolkata, 2006.*
5. *Westerhoff, Jan, The Dispeller of Disputesr: Nāgārjuna's Vigrahavyāvartanī, Oxford University Press, New York, 2010.*
6. *Bhattacharyya,Kamaleswar, The Dialectical Method of Nāgārjuna (Vigrahavyāvartanī) tr. & critically edited by E.H. Johnston and A. kunst, Motilal Banarsidass, Delhi 1978.*

ATMADEEP
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume-I, Issue-IV, March, 2025, Page No. 998-1003
Published by Uttarsuri, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.096

কাল বিষয়ে জৈনমত ও কান্টের মত: একটি তুলনামূলক আলোচনা

মনিরুল খাঁন, *গবেষক, দর্শন বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2025; Accepted: 26.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Jaina metaphysics the notion of substance occupies a prominent position. Substance in Jainism has been divided into two categories- *astikāya* and *anastikāya*. According to them, time is the only *anastikāya* substance because it does not occupy any space. The existence of time can be inferred from the different qualities of substance like continuity, action, remoteness, farness, oldness, newness etc. Jaina philosophers think that though we divide time into different units for the convenience of our daily life, but it is considered one, indivisible and permanent from transcendental view. Kant, a German philosopher, considers time as *a priori* forms of sensibility. For him, time is not an empirical idea and we cannot think or imagine anything independent of time. By the exposition of metaphysical and transcendental, he wants to prove time as *a priori* intuition. In this paper, I shall focus to make a comparative study between Kantian and Jaina approach on time.

Keywords: Jaina, Substance, Continuity, Change, Kant, Time, form of sensibility, *a priori* intuition.

দ্রব্যের ধারণা দর্শনের আধিবিদ্যক আলোচনায় একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। দর্শনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বুদ্ধিবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিকরা দ্রব্যের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন। একইভাবে ভারতীয় দর্শনেও দ্রব্যের স্বরূপ ব্যাখ্যার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। জৈন দর্শনও তার ব্যতিক্রম নয়। জৈনমতে, যা গুণ ও পর্যায়ের আশ্রয়, তাই দ্রব্য- "গুণপর্যায়বৎ দ্রব্যম্।"[১] দ্রব্যেই গুণ আশ্রিত থাকে, গুণে গুণ আশ্রিত থাকতে পারে না। তাই জৈনরা বলেন, "দ্রব্যাশ্রয়া নির্গুণা গুণাঃ।"[২] যেমন, জ্ঞানরূপ গুণ জীবে আশ্রিত, রূপরসাদিগুণ পুদগলে আশ্রিত, গতিরূপ গুণ ধর্মে আশ্রিত, স্থিতিরূপ গুণ অধর্মে আশ্রিত, অবগাহরূপ গুণ আকাশে আশ্রিত। অনুরূপভাবে, বর্তনাহেতুত্বরূপ গুণটি কালে আশ্রিত থাকে। সুতরাং কালও যে একটি দ্রব্য তা স্বীকার করতে বাঁধা নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জৈন দর্শনে দ্রব্যকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে - অস্তিকায় দ্রব্য (extended substance) ও অনস্তিকায় দ্রব্য (non-extended substance)। 'অস্তি' শব্দের অর্থ বিদ্যমান থাকা, 'কায়' শব্দের অর্থ দেহ বা শরীর। এখানে 'কায়' শব্দটিকে 'বিস্তৃতিবোধক' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যে সকল দ্রব্য কায় বা দেহের মতো স্থান জুড়ে থাকে, তাদের অস্তিকায় দ্রব্য বলে। জৈনমতে, জীব (মুক্ত, বদ্ধ) এবং অজীব (ধর্ম, অধর্ম, আকাশ, পুদগল) হল অস্তিকায় দ্রব্য। অস্তিকায় এর ঠিক বিপরীত হল অনস্তিকায়। যে সকল দ্রব্য কোন স্থান জুড়ে অবস্থান করে না তা হল অনস্তিকায় দ্রব্য। তাঁদের মতে, কালই হল একমাত্র অনস্তিকায় দ্রব্য কেননা কালের কোন দৈশিক অবস্থান নেই, কাল দেশের দ্বারা সীমিত নয়।

আকাশ বা দেশ যেমন প্রত্যক্ষ করা যায় না, অনুমানের সাহায্যে জানা যায়; অনুরূপভাবে কালের জ্ঞানও প্রত্যক্ষলব্ধ নয়, অনুমানের দ্বারা লব্ধ। উমাস্বাতি তাঁর *তত্ত্বার্থাধিগমসূত্রে* ব্যক্ত করেছেন, "বর্তনা-পরিণাম্-ক্রিয়াঃ

পরত্বাপরত্বে চ কালস্য।"[৩] অর্থাৎ দ্রব্যের বর্তনা বা অবিচ্ছিন্নতা, পরিবর্তন, গতি, নতুন গুণের সংযোজন, পুরানো গুণের পরিবর্তন সম্ভবপর হয় কালের দ্বারা। কোনো একটি বস্তু ভবিষ্যৎ কালের অবস্থাযুক্ত নাকি বর্তমান কালের অবস্থাযুক্ত তা বর্ণনা করা সম্ভব হয় যার সহায়তায় তাই হল বর্তনা। 'বর্তন' এর ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও অবস্থায় দ্রব্য বিদ্যমান থাকে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তৈল রূপে তিল; দই রূপে দুধ; কাণ্ড, পত্র, ফল রূপে বীজাঙ্কুর; জীর্ণ বস্তু রূপে নবীন বস্তু বিদ্যমান থাকে। এইরূপে দ্রব্যের পরিবর্তনই হল বর্তনা। আর এই বর্তনার কারণ হল কাল। বর্ণনাহেতুত্ব হল এমন একটি গুণ যার দ্বারা কাল অনুমিত হয়।

পারমার্থিক ও ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জৈনগণ কালকে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন। কাল বিস্তৃতিহীন হওয়ায় অনস্তিকায় দ্রব্য। আমরা জানি যে দ্রব্যের বিস্তৃতি নেই, তার বিভাগও সম্ভব নয়। তাই কাল অবিভাজ্য। যার আদি ও অন্ত নেই, তা অনন্ত। কালের যেহেতু আদি ও অন্ত নেই, সেহেতু কাল নিত্য। কাজেই পারমার্থিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাল এক, অসীম, অবিভাজ্য বা অখন্ড ও নিত্য। আবার ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কাল সসীম, খন্ডিত ও অনিত্য। অবিচ্ছিন্নতা হল পারমার্থিক কালের লক্ষণ। অন্যদিকে, পরত্ব, অপরত্ব, প্রাচীনত্ব, নবীনত্ব ইত্যাদি হল ব্যবহারিক কালের লক্ষণ। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োজনহেতু আমরা কালকে ক্ষণ, দণ্ড, প্রহর, দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী প্রভৃতিতে বিভক্ত করে থাকি। আর এই রূপ বিভক্ত করার কারণেই কাল সীমিত, খন্ডিত ও অনিত্য হয়ে পড়ে। আসলে একই কাল জগতের সর্বত্র বিরাজ করছে। কাল সম্পর্কিত এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যেও জৈনদের অনেকান্তবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কাল হল সেই আবশ্যিক শর্ত যা না থাকলে অস্তিকায় দ্রব্যের স্থায়িত্ব, পরিবর্তন ইত্যাদি উপলব্ধ হত না। কাল না থাকলে কোনো বস্তুর দীর্ঘকাল ধরে অস্তিত্বশীল হওয়াও সম্ভব হত না।

দেশ ও কাল বিষয়ে কান্টের পূর্ববর্তী দুজন বৈজ্ঞানিক তথা দার্শনিক নিউটন ও লাইবনিজের মতবাদ প্রচলিত ছিল। নিউটন এই ধারণা পোষণ করতেন যে, দেশ ও কাল হল স্ব-স্থিত সত্তা (thing in itself) বা স্বাধীন বাস্তব বস্তু (independent real object)। লাইবনিজ দেশ ও কালকে স্ব-স্থিত সত্তা বা স্বাধীন বাস্তব বস্তুর সম্বন্ধরূপে স্বীকার করেছেন। পরবর্তীকালে দেশ ও কাল সম্পর্কিত নিউটন ও লাইবনিজ উভয়ের মতবাদ কান্ট তাঁর বিশ্ববিখ্যাত *Critique of Pure Reason* গ্রন্থে যুক্তিসহকারে নস্যাৎ করেন। কান্টের বক্তব্য হল নিউটনের মতবাদ মেনে নিলে আমাদের এ কথা স্বীকার করতে হবে যে, সকল বস্তুকে যদি বাস্তব বস্তু হতে হয় তাহলে সকল বস্তুকে কালে অবস্থান করতে হবে। কিন্তু সেক্ষেত্রে একটি সমস্যা তৈরি হবে। সমস্যাটি হল কালকেও বাস্তব বস্তু হতে গেলে কালে অবস্থান করতে হবে। কিন্তু কাল কোনভাবেই কালে অবস্থান করতে পারে না। এমতাবস্থায়, কালকে অবস্তু (non-entity) বলে আমাদের মেনে নিতে হবে। একই সমস্যা দেশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাজেই দেশ ও কাল সম্পর্কে নিউটনের মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। আবার লাইবনিজের মতবাদ স্বীকার করলে আমাদের মেনে নিতে হবে যে, দেশ ও কাল হল অভিজ্ঞতালব্ধ ধারণা। ফলস্বরূপ কাল সম্পর্কিত মূল নীতিগুলির পূর্বতঃসিদ্ধতা প্রমাণ করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। পূর্বোক্ত সমস্যাগুলির জন্য উভয়ের মতবাদ পরিত্যাগপূর্বক কান্ট দেশ ও কাল বিষয়ক এক স্বকীয় মতবাদ প্রতিষ্ঠা করতে প্রয়াসী হন। তাঁর মতে, দেশ ও কাল বাস্তব বস্তুও নয়, আবার বাস্তব বস্তুর সম্বন্ধও নয়; দেশ ও কাল হল ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকার (forms of sensibility) যা মানব মনে অবস্থান করে।

জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে দেশ ও কালের ভূমিকা কি তা কান্ট বর্ণিত জ্ঞানীয় প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ করলেই সহজবোধ্য হবে। কান্টের মতে, জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার ক্ষেত্রে মানব মনের ইন্দ্রিয় বৃত্তি (sensibility) ও বুদ্ধিবৃত্তি (understanding) নামক দুটি বৃত্তি যৌথ ভূমিকা পালন করে। স্ব-স্থিত সত্তা মনকে প্রভাবিত করলে ইন্দ্রিয়বৃত্তি (যা মানব মনের নিষ্ক্রিয় গ্রহণ ক্ষমতা) উদ্বুদ্ধ হয় এবং সংবেদন উৎপন্ন হয়। এই সংবেদনকে ইন্দ্রিয়বৃত্তি তার নিজস্ব আকার তথা দেশ ও কালের আকারে আকারিত করে গ্রহণ করে। এই দেশ-কালের আকারে আকারিত সংবেদনের তাৎক্ষণিক প্রতীতি হল স্বজ্ঞা (intuition)। মনে রাখতে হবে যে সংবেদনের সাথে দেশ কালের তাৎক্ষণিক প্রতীতি হলেও দেশ কালের সংবেদন হয় না।

কান্টের বিবেচনায় জ্ঞানের প্রাথমিক উপাদান হল বিশুদ্ধ এবং অবিশুদ্ধ স্বজ্ঞা, যাদের একত্রে অবভাস (appearance) বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রদত্ত দেশ ও কালের আকারে আকারিত সংবেদনই হল অবভাস। অবভাসের উপাদান হল সংবেদন এবং আকার হল দেশ ও কাল। ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা অবভাসিত বস্তু গৃহীত হলেও জ্ঞানের বিষয় গঠিত হয় না। বুদ্ধিবৃত্তি নামক মানব মনের অপর এক বৃত্তি নিজের অন্তঃস্থল থেকে ধারণা (category) প্রয়োগ করে। অতঃপর ইন্দ্রিয়বৃত্তির ক্রিয়াজন্য উৎপন্ন স্বজ্ঞাগুলি ওই ধারণাসমূহের দ্বারা সংশ্লেষিত হয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এইভাবে স্বজ্ঞা ও ধারণা উভয়ের সমন্বয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। এ প্রসঙ্গে কান্ট বলেছেন,

> "Thoughts without content are empty, intuitions without concepts are blind."[৪]

এতদবধি যা বোঝা গেল তাতে স্পষ্ট যে, স্বস্থিত সত্তার সংবেদন হলেও ইন্দ্রিয়বৃত্তি প্রদত্ত দেশ-কালের আকারে আকারিত না হলে সংবেদনের তাৎক্ষণিক প্রতীতি সম্ভব নয়। ফলস্বরূপ স্বজ্ঞা উৎপন্ন হবে না। আর স্বজ্ঞা উৎপন্ন না হলে অবভাস সম্ভব নয়। অবভাস এর অনুপস্থিতিতে জ্ঞানীয় প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপগুলিও কোন মতেই সম্ভব নয়। কাজেই দেশ ও কাল হল অবভাসের প্রাকশর্ত বা আবশ্যিক শর্ত। অবভাসিত সত্তা মাত্রই যে দেশ ও কাল উভয় আকারে আকারিত হয়ে মানব মনের নিকট হাজির হয় এমন নয়। কোনো কোনো অবভাসিত সত্তা কেবলমাত্র কালের আকারে আকারিত হয়ে মানব মনের নিকট হাজির হয়, আবার কোনো কোনো অবভাসিত সত্তা দেশ ও কাল উভয় আকারে আকারিত হয়ে মানব মনের নিকট হাজির হয়। যে সকল অবভাসিত বস্তু দেশ ও কাল উভয় আকারে আকারিত হয়ে মানব মনের নিকট হাজির হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিশুদ্ধ ধারণাসমূহ দ্বারা নির্ধারিত হয় সেগুলি বহির্জগৎ (outer world) গঠন করে। আর যে সকল অবভাসিত বস্তু কেবলমাত্র কালের আকারে আকারিত হয় এবং বুদ্ধিবৃত্তির বিশুদ্ধ ধারণাসমূহ দ্বারা নির্ধারিত হয় সেগুলি অন্তর্জগত (inner world) গঠন করে। কাজেই দেখা যাচ্ছে অন্তর্জগত গঠনের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকাররূপে কাল এককভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কান্ট তাঁর *Critique of Pure Reason* গ্রন্থের 'Transcendental Aesthetic' অধ্যায়ে বিষয়রূপে কাল সম্পর্কে আধিবিদ্যক ব্যাখ্যায় চারটি যুক্তির মাধ্যমে প্রতিপাদন করেছেন কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ স্বজ্ঞা। কোনো প্রত্যয়ের আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা বলতে বোঝানো হয় ঐ প্রত্যয়টি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ প্রত্যয়টি যে পূর্বতঃসিদ্ধ ভাবে প্রদত্ত তা প্রমাণ করা। প্যাটন এর ভাষায়,

> "A metaphysical exposition of an idea analyses the idea by itself and by analysis shows it to be given *a priori*."[৫]

চারটি যুক্তির মধ্যে প্রথম দুটি যুক্তির পতিপাদ্য বিষয় হল কাল পূর্বতঃসিদ্ধ, ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। শেষ দুটি যুক্তির পতিপাদ্য বিষয় হল কাল স্বজ্ঞা, ধারণা নয়।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কাল প্রত্যয়ের আধিবিদ্যক ব্যাখ্যার তৃতীয় যুক্তিটি জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার অন্তর্গত হওয়ায় সংখ্যার ক্রমহেতু পঞ্চম যুক্তির কথা এসে যায়। কান্টের প্রথম যুক্তি অনুযায়ী, আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে পূর্বতঃসিদ্ধ আকাররূপে কাল থাকে বলেই যে কোনো বাহ্য কিংবা আন্তর বস্তুর অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে। অর্থাৎ কোন বস্তুর অভিজ্ঞতা হওয়ার অর্থ কালে অবস্থিতরূপে ঐ বস্তুর অভিজ্ঞতা হওয়া। কাজেই সকল বস্তুর অভিজ্ঞতার পূর্বশর্ত হল কাল এবং সেই কারণেই কাল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ হতে পারে না, তা পূর্বতঃসিদ্ধ । এ প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করেছেন,

> "Time is not an empirical concept that has been derived from any experience."[৬]

দ্বিতীয় যুক্তিতে 'কাল' সম্পর্কিত প্রত্যয়টির আবশ্যিকতার স্বপক্ষে কান্টের যুক্তি হল - আমরা বাহ্য বা আন্তর বস্তুবিহীন বিশুদ্ধকাল বা শূন্যগর্ভ কালের (empty time) চিন্তা বা কল্পনা করতে পারলেও এমন কোন বস্তুর কল্পনা করতে পারি না যা কালে অবস্থিত নয়। যে কোন বস্তুর অবভাস মাত্রই তা কালের আকারে আকারিত অবভাস। সুতরাং, কাল হল সকল বস্তুর অবভাসের আবশ্যিক শর্ত। তাই তিনি বলেছেন,

> "Time is a necessary representation that underlines all intuitions."[৭]

আর যা আবশ্যিক, তাই পূর্বতঃসিদ্ধ। চতুর্থ যুক্তিতে কান্টের মূল বক্তব্য হল বিষয়রূপে কাল সাধারণ ধারণা (general concept) নয়। অনেকে মনে করেন, আমাদের যখন বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞতা হয়, তখন সেই বিষয়গুলি বিভিন্ন কালিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েই অভিজ্ঞতার বিষয় হয়। যেমন আমরা আমাদের ব্যবহারিক সুবিধার্থে কালকে ক্ষণ, মিনিট, ঘন্ট, দিন, প্রহর, সপ্তাহ, মাস, বছর, শতাব্দী ইত্যাদিতে বিভাজন করে থাকি। এইরূপ খন্ড খন্ড কাল তথা বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সামান্যীকরণের মাধ্যমে কালের ধারণা গঠন করি। কান্ট এই প্রকারে কালের ধারনা গঠনের সম্ভাবনা অস্বীকার করেননি। কিন্তু তাঁর মতে, বিষয়রূপে কাল সম্পর্কে সামান্য ধারণা গঠন করা সম্ভব নয়। যে সকল কালিক সম্পর্কগুলি আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত হয়, সেগুলি খন্ড খন্ড কাল সম্পর্কিত। আর খন্ড খন্ড কাল হল এক ও অখণ্ড কালের অংশ; দৃষ্টান্ত নয়। সামান্য বা সাধারণ ধারণা হল অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে অনুগত সাধারণ ধারণা। কিন্তু খন্ড খন্ড কালগুলি এক ও অখন্ড কালের দৃষ্টান্ত না হওয়ায় বিষয়রূপে কাল সাধারণ ধারণা নয়, তা স্বজ্ঞা। পঞ্চম যুক্তিতে কান্টের মূল বক্তব্য হল কাল অসীম হওয়ার কারণে কাল সামান্য ধারণা নয়, তা স্বজ্ঞা। যদি কাল সামান্য ধারণা হত তাহলে কালের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত থাকত। সেই সকল কালিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই সামান্যীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কালের ধারণা গঠিত হত। ফলস্বরূপ কালকে 'অসীম' পরিমাণ বিশিষ্ট বলা যেত না। একটি সামান্য ধারণার অধীনে অসংখ্য বিশেষ বিশেষ বস্তু দৃষ্টান্ত রূপে থাকে। বিশেষ বিশেষ বস্তুর পরিমাণ বিশিষ্ট হলেও সামান্য ধারণার পরিমাণ নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু বিষয়রূপে কাল অখন্ড হওয়ায় কালের বিভিন্ন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না, সেগুলি কালের অংশ। আর তাছাড়া 'কাল হল অসীম' এইভাবে কালের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। কাজেই বিষয়রূপে কালকে সামান্য ধারণা বলা যায় না।

কাল সংক্রান্ত জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে কান্ট পরোক্ষভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছেন কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ স্বজ্ঞা। কোনো ধারণার জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করার অর্থ হল নীতিরূপে ওই ধারণার এমন ব্যাখ্যা যার উপর নির্ভর করে অন্যান্য সংশ্লেষক পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের সম্ভাবনা বোঝা যায়। কান্টের ভাষায়,

> "Iunderstandby transcendental exposition the explanation of a concept, as a principle from which the possibility of other *a priori* synthetic knowledge can be understood."[৮]

কাল বিষয়ক জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় কান্ট কাল সম্পর্কিত কতকগুলি সর্বজনগ্রাহ্য ও স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতির উল্লেখ করেছেন। যেমন-কাল কেবলমাত্র একটি মাত্রাবিশিষ্ট। এই প্রকার মূলনীতিগুলি কঠোরভাবে সার্বিক ও আবশ্যিক হওয়ায় পূর্বতঃসিদ্ধ। আর মূলনীতিগুলি যেহেতু পূর্বতঃসিদ্ধ সেহেতু মূলনীতির বিষয়রূপে কাল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ হতে পারে না। কাজেই কান্টের মত অনুযায়ী, আমাদের স্বীকার করতে হয় কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ। আবার এই মূলনীতিটি সংশ্লেষক বচন। কেননা এই নীতিটির উদ্দেশ্য ধারণার মধ্যে বিধেয় ধারণা নিহিত নেই এবং বিধেয় ধারণাটি উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন তথ্য জ্ঞাপন করে। বিষয়রূপে কাল সামান্য বা সাধারণ ধারণা হলে কাল সম্পর্কে সংশ্লেষক বচন গঠন করা যেত না। কিন্তু কাল সম্পর্কিত মূলনীতিগুলি সংশ্লেষক হওয়ায় বিষয়রূপে কাল সামান্য বা সাধারণ ধারণা নয়, তা স্বজ্ঞা একথা আমাদের মেনে নিতে হয়। কাল সম্পর্কিত মূল নীতিগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক হওয়ায় তা কাল সংক্রান্ত অন্যান্য মূলনীতি যেমন গতি ও পরিবর্তন সম্পর্কিত নীতিগুলির সম্ভাব্যতা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। সুতরাং, কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ স্বজ্ঞা।

এখন কাল বিষয়ে জৈনমত ও কান্টের মতের মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা করতে হলে কাল সম্পর্কিত উভয় দর্শনের চিন্তাভাবনার মধ্যে সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের কথা বলতেই হয়। জৈন দর্শনে কালকে প্রতিটি অস্তিকায় দ্রব্যের প্রাকশর্তরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। একইভাবে কান্টের দর্শনেও কালকে সকল অবভাসের প্রাকশর্তরূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে জৈন দর্শনে কালকে একটি দ্রব্য (অনস্তিকায়) হিসেবে বিবেচিত হলেও কান্টের দর্শনে কালের স্বরূপ তেমন নয়। কাল কোন স্বতন্ত্র বস্তু বা স্বতন্ত্র বস্তুর ধর্ম নয়, তা আমাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকারমাত্র, বিষয়রূপে কাল পূর্বতঃসিদ্ধ স্বজ্ঞা। জৈন স্বীকৃত অনস্তিকায় দ্রব্যরূপে কাল সকল অস্তিকায় দ্রব্যের (যা দৈশিক অবস্থান জুড়ে থাকে) আবশ্যিক শর্তরূপে কাজ করে। কিন্তু কান্ট স্বীকৃত পূর্বতঃসিদ্ধ

স্বজ্ঞারূপে কাল বহির্জগত ও অন্তর্জগত গঠনে আবশ্যিক ভূমিকা পালন করে। কেননা বাহ্য কিংবা আন্তর উভয় অবভাসিত বস্তুই কালের আকারে আকারিত হয়ে বুদ্ধিবৃত্তির বিশুদ্ধ ধারণাসমূহ দ্বারা নির্ধারিত হয়। জৈন মতে, কাল প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়, তা অনুমেয়। 'বর্তনাহেতুত্ব' নামক গুণ থেকেই কালের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আরও সহজ ভাবে বলা যায় যে, বিভিন্ন বস্তুর সহাবস্থান ও পারম্পর্য (coexistence and succession) সম্পর্কের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 'কাল' নিঃসৃত হয়। কিন্তু কান্টের ধারণা সম্পূর্ণরূপে এই মতের সাথে বিপরীত। কেননা সকল বস্তুর অভিজ্ঞতার প্রাকশর্ত হওয়ায় কাল ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, তা পূর্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং, কান্টের মত অনুযায়ী বলা যায় পূর্বতঃসিদ্ধ আকাররূপে আগে কাল, পরে বস্তুর অভিজ্ঞতা। কান্টের মতে, কাল ইন্দ্রিয়বৃত্তির আকার হওয়ায় তা আগে থেকেই মানব মনে অবস্থান করে। কিন্তু জৈন মতে, কাল কোথায় থাকে তার কোনো সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। আবার 'কাল' এর কালে থাকা কোনমতেই সম্ভব নয়। কাল সম্পর্কিত আধিবিদ্যক ব্যাখ্যার চতুর্থ যুক্তিতে বিষয়রূপে কালের পূর্বতঃসিদ্ধতা প্রমাণ করতে গিয়ে কান্ট বলেছেন, খন্ড খন্ড কাল হল এক ও অখণ্ড কালের অংশ। পঞ্চম যুক্তিতে 'কাল সামান্য ধারণা নয়, তা স্বজ্ঞা' প্রতিপাদন করতে গিয়ে কান্টের মূল যুক্তি হল 'কাল অসীম'(Time is infinite)। কান্ট স্বীকৃত 'কাল এক, অখন্ড ও অসীম' এই মতামতের সাথে জৈন মত সামঞ্জস্যপূর্ণ কেননা তাঁরাও বলেছেন ব্যবহারিক দিক থেকে কাল খন্ডিত, সসীম হলেও পারমার্থিক দিক থেকে কাল এক, অখন্ড ও অসীম। জৈনদের এরূপ বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুধাবন করা যায় যে তাঁরা কালের ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় সত্তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কান্ট কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতেই কালের বাস্তবতা স্বীকার করেছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের ঊর্ধ্বে কালের কোন বাস্তবতা তিনি স্বীকার করেননি। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুকে জানার বিষয়ীগত শর্ত ছাড়া কাল আর কিছুই নয়। অতীন্দ্রিয় জগতে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ানুভব ব্যতিরেকে যদি আমরা কালকে বিচ্ছিন্নভাবে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে কাল বলে আমরা কিছুই পাব না। তাই কান্ট মনে করেন, কাল ঐন্দ্রিয়কভাবে বাস্তব, কিন্তু অতীন্দ্রিয়ভাবে অবাস্তব (empirically real but transcendentally ideal)।

তথ্যসূত্র:

১. উমাস্বাতি, *তত্ত্বার্থাধিগমসূত্র*, ৫/৩৮
২. তদেব,৫.৩৯
৩. তদেব,৫.২২
৪. N.K. Smith, *A Commentary to Kant's 'Critique of Pure Reason*, B75
৫. H.J. Paton, *Kant's Metaphysic of Experience*, vol.1, p.108
৬. N. K. Smith, *Kant's Critique of Pure Reason*, p.74
৭. Ibid., pp.74-75
৮. Ibid., B40

গ্রন্থপঞ্জী:

1. Sharma, Chandradhar, A Critical Survey of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi, 1960
2. Paton, Herbert James, Kant's Metaphysic of Experience, George Allen & Unwin Ltd., London, 1965
3. Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, trans by N.K. Smith, Macmillan & Co. Ltd., London 1970
4. Hiriyanna, M., Outlines of Indian Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi, 1993

5. Das, Rasvihary, A Handbook to Kant's Critique of Pure Reason, Progressive Publishers, Calcutta, 1992
6. Chatterjee, Satischandra and Datta Dhirendranath, An Introduction to Indian Philosophy, Rupa Publications India Pvt. Ltd., New Delhi, 2007
7. Roy, Sunil, Kant on Human Subject, The University of Burdwan, Burdwan, 2010
8. Masih, Y., A Critical History of Western Philosophy, Motilal Banarsidass Publishers Pvt. Ltd., Delhi, 1947
9. হোসেন, তাফাজল, ইমানুয়েল কান্টের প্রথম ক্রিটিক একটি উপস্থাপনা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৭
10. সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৭৪
11. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৯
12. সরকার, প্রহ্লাদ কুমার, কান্টের দর্শন (সম্পাদিত), দর্শন ও সমাজ ট্রাস্ট, হাওড়া, ২০১০
13. দাস, রাসবিহারী, কান্টের দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১৯৮৪
14. ন্যায়াচার্য, শ্রী সতীন্দ্রনাথ, জৈন দর্শনের দিগ্ দর্শন, সংস্কৃত কলেজ, কলিকাতা, ১৯৫৭

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1004-1009
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.097

উপনিষদের আলোকে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক: একবার ফিরে দেখা

ড. ব্রততী চক্রবর্তী, *সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, টুরকু হাঁসদা লপসা হেমরম মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 22.03.2025; Accepted: 25.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The all-round development of a society depends on proper education. The implementation of proper education mainly depends on two factors- Student and Teacher. Healthy and comfortable partnership of these two moves the education process forward. In the present time the society is not getting the benefits of that education. But the history of this India bears witnesses to a fair education system where the thirst for knowledge of students has been satisfied by the unstinting education of fatherly Brahmavid gurus, and a healthy and normal society has been created. In the Upanishadic era, we see the student as a disciple and the teacher is known as a Guru or Acharya. The Upanishads inform us about the minimum qualifications that a student needs to have in order to acquire knowledge. The Upanishads advise a five-year-old boy to enter Brahmacharya. This was a must for all children. One of the qualifications of a student was his inquiring mind. Apart from this the Brahmacharya, Tapah and Sraddha were also the qualities of students. Their education was completed in the presence of the Brahmavid Guru. The characteristics and duties of the Guru have been discussed in the Upanishads. The Guru lights the fire of knowledge in the heart of the disciple. The Upanishads do not say that the Guru should be only a Brahmin who knows the Vedas. We see many people like Brahmins, Kshatriyas, kings, ordinary householders, fathers, husbands, etc. as Guru. Even examples of learning from non-humans are found in the Upanishads.

Keywords: *Shishya, Guru, Brahnacharya, Upanayana, Jijnasa, Sraddha etc.*

কোন সমাজ তথা সামাজিকের সর্বাঙ্গীণ বিকাশে শিক্ষার মাহাত্ম্য অপরিসীম। সামাজিকেরা যদি সুশিক্ষায় শিক্ষিত হন তাহলে সেই সমাজ হবে রুচিশীল, প্রগতিশীল এবং সমৃদ্ধ। কিন্তু এর বিপরীত হলে সেই সমাজের অবক্ষয় অনিবার্য। তাই বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষার বিষয়টি বিবেচনার দাবি রাখে, যখন চারিদিকে দুর্নীতি, অরাজকতা, মূল্যবোধহীনতা সমাজকে কলুষিত করে চলেছে। এই সুশিক্ষার বাস্তবায়ন দুটি বিষয়ের ওপর মূলতঃ নির্ভর করে। প্রথম হল শিক্ষার্থী এবং দ্বিতীয় শিক্ষক। প্রথমজন জ্ঞানপ্রার্থী এবং অন্যজন জ্ঞানদাতা। এই দুইয়ের প্রাঞ্জল, সচ্ছন্দ অংশীদারিত্বে শিক্ষা প্রক্রিয়াটি এগিয়ে চলে। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে শিক্ষা পদ্ধতিকে উন্নত যুগোপযোগী করার জন্য অনুসৃত হচ্ছে নানান বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি, সংশোধিত করা হচ্ছে পাঠ্যক্রম, মূল্যায়নের মাধ্যমে পরিমাপ করা হচ্ছে শিক্ষার মানের। কিন্তু এত কিছুর পরও সেই শিক্ষার কোন চিহ্ন মানুষের জীবনচর্যায় ছাপ ফেলে না। সমস্ত শিক্ষনীয় বিষয়গুলি মগজস্থ হচ্ছে কিন্তু আত্মস্থ হচ্ছে না। শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুদৃঢ় করার জন্য প্রযুক্ত হচ্ছে নানান কৌশল। তৈরি করা হচ্ছে মেন্টর-মেন্টি গ্রুপ যেখানে শিক্ষক মেন্টরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধাগুলির খেয়াল রেখে তাদের প্রতিকূলতাগুলিকে দূর করার প্রয়াস করছেন । কিন্তু শিক্ষাব্যবস্থার এই

আরম্বরের মধ্যেও থেকে যাচ্ছে প্রাণের অভাব, স্বাচ্ছন্দের অভাব। যার ফলস্বরূপ সেই শিক্ষার সুফল পাচ্ছে না বর্তমান সমাজ। কিন্তু এই ভারতবর্ষের ইতিহাসই সাক্ষ্যবহন করে এমন এক সুষ্ঠু শিক্ষাব্যবস্থার যেখানে পিতৃতুল্য ব্রহ্মবিদ গুরুদের কার্পণ্যরোহিত বিদ্যাদানে তৃপ্ত হয়েছে শিষ্যের জ্ঞানপিপাসা, রচিত হয়েছে এক সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। মানব সমাজের ঘটে যাওয়া উত্থান-পতন, উন্নতি-অবক্ষয়, ভালো-মন্দ সবকিছুই প্রতিফলিত হয় সাহিত্যদর্পণে। তাই একটি সমাজকে জানার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হলো সাহিত্য। আমাদের পূর্বপুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষা, রীতি-নীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কৃতি -এই সমস্ত কিছুর ইতিহাস বিবৃত রয়েছে আমাদের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদে। এই বৈদিক সাহিত্যে অবগাহন করলে জানতে পারা যায় তৎকালীন ভারতবর্ষের শিক্ষাপদ্ধতি, গুরু ও শিষ্যের স্বরূপ এবং তাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে। 'বৈদিক সাহিত্য' শব্দবন্ধ উচ্চারিত হলে বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্ এই চারটি ভাগের কথা মানসপটে ফুটে ওঠে। এদের মধ্যে প্রথম দুইয়ের সমাহার 'কর্মকাণ্ড'রূপে এবং অবশিষ্ট দুটি 'জ্ঞানকাণ্ড'রূপে সর্বজনবিদিত। বৈদিক আচারসর্বস্ব যজ্ঞাদিক্রিয়া ও তাদের বিধি-বিধানের অন্তরালে ঋষিকবির অন্তরে যে জ্ঞানতৃষ্ণার জন্ম হয়েছিল তা আরণ্যকে পরিবর্ধিত হয়ে চরিতার্থ হয় উপনিষদে। বেদান্ত নামে খ্যাত উপনিষদের এই নামকরণ যে শুধুমাত্র বেদের অন্তিমে বা শেষে অবস্থানের জন্য হয়নি সে বিষয়ে সহৃদয় পাঠককুল অবশ্যই অবগত। 'অন্ত' পদটি এক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বে পর্যবসিত। সমগ্র বেদে বর্ণিত জ্ঞানরাজির সারাৎসার, সর্বোৎকৃষ্ট জ্ঞান বিধৃত এই উপনিষদে। বৈদিক তথা ঔপনিষদীয় শিক্ষাপদ্ধতি গুরুশিষ্যপরম্পরাকে অনুসরণ করে। উপনিষদ্ শব্দটিই তার সাক্ষ্য বহন করে। উপ ও নি উপসর্গযোগে সদ্ ধাতুর উত্তর ক্বিপ্ প্রত্যয় যোগে গঠিত 'উপনিষদ্' পদটি। উপ উপসর্গের অর্থ সত্বর বা সামিপ্য, নি উপসর্গ নিশ্চয় বা নিঃশেষ অর্থকে দ্যোতিত করে। সদ্ ধাতুর নানা অর্থের মধ্যে বিশরণ অর্থাৎ গতি বা প্রাপ্তি, অবসাদন, বিনাশ প্রভৃতি গ্রহণ করা হয়। সুতরাং ব্যুৎপত্তিলব্ধ একাধিক অর্থের মধ্যে[১] এটিও গ্রহণযোগ্য – শিষ্য গুরুর সমীপে উপগত হয়ে নিঃসংশয়চিত্তে যে জ্ঞান গ্রহণ করে বা প্রাপ্ত হয় তাই উপনিষদ্। Paul Deussen- এর ভাষায়- Upanisads means a confidential secret sitting. একাগ্রতা বিঘ্নকারী সমস্ত আকর্ষণ থেকে দূরে একান্তে নিভৃতে গুরুসমীপে উপবিষ্ট হয়ে অভিজ্ঞ আচার্যের কাছে শিষ্য জ্ঞানার্জন করবে। যে কোনও বিষয়ে ব্যুৎপন্ন, সুদক্ষ হতে হলে এই একান্তবাস আজকের যুগেও সমান প্রয়োজনীয়। কেমন ছিল সেই গুরু ও শিষ্যের স্বরূপ? জ্ঞানার্জন ও জ্ঞানদান করতে গেলে কোন কোন গুণাবলীর আধিকারী হতে হতো তাদের? এই সমস্তই বিধৃত রয়েছে উপনিষদ্ সাহিত্যে। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা কিছু প্রধান উপনিষদ্সমূহে বিধৃত বিভিন্ন আখ্যায়িকাকে অবলম্বন করে ঔপনিষদীয় যুগের গুরু-শিষ্যের স্বরূপ ও তাদের কর্তব্যের প্রতি আলোকপাত করার প্রয়াস করব। এখানে মূলতঃ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে অন্যান্য উপনিষদের আলোচনাও করা হয়েছে।

শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানুষের অজ্ঞানকে দূর করে জ্ঞানের আলো প্রজ্জ্বলিত করা। প্রকৃত সুশিক্ষা একদিকে যেমন অজানাকে জানতে, জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, অন্যদিকে মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলিকে বিকশিত করে এক সুন্দর সমাজ গড়তে সহায়ক হয়। একজন মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের মাধ্যমে যেমন জ্ঞানার্জন করতে পারে, তেমনি জীবনে চলার পথে কোন জ্ঞানী ব্যক্তির সান্নিধ্যও তাকে অজানা থেকে জ্ঞানের মার্গে নিয়ে যায়। এই দুইয়েরই সন্ধান পাওয়া যায় উপনিষদে। তবে দুটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজন শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের, একজন জ্ঞানপ্রার্থী আর অন্যজন জ্ঞানদাতা। প্রথমজন বিনম্রচিত্তে, শ্রদ্ধাশীল হয়ে জিজ্ঞাসু মন নিয়ে উপস্থিত হবে জ্ঞানবৃদ্ধ, পিতৃতুল্য আচার্যের কাছে, যিনি নিজের প্রজ্ঞার আলোয় আলোকিত করবে শিষ্যের জীবন, নিরসন করবেন তার সমস্ত জিজ্ঞাসা। এই চিত্রই প্রতিফলিত হয়েছে উপনিষদ্-দর্পণে। প্রথমেই আমরা অলোকপাত করব শিক্ষার্থী বা শিষ্যের বিষয়টিতে। জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায় শিক্ষক বরিষ্ঠ হলেও শিক্ষার্থীর আলোচনা প্রথমে করার যথার্থ কারণ বিদ্যমান। একজন জ্ঞানী ব্যক্তিকে আমরা সম্মান করি, সমাজ তাঁকে পণ্ডিত, সজ্জন ইত্যাদিরূপে সম্বোধিত করে, কিন্তু তিনি একজন শিক্ষক বা গুরুরূপে চিহ্নিত হন তখনই যখন তার সান্নিধ্যে আসে কোন জিজ্ঞাসু শিষ্য বা ছাত্র। শিক্ষার্থী বিদ্যাগ্রহণার্থে গুরুসমীপে এলে তবেই তার শিক্ষকসত্ত্বা জাগরিত হয়। তাই যে একজন প্রাজ্ঞকে শিক্ষক বা গুরু করে তোলে তার আলোচনা বর্তমান প্রসঙ্গে অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বলে মনে হয়। তাই প্রথমে আমরা উপনিষদে বর্ণিত শিক্ষার্থীর স্বরূপ আলোচনা করব।

বর্তমানে আমরা শিক্ষার্থী বা ছাত্র পদের দ্বারা যাদের বুঝি উপনিষদ্ ও তার সমসাময়িক কালে তাদের আমরা 'শিষ্য'রূপে দেখি। কোনও কোনও স্থলে 'অন্তেবাসী' পদের প্রয়োগ দেখা যায়।[২] বিদ্যাগ্রহণকালে শিষ্য গুরুগৃহে গুরুর নিকটে বাস করত বলে সে অন্তেবাসী। পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিক্ষাগ্রহণ প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক এই দুই পদ্ধতিতেই সম্ভব ছিল। দুটি ক্ষেত্রেই শিষ্যত্ব গ্রহণের জন্য কিছু যোগ্যতার প্রয়োজন ছিল। তাদের সেই জ্ঞানের অধিকারী হতে হতো। ফলে স্বামীত্বকে বলে অধিকার, সেই স্বামীত্ব বা প্রভূত্ব যে অর্জন করে সেই অধিকারী।[৩] পাত্র যদি ছিদ্রাদি ত্রুটিযুক্ত হয় তাতে যতই উন্নতমানের জল রাখা হোক, সেই জল যেমন ক্ষরিত হবেই ঠিক তেমনি অধিকার বা যোগ্যতাহীন শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রেও উত্তম শিক্ষাও কার্যকরী হবে না। তাই উপনিষদ্ বারংবার শিষ্যের যোগ্যতার কথা সুনিশ্চিত করেছেন। শিষ্য গুরূপদিষ্ট জ্ঞান গ্রহণে, গৃহীত জ্ঞান ধারণে এবং সেই জ্ঞানের যথার্থ প্রয়োগে যোগ্য কিনা এই বিষয়গুলিই তার যোগ্যতা বা অধিকারের পরিমাপক।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার কেন্দ্র হিসাবে সেই সময় গুরুগৃহ নির্দেশিত। এই শিক্ষা ছিল সম্পূর্ণরূপে আবাসিক। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেই সময় পঞ্চবর্ষীয় বালককে সঁপে দেওয়া হত গুরুর হাতে দীর্ঘ দ্বাদশবর্ষের জন্য। জীবনের যে অধ্যায়ে মন থাকে কালিমামুক্ত, নতুনকে গ্রহণ করার ক্ষমতা থাকে সর্বাধিক, বুদ্ধির উপর মিথ্যার আবরণ যখন থাকে না সেই শৈশব ও যৌবনকালকেই বিদ্যালাভের কাল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিদ্যালাভের এই সময়কাল যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের আরুণি-শ্বেতকেতু সংবাদে। সেখানে প্রায় দ্বাদশবর্ষ উত্তীর্ণ শ্বেতকেতুর বিদ্যাগ্রহণের আগ্রহ উৎপন্ন না হওয়ায় পিতা আরুণি চিন্তিত হন এবং পুত্রকে বলেন- 'শ্বেতকেতো বস ব্রহ্মচর্যং'। কারণ ব্রাহ্মণবংশে জন্মে বেদাধ্যায়নের মাধ্যমে ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী না হলে তা নিন্দনীয়। লোকে সে 'ব্রহ্মবন্ধু' বলে পরিচিত হবে, ব্রাহ্মণ নয়। তাই শ্বেতকেতু গুরুগৃহে চব্বিশ বছর পর্যন্ত বেদাধ্যয়ন করে ফিরে আসে। এর থেকে জ্ঞাত হয় যে ব্রহ্মচর্যাশ্রমের সময়সীমা দ্বাদশ বৎসর। এই ব্রহ্মচর্যাশ্রম শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ সন্তানের জন্য নয়, রাজার সন্তান থেকে সাধারণ গৃহস্থের সন্তান, পুত্র কন্যা সকলের জন্যই পালনীয় ছিল।[৪] সমাজের সকলের বিদ্যালাভে অধিকার ছিল বলেই পিতৃপরিচয়হীন জাবাল সত্যকামের বিদ্যালাভ সম্ভব হয়েছিল। তাই সত্যকাল গৌতমের কাছে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হতে ইচ্ছাপ্রকাশ করলে গৌতম যখন তাঁর গোত্র জানতে চাইলেন তখন সত্যকাম বলে যে সে মাতা জবালির সন্তান, পিতার গোত্র তার অজানা। তার এই সত্যভাষণে প্রীত হয়ে গুরু গৌতম তাকে তৎক্ষনাৎ শিষ্যত্বে বরণ করার জন্য প্রস্তুত হন।[৫]

ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আগত ছাত্রদের প্রথম কর্তব্য হল উপনয়ন। 'উপ' অর্থাৎ সমীপে 'নয়ন' অর্থাৎ আনয়ন। ব্রহ্মজ্ঞ গুরুর সান্নিধ্য লাভ করে নবাগত, প্রাপ্তি হয় শিষ্যত্বের। এখন থেকে তার সমস্ত দায়িত্ব গুরুর। গুরুর এই একান্ত সান্নিধ্য যে কেবলমাত্র বেদাধ্যয়ন বা ব্রহ্মবিষয়ক আলোচনার জন্য আবশ্যক তা নয়, এর দ্বারা গুরুর ব্যক্তিত্বের ও জীবনচর্যার প্রভাব পড়ত শিষ্যের জীবনে। অধ্যয়নের পাশাপাশি চলতে থাকত দৈনন্দিন কার্যাবলি, যেমন- সমিধ আহরণ, পশুচারণ, ভিক্ষান্ন সংগ্রহ ইত্যাদি। এই সমস্ত কর্তব্য তাদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে পরিচিত হতে সহায়ক হত। ভিক্ষান্নের দ্বারা ক্ষুধানিবৃত্তির ফলে অন্নের মাহাত্ম্য অনুভূত হত। সমস্ত বাহুল্যকে বর্জন করে পরিমিতে জীবনযাপনের শিক্ষায় শিক্ষিত হত তারা। সকলের সঙ্গে সহাবস্থানের ফলে সৌহার্দ্য, মৈত্রী, সহযোগিতা, সহমর্মীতা প্রভৃতি মানবিক গুণগুলিও বিকশিত হত। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়ন ব্যতীত গুরূপদিষ্ট পথে জীবনযাপন শিষ্যের কর্তব্যসমূহের মধ্যে অন্যতম। উপনিষদে প্রতিপাদিত গুরুশিষ্যপরম্পরাদ্যোতক বিভিন্ন কাহিনীগুলি বিচার করলে শিষ্যের কিছু গুণাবলী বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়, যেগুলি শিষ্যের মধ্যে থাকা আবশ্যক। সেগুলির মধ্যে অন্যতম হল জিজ্ঞাসু মন। শিষ্যের জানার ইচ্ছা হতে হবে স্বতোৎসারিত। তবেই শিক্ষা হবে ফলপ্রসু, অন্যথায় তা হবে নামমাত্রে পর্যবসিত। যেমন- শ্বেতকেতুর ব্রহ্মচর্যপালন স্বেচ্ছায় ছিল না, পিতার ইচ্ছা পূরণার্থে সে গুরুগৃহে গিয়েছিল, লোকনিন্দা থেকে নিজের বংশকে রক্ষা করার জন্য। ফলে বিদ্যালাভ করা সত্ত্বেও তার চরিত্রে তার ইতিবাচক প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়নি। তাই পিতা লক্ষ্য করেছেন ছেলের পাণ্ডিত্যাভিমান। বলা হয়েছে- 'স হ দ্বাদশবর্ষ উপেত্য চতুর্বিশতিবর্ষঃ সর্বান্ বেদানধীত্য মহামনা অনূচায়মানী স্তব্ধ এয়ায়'।[৬] শ্বেতকেতুর আচরণে 'মহামনা' অর্থাৎ নিজের মনকে উন্নত ভাবা, নিজেকে পণ্ডিত মনে করা এবং অবিনয়ের ছাপ দেখে বোঝা যায় যে সে সুশিক্ষিত হয়নি। সুতরাং শিক্ষার্থীর জানার ইচ্ছা সহজাত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ওই একই উপনিষদে আমরা আর একজন শিক্ষার্থীকে দেখতে পাই যার জিজ্ঞাসা স্বাভাবিক হওয়ায় তাঁর

মধ্যে গুরু লক্ষ্য করেছেন ব্রহ্মতেজ- 'ব্রহ্মবিদেব বৈ সৌম্য ভাসি'। সত্যকাম গুরু গৌতম প্রদত্ত চারশ গাভী নিয়ে চার সহস্র গাভী ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে দীর্ঘ অরণ্যবাস করে। তার তপস্যায় অভিভূত হয়ে স্বয়ং প্রকৃতি তাকে নানা রূপে ব্রহ্মজ্ঞান দান করেন। তৎসত্ত্বেও গুরূপদিষ্ট না হওয়ায় তিনি নিজেকে ব্রহ্মবিদ মনে করেন নি। পরবর্তীতে গুরুর উপদেশ লাভ করে সে কৃতার্থ হয়।[৭] শুধুমাত্র প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রেই শিষ্যের উক্ত গুণ আবশ্যক এমন নয়, যে কোন ক্ষেত্রেই জানার ইচ্ছা স্বাভাবিক হলে তবেই তা ফলপ্রসু হয়। যেমন বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্যের স্ত্রী মৈত্রেয়ীর অমৃতত্বের স্বাভবিক জিজ্ঞাসা [৮] তাকে আত্মজ্ঞ বা ব্রহ্মবিদ করে তুলেছে। তাই সংসারত্যাগোদ্যত যাজ্ঞবল্ক্য প্রিয়া মৈত্রেয়ীকে আত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়েছেন।

'ব্রহ্মচর্য'[৯] কে শিক্ষা বা বিদ্যালাভের জন্য শিষ্যের গুণরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে বারংবার। শৈশবে গুরুগৃহে বাস করে প্রথাগতভাবেই হোক বা কোন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির কাছে বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্যই হোক, ব্রহ্মচর্যের কথা বারবার বলা হয়েছে উপনিষদে শিক্ষার প্রাক্‌শর্ত হিসাবে। যেমন- প্রশ্নোপনিষদে সুকেশা, সত্যকাম, সৌর্যায়ণি, কৌশল্য, বৈদর্ভী ও কবন্ধী – এই ছয়জন ব্রহ্মপরায়ন ব্যক্তি পরব্রহ্মের জ্ঞানের নিমিত্ত পৈপল্লাদ ঋষির কাছে উপস্থিত হলে ঋষি বলেন- 'ভূয় এব তপসা ব্রহ্মচর্যেণ শ্রদ্ধয়া সংবৎসরং সংবৎস্যথ'। তপস্যা, শ্রদ্ধার সঙ্গে একবছর ব্রহ্মচর্য পালন করার কথা বলেন ঋষি, তবেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য জিজ্ঞাসার অধিকারী হবেন তারা। তারা সকলেই একবছর ব্রহ্মচর্যের পালন করে নিজেদের প্রশ্নগুলি মহর্ষি পৈপল্লাদকে করেন ও তাদের জিজ্ঞাসার নিরসন হয়। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেবরাজ ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন প্রজাপতির কাছে ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্য গেলে সেখানে তারা দুজনে বত্রিশ বছর ব্রহ্মচর্য পালন বাস করেন।[১০] বৃহদারণ্যকে বর্ণিত প্রজাপতির তিন সন্তান- দেবতা, মানুষ ও অসুর প্রজাপতির থেকে উপদিষ্ট হওয়ার জন্যও ব্রহ্মচর্যের পালন করেছিলন, তবেই তারা উপদিষ্ট হন। সুতরাং গুরু বা আচার্যের উপদেশলাভের পূর্বশর্ত শিষ্যের ব্রহ্মচর্য যাপন।

ব্রহ্মচর্যের সঙ্গে শিষ্যের মধ্যে তপস্যা ও শ্রদ্ধা থাকা কাঙ্খিত। 'তপ্' ধাতুনিষ্পন্ন তপস্যা শব্দের দ্বারা মূলত শ্রমসাধ্য আপাতকঠিন কাজকে বোঝায় যা শরীরে তাপের সঞ্চার করে। তপস্যা হল কায়িক, বাচিক ও মানসিক কৃচ্ছসাধন, যার দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযমের মাধ্যমে জীবনে স্থিরতা আসে। অপরপক্ষে 'শ্রদ্ধা' হল গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হলে জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়। তাই উপনিষদের সর্বত্র শিষ্যের আচরণে শ্রদ্ধা পরিলক্ষিত হয়। উপনিষদের সারাৎসার গীতাতেও শ্রদ্ধাবানের প্রশংসা করে বলা হয়েছে-

'শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ
জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি।। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৪/৩৯

উক্ত গুণযুক্ত শিষ্য সমিধপাণি হয়ে সদ্‌গুরুর সান্নিধ্যে একাগ্রচিত্তে উপবিষ্ট হয়ে কাঙ্ক্ষিত বিষয়ের জ্ঞানলাভ করবে। সমিধ হল যজ্ঞার্থে আহরিত কাষ্ঠখণ্ড। শিক্ষারম্ভে সমিধ নিয়ে যাওয়া বিষয়টি প্রচলিত প্রথাকে অনুসরণ করে যার একটি অন্তর্নিহিত অর্থ বিদ্যমান। কাঠ যেমন যজ্ঞকুণ্ডে অগ্নিকে প্রজ্বলিত হতে সাহায্য করে, ঠিক তেমনি গুরুর সান্নিধ্যও শিষ্যের হৃদয়ে জ্ঞানাগ্নিকে প্রজ্বলিত করবে, যার আলোকে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার, অজ্ঞান দূরীভূত হবে। শিষ্যের হৃদয়ের সমস্ত সংশয়, দ্বন্দ্বকে নিরস্ত করে তাকে সুশিক্ষার পথে চালিত করেন যিনি তিনিই শিক্ষক, শিক্ষাগুরু। শিক্ষক হলেন সেই কারিগর যিনি পথপ্রান্তে পড়ে থেকে মৃত্তিকাখণ্ডকে ব্যবহারোপযোগী পাত্রে পরিণত করতে সক্ষম। নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জলসিঞ্চনে কোমলমতি শিশুকে সুমানব করে তোলেন। বর্তমান যুগের শিক্ষক উপনিষদে গুরুরূপে সুবিদিত। গুরুর গুণাবলী ও শিষ্যের জীবনে তার ভূমিকা আলোচনার পূর্বে গুরু কে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। 'গৃণাতি উপদিশতি ধর্মং গিরত্যজ্ঞানং চ' অর্থাৎ যিনি ধর্মের উপদেশের মাধ্যমে অজ্ঞানকে তিরোহিত করেন তিনিই গুরু। আগমসার গ্রন্থে পদবিশ্লেষণের মাধ্যমে গুরুর ভূমিকা বর্ণিত হয়েছে। গুরু পদের গকার সিদ্ধিদায়ক, রকার পাপসমূহের দাহক এবং উকার শিব বা মঙ্গলকামী। যিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশের মাধ্যমে শিবের সাথে নিজের অভেদজ্ঞান করান তিনিই গুরু।[১১]

নামের দ্বারাই শিষ্যের জীবনে গুরুর ভূমিকা প্রতীত হচ্ছে। ঔপনিষদীয় যুগে ব্রহ্মচর্যাশ্রমকালে অর্থাৎ প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুরু 'আচার্য'রূপে অভিহিত। উপনীত দ্বিজটিকে আচার্য নিজপুত্রজ্ঞানে পালন করতেন। তিনি হবেন

সমস্ত জ্ঞানের অধিকারী, 'শোত্রিয়' অর্থাৎ যা কিছু জ্ঞাতব্য তা সমস্তের জ্ঞাতা। তিনি সংযতচিত্ত, স্থিতধী, প্রাজ্ঞ, বিচক্ষণ ও অহংকারশূণ্য। নিজের জ্ঞানের প্রতি অহংকার গুরু বা আচার্যের যে কাম্য নয় তার পরিচয় বৃহদারণ্যকে পাওয়া যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণে বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদে দেখা গেছে পাণ্ডিত্যাভিমানী বালাকির আত্মপ্রচার। তাকে সেখানে 'দৃপ্তবালাকি' বলে সম্বোধিত করা হয়েছে। তিনি রাজা অজাতশত্রুর সভায় এসে রাজাকে ব্রহ্মোপদেশ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। রাজা সাগ্রহে তাকে আমন্ত্রন জানান উপদেশ দেওয়ার জন্য। কিন্তু ক্রমে রাজারা সঙ্গে তত্ত্বালোচনার পর তিনি নিজের জ্ঞানের সসীমতা অনুধাবন করেন এবং অজাতশত্রুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

গুরু যে কেবলমাত্র বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই হবেন সেই কথা বলে না উপনিষদ্। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, রাজা, সাধারণ গৃহস্থ, পিতা, স্বামী প্রভৃতি অনেকেই গুরুরূপে নির্দেশিত হয়েছে। যেমন- পূর্বোক্ত বালাকি-অজাতশত্রু সংবাদে গুরুরূপে প্রতিষ্ঠিত অজাতশত্রু একজন ক্ষত্রিয় রাজা। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত শ্বেতকেতু-প্রবাহণ সংবাদে (৫/৩) শ্বেতকেতুর পিতা স্বয়ং গৌতম রাজা প্রবাহণের কাছে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত হয়ে 'পঞ্চাগ্নিবিদ্যা' আয়ত্ত্ব করেন। একই উপনিষদে প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদুম্ন, জন এবং বুড়িল নামে পাঁচজন মহাগৃহস্থ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য ক্ষত্রিয়রাজা কৈকেয়পুত্র অশ্বপতির কাছে যান।[১২] ব্রহ্মবিদ জনক রাজার নাম সর্বজনবিদিত। দেবতাও উপনিষদে গুরুরূপে বর্ণিত হয়েছে। যেমন – কঠোপনিষদে স্বয়ং যম নচিকেতাকে আত্মতত্ত্ব উপদেশ দিয়েছেন, বৃহদারণ্যকে ও ছান্দগ্যে প্রজাপতি গুরুর আসনে অধিষ্ঠিত হয়ে যাথাক্রমে দেবতাদি সন্তানত্রয় ও ইন্দ্র-বিরোচনকে উপদেশ দিয়েছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে পিতা বরুণ ভৃগুকে উপদেশ দিয়েছেন। সেই একই চিত্র দেখা যায় ছান্দোগ্যে যেখানে দাম্ভিক শ্বেতকেতুকে যথার্থ শিক্ষা দিতে পিতা আরুণি গুরুরূপে অবতীর্ণ। মৈত্রেয়ীর গুরু তার নিজের স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গুরু কে হবেন তার নির্দিষ্ট কোনও বিধান ছিল না উপনিষদের কালে। নিরহংকার জ্ঞানী ব্যক্তি যোগ্য জ্ঞানপ্রার্থীকে জ্ঞানোপদেশ দিতেন। কেবলমাত্র মানুষ নয়, মনুষ্যেতরের কাছেও শিক্ষালাভের নিদর্শনও পাওয়া যায় উপনিষদে। সত্যকামকে অগ্নি প্রভৃতি প্রকৃতির অংশ ব্রহ্মোপদেশ দিয়েছিল।

গুরু হবেন পক্ষপাতশূন্য। তিনি সকলকে সমান উপদেশ দান করবেন। শিষ্য তার নিজের সামর্থ অনুযায়ী সেই উপদেশ গ্রহণ করবে। তাই পিতা প্রজাপতি তাঁর তিন সন্তান- দেবতা, মানব ও অসুরকে 'দ-দ-দ' এই একই উপদেশ দিয়েছিলেন। তারা তাদের সামর্থ অনুযায়ি অর্থগ্রহণ করে। দেবতারা গ্রহণ করেন- 'দাম্যত', মানবেরা- 'দত্ত' এবং অসুরেরা গ্রহণ করে 'দয়ধ্বম্' অর্থ। এই হল অধিকারীভেদে উপনিষদের শিক্ষার এক অসামান্য নিদর্শন। দেবতারা অসীম ক্ষমতাশালী, তাই তাদের নিজেকে দমন করার উপদেশ। কামনাজর্জরিত মানবের লোভ প্রশমনের জন্য দানের উপদেশ এবং পেশীশক্তিতে বলীয়ান অসুরদের জন্য দয়ার উপদেশ। এই শিক্ষা সর্বকালের জন্য প্রাসঙ্গিক।

জ্ঞানারণ্যে গুরু প্রদীপতুল্য। গুরু শিষ্যকে জানতে সহায়তা করবেন, তার জানার পথের বাধাগুলিকে সরিয়ে অনুকূল পরিবেশের সৃষ্টি করে দেবেন। জানতে হবে শিষ্যকে নিজেই। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের চতুর্দশ খণ্ডে আরুণি শ্বেতকেতুর দৃষ্টান্তে জ্ঞান অর্জনে গুরুর ভূমিকা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। আরুণি বলেছেন— গান্ধার দেশের কোন এক ব্যক্তিকে চোখ বেঁধে দুষ্কৃতিরা লোকশূন্য অরণ্যে এনে পরিত্যাগ করে, তখন সেই ব্যক্তি দিক্‌ভ্রান্তের মত অনুভব করে। সেই সময় কোন এক করুণাময় পুরুষ এসে তাকে বন্ধনমুক্ত করে উপদেশ দেয়— 'এতাং দিশাং গান্ধারা এতাং দিশাং ব্রজেতি'। এইভাবে দিক দর্শিত হলে সেই ব্যক্তি নিজ প্রচেষ্টায় গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নিজের দেশে উপনীত হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুর ভূমিকা সেই করুণাময় পুরুষ সদৃশ। অজ্ঞানাচ্ছন্ন শিষ্যের চোখের আবরণ সরিয়ে দিয়ে তাকে শিক্ষালাভের উপযুক্ত করে তোলা গুরুর কর্তব্য। শিখতে হবে শিষ্যকে নিজেই। গুরুর মুখোচ্চারিত উপদেশ শ্রবণ করে বিচারপূর্বক মননের পর বিষয়টিকে আত্মস্থ করা শিষ্যের কাজ। গুরু তাকে কিভাবে শিখতে হয়, জানতে হয় সেই পথের সন্ধান দেবেন। এগিয়ে গিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে ছাত্রকেই। নিজে শিখলে তবেই সেই জ্ঞানকে জীবনে প্রযোগ করতে সক্ষম হবে সে, নাহলে শিক্ষালাভ গলাদ্ধকরণ ও উদ্গীরণে পরিণত হবে।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে উপনিষদে বর্ণিত শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক এই সমস্তকিছুর প্রতিফলন শিক্ষাক্ষেত্রে আবশ্যক। শিক্ষক হওয়ার অর্থ তার নিজের জানার পরিসমাপ্তি নয়, শিক্ষার্থী বা ছাত্রকে

শেখানোর মাধ্যমে তিনি পুনরায় সেগুলিকে জানবেন, তবে সেই জানা আগের থেকে উন্নততর। উপনিষদের শিক্ষা থেমে যেতে শেখায় না, জীবনের চলমানতার মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের উৎকর্ষতা সেখানে অভিপ্রেত। তাই ঋষিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে সমতার সূর-

'ওঁ সহ নাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্যং করবাবহৈ
তেজস্বী নাবধীত্মস্তু, মা বিদ্বিষাবহৈ'।।[১৩]

তথ্যসূত্র:

১. যে বিদ্যা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে একাত্মতা প্রতিপাদন করে কারণসহ সংসার-দুঃখ বিনষ্ট করতে পারে, তাই উপনিষদ্। অথবা, যা সত্বর গতিতে নিশ্চিতরূপে আত্মসমীপে নিয়ে যায়। অথবা, যে বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে তন্নিষ্ঠ হয়ে নিঃসংশয়চিত্তে তার অনুশীলন করলে সেই বিদ্যাই অবিদ্যা প্রভৃতি দুঃখঘটক সংসারবন্ধনকে শিথিল করে বা নিঃশেষে বিনাশ করে।- বৃহদারণ্যক, কঠ ও মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্যভূমিকা।

২. দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৪/১০/১।

৩. অধিকারস্তু ফলে স্বাম্যম্ অধিকারী চ তৎপ্রভূঃ।- সাহিত্যদর্পণ, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

৪. বেদে 'ব্রহ্মচারিণী' ও 'ব্রহ্মবাদিনী' নারীর উল্লেখ আছে। যে কন্যারা ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালনের পর সংসারে গমন করে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করতেন তাদের ব্রহ্মচারিণী বলা হত, যারা বিবাহাদি না করে মন্ত্রদ্রষ্টা হতেন তারা ব্রহ্মবাদিনী নামে পরিচিতা হতেন।

৫. দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৪/৪, সত্যকাম জাবাল আখ্যায়িকা।

৬. দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৪/১/২।

৭. দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্, সত্যকাম জাবাল আখ্যায়িকা।

৮. সা হোবাচ মৈত্রেয়ী যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাং? যদেব ভগবান্বেদ তদেব মে ব্রুহীতি- বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ২/৪/৩।

৯. যোগমতে সর্বদা কায়মনোবাক্যে মৈথুলের ত্যাগই হল ব্রহ্মচর্য- যোগসূত্র, সাধনপাদ।

১০. দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৮/৭/১।

১১. 'গকারঃ সিদ্ধিদঃ প্রোক্তোরেফঃ পাপস্য দাহকঃ।/ উকারঃ শম্ভুরিত্যুক্তস্ত্রিতয়াত্মা গুরুঃ স্মৃতঃ।।
গকারোজ্ঞানসম্পত্যৈরেফস্তত্ত্বপ্রকাশকঃ।/উকারাৎ শিবতাদাত্মং দদ্যাদিতি গুরুঃ স্মৃতঃ।।

১২. দ্রষ্টব্য ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৫/১১।

১৩. অর্থাৎ আমাদের উভয়কে (আচার্য ও শিষ্য) ব্রহ্ম তুল্যভাবে রক্ষা করুন, ব্রহ্ম আমাদের উভয়কে বিদ্যাফল যেন তুল্যভাবে ভোগ করান, আমরা উভয়ে যেন সমানভাবে বিদ্যালাভের উপযুক্ত বিদ্যা-সামর্থ অর্জন করতে পারি, আমাদের অধ্যয়ন বীর্যশালী হোক, আমরা যেন পরস্পরকে বিদ্বেষ না করি।- কঠোপনিষদ্ শান্তিপাঠ।

গ্রন্থপঞ্জী:

১.গোস্বামী, সীতানাথ (অনুবাদক), কঠোপনিষদ্, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, ২০০২।

২.মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল, উপনিষদের অমৃত, শ্রী সারদা মঠ, কলকাতা, ২০১৩।

৩. বসু, নাগেন্দ্রনাথ (সম্পাদক), বাংলা বিশ্বকোষ, ৫ম খণ্ড, বি আর পাবলিশিং কর্পোরেশন, দিল্লি, ১৯৮৮।

৪.সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ দূর্গাচরণ (সম্পাদক, অনুবাদক ও ব্যাখ্যাতা), ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ১ম ও ২য় ভাগ, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ২০১৪।

৫.সেন, অতুলচন্দ্র (সম্পাদক), উপনিষদ্ (অখণ্ড সংস্করণ), হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1010-1015
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.098

অদ্বৈত ও দ্বৈত বেদান্তের দৃষ্টিতে মহাবাক্যার্থ বিচার

রত্না দালাল, *গবেষক, দর্শনবিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 06.03.2025; Accepted: 25.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Vedanta philosophy is one of the theistic schools of Indian philosophy. Vedanta is the core of the Vedas, and the essence of the Vedas is inherent in the Mahavakya. When the etymological meaning of 'Mahavakya' is analyzed, the two words that are basically found are, 'Maha' means 'great' and 'vakya' means speech, that is, the great speech is the Mahavakya. Mahavakya is an important part of Vedanta. If the Vedas are compared to a tree, then its fruit is the Upanishads and Mahavakya is the juice of this fruit. With reference to the Vedas, four great Mahavakyas have been accepted in Vedanta. These four great Mahavakyas are- 'Aham Brahmasmi' which is known as the Yajurvedic Mahavakya and is in the Brihadaranyaka Upanishad. 'Tat tvam asi Mahavakya' which is known as the Samavedic Mahavakya and is included in the Chāndogya Upanishad. 'Ayam atma Brahma' which is included in the Mandukya Upanishad of the Artharva Veda and 'Prajnanam Brahma' which is included in the Aitarya Upanishad of the Rig Veda. In this paper, I have made a comparative discussion about the Tat tvam asi Mahavakya by highlighting the Advaita Vedanta view and the Dvaita Vedanta view.

Key words- *Tat tvam asi Mohavakya, Sāmānādhikaraṇya, Biśēṣaṇa biśēṣyabhāba, Lakṣaṇā, Jahadajahaṯ Lakṣaṇā.*

'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য সামবেদের ছান্দোগ্য উপনিষদের (৬/৮/৭) অন্তর্গত। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের শাব্দিক অর্থ হলো 'সেই হও তুমি'। এই মহাবাক্য সন্ধিবিচ্ছেদ করলে 'তৎ' এর সঙ্গে 'ত্ব' এর সন্ধি করলে হয় 'তত্ত্ব'। 'তত্ত্ব' এর অর্থ হল সত্যতা বা ব্রহ্ম আদি, 'ত্বম' শব্দের অর্থ 'তুমি'। এখানে তুমি শব্দটির দ্বারা আত্মা এবং শরীর এই উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। 'অসি' শব্দের অর্থ হল 'হওয়া'। এই মহাবাক্যের দ্বারা এই বোধ হয় যে, জীব ব্রহ্মস্বরূপ। আমরা যে পূর্নতাকে বাইরের জগতে খুঁজে থাকি সেই পূর্নতা আমাদের নিজের অন্তরেই বিরাজমান। মানুষ শান্তি, জ্ঞান, প্রেম, খুশি, এই সমস্ত বস্তুগুলিকে ভৌতিক সংসারে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু যদি যথাযথ ভাবে আমরা এগুলিকে খোঁজার চেষ্টা করি তাহলে দেখা যাবে যে তা আমাদের মধ্যেই আছে।

অদ্বৈতমতে: তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ 'তত্ত্বমসি' বাক্যটি ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে। অদ্বৈত বেদান্ত মতে পিতা উদ্দালক পুত্র শ্বেতকেতুকে এই বাক্যে জীব-ব্রহ্মের একত্ব উপদেশ করেছেন। অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে-

''ঐতদাত্মঅ্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যৎ স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতু! ইতি।।" [১](ছান্দোগ্যউপ:৬।৮।৭)

অর্থাৎ বাস্তবতা হল সেই আত্মা, যেই আত্মা তুমি শ্বেতকেতু। উদ্দোলক শ্বেতকেতুকে বলেছিলেন যে, এই সবই আত্মান্। গোবিন্দপাদাচার্য তাঁর রত্নপ্রভা গ্রন্থে শরীরক ভাষ্যের বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

''ন অসি ত্বম সংসারী কিন্তু তত্ত্বমসি।"[২]

অর্থাৎ শ্বেতকেতু একজন সংসারী ব্যক্তি নন, তিনি নিঃশর্ত সৎ, পরম ব্রহ্ম, সর্বাত্মা। উদ্দোলক শ্বেতকেতুকে কেবলমাত্র অদ্বৈতবাদই শেখাননি তিনি বরং তাঁকে ব্রহ্মের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন যে,-যে পরম সৎ, সেই তুমি। তবে মহাবাক্য আলোচনা করার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, বাক্য কী? একটি বাক্য হল শব্দের একক, যা অর্থপূর্নভাবে আমাদের চিন্তাকে প্রকাশ করে। বাক্য হল বৈধ জ্ঞানের একটি মাধ্যম। যেখানে উদ্দেশ্য বিধেয়ের মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকে, যেমন-'পুস্তকম্ আনয়' বা একটি বই আনুন। এই বাক্যের দ্বারা বইয়ের সম্বন্ধে একটি জ্ঞানের কথা বলা হয়। সাধারন বাক্য সর্বদা সম্বন্ধ জ্ঞাপক। এই ধরনের সম্পর্ক যুক্ত বাক্য ছাড়াও আমরা অন্যান্য ধরনের বাক্য খুঁজে পাই যা প্রকৃতপক্ষে সম্পর্কহীন; এই ধরনের বাক্য অর্থের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক যুক্ত করে না। এই ধরনের বাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয়র মধ্যে কেবলমাত্র স্বরূপ মাত্রত্ব হিসাবে জানা যায়। এই বাক্যগুলি 'অখণ্ডার্থ বাক্য বা অসম্বন্ধীয় বাক্য হিসাবে পরিচিত। এই বাক্য গুলি ' সংসর্গ অগোচর প্রতিজনকম্' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে।

অদ্বৈত বৈদান্তিক 'সোহয়ং দেবদত্ত', 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি বাক্যে অখন্ডবোধক বাক্যের উপর ভিত্তি করে ব্রহ্মের সঙ্গে জীবের একত্ব প্রতিপাদন করা হয়। তবে 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই পদ দুটির অর্থ আক্ষরিক ভাবে আলাদা। এই শব্দ দুটি পরোক্ষভাবে চেতনাকে বোঝায়। 'তৎ' শব্দটির দ্বারা অসীম, অনন্ত, সৎ চেতনাকে বোঝায় এবং 'ত্বম্' বলতে স্বতন্ত্র জীবকে বোঝায় যা অবিলম্বে স্বপ্রকাশক এর মাধ্যমে স্বতন্ত্র প্রকৃতি মূলক জাগতিক জীবনের সমস্ত সীমাবদ্ধতা এবং অপূর্নতাকে বোঝানো হয়। 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই শব্দ দুটির আক্ষরিক অর্থ ভিন্ন কিন্তু একই অর্থকে প্রকাশ করায় 'তত্ত্বমসি' একটি অখন্ডার্থকবাক্য। অখন্ডার্থক সম্পর্কটি তিন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যথা-

(১) সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ (২) বিশেষণ বিশেষ্যভাব সম্বন্ধ (৩) লক্ষ্যলক্ষণাভাব সম্বন্ধ

১। সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ- নৃসিংহ সরস্বতি বেদান্তসারের বিখ্যাত সুবোধনীর লেখক সামানাধিকরণ্যকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন যে ''ভিন্নপ্রবৃত্তি নিমিত্তয়োঃ একাস্মিন অর্থে প্রবৃত্তিঃ সমানাধিকরণ্যম্"[৩], অর্থাৎ ভিন্ন প্রবৃত্তি নিমিত্তক শব্দের একার্থভিধায়কত্ত্বকেই সামানাধিকরণ্য বলে। সামানাধিকরণ্য হল একই অবস্থানে থাকা দুটি শব্দের মধ্যে সম্পর্ক। টীকাকারগণও সেই কথাই বলেছেন। যেই সমস্ত শব্দের ক্ষেত্রে ভিন্ন অক্ষর বিন্যাস হওয়া সত্ত্বেও তা একই অর্থকে প্রকাশ করে তাকে পর্যায় শব্দ বলে, যেমন ঘট ও কলস। আর যে সমস্ত শব্দের অক্ষর বিন্যাস ও অর্থ ভিন্ন তাদের অর্পযায় শব্দ বলে, যেমন তৎ ও ত্বম। সমানঅধিকরণ অর্থাৎ প্রবৃত্তি বিষয় যাদের সেই বিগ্রহ (দুটি শব্দের মধ্যে যে সম্বন্ধ) থেকে সামানাধিকরণ্য শব্দের অর্থ সিদ্ধ হয়। এই সম্বন্ধ হল পদনিষ্ঠ সম্বন্ধ। একটি দৃষ্টান্তবাক্যর মাধ্যমে বিষয়টি বোঝানো যেতে পারে 'সোহয়ং দেবদত্ত'; এখানে 'সঃ' এবং 'অয়ং' এই শব্দ দুটি আপাত দৃষ্টিতে ভিন্ন অর্থ বিশিষ্ট হলেও বাক্যদুটির তাৎপর্য একই। অর্থাৎ অতীতকালের দেবদত্ত এবং বর্তমানকালের দেবদত্তের অভেদ প্রতিপাদনই উক্তবাক্যের অর্থ। অনুরূপভাবে, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যে 'তৎ' এবং 'ত্বম' দুটি ভিন্ন শব্দ। তাদের নির্দেশমূলক অর্থ ও ভিন্ন। এখানে 'তৎ' শব্দের দ্বারা শুদ্ধ চৈতন্যকে নির্দেশ করা হয়েছে যা অদৃশ্য, অসীম, অনন্ত ইত্যাদি এবং 'ত্বম' শব্দের দ্বারা সসীম, অল্পজ্ঞ, চৈতন্যকে বোঝানো হয়েছে। 'তৎ' শব্দের অর্থ হল সর্বজ্ঞতাদি চৈতন্যের নির্দেশক এবং 'ত্বম' এর অর্থ হল অল্পজ্ঞতাদি চৈতন্যের নির্দেশক। তবে এই দুটি শব্দ একই চৈতন্যকে নির্দেশ করে। এর থেকে আমরা বলতে পারি যে, এই দুটি শব্দ একই চৈতন্য বা ব্রহ্মকে নির্দেশ করে।

---

[১] 'Upanishad Samgrah': Edited by Prof. J. L. Sastri (containing 188 upanishads), Delhi Motilal. Banarasidass, p. 66.

[২] 'Ratnaprabha Commentary on Brahmasutra': Wrote by Govindananda, 1.1.2.

[৩] সদানন্দযোগীন্দ্র, 'বেদান্তসার:', অনুবাদক ও সম্পাদক ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, পৃ; ১৪২, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা,১৯৮০।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা একথা বলতে পারি যে, দেবদত্ত যাকে কয়েকবছর আগে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় দেখেছিলেন এবং আজ অন্য পরিস্থিতিতে তাকে একটি ভিন্ন জায়গায় দেখার পর এটি সনাক্ত করা যায় যে তিনি একই দেবদত্ত। অনুরূপ ভাবে 'তত্ত্বমসি' বাক্যের দ্বারা নির্ধারণ করা যায় যে, 'তুমিই সেই' অর্থাৎ জীব ব্রহ্মের সঙ্গে অভিন্ন তা জানা যায়।

২। বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সম্বন্ধ- আচার্য সদানন্দযোগীন্দ্র এর অর্থ নিরূপন প্রসঙ্গে বলেন- 'বিশেষণ' এবং 'বিশেষ্য' দুটি পদ; বিশেষণ বলতে বৈশিষ্ট্য এবং বিশেষ্য বলতে পদার্থকে বোঝায়। একই বাক্য 'সোহয়ং দেবদত্তঃ' এখানে 'সঃ' এবং 'অয়ম' পদের বাচ্যার্থদ্বয় পরস্পর বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সম্বন্ধে বর্তমান। অনুরূপ ভাবে 'তত্ত্বমসি' বাক্যেও 'তৎ' ও 'ত্বম' পদ একই রীতিতে একে অন্যের বিশেষণ বা বিশেষ্য হতে পারে। অল্পজ্ঞত্বাদি বিশিষ্ট চৈতন্য হতে অভিন্ন। এই স্থলে দু প্রকার অন্বয় হয়- 'ত্বং তৎ অসি' বা 'তৎ ত্বম অসি' এক্ষেত্রে প্রথম 'ত্বম্' শব্দটি বিশেষ্য এবং দ্বিতীয় 'তৎ' শব্দটি বিশেষ্য অনুরূপ বিশেষণ ও অর্থের বিশেষ্যতায় শব্দে উপচারিত হয়। উক্ত আলোচনা থেকে নিঃসৃত হয় যে, শব্দার্থের বিশেষণ বিশেষ্যাভাব পরস্পর ভেদব্যাবৃত্তির অধীন, ব্যাবৃত্তি আবার শব্দার্থের অভেদ প্রতীতির অধীন এবং স্পষ্টতই উক্ত অভেদ প্রতীতি বাচ্যার্থপক্ষে সম্ভব হয়না। অতএব বিবক্ষিত অভেদ উপপত্তির স্বার্থেই শব্দ অথবা তদ্বাচ্যার্থ এবং বাচ্যার্থ প্রতিপাদ্য অখন্ডার্থের মধ্যে লক্ষ্য লক্ষণাভাব সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়েছে। অতঃপর গ্রন্থাকার সেই লক্ষ্যলক্ষণাভাব সম্বন্ধের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলেছেন।

৩। লক্ষ্যলক্ষণাভাব সম্বন্ধ- অদ্বৈতবাদীগণ লক্ষণার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদন করেছেন। সাধারনত শব্দের দুটি অর্থ বর্তমান- মুখ্য অর্থ, গৌনঅর্থ। একটি শব্দের দ্বারা সরাসরি যে অর্থকে বোঝায় তা বাক্যের মুখ্য অর্থ। অন্নং ভট্ট দীপিকাটীকায় বলেছেন- 'শক্যসম্বন্ধে লক্ষণা'[৪]। একটি পদের শক্তির দ্বারা যা বোধিত হয় তাই শক্য, সেই শক্যের সঙ্গে সম্বন্ধই হল লক্ষণা। মীমাংসকের উক্তি হল- 'অভিধেয়াবিনাভূত প্রবৃত্তি লক্ষনেষ্যতে'[৫]। অভিধেয়ের অভিনাভূত অর্থ শব্দের প্রবৃত্তিই লক্ষণা। এই লক্ষনা তিন প্রকারের- **১) জহৎ লক্ষণা। ২) অজহৎ লক্ষণা ৩) জহদজহৎ লক্ষণা।**

১) জহৎ লক্ষণা- 'বাচ্যার্থমশেষতঃ পরিত্যজ্য তৎসম্বন্ধিনি অর্থান্তরে বৃত্তিঃ জহল্লক্ষণা'[৬]। (বিদ্বন্মনোরঞ্জনী)।
অর্থাৎ যে লক্ষণায় একটি পদের বাচ্যার্থ বা বাক্যার্থ সম্পূর্ন পরিত্যাগ হয়, বাক্যের অর্থবোধে ঐ পদের বাচ্যার্থের অন্বয় হয় না, তাই জহৎলক্ষনা; যেমন – 'গঙ্গায়ং ঘোষঃ' অর্থাৎ গঙ্গার তীর বিশেষ।

২। অজহৎ লক্ষণা – ''বাচ্যার্থাপরিত্যাগেন তৎসম্বন্ধিনি অর্থান্তরেবৃত্তি অজহল্লক্ষনা''[৭]।
যে লক্ষণায় পদের বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ সম্পূর্ণ পরিত্যাগ হয় না, বাক্যের অর্থ বোধে বাচ্যার্থের ও অন্বয় হয়, তাকে অজহৎলক্ষণা বলে; যেমন- 'ছত্রিনোগচ্ছন্তি' অর্থাৎ ছত্রধারী ও ছত্রহীন উভয়কেই বোঝায়।

৩। জহদজহৎ লক্ষণা- 'যত্র বাচ্যেকদেশত্যাগেন একদেশ অনুয়ঃ তত্র জহৎ অজহৎ ইতি'[৮]।
অর্থাৎ যে লক্ষণায় পদের বাচ্যার্থ বা শক্যার্থের একাংশ পরিত্যাগ হয় এবং একাংশ গৃহীত হয় তাকে জহৎ অজহৎ লক্ষণা বলে। বাচ্যার্থের ভাগ বা অংশ বিশেষকে ত্যাগ করায় ইহাকে ভাগত্যাগ লক্ষণা এবং ভাগ মাত্রের গ্রহন করায় ভাগ লক্ষনাও বলা হয়। 'তত্ত্বমসি' বাক্যে 'তৎ' পদের দ্বারা শুদ্ধ চৈতন্য 'ব্রহ্ম' এবং 'ত্বম' পদের দ্বারা জীবাত্মাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

---

[৪] অন্নংভট্ট, তর্কসংগ্রহ ও দীপিকাটীকা, অনুবাদক দীপক কুমার বাগচী, পৃ; ১৫৩, মিত্রম পাবলিশার্স, ২০১২

[৫] সদানন্দযোগীন্দ্র, 'বেদান্তসার:' , অনুবাদক বিপদভঞ্জন পাল, পৃ; ২১১

[৬] সদানন্দযোগীন্দ্র, 'বেদান্তসার:', অনুবাদক ও সম্পাদক ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য, পৃ; ১৪৫, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলিকাতা,১৯৮০

[৭] ঐ, পৃঃ ১৪৫

[৮] ঐ, পৃ; ১৪৫

উপরিক্ত দুধরনের লক্ষণা (জহৎলক্ষণা, অজহৎলক্ষণা) তত্ত্বমসি মহাবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদনের ক্ষেত্রে সমর্থ নয়। কেবলমাত্র জহদজহৎ লক্ষনা বা ভাগত্যাগ লক্ষনার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করা সম্ভব। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি অদ্বৈত বেদান্ত সম্প্রদায় বিভিন্ন যুক্তির দ্বারা 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'তুমিই হও ব্রহ্ম' তা প্রতিপাদন করলেন।

তত্ত্বমসি মহাবাক্যার্থ বিচার- দ্বৈত বেদান্তদর্শন:

মাধবাচার্য দ্বৈত বেদান্তের প্রবর্তক। দ্বৈত দর্শনে তত্ত্ব দুটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব ও অস্বতন্ত্রতত্ত্ব। ঈশ্বর, অসীম, শ্রেষ্ঠত্ব আধ্যাত্মিক গুণাবলীর মূর্ত প্রতীক মাত্র, যা সমস্ত রকম অপূর্ণতা থেকে মুক্ত ও স্বাধীন। ব্যক্তি বা জীব ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। এই মতে ঈশ্বর এবং জীবের মধ্যে কখনই একত্ব সম্ভব নয়। জীব মুক্তিলাভ করে ঈশ্বরের ইচ্ছায়, এমনকি মুক্তি প্রাপ্তরাও ঈশ্বরের সাথে নিজের সাদৃশ্যতা অর্জন করে। এমনকি ভক্তির দ্বারাই জীবের মুক্তি সম্ভব হয়।

দ্বৈত মতে তত্ত্বমসি মহাবাক্য ঈশ্বরের সাথে জীবের অভিন্নতা প্রতিপাদন করে না। এখানে 'তৎ' শব্দের অর্থ 'চিরঅজানা' এবং 'ত্বম' শব্দের অর্থ জ্ঞাতসত্তা বা জীব। মধ্বাচার্য বলেন জীব এবং ঈশ্বর একে অপরের সাথে অভিন্ন নয়। তিনি বিষয়টি একটি উদাহরনের সাহায্যে বুঝিয়েছেন একজন শূদ্র ভক্তি সহকারে পূজা করে ব্রহ্মলাভ করেন। তিনি ব্রহ্মকে উপাস্য মনে করেন কিন্তু নিজে ব্রহ্ম হন না। একই ভাবে 'তৎ' এবং 'ত্বম' এই শব্দ দুটির মাধ্যমে জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা প্রতিপাদিত হয় না বরং জীব ব্রহ্মের সাদৃশ্যতা অর্জন করে মাত্র। এই তত্ত্বমসি বাক্যের দ্বারা কেবলমাত্র সাদৃশ্যতাকে বোঝায় অভিন্নতাকে নয়। মধ্বাচার্য যুক্তি দিয়েছেন যে, ব্রহ্মের জ্ঞান এবং আনন্দের গুণাবলীর কিছু অংশ জীবের মধ্যে থাকায় এদের উভয়কে অভিন্ন বলে মনে হয়।

''তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ"[৯]।।২।৩।২৯

শ্রুতিতে জীব এবং ঈশ্বরের একত্বের কথা বলা হয়। তবে মধ্বাচার্যের মতে, জীব ঈশ্বরের সমতুল্য জ্ঞান অর্জন করতে অক্ষম। মধ্বাচার্য তাঁর গ্রন্থ 'বিষ্ণুতত্ত্ব নির্ণয়' এর ভাষ্যে বলেছেন-'অতত্ ত্বং অসি[১০]'। অর্থাৎ ঈশ্বর ও জীব অভিন্ন নয়। তিনি আরও বলেন ছান্দোগ্য উপনিষদে ষষ্ট অধ্যায়ের আটটি বিভাগে ঘোষনা করা হয়েছে যে, স্বতন্ত্র ব্যক্তি পরম ব্রহ্ম থেকে আলাদা এবং ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। 'তত্ত্বমসি' শিক্ষাদানে উদ্দোলক তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে যে নয়টি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তাতে মূলত জীব এবং ঈশ্বর যে আলাদা তা বোঝানো হয়েছে। জীবের কর্তব্য হল এই পার্থক্যকে বুঝে ঈশ্বরের উপাসনা করা। নয়টি দৃষ্টান্তকে বিশ্লেষন করে মধ্বাচার্য এবং তাঁর অনুগামীরা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য প্রতিপাদন করার চেষ্টা করেছেন।

প্রথম দৃষ্টান্ত - এই দৃষ্টান্তে মূলত আশ্রয় এবং আশ্রিতের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। জীবের সমস্ত কাজ ব্রহ্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং জীবের বিশ্রাম নেওয়ার স্থান হল ব্রহ্মের মধ্যে। অতএব জীব এবং ব্রহ্ম মূলত ভিন্ন; উদ্দোলক মূলত এই ভেদের কথাই বলেছেন।

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত – মৌমাছি যেমন মধুর মধ্যে কোন গাছের রস আছে বা নেই তা উপলব্ধি করতে পারে না। অনুরূপভাবে, গভীর নিদ্রার সময় জীব পরম ব্রহ্মের সাথে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত থাকে কিন্তু জাগ্রত অবস্থায় তা তাদের ব্যক্তিত্বের অর্ন্তগত হয়না কারণ জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য চিরন্তন।

তৃতীয় দৃষ্টান্ত - তৃতীয় উপমায় বোঝানো হয়েছে যে, নদীর ঢেউ গুলি উপলব্ধি করতে অক্ষম যে সমুদ্রেই তার স্বতন্ত্র উপস্থিতি। একই ভাবে, জীব পরম ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে অক্ষম। তারা ব্রহ্ম থেকে নিজেকে আলাদাই ভাবে।

চতুর্থ দৃষ্টান্ত - জীবন্ত আত্মার দ্বারা পরিব্যাপ্ত যে গাছ দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে তা তার পুষ্টির ও বৃদ্ধির জন্য জল সংগ্রহ করে, কিন্তু যদি জীবন (জীবন্ত আত্মা) তার একটি আত্মা ছেড়ে যায় তবে সেই শাখাটি শুকিয়ে যায়। সেই শাখাটিকে কাঁটলে আর রস নির্গত হয় না। অনুরূপভাবে, যদি ব্রহ্ম জীবের মূর্ত আত্মার মধ্যে অনুপস্থিত থাকে তাহলে জীবের প্রাণ থাকবে না। অতএব, স্বতন্ত্র ব্যক্তি তার প্রাণের স্বার্থে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল। তাই জীব

[৯] **'বেদান্তদর্শনম্ (দ্বিতীয় অধ্যায়)',** অনুবাদক স্বামী বিস্বরূপানন্দ, পৃঃ ৬২৭

[১০] **'মধ্বাচার্য', 'বিষ্ণুতত্ত্ব নির্ণয়',** অনুবাদক কে. টি. পাণ্ডুরঙ্গি (ইং), পৃ; ৯১, দ্বৈত বেদান্ত, বেঙ্গালর,১৯৯১

ও ব্রহ্মের অভিন্ন নয় বরং জীব তার নিজের জন্য ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের ওপর নির্ভরশীল।

পঞ্চম দৃষ্টান্ত - এই বীজের মধ্যে যে ন্যায় রোধ বৃক্ষের বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে তা জানা যায় না। তেমনি সাধারন যোগী এমনকি জীবও একথা জানতে পারে কিন্তু উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয় যে জীবের মধ্যে সূক্ষ্ম ভগবান এতে বাস করেন। যদিও পরম ব্রহ্মের শক্তি ন্যায় রোধ বৃক্ষের মতো অনুভূত হয়, কিন্তু তা অনুধাবন যোগ্য নয়।

ষষ্ট দৃষ্টান্ত - একটি লবন খন্ডকে জলে দ্রবীভূত করলে লবন সমগ্র জল জুড়ে বিস্তৃত থাকে। লবন দেখতে জলের মত হয়, কিন্তু জলের প্রতিটি ফোঁটার স্বাদ পেলে তবেই লবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, বিষ্ণুর সারধর্ম জীবে ব্যাপ্ত থাকে যদিও তা পৃথক ভাবে দৃশ্যমান নয়। অতএব, জীব ঈশ্বরের থেকে আলাদা।

সপ্তম দৃষ্টান্ত - উপনিষদের চতুর্দশ খন্ডে একজন ভ্রমনকারী ও অন্ধের ব্যক্তির উপমা দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তি ডাকাতের চোখ বেঁধে বনে ছেঁড়ে দিয়ে এসেছিল যাতে সে নিরাপদে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে না পারে। একই ভাবে ব্যক্তি অজ্ঞানতায় আবৃত এবং সংসারে অন্ধকারে অরন্যে নিক্ষিপ্ত গুরুর পরামর্শে শ্রবন, মনন, প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করে অতঃপর সে ভগবানকে উপলব্ধি করে।

অষ্টম দৃষ্টান্ত - অষ্টাদশ খন্ডে বলা হয়েছে- একজন মানুষ অসুস্থ হলে তাঁর আত্মীয়স্বজন তাঁকে ঘিরে জিজ্ঞাসা করে 'তুমি কি আমাকে চিনতে পারছ?' যতক্ষন অসুস্থ ব্যক্তি উত্তর প্রদান না করে। মৃত্যু শয্যায় মানুষ তার চরম অসহায়ত্ব উপলব্ধি করতে পারে যে, সে ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল। সারাজীবন তিনি অনুভব করেন যে, তিনি সকলের কর্তা এবং চেষ্টা করেন ঈশ্বরকে উপেক্ষা করার কিন্তু মৃত্যু শয্যায় সে তার সীমাদ্ধতাকে অনুভব করে। এই উপমাটি প্রমান করে যে, ব্রহ্মের অদৃশ্য শক্তির উপর মানুষের আত্মনির্ভরতা।

নবম দৃষ্টান্ত - ষষ্ট অধ্যায়ের ষোড়শ বিভাগে অভিযুক্ত ব্যক্তির অগ্নিপরীক্ষায় বলা হয় যদি ব্যক্তিটি নির্দোষ হয় তাহলে রডটি তাকে পোঁড়াতে পারবে না। কিন্তু রডটির দ্বারা সে পুড়ে যায়। অতএব জীব ব্রহ্মের স্বরূপ নয়।

মধ্বাচার্য তাঁর বিষ্ণুতত্ত্ব নির্ণয় এ স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে, উপরিক্ত নয়টি দৃষ্টান্তই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভিন্নত্ব প্রতিপাদন করে। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য এত সূক্ষ্ম যে মানুষ তা বুঝতে অক্ষম। উদ্দোলক তাঁর পুত্র শ্বেতকেতুকে বুঝিয়েছেন যে, মানুষের আত্মা ঈশ্বরের থেকে বিচ্ছিন্ন। তাই আমাদের কর্তব্য হল ঈশ্বরের উপাসনা করা। তত্ত্বমসি বাক্যের দ্বারা মূলত এটাই বোঝানো হয়েছে যে, এই জীব ও জগৎ ব্রহ্মের ওপর নির্ভরশীল ব্রহ্মের দ্বারাই তার উৎপত্তি, এই ব্রহ্মকে পাওয়া যাবে একমাত্র ভক্তির দ্বারা।

উপসংহার:

পরিশেষে বলা যায়, উপনিষদকে অনুসরণ করে যে চারটি মহাবাক্য উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে তত্ত্বমসি মহাবাক্য উন্নততর। তবে ভারতীয় বেদান্ত দর্শনে প্রসিদ্ধ অদ্বৈত বেদান্ত ও দ্বৈত সম্প্রদায়ের মধ্যে তত্ত্বমসি মহাবাক্যের অর্থ নির্ণয় নিয়ে মত পার্থক্য রয়েছে। অদ্বৈতবাদীগন বলেন জীব এবং ব্রহ্ম অভিন্ন। অজ্ঞানের কারণেই জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পার্থক্য অনুভূত হয়। এই তত্ত্বমসি মহাবাক্যের মূল লক্ষ্য হল জীবকে অজ্ঞানতা থেকে মুক্ত করে সঠিক জ্ঞান প্রদান করা যে, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে একটি মাত্র চেতনা রয়েছে। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যটির মধ্যে ব্যক্তির বিকাশের আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক নির্দেশনা রয়েছে। যদি সকল জীবই ব্রহ্ম হয়, তখন সকলের সাথেই সমান আচরন করা উচিত। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যটি এই দিক থেকে আধ্যাত্মিক মানবতাকে নির্দেশ করে। অপরদিকে দ্বৈতবাদীগন একথা মানেন না। তাঁরা বলেন 'ঈশ্বরের কৃপা'-ই চূড়ান্ত মুক্তির উপায়। তাঁরা কখনো জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অভিন্নতা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে জীবের মধ্যে সামগ্রিক ভক্তি তখনই সম্ভব যখন ব্যক্তির মধ্যে শ্রদ্ধাবোধ এবং ঈশ্বরের প্রতি নির্ভরশীলতা থাকে। তাঁরা ঈশ্বরকেই জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য বলে মনে করেন।

গ্রন্থপঞ্জী

1. পাল, বিপঞ্জন, বেদান্তসার, কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৪২২
2. বাগচী, দীপক কুমার, তর্কসংগ্রহ ও দীপিকা (অন্নংভট্ট), কলকাতা: মিত্রম পাবলিশার্স, আগষ্ট,২০১২

3. বিশ্বরূপানন্দ, স্বামী, বেদান্তদর্শনম্ দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ফাল্গুন, ১৩৯৫
4. মিশ্র, প্রভাত, শংকরের দর্শন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জানুয়ারি ২০১৯
5. সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, জুলাই, ২০১৪
6. Bādarāyana, Vedāntadarśan, trans. Viswarupananda, Kolkata: Udbodhan Karyalaya, 1999.
7. Madhvacarya, Viṣnutattvavinirnaya, trans. S.S. Raghavachar,Mangalore: Sri Ramakrishna Ashrama, 1971.
8. Sarvjñātmamuni, Sankṣepasārīraka, ed. Swami Yogendrananda, Varanasi: Sriudasin Sanskrit Mahavidyalaya, 1987.
9. Sastri, J.L, Upanisat Samgrahamh, containing 188 upanisads, Delhi: Motilal Banarsidass, 1970.
10. The Upanishad, Chandogya Upanishad, Trans. F.Max Muller, (Oxford: At The Clarendon Press, 1879)

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1016-1026
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.099

বেদান্ত আধুনিক হতাশাগ্রস্ত জীবনের মহৌষধ

ড. কৃষ্ণ ধীবর, *সহকারী আধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ, রামপুরহাট, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 07.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Since the birth of civilization, man has been plagued by three types of suffering. In family life and in personal life man today is imprisoned in the prison of threefold suffering. In the globalized world, people are constantly burned by the intense mental pressure on the one hand and physical pain on the other hand. People lose the value of life while searching for the way of liberation. Where is the relief from this frustration?

All egos of life are destroyed in Vedantic sense. When ego is destroyed, man realizes God within himself. When all the darkness of life is dispelled by the light of knowledge then the real value of life is realized. Self-confidence develops in life when all the inferiority of human life is removed by Vedic consciousness. So, it can be said that Vedanta is the elixir of liberation from all the frustrations of life. How Vedantic intuition can guide us through life's frustrations is the main object of my article.
Keyword: *Vedantic, Ego, Knowledge, Self-confidence, Consciousness, Vedanta.*

"জ্যোতির্ময়, তাঁরে জেনে, তাঁর পানে চাহি
মৃত্যুরে লঙ্ঘিতে পারো, অন্য পথ নাহি।"[1]

সূর্যের প্রথম কিরণ দেহের উপর বিচ্ছুরিত হওয়ার পর থেকেই মানুষ ত্রিবিধ দু:খের যাঁতাকলে পিষছে। পিষণরত মানুষের কাতর যন্ত্রণা দার্শনিকের ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে "দু:খত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা"[2] রূপে। সাংসারিক জীবনে হোক বা ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ আজ ত্রিবিধ যন্ত্রণার কারাগারে বন্দী। বিশ্বায়নের দুনিয়ায় একদিকে প্রবল মানসিক চাপ অন্যদিকে দেহ-মনের ভাঙনে অজানা রোগ বাসা বাঁধছে শরীরের কোনায় কোনায়। আবার যে সম্পর্কের জন্য 'পথের পাঁচালী'র অপু একদিন আশ্রয় নিয়েছিল দিদির বৃষ্টিভেজা আঁচলের আড়ালে, সেই সম্পর্কের জন্য মানুষ আজ হা-পিত্যেশ করে। মুক্তির পথ অন্বেষণ করতে গিয়ে মানুষ জীবনের মুল্য হারিয়ে ফেলে। জীবনযন্ত্রণার চাপে কারো ঘটছে অকালমৃত্যু আবার কেও মনের কষ্টে কাতরাতে কাতরাতে দিনরাত্রির আলো শোষণ করছেন। কিন্তু এমন তো হওয়ার কথা ছিল না। বিশ্ব আজ বিজ্ঞানের আশীর্বাদধন্য। বিশ্বায়নের দুনিয়ায় কয়েকটি সুইচের চাপে সারা পৃথিবী আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। সকালে ঘুম থেকে উঠলেই বিজ্ঞানের হাতছানি, ঘরের বাইরে বিজ্ঞানের মুন্সিয়ানা। জামার একটা ছোটো বোতাম থেকে শুরু করে আকাশের বুকে উড়ন্ত বিমান সবর্ত্র বিজ্ঞান উঁকি দিচ্ছে অহ:রহ। এতো পাওয়ার মাঝেও না পাওয়ার বেদনা কেন? গায়ে হতাশার গন্ধ মেখে মানুষকে কেন প্রতিদিন ছুটতে হচ্ছে রাজপথ থেকে গলিপথে? এই হতাশা থেকে মুক্তি কোথায়?

[1] 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (চতুর্থ খণ্ড), নৈবেদ্য কাব্যের ৬০সংখ্যক কবিতা, পৃষ্ঠা-২৯৪

[2] সাংখ্যকারিকা-১, পৃষ্ঠা-৪

এই প্রশ্নগুলি মনের দরজায় রেখেই যদি আমরা ভারতীয় আধ্যাত্মিক সাধনার অন্দরমহলে মন ফেরায়, যে সাধনা ভারতীয় দর্শনের উচ্চতর ভাবনার দ্বারা চিরকাল লালিত হয়েছে, তাহলে আমাদের বর্তমান জীবনে হতাশার গাঢ় অন্ধকারের আড়ালে এক বিন্দু আশার আলোর ঝলকানি দেখতে পাব। সেই আলোর শান্ত স্নিগ্ধ তাপ শোষণ করে জীবন উপলব্ধি করবে-"আমার মুক্তি আলোয় আলোয়।" সেই আলোর সন্ধান দিতেই বৈদিক মননঋদ্ধ ঋষিরা সাধনায় মগ্ন হলেন। ঋষিদের সেই সাধনার ফসলী হল বেদ। আর বেদের অন্তিম পর্বে বিকশিত উপলব্ধিই হল বেদান্ত।

বৈদান্তিক উপলব্ধিতে জীবনের সকল অহংকার ধ্বংস হয়ে মানুষ নিজেকে 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি' রূপে উপলব্ধি করেন। যখন জ্ঞানের আলোয় জীবনের সমস্ত অন্ধকার দূর হয় তখন জীবনের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধ হয়। মানুষের জীবনের সমস্ত হীনমন্যতা বৈদান্তিক চেতনার দ্বারা দূর হলে জীবনে আত্মপ্রত্যয় গড়ে ওঠে। তাই বলা যায় বেদান্ত জীবনের যাবতীয় হতাশা থেকে মুক্তির মহৌষধ। বৈদান্তিক অনুভূতি কিভাবে আমাদের জীবনের হতাশা কাটিয়ে মুক্তির পথ দেখাতে পারে তাই আমার পত্রের মূল উপজীব্য।

হীনমন্যতা দূরীকরণ ও আত্মবিশ্বাস গঠনে বেদান্ততত্ত্ব:

বর্তমান মানবজীবনের যাবতীয় হতাশার একটি প্রধান কারণ হল হীনমন্যতা অর্থাৎ নিজের উপর বিশ্বাস না রাখা। বিশ্বায়নের দুনিয়ায় বিজ্ঞানের আশীর্বাদধন্য হয়েও আজ মানুষ প্রতিমুহূর্তে হীনমন্যতার অন্ধকারে ডুবে থাকে। বাঁচার ইচ্ছা থাকলেও কে যেন তাকে পিছন থেকে ডাক দেয়। হীনমন্যতার সঙ্গে লড়াই করতে করতে জীবনের শক্তি যখন হ্রাস পেতে থাকে তখন জীবনের সমস্তকিছু ধূসর মনে হয়, কিন্তু বৈদান্তিকশক্তি হীনমন্যতার বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবনে আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে তোলে। জীবনানন্দের ভাবনায়-

"আলো আর অন্ধকারে মুছে যায় সে সব ব্যর্থতা।"[3]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দাঁড়িয়ে হতাশাগ্রস্ত অর্জুনকে আমরা বলতে শুনেছিলেন

"ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।"[4]

আবার সেই অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক উপদেশে আপ্লুত হয়ে উপলব্ধি করেছিলেন-

"নষ্টো মোহ: স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।"[5]

সেই জন্য বলা হয় Shree krishna is the best teacher and Arjun is the best student of the world.

প্রশ্ন হল, আমরা আমাদের ব্যাবহারিক জীবনযাত্রায় হীনমন্যতাকে কিভাবে কাটিয়ে উঠব এবং জীবনের ব্যর্থতাকে কিভাবে সাফল্যে রূপান্তরিত করব? উত্তরে বলতে পারি, উপনিষদ্ অনুসারে জগতের প্রত্যেকটি জীবের মধ্যেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বিরাজিত- "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্।"[6] আমাদের জীবন সর্বশক্তিমান ব্রহ্মেরই অংশমাত্র, আমরা যদি উপলব্ধি করতে পারি "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"[7] তবে জীবনের প্রকৃত শক্তির প্রতি আত্মবিশ্বাস গড়ে উঠবে। আমরা হীনমন্যতা কাটিয়ে জীবনে গভীর আত্মপ্রত্যয় ফিরে পাব। অন্তরের সেই আত্মপ্রত্যয় জীবনযুদ্ধের রণক্ষেত্রে রক্ষাকবচ রূপে উপলব্ধ হবে।

একটি গল্পের সাহায্যে বিষয়টি আলোকপাত করা যাক। এক গভীর জঙ্গলে একটি সন্তানসম্ভাবা সিংহী বাস করত। একদিন সে একদল ভেড়াকে আক্রমণ করতে তাদের পিছু হাঁটতে শুরু করল। তারপর ভেড়াগুলিও ভয় পেয়ে সামনে

---

[3] জীবনানন্দ দাশ, স্বপ্নের হাতে, পৃষ্ঠা-৮৩

[4] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১/৩১

[5] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-১৮/৭৩

[6] ঈশোনিষদ্-১

[7] ছান্দোগ্য উপনিষদ্

দিকে ছুটলো, তাদের চলার পথে একটি নালা উপস্থিত হল। ভেড়াগুলি লাফ দিয়ে নালাটি পেরিয়ে গেল। কিন্তু সিংহীটি লাফাতে গিয়ে একটি বাচ্চা প্রসব করে মারা গেল। তারপর সিংহের বাচ্চাটি ভেড়াদের দলে মিশে গিয়ে তাদের আচার-আচরণ অনুসরণ করতে লাগল। সেই বনে অন্য এক সিংহ সেই সিংহের বাচ্চাটিকে ডেকে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল যে, সে সিংহের বাচ্চা। কিন্তু দীর্ঘদিনের সংস্কারবশত: সিংহের বাচ্চাটি ভেড়াদের দলেই ফিরে গেল। তারপর আবার একদিন সিংহটি ঐ বাচ্চা সিংহটির সামনে কিছু মাংসের টুকরো রেখে দিল এবং বলল এবার তুমি সিংহের মতো গর্জন করে মাংসের টুকরোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়। কিন্তু বাচ্চা সিংহটি তা পারল না, ভেড়াদের মতো ডাক দিয়ে ঘাস খেতে শুরু করল। কিন্তু অনেকবার চেষ্টার পর সেই সিংহের বাচ্চার ভিতর থেকে আসল সিংহের ডাকটি বেরিয়ে এলো। সিংহের ডাকই হল তার আসল ডাক। সিংহের মতো মানবজীবনের আসল শক্তি তার অন্তরেই নিহিত। সচ্চিদানন্দের অংশরূপে অন্তর থেকে প্রত্যেকটি মানুষই অফুরন্ত ক্ষমতার অধিকারী। তাই উপনিষদ্ ঋষিরা উপদেশ দিয়েছিলেন-"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।"[8] প্রতিটি মানুষ যদি উপলব্ধি করতে পারে যে, জীবনের অভিধানে হীনমন্যতার কোনো স্থান নেই, গভীর আত্মবিশ্বাসে সে ভাণ্ডার পূর্ণ। তবে সেই আধ্যাত্মিকতার প্রতিটি উপলব্ধি মানুষকে হতাশা থেকে চিরমুক্তি দেবে। সেই আধ্যাত্মিকতা রূপের নয়, অরূপের সাধনা। বেদান্তের মতে আমার মধ্যেও যদি ঈশ্বররূপী ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে পারি তবেই তো হীন্যমন্যতা কাটিয়ে নিজের মধ্যে সেই সাধনা করতে পারব আমরা। বিবেকানন্দের ভাষায়-"**বেদান্ত পাপ স্বীকার করেন না, ভ্রম স্বীকার করেন। আর বেদান্ত বলেন,**

> **সর্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম –এই: নিজেকে দুর্বল, পাপী ও হতভাগ্য জীব বলা ; এরূপ বলা যে, আমার কোন শক্তি নাই, আমি ইহা করিতে পারি না।"**[9]

নিঃস্বার্থপরতা ও বেদান্তচেতনা:

আজ ব্যস্ততার দুনিয়ায় সারা পৃথিবীর মানুষ ছুটছে সময়ের হাতঘড়িকে জীবনের সাতপাকে বেঁধে নিয়ে। আজ প্রতিদিন নূতন নূতন অভিজ্ঞতায় মানুষের দিনযাপন হয়। বিজ্ঞানের দৌলতের সারা পৃথিবী আজ তার হাতের মুঠোয়। কিন্তু জীবনে এত কিছু পাওয়ার পরেও ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিটি মানুষ আজও অসুখী, অশান্তির কারাগারে বন্দী। মানুষের এই যাবতীয় অশান্তির প্রধান কারণ হল স্বার্থপরতা। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য বৃহত্তর স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিচ্ছি আমরা। পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ আজ ব্যস্ত তার নিজের সংসার,আত্মীয় পরিজন, নিজের ঘরবাড়ি, নিজের চাকরি, এবং ব্যক্তিগত সাফল্যের জন্য। যদিও মানুষের এই মনোভাবের জন্য তাকে দায়ী করা যায় না। তবুও বেদান্ত এর বিরূপ মতবাদ পোষণ করে। মানুষের এই স্বার্থপরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বেদান্ত নিঃস্বার্থপরতার কথা বলে। বেদান্ত মনে করিয়ে দেয় মৈত্রীর সেই বিখ্যাত উক্তি –

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম।"[10]

এই পৃথিবীতে নিজের স্বার্থের পিছনে ছুটে কত মানুষ সুখী হতে পেরেছে তা আমরা জানি না? তবে বেদান্ত সাধকদের মতে "ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা" বাণীকে হৃদয় শোষণ করতে করতে নি:স্বার্থভাবে কারো কি জন্য কিছু করলে তা ব্রহ্মাস্বাদসহোদর এর সমান শান্তি পাওয়া যায়। বেদান্তের ঋষিদের মতে "ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্" অর্থাৎ এই জগতের সবকিছুর মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। এই পৃথিবীর একটি জড় বস্তুর মধ্যে যেমন ঈশ্বর পরমাণুরূপে বাস করেন তেমনি একটি জীব বা মানুষের মধ্যেও আত্মারূপে তিনি বিরাজ করেন। নিজ স্বার্থে করাও প্রতিটি কাজ যদি অন্যের হিতার্থে সাথে করা যায় তবে বোধহয় এক অনাবিল শান্তি নীড়ে জীবন বিরাজ করতে পারে- এই হল বেদান্তের এক শ্রেষ্ঠ অনুভুতি।

অহংকার ও বেদান্তসাধনা:

---

[8] কঠোপনিষদ্-১/৩/১৪

[9] স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃঃ ১৭১

[10] বৃঃ উঃ - ৪/৫/৪

আজ মানবমনে অহংকারের নিত্য আনাগোনা। অহংকার হতাশাকে প্রতিনিয়ত আহ্বান জানায়। আমিত্ব ভাবই হল অহংকার। জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি অথবা দেহের প্রতি মোহ থেকেই অহংকারের জন্ম হয়। তবে আসক্তি পূরণে মোহের মৃত্যু হয় না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় কামনার দ্বারা কামনা বাড়তে থাকে- "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।"[11] আবার কেও কেও দেহকেই চেতন মনে করে অহংকারে ডুবে থাকে। এই অহংকার থেকে দম্ভ তৈরি হয়। দম্ভের অধিকারী হয়েও যখন সে কামনা পূরণে ব্যর্থ হয় তখন তার জীবনে চরম হতাশা নেমে আসে। বৈদান্তিক সাধনায় জীবন "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি" অনুভব করে। বৈদান্তিক চেতনা জীবনের মায়াকে ম্লান করে "খাঁচার ভিতর অচিনপাখি"কে উপলব্ধি করায় এবং অন্তরের অহমবোধকে প্রেমে রূপান্তরিত করে।

শংকরাচার্য উপলব্ধি করেছিলেন যে-"ব্রহ্ম সত্য জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।" ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্মস্বরূপ, ব্রহ্ম হতে জীব ও জগতের পৃথক কোনো সত্তা নাই। মায়ার দ্বারা জগত আচ্ছাদিত-এই হল সমগ্র বেদান্তের উচ্চনিনাদ। কিন্তু সাংসারিক মানুষ প্রশ্ন করতে পারেন "বিশ্ব যদি স্বপ্ন দেখে সে স্বপন কাহার স্বপন।"[12] রূপরসগন্ধভরা পৃথিবীর সৌন্দর্যকে এক লহমায় মিথ্যে বলি কি করে? আর বাস্তব জগতে যাকে ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে পারি না, তাকে খোলা মনে সত্য বলে কি স্বীকার করা যায়? বেদান্ত দার্শনিকেরা নিজেরাই এই সংশয়ের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন তিনটি দশায় মানবজীবন আবর্তিত হয়-ব্যাবহারিক দশা, প্রাতিভাসিক দশা এবং পারমার্থিক দশা। ব্যাবহারিক বা জাগতিক দশায় এই জগত সংসারকে আমরা মিথ্যা বলতে পারি না। প্রতিদিন চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে সবকিছুই সত্য বলে মনে হয়। আমি আমার সামনের চায়ের কাপটিকে যেমন অস্বীকার করতে পারি না, তেমনি আমি আমার নিজের শরীরকেও অস্বীকার করতে পারি না। কিন্তু বেদান্তের "তত্ত্বমসি"[13] বাক্যের দ্বারা যখন উপলব্ধি হবে যে, ব্রহ্মই একমাত্র সৎ ও নিত্য বস্তু এবং ব্রহ্মভিন্ন বাকি সবই অসৎ ও অনিত্য। তখন অর্থাৎ পারমার্থিক দশায় অনিত্য বস্তুকে মিথ্যা বলে বলে মনে হবে, কারণ পারমার্থিক অবস্থায় ব্রহ্ম ছাড়া দেহের কোনো মূল্য নেই। একমাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম বা আত্মাই নিত্য। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে আত্মার নিত্যত্ব সম্পর্কে উপদেশ দিতে গিয়ে বলছেন-

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি ।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"[14]

সুতরাং, সেই পারমার্থিক অনুভূতিতে নিত্য, শুদ্ধ আত্মাকেই পরম সত্য বলে মনে হবে। এই চৈতন্যবিশিষ্ট আত্মাই শরীরকে পরিচালনা করে। সুতরাং দেহ নিয়ে অহংকার করে কি হবে? তবে অহংকারের জন্ম মনে নেয়, শরীরে নয়। শরীর অহংকারকে প্রকাশ করে মাত্র। তাই মন থেকে অহংকারকে ত্যাগ করা প্রয়োজন। মন থেকে অহংকার সরানোর জন্য বেদান্তের শম, দম উপরতি, তিতিক্ষা সমাধান এবং শ্রদ্ধা এই ষটসম্পত্তির উপাসনা প্রয়োজন। বেদান্তের এই ছটি সাধনার দ্বারা মন শান্ত হলে মনে বৈরাগ্যভাব জন্ম নেবে । মনের সেই বৈরাগ্যে সমস্ত অহংকার মুক্তিতে রূপান্তরিত হবে। দার্শনিক কবির ভাষায়-

"বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্যবন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ।"[15]

---

[11] মনুসংহিতা-২/৯৪, পৃষ্ঠা-১০০

[12] চিরদিন, কড়ি ও কোমল, রবীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা-২১৭)

[13] ছান্দোগ্য উপনিষদ্-৬/৮/৭

[14] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-২/২২

[15] সঞ্চয়িতা, নৈবেদ্য কাব্যের 'মুক্তি' কবিতা, পৃষ্ঠা-৩২৫

দেহের ও মনের অহংকার ধ্বংস হলে বাহ্যিক বিষয়ের প্রতি সমস্ত আকাঙ্ক্ষা নষ্ট হবে। ফলে দেহ এবং মন পরম শান্তি লাভ করবে। এইভাবে জীবনের সমস্ত হতাশা আনন্দে রূপান্তরিত হলে মানুষ অনুভব করবে- "সকল অহংকার হে আমার ডুবাও চোখের জলে।"[16]

সময়ের মূল্য ও মনের একাগ্রতায় বেদান্তভাবনা:

আধুনিক জীবনে মানুষের হতাশার আর একটি বিশেষ কারণ হল মনে একাগ্রতার অভাব। সময়ের হাতঘড়িকে সঙ্গে নিয়ে আমরা প্রতিদিন হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ছুটে চলি। আমরা জীবনের সবকিছুকে একসঙ্গে ভোগ করতে চাই। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা আপন খেয়ালে স্থান পরিবর্তন করে। তাই আমরা সঠিক সময় সঠিক কর্ম করতে ব্যর্থ হয়। যেমন চিকিৎসকেরা সঠিক সময় আমাদের নিদ্রার উপদেশ দেন কিন্তু আমরা তা অবলীলায় অমান্য করি। তাঁরা ঠিক সময় ঠিকঠিক ভোজনের পরামর্শ দেন কিন্তু তাও আমরা পালন করি না। ফলে দেহ মনের ভাঙনে অজানা রোগ বাসা বাঁধে দেহমন্দিরের কোণায় কোণায়। ফলস্বরূপ জীবনের আয়ু অকালমৃত্যুকে স্বাগত জানায়। অন্যদিকে ছাত্রজীবনেও আমরা সময়কে অবলীলায় অতিবাহিত করি। অথচ ছাত্রজীবন অধ্যয়নের উপযুক্ত সময়, উপনিষদ্ ঋষিদের ভাষায়-"ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপ:।" কিন্তু ছাত্রজীবনে অমূল্য সময় নষ্ট করে আমরা ভবিষ্যতকে বিপদের মুখে এগিয়ে দিই। ছাত্রাবস্থায় অকারণে মনকে বিপথে নিয়োজিত করে আমরা জীবনের মূল্যবান সময়কে কলুষিত করি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই হতাশা ছাত্রজীবনের অন্যতম সঙ্গী হয়ে ওঠে। সময়কে যদি জীবনের সমান্তরালে বয়ে নিয়ে যেতে না পারি, তবে-"সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চ'লে যেতে হয় কি কাজ করেছি আর কি কথা ভেবেছি।"[17]

বৈদান্তিক উপলব্ধিতে জীবনের এই হতাশা দূর করা সম্ভব। তেত্রিশ কোটি দেবতারা হলেন বেদান্তের সগুণ ব্রহ্মের অন্যতম প্রতীক। সেই তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে দ্বাদশ আদিত্য অন্যতম। আদিত্য শব্দের অর্থ হল সূর্য, যা সময়কে নিয়ন্ত্রণ করে। এই দ্বাদশ আদিত্যই বারো মাসের বোধক। সুতরাং দ্বাদশ আদিত্যকে শ্রদ্ধা করার মধ্য দিয়ে যদি আমরা সময়কে সম্মান করতে পারি অথবা সঠিক সময় সঠিক কর্ম করতে পারি, তাহলে গৃহস্থ এবং ছাত্রসমাজের মন থেকে হতাশা চিরতরে বিদায় নেবে।

কিন্তু মনকে স্থির করতে না পারলে আমরা সময়ের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না। আর তা না হলে মনের একাগ্রতা আসবে না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের রণাঙ্গনে দ্বিধাগ্রস্থ অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছিলেন, হে সখা, আমার এই ধনুকের তীর দ্বারা আমি বায়ুদেবকে পর্যন্ত স্থির করে দিতে পারি। কিন্তু মনকে স্থির করতে পারছি না। আমার মন খুব চঞ্চল-

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুস্করম্।"[18]

আমরা যখন যে কাজটি করব তখন সম্পূর্ণ মনসংযোগ দিয়ে যদি করতে পারি তাহলে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে। ফলে মন শান্তভাবে অবস্থান করবে। নেপোলিয়নের ভাষায় বলা যায়, আমার মনের অনেকগুলো Drawer আছে। আমি যখন রাজকার্য করি তখন মনের সেই Drawer খুলে রাখি আর তখন বাকি Drawer বন্ধ করে রাখি। আবার যখন রাজকার্য ছেড়ে একান্তে অন্দরমহলে সময় অতিবাহিত করি তখন অন্য Drawer বন্ধ রাখি। এই হল মনসংযোগের গোপনসূত্র।

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, আমরা যখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছি তখন মনঃসংযোগ দিয়ে কাজটি করব এটা ঠিকই কিন্তু যখন অন্য কাজ করছি তখন সম্পূর্ণ মনসংযোগের প্রয়োজন কি? উত্তরে বলা যায়, আমরা যদি কম গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলিও সম্পূর্ণ মনসংযোগ দিয়ে করতে পারি, তাহলে গুরুত্বপূর্ণ কাজটি করার সময় সেই মনসংযোগ সমান্তরালভাবে সংস্কাররূপে উদ্ভব হবে, ফলে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পাবে। স্বামীজির এক শিষ্য শরৎচন্দ্র একদিন স্বামীজির ঘরে গিয়ে বইয়ের আলমারিতে অনেকগুলি Encyclopedia দেখতে পেলেন। শরৎচন্দ্র স্বামীজিকে প্রশ্ন

---

[16] গীতাঞ্জলি -১ সংখ্যক কবিতা

[17] জীবনানন্দ দাশ, 'সময়ের কাছে'

[18] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৬/৩৪

করলেন-একজন মানুষের পক্ষে একজীবনে এতো বই পড়া কি সম্ভব? স্বামীজি বললেন, হ্যাঁ, সম্ভব। তুমি আমাকে এই নয়টি খন্ড থেকে প্রশ্ন করো। শরৎচন্দ্র প্রশ্ন করলেন, স্বামীজি কমা, পূর্ণচ্ছেদসহ উত্তর দিলেন। একই ঘটনা মিরাটেও এক গ্রন্থাগারিক এর সঙ্গে ঘটেছিল। এই হল মনসংযোগের শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

মনকে স্থির করার আর একটি উপায় হল ইন্দ্রিয়সংযম। বিষয়ের প্রতি অনাসক্তিই হল ইন্দ্রিয়সংযম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলেছেন –

"যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোহঙ্গনীব সর্বশঃ
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা।"[19]

অর্থাৎ কচ্ছপ যেমন তার অঙ্গসমূহ তার কঠিন বাইরের আবরণের মধ্যে সঙ্কুচিত করে, তেমনই যে ব্যক্তি তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষয় থেকে প্রত্যাহার করে নিতে পারেন, তাঁর চেতনা চিন্ময়জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাছাড়া ইন্দ্রিয়গুলিকে বিষধর সর্পের সঙ্গেও তুলনা করা হয়, যারা কোনো নিয়ন্ত্রন ছাড়াই ঘুরতে থাকে। কিন্তু আমাদের দক্ষ সাপুড়ের মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হওয়া দরকার, যাতে ঐ সর্পগুলি (ইন্দ্রিয়সমূহ) ছোবল মারতে না পারে।

যাইহোক ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা মনোসংযোগ বৃদ্ধি হলে খুব কম সময়ে জীবনের লক্ষ্য পূরণ করা সম্ভব হবে। ফলে মনের একাগ্রতার দ্বারা আমরা সময়কে সম্মান করতে পারব। সময়ের গতিকে জীবনের সঙ্গে মিশিয়ে সুন্দরভাবে জীবন অতিবাহিত করতে পারব। তাছাড়া স্থির জলে যেমন প্রতিবিম্ব স্পষ্ট হয় তেমনি স্থির ও শান্ত মনে জীবনের সুখ অতিস্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ধর্মের অজ্ঞানতা ও বেদান্ততত্ত্ব:

আজ বিশ্বায়নের দুনিয়ায় মানুষের হতাশার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল প্রকৃত ধর্মের প্রতি অজ্ঞানতা। বেদান্তমতে নিজেকে উপলব্ধি করায় হল জীবনের বড় ধর্ম। আজকের মানুষ ধর্মের প্রকৃত মর্মকথা অনুধাবনে অক্ষম। আজকের দিনে স্বার্থপরতা হল মানুষের ধর্ম। সবাইকে পিছনে ফেলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করাই হল ধর্ম। নিজের সুখের সন্ধান করাই হল মানুষের ধর্ম। কেউ বলেন জীবে প্রেম করাই ধর্ম, আবার কেউ বলেন পাথরের মূর্তির কাছে বসে আরাধনা করাকে ধর্ম বলে, কেও আমিষ খাওয়াকে অধর্ম বলেন আবার কেও নিরামিষ খাওয়াকে ধর্ম বলেন। কিন্তু কোথা থেকে এসেছে এই ধর্ম? কোন ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে ধর্মের এই সংজ্ঞা ? ধর্মের প্রতি মানুষেরই এই অজ্ঞানতা তাঁদের বিবেকবুদ্ধিকে ভুলপথে পরিচালিত করে। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তৈরি করে। ফলে বিবেকের সঙ্গে লড়াই করতে করতে মানুষ প্রতিমুহূর্তে হতাশ হয়ে পরে।

বৈদান্তিক জগতেই মানুষ এই হতাশা দূর করতে পারে। বেদান্ত কোনো বিষয় নয়, বেদান্ত হল জীবনের পরম উপলব্ধি। সেই উপলব্ধিতে স্নান করতে পারলে হৃদয়সমুদ্রে চেতনার মুক্ত মেলে। সেই চেতনা মানুষের বিবেকশক্তি বৃদ্ধি করে। মানুষ তখন জীবনের সমস্ত দ্বন্দ্ব কাটিয়ে নিজের বিবেকবোধকে জাগ্রত করতে পারে তখন সে জাগতিক ধর্মের সাথে মিশে যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কথায় কথা মিশিয়ে বলা যায়-

"জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন।"[20]

প্রকৃত ধর্ম মানুষকে সুন্দরের উপাসক করে তোলে। আধুনিক সভ্যতায় ধর্ম বলতে যদি আমরা কর্মকে বুঝি তাহলে সেই ধর্মের উচ্চতর অনুভূতিই হল বেদান্ত। জীবনের প্রতিটি কর্মে বেদান্ত উপলব্ধি করতে পারলে সেটাই হবে পরমধর্ম।

বেদান্ততত্ত্ব অনুসারে প্রত্যেকটি মানুষের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট দর্শন আছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষের যাত্রাপথ সেই দর্শনের দ্বারা পরিচালিত। সেই নির্দিষ্ট দর্শনের বাইরে জীবন পরিচালনা করলেই জীবনে হতাশা নেমে আসে।

---

[19] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-২/৫৮

[20] 'গীতাঞ্জলি'-১৬ সংখ্যক কবিতা

আর এই নির্দিষ্ট দর্শনের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করলে জীবন অনুভব করে-"আমারই চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ, চুনি উঠল রাঙা হয়ে"[21] এই এই চুনি আর পান্নার সৌন্দর্যই জীবনের প্রকৃত ধর্ম। জীবনের এই ধর্ম মানুষকে সুখী ও সমৃদ্ধ করে তোলে। জীবনের এই দর্শনই তাকে শেখায় মূল্যবোধের কথা। জীবনের এই দর্শনের দ্বারাই সে অনুভব করে জীবের মধ্যেই ঈশ্বর আছেন। মানবতাবাদী কবি রবীন্দ্রনাথ বলছেন-

> "আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। সেই মানুষের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়।"[22]

তাই ভগবানস্বরূপ জীবকে ঘৃণা নয়, প্রেম করতে হবে-

> "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"[23]

ধর্মের এই আধ্যাত্মিকস্তরের এই অনুভূতিতে মানুষ নিজের মধ্যে অপরকে খুঁজে পায়। উপনিষদের ঋষি বলছেন-

> "যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেব অনুপশ্যতি।
> সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুপুপ্সতে।"[24]

তবে ধর্মের প্রকৃত সৌন্দর্যকে উপভোগ করতে হলে মানুষের নিজের বিকশিত হওয়া প্রয়োজন। একটি গাছ যেমন অঙ্কুর থেকে বিকশিত হতে হতে বিশাল মহীরুহে পরিণত হয়, তেমনি একজন মানুষও বিকশিত হয়ে নিজের জীবনের প্রকৃত ধর্ম অনুভব করে। এবং ধর্মের পথে বৈদান্তিক উন্নতি হলে জীবনের হতাশা দূরে সরিয়ে মানুষ জীবনের প্রকৃত মূল্য অনুভব করে।

আনন্দতত্ত্ব ও বৈদান্তিক চেতনা:

মুঠোফোনের দৌলতে সারা দুনিয়া আজ আমাদের মস্তিষ্কবন্দী। মঙ্গলগ্রহে জলের অনুসন্ধান হোক অথবা চাঁদের মাটিতে রকেট প্রেরণ হোক-সবই বিজ্ঞানের নবজাগরণের প্রতীক। কম্পিউটার স্কিনে চোখ রেখে মনের খোরাক মিটছে প্রতিনিয়ত। প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীবনকে সহজ থেকে সহজতর করেছি আমরা। জীবনের এতো ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও আমরা কি আনন্দে আছি? মনের ভিতর থেকে উত্তর আসবে, না, আমরা আনন্দে নেই। প্রতিমুহূর্তে আমরা জীবনে এক কুচি আনন্দের জন্য হাহাকার করছি। সমাজের একজন ঐশ্বর্যশালী মানুষেরও মনে আনন্দ নেই। এই আনন্দের জন্যই তো একজন সন্ন্যাসী ঘর ছাড়েন, আবার এই আনন্দের জন্যই একজন চোর চুরি করেন। মানুষের এই নিরানন্দের জগত থেকেই হতাশার জন্ম হয়। তবে কি এই নিরানন্দের কারাগার থেকে মুক্তি কোথায়? বৈদান্তিক শিক্ষাই হল জীবনে নিরানন্দ থেকে মুক্তির মূল চাবিকাঠি। বেদান্তের আধ্যাত্মিকস্তরে নিজেকে উন্নীত করতে পারলে জীবনে পরম আনন্দ পাওয়া যায়। জীবনের সৃষ্টি তো আনন্দ থেকেই-

> "আনন্দদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"[25]

আনন্দব্রহ্ম থেকেই যখন জীবনের উৎপত্তি তখন এতো নিরানন্দ আসে কোথা থেকে?

---

[21] 'সঞ্চয়িতা', শ্যামলী কাব্যের 'আমি' কবিতা, পৃষ্ঠা-৫২৬

[22] 'মানুষের ধর্ম', ভূমিকা অংশ।

[23] স্বামীজির বাণী ও রচনা(ষষ্ঠ খণ্ড) পৃষ্ঠা-২১০

[24] ঈশোপনিষদ-৬

[25] তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-৩/৬

জীবনের চারটি পুরুষার্থের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু দার্শনিকেরা মোক্ষ বা মুক্তির মধ্যেই পরম আনন্দ খুঁজে পেয়েছেন। তাই যুগে যুগে তাঁরা এই স্তরের সাধনা মত্ত হয়েছেন। ব্যাবহারিক জীবনে আমরা আনন্দ বলতে ইন্দ্রিয়সুখকে বুঝি। আনন্দকে ভোগ করার একটি মাধ্যম হল ইন্দ্রিয়। যেমন, আমরা কেও খাদ্যরসিক, আর কেও ভ্রমণপ্রিয়, আবার কেও দেহের আরামকেই সুখ বলে মনে করি। তবে বৌদ্ধ দার্শনিকদের মতে ইন্দ্রিয়সুখ হল ক্ষণস্থায়ী। ক্ষণস্থায়ী সুখ কখনো প্রকৃত আনন্দ দিতে পারে না। কারণ ইন্দ্রিয়সুখের মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকে। আবার বেদান্তদর্শন অনুসারে অনিত্য বস্তুতে আনন্দ পাওয়া যায় না কারণ অনিত্য বস্তু চিরস্থায়ী নয়। আমাদের দেহ হল অনিত্য বস্তু। আমরা যেমন পুরনো কাপড় খুলে নতুন কাপড় পড়ি তেমনি আমাদের দেহও জীর্ণ হলে অন্য দেহ ধারণ করে-

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি ।

তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"[26]

সুতরাং অনিত্য দেহের দ্বারা বা ইন্দ্রিয় দ্বারা কেও প্রকৃত আনন্দ পায় না। সুতরাং যা নিত্য নয় তার প্রতি মোহ ত্যাগ করা উচিত। অনিত্যের মধ্যে মোহ না রেখে নিত্যের সঙ্গে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারলেই "আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে" ।

জীবনে আনন্দ লাভ করার আর একটি উপায় হল প্রতিদিনের কর্মে আনন্দ অন্বেষণ করা। আমরা প্রতিদিনের কর্মের মধ্যে যদি আনন্দ মেশাতে পারি তাহলে জীবনে হতাশা থাকবে না। আমরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত। কেও অধ্যাপক, কেও ডাক্তার আবার কেও কৃষক, কেও বা ছাত্র। একজন অধ্যাপক যদি তার অধ্যাপনার মধ্যে আনন্দ খুঁজে পান তবে তিনি মনে শান্তি পাবেন। একজন কৃষক যদি কৃষিকাজ আনন্দসহকারে করেন তবেই কৃষক জীবনের হতাশা থেকে বেড়িয়ে আসতে পারবেন। তবে কর্মের মধ্যে আনন্দ পেতে হলে সততার সঙ্গে কর্ম করতে হবে। এইভাবে জীবনের প্রতিটি কর্মের মধ্যে আনন্দ লাভ করতে পারলে আমরা জীবনে শান্তি অনুভব করব। হতাশা জীবন থেকে দূরে সরে যাবে। তবে সকাম কর্মের মধ্যে আমরা আনন্দ খুঁজে পেলেও তার মধ্যে স্বার্থপরতা লুকিয়ে থাকে । ফলে সেই কর্ম থেকে হতাশার চিরমুক্তি হয় না। তাই বেদান্ত সাধকেরা নিষ্কাম কর্মের মধ্যে আনন্দ খুঁজেছেন। যে কর্মে ফলের প্রতি কোনো আকাঙ্ক্ষা থাকে না তাকে নিষ্কাম কর্ম বলা হয়। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার শ্রেষ্ঠ ছাত্র অর্জুনকে নিষ্কাম কর্মের উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন–

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন

মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি।"[27]

অর্থাৎ কর্মেতেই তোমার অধিকার আছে, ফলে নয়। কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কর্ম করো। সেই কর্মে কোনো স্বার্থপরতা থাকে না। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, কর্ম করবো অথচ কর্মফলে আকাঙ্ক্ষা থাকবে না- এটা কি করে সম্ভব? বেদান্ত দার্শনিকেরা তত্ত্বটির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন, বর্তমানে আমরা যে ফল ভোগ করি তা সবই প্রারব্ধকর্মের ফল। প্রারব্ধ কর্ম হল আগের জন্মের কর্ম। আর বর্তমানে আমরা যে সমস্ত কর্ম করছি তার ফলও ভবিষ্যতে পাব। আমরা জানি না আমাদের প্রারব্ধ কর্মে কি ফল সঞ্চিত আছে, তাই ফলের আকাঙ্ক্ষা না করাই ভালো। শ্রীমদ্ভগবদগীতার এই ভাবনাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করলে হৃদয় থেকে স্বার্থপরতা চলে যাবে এবং জীবন "তেন ত্যক্তেন ভূঞ্জীথা" অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

তবে ধর্ম, অর্থ ও কামের আনন্দের মধ্যে সীমাবদ্ধতা থাকে। এই তিন প্রকার আনন্দের মধ্যে যে পূণ্য অর্জন হয় তা ক্ষয় হয়, সেই পূণ্য ক্ষয় হলে আবার ইহলোকে ফিরে আসে। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় বলা হয়েছে-

"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।"[28]

---

[26] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-২/২২

[27] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-২/৪

[28] শ্রীমদ্ভগবদগীতা-৯/২১

কিন্তু মোক্ষের আনন্দ সীমাহীন, মোক্ষের আনন্দই হল প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা। এক অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করাই হল আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য। আমাদের সকলের অন্তরে সেই শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মই হলেন আত্মা। তিনি নিত্য, তার কোনো ধ্বংস নেই। তিনি সদা আনন্দস্বরূপ। সেই আনন্দব্রহ্ম থেকেই পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীব সৃষ্টি হয়েছে-

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে।"[29]

সুতরাং জীবন আনন্দ স্বরূপ।জীবনের এই আনন্দ মায়ার দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে। সেই অজ্ঞান বা মায়াকে জ্ঞানের দ্বারা সরাতেই পরম আনন্দ প্রকাশিত হয়। জীবনের মধ্যেই আনন্দ থাকে, জীবনের বাইরে নয়। ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে ব্রহ্ম আছেন সেজে। অথচ আমরা জীবনের বাইরে আনন্দ খুঁজতে যাই। তখনই মায়ার ফাঁদে পড়ে আমরা হতাশ হয়। জীবনের একের মধ্যে যদি আনন্দ খুঁজতে পারি তবে জীবন থেকে হতাশা সরে গিয়ে জীবনের পরম অমৃত লাভ করব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়-

"খণ্ডতার মধ্যে কদর্যতা, সৌন্দর্য একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে প্রয়াস, শান্তি একের মধ্যে; খণ্ডতার মধ্যে বিরোধ, মঙ্গল একের মধ্যে; তেমনি খণ্ডতার মধ্যেই মৃত্যু, অমৃত সেই একের মধ্যে।"[30]

প্রশ্ন উঠতে পারে আনন্দ কিভাবে আমাদের আত্মার মধ্যে থাকে? উপনিষদে বলা হয়েছে আনন্দ ব্রহ্মরূপে আমাদের আত্মার মধ্যে থাকে তাই জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। পঞ্চদশীতে বলা হয়েছে-

"ইয়মাত্ম। পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ।
তৎ প্রেমাত্মাধর্ম্যত্র নৈবমষ্টার্থমাত্মনি
অতন্ত পরমন্ডেন পরমানন্দতাত্মনঃ।"[31]

এই জ্ঞানই হল আত্মা, আত্মাই হল পরমানন্দ, কেননা ইনিই পরম প্রেমের আধার। পরম প্রেমের আধার বলেই আত্মা পরম আনন্দস্বরূপ। যখন আমরা আমাদের ভিতরের আত্মাকেই আনন্দরূপে স্বীকার করতে পারব তখন বাহ্যিক বিষয়ের আনন্দ আমাদের তৃপ্তি দিতে পারবে না। তখন নিষ্কাম কর্মের ঊর্ধ্বে উঠে আমরা জীবনকে উৎসর্গ করতে পারব। জীবন তখনই সংকেত দেবে-তোমার আনন্দ অন্যের হাতে, আর অন্যের আনন্দ তোমারই মাঝে।

একটি গল্পের সাহায্যে বিষয়টি স্পষ্ট করা যাক। এক বক্তা বক্তব্য রাখবেন বলে মঞ্চে উঠেছেন। হঠাৎ করে তিনি মঞ্চ থেকে নেমে এলেন। তারপর সমস্ত শ্রোতাদের একটি ছোট্ট ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানে আগে থেকেই অনেক বায়ুভর্তি বেলুন রাখা ছিল। তিনি প্রত্যেক শ্রোতাকে একটি করে বেলুন তুলে নিয়ে নিজেদের নাম লিখতে বললেন। তারপর বেলুনগুলি ফেলে দিতে বললেন। শ্রোতারা তাই করলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি প্রত্যেকের নাম লেখা বেলুনগুলি খুঁজে বের করতে বললেন। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হল। নিজের নাম লেখা বেলুন কেও খুঁজে পেল, আবার কেও পেল না। তারপর সেই বক্তা বললেন যেকোনো নাম লেখা বেলুন হাতে নিন এবং তাতে যার নাম লেখা আছে তাকে ফেরত দিন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে কাজটি সম্পন্ন হল। তারপর বক্তা বললেন আমি মঞ্চে উঠে এটাই বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, আপনার নিজের আনন্দ অপরের হাতে আছে এবং অপরের আনন্দ আপনার হাতে। আনন্দের এই উপলব্ধিতে কোনো সীমাবদ্ধতা থাকে না। এই প্রকার আনন্দের দ্বারা জীবনের সমস্ত হতাশা ধ্বংস হয়। আমরা জীবনের প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করি। সুতরাং ধর্ম অর্থ ও কাম কেও যদি আধ্যাত্মিক চেতনার দ্বারা আনন্দে রূপান্তর করতে পারি তবেই জীবন 'ব্রহ্মাস্বাদসহোদর'-এর অনুভূতির শরিক হবে।

---

[29] তৈত্তিরীয় উপনিষদ্-৩/৬

[30] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাচীন ভারতে এক: ধর্ম পৃষ্ঠা-৫৪

[31] পঞ্চদশী-৮,৯

বেদান্তচর্চার ফল:

বৈদান্তিক চিন্তায় আমরা দুই ধরনের ফল লাভ করতে পারি। ১) দার্শনিক ফল এবং ২) ব্যাবহারিক ফল। বেদান্ত অভ্যাস করলে এই জন্মে হোক বা জন্মান্তরে ভগবানপ্রাপ্তি সম্ভব। আর যদি ভগবানপ্রাপ্তি না হয় তবে সাধকের মহাপুরুষদের মতো গতি প্রাপ্তি ঘটে। এই হল বেদান্তচর্চার দার্শনিক ফল। অন্যদিকে বলা যায়, নিরন্তর বেদান্ত অভ্যাস করলে মানুষ জীবনে চলার পথে অফুরন্ত শক্তি পায়। যখন আমাদের জীবন চলার পথে হতাশায় বিপর্যস্ত হয়, তখনই বৈদান্তিক শক্তি আমাদের জীবনকে হতাশা আর হীনমন্যতা থেকে বের করে আনে-"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধোত"[32] বাণীকে উপলব্ধি করতে শেখায়, বৈদান্তিক শক্তির দ্বারা আমাদের আত্মবিশ্বাস গড়ে ওঠে, যা আমাদের ভবিষ্যতে চলার পথ প্রশস্ত করে। আমাদের জীবন আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে-এই বেদান্তচর্চার ব্যাবহারিক রূপ।

মানবজীবন প্রকৃতপক্ষে হতাশাগ্রস্ত নয়, সত্য, শিব ও সুন্দর থেকেই জীবন উৎসারিত হয়। তবে জীবনে এতো হতাশা আসে কোথা থেকে? জীবনের প্রতিমুহূর্তের অজ্ঞান, অহংকার এবং হীনমন্যতা থেকেই হতাশার জন্ম হয়। যেকোনো বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞানের অভাবই হল অজ্ঞান। এই অজ্ঞানকেই দার্শনিক ভাষায় 'মায়া'[33] বলা হয়। অহংকার হল আমিত্বের ভাব। দার্শনিকের ভাষায়-"অভিমানাত্মিকা অন্ত:করণবৃত্তি: অহংকার:।"[34] আমরা প্রতি সেকেণ্ডে যদি দশটি বাক্য বলি, তো দশটিতেই অহম্‌বোধ মিশেল হয়ে থাকে। এই অহম্‌বোধই হল অহংকার। আর নিজের মধ্যে অন্তর্নিহিত শক্তি বা যোগ্যতাকে অনুভব না করাই হল হীনমন্যতা। বৈদান্তিক চেতনায় কিভাবে জীবন হতাশার করালগ্রাস থেকে মুক্তি পাবে তা আমার অতিক্ষুদ্র জ্ঞানে আলোকপাত করলাম ।

উপসংহার:

আলোচনার শেষে কলমের শেষ খোঁচা দেওয়ার আগে বলতে পারি যে, মানুষের সমস্ত হতাশার মূল হল তার মনের ইচ্ছে। কিছু পাওয়ার সাফল্য এবং কিছু না পাওয়ার ব্যর্থতাই হল জীবনের পরিচয়। মৃগ যেমন শিকারীকে ছুটিয়ে বেড়ায় তেমনি ইচ্ছেও মানুষকে দিগ্বিদিক ছুটিয়ে বেড়ায়। ইচ্ছে যখন অপূর্ণ থেকে যায়, মানুষের আশা যখন ভেঙে যায়, সেই নিরাশা আর অপূর্ণতা থেকেই হতাশার জন্ম হয়। তবে বৈদান্তিক জ্ঞানের কিরণ মানুষের ইচ্ছের গহ্বরে প্রবেশ করলেই "সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"[35] জীবন হতাশার আগুনে পুড়তে পুড়তে খাঁটি সোনায় রূপান্তরিত হয়। পূর্ণিমার চাঁদেই সবসময় গ্রহণ লাগে, আবার সেই গ্রহণ কেটে গেলে চাঁদ তার নিজস্ব দীপ্তিতে আকাশের বুকে দিব্যি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। জীবনও হতাশার পরীক্ষা দিতে দিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। দুঃখ ও শোকের ছায়া কেটে গেলে জীবন সুন্দর হয়ে ওঠে। এই হল জীবনের নিয়ম। বেদান্ত জীবনের বাইরের কোনো অনুভূতি নয়। বেদান্ত হল মানুষের অন্তরের পরম উপলব্ধি। সময়ের গতিতে জীবনে বেদান্তের আধ্যাত্মিকতার চাকা ঘুরতে থাকে। তবে সময় কখনও মানুষের তৈরি করা পথে চলে না। মানুষকে সময়ের নির্দেশিত পথে চলতে হয় । হতাশার মধ্য দিয়েই বেদান্তকে উপলব্ধি করতে হয়। এই হল জীবনের চরম সত্য উপলব্ধি। তাই জীবনে যখনই হতাশা আসবে, তাকে সময়ের স্রোতে তাকে ছেড়ে দেওয়াই শ্রেয়-এই হল বেদান্তের মূল মন্ত্র।

এতো গভীর তত্ত্ব আলোচনার পরে আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে যে, আজকের সমাজের মানুষ তার ব্যস্ততাময় জীবনে এবং তার সংগ্রামময় জীবনে উচ্চতর এই আধ্যাত্মিকতত্ত্ব কি উপলব্ধি করতে পারবে? অথবা উপলব্ধি করার

---

[32] কঠোপনিষদ্-১/৩/১৪

[33] 'মায়া' হল বেদান্তদর্শনের একটি পারিভাষিক শব্দ। শংকরাচার্যের মতানুসারে 'মায়া' ঈশ্বরের অনির্বচনীয় শক্তি। শংকর ঈশ্বরকে জাদুকরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জাদুকর যেমন তার জাদুশক্তির বলে এক টাকাকে দশ টাকা বানান, ঈশ্বরও তেমনিভাবে তার মায়াশক্তি দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করেন।

[34] বেদান্তসার, সদানন্দযোগীন্দ্র, পৃষ্ঠা-১১৬

[35] 'গীতাঞ্জলি', ৯৪ সংখ্যক কবিতা

পর ব্যাবহারিক জীবনে তা কি প্রয়োগ করতে পারবে? আমার মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রেই লুকিয়ে আছে। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে অর্জুন সুস্থ মনযোগ সহকারে শ্রীকৃষ্ণের সমগ্র উপদেশ শ্রবণ করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন- "নষ্টো মোহ স্মৃতির্লব্ধা।" শুধু তাই নয়, ব্যাবহারিক জীবনে সেই তত্ত্ব প্রয়োগও করেছেন। আজ বিজ্ঞানের যুগে দাঁড়িয়ে আমরা কি অর্জুনের থেকে বেশি উদ্বিগ্ন? নাকি অর্জুনের থেকে বেশি ব্যস্ত? যদি তা না হয় তাহলে আমরাও আমাদের জীবনে গভীর আধ্যাত্বিকতত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারব এবং ব্যাবহারিক জীবনে তা প্রয়োগ করতে পারব। তবে প্রথমেই আমাদের সুস্থ মানসিকতার প্রয়োজন। সুস্থ মানসিক স্থিতিতে বেদান্ততত্ত্ব আমাদের জীবনকে সুন্দর করে তুলবে-এই আশা নিয়েই শেষ করলাম।

তথ্যসূত্র:

1. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, আত্মপরিচয়, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৩৫০, পরবর্তী সংস্করণ-১৪১৭।
2. সেন, অতুলচন্দ্র, উপনিষদ্ (অখণ্ড সংস্করণ),হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম খণ্ড প্রকাশ-১৯৭২, দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ-১৯৭৬, অখণ্ড সংস্করণ-১৯৮০, পুনর্মুদ্রণ-১৯৮০।
3. জুষ্টানন্দ, স্বামী, অনুদিত, কঠোপনিষদ্ (শঙ্করভগবৎকৃত ভাষ্যসমেতা), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৯৯৭, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ-২০১১
4. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান, বিশ্বভারতী, কলকাতা, প্রকাশকাল (পুনর্মুদ্রণ)-১৪২১
5. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, প্রকাশকাল-১৩১৭, পুনর্মুদ্রণ-১৩৬৩।
6. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রণীত, ধর্ম, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩১৫, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৬।
7. দাশ, জীবনানন্দ, ধূসর পাণ্ডুলিপি, সিগনেট প্রেস, কলকাতা, প্রকাশকাল-১৩৬৩
8. বেদান্তবাগীশ কালিবর সম্পাদিত: বেদান্তসার, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।
9. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, প্রকাশকাল ১২৯৩, পুনর্মুদ্রণ-১৪০৯
10. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র-রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, সুলভ সংস্করণ-১৩৯৪, পুনর্মুদ্রণ-১৪২২, পৃষ্ঠা-২৯৪
11. ধীবর, কৃষ্ণ, সম্পাদিত: বেদান্তসার, সংস্কৃত বুক ডিপো, কলকাতা, প্রকাশকা- ২০২১
12. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দু, (সম্পাদনা), মনুসংহিতা (কুল্লূকভট্টটীকাসহ), সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা, প্রকাশকাল(দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৪১৬
13. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রণীত, মানুষের ধর্ম, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৩৩, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৮।
14. **ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রণীত, শান্তিনিকেতন (দ্বিতীয় খণ্ড), বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৫৬, পুনর্মুদ্রণ-১৪০১**
15. ঘোষ, জগদীশচন্দ্র (সম্পাদিত), শ্রীমদ্ভগবদগীতা, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রকাশকাল- (ত্রিংশতিতম সংস্করণ), ২০০৩
16. বিশ্বনাথানন্দ, স্বামী, প্রকাশিত, শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃত (অখণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৬-১৯৮৭, ৪১তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১৫।
17. দাশ, জীবনানন্দ, শ্রেষ্ঠ কবিতা, গীতাঞ্জলী, কলকাতা, প্রকাশকাল-২০১৫
18. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, সঞ্চয়িতা, সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রকাশকাল-১৪১৫
19. স্বামীজির বাণী ও রচনা, (তৃতীয় খণ্ড), উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-১৯৬৪, ২৬তম পুনর্মুদ্রণ- ২০১২
20. পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু সাংখ্যভূষণ সাহিত্যাচার্য (সম্পাদিত), সাংখ্যকারিকা (বাচস্পতিমিশ্রকৃত তত্ত্বকৌমুদীভাষ্যসহ) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, প্রকাশকাল- ১৯৮৩

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1027-1032
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.0100

বাংলা সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্বের অনুসন্ধান: একটি সমালোচনামূলক বিশ্লেষণ

ড. মো. সিদ্দিক হোসেন, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.02.2025; Send for Revised:11.03.2025: Revised Received: 25.03.2025; Accepted: 29.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Kazi Nazrul Islam stands as a revolutionary figure in Bengali literature, whose works, particularly during the 1920s and 1930s, reflect an intense engagement with the socio-political and religious dynamics of his time. Among his diverse literary themes, the representation of Muslim heritage holds significant prominence. His poetry, songs, essays, and fiction deeply incorporate Islamic traditions, historical narratives, and religious elements, demonstrating a profound understanding of the Quran, the life of Prophet Muhammad (PBUH), and various aspects of Muslim culture.

Nazrul composed nearly two thousand songs infused with Islamic spiritual themes, covering religious practices such as prayer (namaz), fasting (roza), Eid celebrations, Hajj, and Zakat. His poetic translations, including 'Kavya Ampara', aimed at making Islamic teachings more accessible, while 'Marubhaskar' depicted the life of Prophet Muhammad (PBUH). His notable works like 'Fathea-e-Dowazdaham' and 'Korbanir Eid' illustrate his spiritual consciousness and integration of Islamic values into the socio-political framework. However, his literary engagement with Islam was not limited to devotional aspects; rather, it served as a medium for resistance against colonial oppression, feudalism, and religious dogma.

Nazrul's poetry and essays often criticized exploitative religious orthodoxy while upholding the essence of Islamic humanism and justice. His works such as 'Jinjir' invoked the struggles of Muslim warriors, using Islamic historical narratives to inspire resistance and awakening. Furthermore, his critical engagement with religious hypocrisy positioned him as both a reformist and a revolutionary. His songs, including widely recognized compositions for Ramadan and Eid, continue to resonate within Bengali Muslim communities.

This study explores Nazrul's literary contributions, examining how his Islamic influences shaped Bengali literature and played a crucial role in fostering cultural consciousness and anti-colonial resistance. By contextualizing his writings within the broader literary and historical discourse, this research highlights Nazrul's enduring legacy as a poet, thinker, and reformer who sought to harmonize faith with social justice.

Keywords: *Kazi Nazrul Islam, Bengali Literature, Muslim Heritage, Islamic Influence, Colonial Resistance, Religious Reform.*

"ইসলাম বলে, সকলের তরে মোরা সবাই সুখ-দুখ সম-ভাগ করে নেব সকলে ভাই, নাই অধিকার সঞ্চয়ের!"[১]

নজরুল সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। 'ঈদ-মোবারক' কবিতার উক্ত উদ্ধৃতিটি 'মুসলিম ঐতিহ্য ও নজরুল সাহিত্য' শীর্ষক আলোচ্য প্রবন্ধটিতে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে আছে। নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতা, গান, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তৎকালীন অর্থাৎ নজরুল সমকালীন পরাধীন ভারতে বিশেষ করে অবিভক্ত বাংলাদেশে পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িকতা, মৌলবাদ, সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং দেশি-বিদেশি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝান্ডা উড়িয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আর্থ-সামাজিক এবং সমকালীন নানা ঘটনাকে সাহিত্যের পটভূমি করে তুলেছিলেন। এজন্য নজরুল ইসলামকে ইংরেজ সরকারের কাছে জবাবদিহির কাঠগড়ায়ও দাঁড়াতে হয়েছিল। ইংরেজ সরকার নজরুলের একের পর এক গ্রন্থ নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি, নজরুলকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছিল। এ থেকেই বুঝা যায়, উপনিবেশ শাসন নজরুলকে যথেষ্টই ভয় করে চলত। বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় নজরুল বিচরণ করেছেন একান্তই নজরুলীয় রীতিতে। এমনকি অনুবাদ সাহিত্যেও যথেষ্ট পারদর্শিতার এবং নিপুণতার সাক্ষর রেখে গেছেন নজরুল। নজরুল যখন বাংলা সাহিত্যে "একহাতে বাঁশের বাঁশরি, আর হাতে রণতূর্য" নিয়ে আবির্ভূত হলেন তখন বাংলা সাহিত্যের একাধিপতি সম্রাট ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এ সময়কালের প্রায় সব লেখকগণই তখন রবীন্দ্র জয়গানে লীন। রবীন্দ্র বলয় থেকে বের হয়ে আসার সেই মনোবল বা লেখার ঐশ্বর্যও কারো ছিল না। ঠিক তখনই নজরুল এলেন ভিন্ন এক স্বর নিয়ে। রবীন্দ্র বলয় থেকে সবার দৃষ্টি ঘোরালেন এক নতুন স্রষ্টার দিকে। যার অগ্নিবীণার সুরে মোহভঙ্গ হল সবার। আসন দুলে উঠল উপনিবেশবাদ শাসনের। ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করে জন্মের দশ বছরের মধ্যেই নজরুল নিজের দিকে নিজের অজান্তেই মানুষের চোখ ফেরাতে সক্ষম হন তাঁর সৃষ্টিশীল ও সৃজনশীল অতুলনীয় কর্মের মাধ্যমে। সাহিত্য জগতে এক অলৌকিক সৃষ্টিশীল ক্ষমতা নিয়ে এগুতে শুরু করেন নজরুল। নজরুলের ইসলামি চেতনামূলক রচনাও এ সময় বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

নজরুলের সমগ্র রচনা তাঁর মৌলিক চেতনায় সমৃদ্ধ। নজরুল যেমন লিখেছেন উপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, তেমনি ধর্মীয় চেতনামূলক রচনাও রয়েছে তাঁর প্রচুর। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, মুসলমান সকল ধর্মের প্রবাহ নজরুল সাহিত্যে রয়েছে। নজরুল সাহিত্যের একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সম্প্রদায়। তিনি কখনো ইসলাম ধর্মকে পুঁজি করে ফতোয়াবাজ, পীর ফকিরদের রমরমা ব্যবসার মুখোশ উন্মোচন করেছেন, কখনো ইসলামি ঐতিহ্যের প্রবাহে পাঠক হৃদয় ভাসিয়ে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে কবিতা ও গানেই তিনি বেশি বিচরণ করেছেন।

নজরুল রচনায় মুসলিম ঐতিহ্য:

'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' কবিতটি ১৩২৭ সালের মোসলেম ভারত অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আবির্ভাব ও তিরোভাব নামে দু'টি অংশে সংকলিত কবিতাটি ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহাম্মদ সা.-কে নিয়ে রচিত। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর পৃথিবীতে আগমন উপলক্ষ্যে রচিত হয় আবির্ভাব। "মহানবি সা.-এর জন্ম মুহূর্তেকে দুনিয়া ও বেহেশতের শুভ ও আনন্দময় লগ্নরূপে উল্লেখ করার পাশাপাশি মুসলমানদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, মুসলিম বিশ্বের ভূগোল ইত্যাদিরও উল্লেখ রয়েছে কবিতাটিতে। সাথে সাথে মুসলিম জাহানের গুরুত্বপূর্ণ স্থানেরও নাম উল্লেখ রয়েছে কবিতাটিতে। ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক চেতনাকে জাগিয়ে তোলার জন্য কবিতায় নজরুল বলেছেন:

"নাই তা-জ
তাই লা-জ?
ওরে মুসলিম, খর্জুর শীষে তোরা সাজ!
করে তসলিম, হর কুর্ণিশে শোর-আওয়াজ
শোন্ কোন মুরদা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা মাঝ!"[২]

এখানে সমকালীন মুসলমানদের হীনমন্যতা দূর করে আপন গৌরবে তাদের সাজতে বলা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর সমকালীন ভৌগলিক ও ঐতিহাসিক চেতনাকে আনন্দের সাথে, উল্লাসের সাথে প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশ করা হয়েছে হযরত মুহাম্মদ সা. হেরা পর্বতের গুহায় আধ্যাত্মিক চেতনা লাভ করার ফলেই ইসলাম ধর্ম প্রচার হয়েছিল।

'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' (তিরোভাব) কবিতাটিতে মহানবি সা. -এর তিরোধান বিষয়টি পরিস্ফুট হয়েছে।

"আজ স্বরণের হাসি ধরার অশ্রু ছাপায়ে অবিশ্রাম
ওঠে একী ঘন রোল-সাল্লালাহো আলায় হিসাল্লাম।"[৩]

নবি দুহিতা ফাতেমা রা.'র কান্না, হাসান হোসেন রা.-এর আহাজারির বর্ণনা, মুয়াজ্জিনের কম্পিত কণ্ঠে আযান ইত্যাদি চিত্র কবিতাটিতে রয়েছে।

'আবির্ভাব' প্রথম প্রকাশিত হয় মোসলেম ভারত, ১৩২৭ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় এবং তিরোভাব প্রকাশিত হয় মোসলেম ভারত ১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায়। নজরুলের 'কোরবানী' কবিতা সরাসরি ইসলাম ধর্মের নানা আচার অনুষ্ঠানের বিষয়ভিত্তিক একটি কবিতা। কবিতাটি মুসলমানদের একটি অন্যতম ধর্মীয় অনুষ্ঠান কুরবানীর ঈদ নিয়ে রচিত। কবিতাটিতে কবি ইসলাম ধর্মের ঈদুল আজহার তাৎপর্যকে এভাবে তুলে ধরেছেন:

"ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্য-গ্রহ' শক্তির উদ্বোধন।
এই দিন-ই 'মীনা'-ময়দানে
পুত্র-স্নেহের গর্দানে
ছুরি হেনে' খুন ক্ষরিয়ে নে'
রেখেছে আব্বা ইবরাহীম সে আপনা রুদ্র পণ!"[৪]

কবিতাটিতে নজরুল কুরবানির তাৎপর্যকেই স্পষ্ট করেছেন। সাথে সাথে ইসলামের একটি ইতিহাসকে তুলে ধরেছেন। কবিতাটিতে একদিকে যেমন হয়রত ইবরাহিম আ.-এর পুত্র ইসমাইল আ.-কে কুরবানি দেয়ার মহান ত্যাগের কথা উল্লেখ আছে তেমনি উল্লেখ আছে কুরবাণির নামে একশ্রেণির লোকের মিথ্যা অহমিকার কথা।
যেমন:

"চাহিনাক গাভী দুম্বা উট,
কতটুকু দান? ও দান ঝুট। চাই কোরবানী, চাই না দান।
রাখিতে ইজ্জত ইসলামের শির চাই তোর, তোর ছেলের দেবে কি? কে আছ মুসলামান?"[৫]

কুরবানিকে নিয়ে নজরুল লিখেছেন শহীদী ঈদ, বকরীদ কবিতাসহ আরো কয়েকটি কবিতা ও গান। কারবালার প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসেনের শাহাদত বরণের করুণ পরিণতির ঘটনার বর্ণনা রয়েছে 'মোহররম' কবিতাটিতে:

"বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তুর্য,
হুশিয়ার ইসলাম, ডুবে তব সূর্য?
জাগো, ওঠো মুসলিম, হাঁকো হায়দরী হাক,
শহীদের দিলে সব লালে লাল হয়ে যাক।"[৬]

প্রায় দুই হাজারেরও বেশি ইসলামি ও মুসলিম ঐতিহ্য নির্ভর গান নজরুল লিখেছেন। যা বাংলা সংগীতেরও বিশেষ অলংকার। আমাদের রমজানের ঈদ নজরুলের যে গানটি ছাড়া পূর্ণ হয় না:

"ও মন রমজানের ঐ রোজার শেষে এল খুশীর ঈদ।
তুই আপনাকে আজ বিলিয়ে দে শোন আসমানী তাগিদ।।
তোর সোনাদানা বালাখানা সব রহে লিল্লাহ দে যাকাত, মুর্দা মুসলিমের আজ ভাঙ্গাইতে নিদ।।
তুই পড়বি ঈদের নামাজ রে মন সেই সে ঈদগাহে যে ময়দানে সব গাজী মুসলিম হয়েছে শহীদ।।"[৭]

এমন অনেক গান আজ মুসলমান সম্প্রদায়ের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সাথে একাত্ম হয়ে আছে। যে গান ছাড়া আমাদের ধর্মীয় জীবন প্রবাহ ও নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ হয় না:

১। *"ত্রিভুবনের প্রিয় মুহাম্মদ এল রে দুনিয়ার।*
আয়রে সাগর আকাশ বাতাস, দেখবি যদি আয়।।

ধূলির ধরা বেহেশতে আজ জয় করিল, দিলরে লাজ আজকে খুশীর ঢল নেমেছে ধূসর সাহারায়
দেখ আমিনা মায়ের কোলে দোলে শিশু ইসলাম দোলে কচি মুখে শাহাদতের বাণী সে শোনায়।।" [৮]

২। *"ইসলামের ঐ বাগিচাতে ফুটলো দুটি ফুল।*
শোভায় অতুল সে ফুল আমার আল্লা ও রসুল।।
যুগল কুসুম উজল রঙে হৃদয় আমার উঠলো রেঙে খোশবুতে তার মাতোয়ারা মনের বুলবুল।।" [৯]

৩। *"নামাজ পড় রোজা রাখ, কলমা পড় ভাই।*
তোর আখেরের কাজ করে নে, সময় যে আর নাই।। সম্বল যার আছে হাতে। হজের তরে যা 'কাবা'তে যাকাত দিয়ে বিনিময়ে শাফায়াত যে পাই।।" [১০]

৪। *"ওরে ও দরিয়ার মাঝি। মোরে নিয়ে যা রে মদিনা।*
তুমি মুর্শিদ হয়ে পথ দেখাও ভাই আমি যে পথ চিনি না।।" [১১]

৫। *"দে যাকাত, দে যাকাত, তোরা দে রে যাকাত।*
তোর দিল খুলবে পরে-ওরে আগে খুলুক হাত।।" [১২]

৬। *"তৌহিদের মুর্শিদ আমার মোহাম্মদের নাম,*
মুর্শিদ মোহাম্মদের নামা ঐ নাম জপিলেই বুঝতে পারি খোদা কালাম,
মুর্শিদ মোহাম্মদের নাম।।" [১৩]

৭। *"ইসলামের ঐ সওদা লয়ে এল নবীন সওদাগর।*
বদনসীব আয়, আয় গুনাহগার, নতুন করে সওদা কর।।" [১৪]

'খেয়া-পারের তরণী' কবিতাটিতে খোলাফায়ে রাশেদীনের চার খলিফার উল্লেখের ভেতর দিয়ে মুসলমানদের শেষ বিচারের দিনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন নজরুল এবং সেই বিচারের দিনে জয়ী হতে হলে কি করতে হবে তারও দিক নির্দেশনা দিয়েছেন এভাবে:

"আবুবকর উম্মান উমর আলী হায়দর দাড়ি যে এ তরণীর, নাই ওরে নাই ডর! কান্ডারী এ তরীর পাকা মাঝি মাল্লা, দাড়ি-মুখে সারি গান-লা শরীক আল্লাহ!" [১৫]

কবিতাটির বিষয়বস্তু সম্পূর্ণরূপে ধর্মীয়। ধর্মীয় একটি বিষয়কে নজরুল তাঁর সাহিত্যে এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে কবিতাটি পাঠের পর যেকোনো মুসলমান হৃদয় কেঁদে উঠে। জান্নাতের পথ অনুসারী হয়ে চলতে অনুপ্রাণিত হয়। কবিতাটির মৌলিকতা এবং নির্মাণ কৌশল এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

'রণভেরী' কবিতাটিতেও ইসলামিক অনুভূতি বিরাজমান। 'ওরে আয়, ঐ ইসলাম ডুবে যায়' কবিতাটির এই একটি মাত্র পংক্তির মধ্যে দিয়েই সমগ্র মুসলমান জাতি জেগে ওঠে।

বলা যায় কাজী নজরুল ইসলাম ধ্যানে, জ্ঞানে খাঁটি মুসলমান ছিলেন। আর তাই ইসলামের ক্রান্তিকাল কাটিয়ে মুসলিম সমাজকে নানাভাবে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তার লেখনির মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে একটি উদ্ধৃতি:

"বিরামহীন কাজের মাঝে মাঝে মুসলিম সমাজকে জাগানো, তাদের অতীত গৌরব ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সক্রিনা করে তোলা, আচার-অনুষ্ঠান ও কুসংস্কার সর্বস্বতার পঙ্কে নিমজ্জিত এ সমাজকে ইসলামের মহান মানবিক মূল্যবোধে উত্তীর্ণ করে সংগ্রামী জীবন তৃষ্ণায় উদ্দীপ্ত করা এ স্বপ্ন দেখা ও কর্মধারায় কখনো তাঁর (নজরুলের) বিরতি ছিল না। কামাল পাশা, আনোয়ার, চিরঞ্জীব জগলুল, আমানুল্লাহ, জামাল উদ্দীন, রীফ সর্দার, উমর ফারুক, খালেদ ইত্যাদি কবিতায় কোথাও সরাসরি ইসলামি ইতিহাস, কোথাও খ্যাতিমান মুসলমান ব্যক্তিত্বের আদর্শ, মহত্ব, শৌর্য বীর্য প্রকাশিত হয়েছে।" [১৬]

'কাব্য আমপারা' নজরুল ইসলামের একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। এটি পবিত্র কুরআন শরীফের আংশিক বাংলা অনুবাদ। 'কাব্য-আমপারা' সম্পর্কে নজরুল বলেছেন:

> *"আমার জীবনে সবচেয়ে বড় সাধ ছিল পবিত্র 'কুরআন' শরীফের বাঙলা পদ্যানুবাদ করা।... আমার বিশ্বাস, পবিত্র কুরআন শরীফ যদি সরল বাঙলা পদ্যে অনুদিত হয়, তাহলে তা অধিকাংশ মুসলমানই সহজে কণ্ঠস্থ করতে পারবেন-অনেক বালক বালিকাও সমস্ত কুরআন হয়ত মুখস্ত করে ফেলবে।"*[১৭]

কাব্য 'আমপারা' সম্পর্কে নজরুল গবেষক কামরুল আহসান বলেন,

> *"এ গ্রন্থে 'খাদেমুল ইসলাম' হিসেবে নিজের পরিচয় উল্লেখের ভেতর দিয়ে কবি তার পরিবর্তিত মানসিকতারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এবং শানে নজুল সংযুক্ত আটত্রিশটি সুরার যাচাইকৃত সুললিত পদ্যানুবাদ করে আপন ইচ্ছার বাস্তবায়ন করেছেন। তবে মনে রাখা দরকার যে, এটি কবির কোনো মৌলিক গ্রন্থ নয়। মুসলমানদের পবিত্র ধর্ম গ্রন্থের আংশিক অনুবাদ মাত্র। এ কারণে নজরুলের কবিত্বগুণের প্রকাশ এতে থাকলেও মৌলিক ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির কোনো ছাপ না থাকাই স্বাভাবিক।"* [১৮]

উপরোক্ত দু'টি উদ্ধৃতির ভেতর 'কাব্য আমপারার' মর্মার্থ স্পষ্ট। এখানে একটি কথা বলা জরুরি, এই কাব্য আমপারাটি যদি নজরুল পূর্ণ করতে পারতেন তাহলে হয়ত মুসলিম বিশ্বে পবিত্র কুরআন শরীফের তাৎপর্য অত্যন্ত সহজবোধ্য হয়ে প্রতিটি বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলমান মানুষের কাছে অবিস্মরণীয় ভূমিকা রাখতে পারতো।

নজরুলের অপর একটি কীর্তি 'মরুভাস্কর' কাব্য। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর জীবনী নির্ভর করে লেখা হয়েছে এ কাব্যটি। এটি প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে। 'মরুভাস্কর' প্রসঙ্গে কবি স্ত্রী প্রমীলা বলেছেন:

> *"অনেকদিন আগে দার্জিলিং এ বসে কবি এই কাব্য গ্রন্থখানি রচনা আরম্ভ করেন। তিনি তখন আধ্যাত্মিকভাবে নিমগ্ন। বিশ্বনবি হযরত মুহাম্মদ সা. -এর জীবনী নিয়ে একখানি বৃহৎ কাব্য গ্রন্থ রচনার কথা তিনি প্রায়ই বলতেন।"* [১৯]

'মরুভাস্কর' কাব্যটি কাহিনি কাব্য বা আখ্যায়িকা ধর্মী মহাকাব্য। তবে যাই হউক না কেন কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ নয়। কারণ, নজরুল একাটানা কাব্যটি রচনা করতে পারেননি। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর বাল্য, কৈশোর ও যৌবনকালের পঁচিশ বছরের ইতিহাস রচনা করার পর নজরুলের লেখনি শক্তি থেমে যায়। নবিজির পঁচিশ বছরের ইতিহাস নজরুল চারটি সর্গের ভেতর আঠারটি পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছেন। 'মরুভাস্কর' মহাকাব্যের আঙ্গিকে নজরুল রচনা করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু এটি অর্ধেক শেষ করার পরই নজরুলের লেখনি শক্তি হারিয়ে যায়। তারপরও বলা যায়, এখানে আমরা আমাদের মুসলিম জাহানের এবং ইসলামের যে ইতিহাস পাই তা নজরুল সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক ও সমাজিক নানারকম অসঙ্গতি থেকে মুক্তি কামনায়ও নজরুলের বিদ্রোহী কবিকণ্ঠ সোচ্চার। 'জিঞ্জীর' কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামি ঐতিহ্য বিষয়ক কবিতা ও গানের সংকলন। 'অগ্নিবীণা', 'বিষের-বাঁশি', 'ভাঙার গান' কাব্যে ইসলামি ঐতিহ্য বিষয়ক কবিতা ও গানে নজরুল ইসলামের সংগ্রামী ও রাষ্ট্রীয় আদর্শকে জাগ্রত করে বর্তমানকে সমৃদ্ধ করার যে প্রয়াস দেখিয়েছেন জিজীরের রচনায় সে প্রয়াস অধিকতর বেগবান। গ্রন্থের খালেদ, চিরঞ্জীব জগলুল, আমানুল্লাহ, উমর ফারুক ইত্যাদি কবিতায় ইসলামের অতীত ঐতিহ্যকে জাগ্রত করে বর্তমানকে অনুপ্রাণিত করে তোলার প্রচণ্ড প্রয়াসই লক্ষণীয়। 'ঈদ-মোবারক' কবিতাটিতে সাম্যের যে আহবান কবি করেছেন তা অসাধারণ। ইসলামের মহান আদর্শাবলীকে উজ্জীবিত করে এ কাব্যেও পরাধীনতা, সাম্প্রদায়িতা, শ্রেণিভেদসহ নানা রকম অসামঞ্জস্যতা থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছেন ইসলামের বীর সেনানীদেরকে। আয় বেহেশতে কে যাবি আয়, ঈদ-মোবারক, আমানুল্লাহ্, অগ্র-পথিক, বার্ষিক সওগাত, অঘ্রাণের সওগাত, নওরোজ, ভীরু ইত্যাদি জিঞ্জীর গ্রন্থের অপরাপর সংযোজন। যৌবন বন্দনা যৌবনের প্রতি জয়গান নজরুল মানসের একটি প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। এ কাব্যের কবিতা ও গানে তেমনি যৌবনকে আলোকের পথে উদ্দীপিত করারও প্রয়াস রয়েছে। জিঞ্জীর সম্পর্কে স্পষ্টতই বলা যায়, এটি শুধু নজরুলের ইসলামি ঐতিহ্য বিষয়ক শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়, এটি বাংলা কাব্যজগতেরও শ্রেষ্ঠ ইসলামি ঐতিহ্য বিষয়ক কাব্যগ্রন্থ।

মুসলিম ঐতিহ্য ও নজরুল সাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধটিতে আলোচনা-পর্যালোচনায় দেখা যায়, নজরুল সাহিত্যে ইসলাম ধর্ম ও মুসলিম ঐতিহ্যের যে সমাহার রয়েছে তা বাংলা সাহিত্যে নজরুল পূর্ব এবং নজরুল পরবর্তী কারো সাহিত্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। নজরুল কখনো ধর্মকে আবার কখনো ধর্মের নানা আনুসঙ্গিক বিষয়কে তার লেখনির

বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়েছেন। তিনি কখনো মুসলিম ঐতিহ্যেকে আবার কখনো কোনো মুসলিম আদর্শকে তার লেখনির বিষয়বস্তু হিসেবে নিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় নজরুল নানাভাবে ইসলাম এবং ধর্মীয় অনুসঙ্গের মনোমুগ্ধকর জোয়ার বয়ে দিয়েছেন। তারুণ্যকে সঠিক পথের ঠিকানা দিয়েছেন নজরুল তার এই মুসলিম ঐতিহ্য বিষয়ক রচনার মধ্য দিয়ে।

তথ্যসূত্র:

১। আহসান, কে. (২০০১), নানা ভাবনা নজরুল, আফসা ব্রাদার্স, বাঙ্গাল বাজার, ঢাকা, পৃ. ৭২.
২। তদেব , পৃ. ৭৪.
৩। হোসেন, এম. (২০০১), নজরুলের মরুভাস্কর কাব্য, নজরুল ইনস্টিটিউট, পৃ. ৬৪.
৪। 'নজরুল রচনাসম্ভার', (১৯৯৭). হজরত প্রকাশনী, পৃ. ২১৪.
৫। তদেব , পৃ. ২২৭.
৬। তদেব , পৃ. ২০১.
৭। তদেব , পৃ. ২২৯.
৮। তদেব , পৃ. ২১৬.
৯। তদেব , পৃ. ২২৭.
১০। তদেব .
১১। তদেব .
১২। তদেব .
১৩। চৌধুরী, এ. এম (২০০১), নজরুল ইসলাম: ইসলামিক কবিতা, নজরুল ইন্, Pp. ৫-৬.
১৪। ইসলাম, কে. এন (১৯৫৭), কাবআমপারা (সংগৃহীত).
১৫। ইসলাম, কে. এন (১৯৫৭), মরুভাসরকার, কলকাতা এডিশন (সূচনাংশ থেকে উল্লিখিত)
১৬। আহসান, কে. (২০০১), নানাভাবনায় নজরুল, আফসার ব্রাদার্স, বাঙ্গাল ঢবাজা, ঢাকা, পৃ. ৭৩.
১৭। নজরুল রচনাসম্ভার, (১৯৯৭), হজরত প্রকাশনী, পৃ. ২৩০.
১৮। তদেব
১৯।তদেব

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1033-1039
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.101

‘অষ্টম গর্ভ’: পৌরাণিক উপমায় অলংকৃত সমাজ বাস্তবতার কাহিনি

সৌরভ মুখার্জি, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, ওয়াই.বি.এন ইউনিভার্সিটি রাঁচি, ঝাড়খন্ড, ভারত*

Received: 13.03.2025; Accepted: 28.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Ashtam Garbh: A Tale of Social Reality Adorned with Mythological Metaphors."Bani Basu's Ashtam Garbh is a unique novel where reality and imagination blend seamlessly, exploring the physical and psychological suffering of women, the crisis of self-identity, the struggles of motherhood, and social oppression in a profound manner.At the heart of the narrative lies the mystical beliefs and rituals of the Shibprasad and Durgaprasad families, creating a bridge between reality and mythology. The birth of three children in this setting is not just a familial event but symbolizes a deep philosophical exploration of life, destiny, and existence.Set against the backdrop of war, partition, and the breakdown of family structures, the novel unfolds through the perspective of children, portraying the complexities, conflicts, and struggles of human life. As their innocent minds confront reality, they gradually come to understand violence, betrayal, and the fight for survival.Bani Basu's distinctive literary style and philosophical approach turn this novel into a profound psychological and existential inquiry, compelling readers to reflect on the fundamental question – "What is the true meaning of human existence?"

***Key Word**: Aashtam Garbh, Poonorjonmo, Maatritiya, Jeevan Chakra, Deshbhaag*

বাণী বসু বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য লেখক, যিনি বাস্তবতার সঙ্গে কল্পনার মিশেলে এক নতুন সাহিত্যিক ধারা সৃষ্টি করেছেন। তাঁর রচনায় সমাজের বাস্তব চিত্র ও রূপকথার প্রতীকী ভাষার সংমিশ্রণ একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। ‘অষ্টম গর্ভ’ শুধুমাত্র একটি গল্প নয়, এটি নারীর জীবনের গভীরতম অনুভূতি, মনের টানাপোড়েন এবং সৃষ্টির শক্তির প্রতীক। উপন্যাসটি নারীর শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা, সামাজিক বাধা এবং আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধানকে কেন্দ্র করে নির্মিত। বাণী বসুর লেখনীতে বাস্তব ও রূপকথার মিশ্রণ বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি সমাজের প্রচলিত নিয়ম, সম্পর্কের জটিলতা এবং নারীর প্রতি বৈষম্যকে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন। উপন্যাসে রূপকথার বিভিন্ন প্রতীক, যেমন পুনর্জন্ম, মাতৃত্ব, এবং জীবনের চক্র একটি গভীর দার্শনিক মাত্রা যোগ করেছে। ‘অষ্টম গর্ভ’ নারীর মানসিক দ্বন্দ্ব ও আত্মপরিচয়ের সংগ্রামের প্রতীক। শিরোনামে ব্যবহৃত ‘অষ্টম গর্ভ’ প্রতীকী। এটি মাতৃত্বের ক্ষমতা এবং সৃষ্টিশীলতাকে চিহ্নিত করে। এই উপন্যাসে নারী চরিত্রগুলোর স্বাধীনতা ও প্রথাগত সমাজের চাপের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। নারী কেবল সমাজের ভূমিকা পালনকারী নয়, বরং একজন ব্যক্তি হিসেবেও নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। বাণী বসুর লেখনী সহজ এবং গভীর। তিনি চরিত্রগুলোর মানসিক অবস্থা বোঝাতে সরাসরি সংলাপের পাশাপাশি বর্ণনার মধ্য দিয়ে অনুভূতির গভীরতা তুলে ধরেন। রূপকথার প্রতীকী ভাষা পাঠককে গভীরভাবে ভাবায়। ‘অষ্টম গর্ভ’ শুধুমাত্র নারীর জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়, এটি সমগ্র মানবসমাজের একটি দর্পণ। বাণী বসু নারীর অভিজ্ঞতার মাধ্যমে একটি

বৃহত্তর সামাজিক ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করেছেন। বাণী বসুর 'অষ্টম গর্ভ' বাস্তবতা ও রূপকথার মেলবন্ধনের মাধ্যমে নারীর জীবনের গভীরতর অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরেছে। এটি কেবল সাহিত্যিক মানের দিক থেকে নয়, বরং সমাজের গভীর সমস্যাগুলো বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও অসাধারণ।

এই উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক দিকগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, নারীর জীবনের বাস্তবতা ও কল্পনার এই অনন্য মিশ্রণ পাঠককে নতুন করে ভাবতে শেখায়। শিরোনামের অধীনে বাণী বসুর বিভিন্ন উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক দিক এবং তাতে বাস্তবতা ও রূপকথার সংমিশ্রণ বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। তার লেখার মধ্য দিয়ে সমাজের বাস্তব সমস্যা ও রূপকথার প্রতীকী উপস্থাপন অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে প্রকাশিত হয়েছে। নীচে উল্লেখিত উপন্যাসগুলো এই আলোচনায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক:

অষ্টম গর্ভ উপন্যাসের শুরু বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যুদ্ধের ভয়াবহতা আর সর্বব্যাপী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখে শিবপ্রসাদ মনে করেন, কলিযুগের শেষ সময় আসন্ন। শিবপ্রসাদ পেশায় একজন বিজ্ঞানসাধক, অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক এবং দক্ষ সার্জন হলেও অলৌকিকতায় তাঁর গভীর আস্থা। যুদ্ধকালীন সংকটের সময়, যখন মানুষ দল বেঁধে কলকাতা ছাড়ছে, তখন শিবপ্রসাদের ছেলে দুর্গাপ্রসাদ পরিবার নিয়ে বীরভূমের সুরুল থেকে কলকাতায় চলে আসেন। দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রী তখন অন্তঃসত্ত্বা, এবং এটি তাঁর অষ্টম গর্ভ।

দুর্গাপ্রসাদ পেশায় একজন হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক। ব্যবহারিক জীবনে তিনি শিবপ্রসাদের আদর্শের বিরোধিতা করলেও অলৌকিক বিশ্বাসে বাবার মতোই দৃঢ়। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, কলিযুগের শেষ সময়ে তাঁদের পরিবারেই এক অবতার আবির্ভূত হবেন। তাঁদের পূর্বপুরুষের নামের কারণে এই পরিবার 'হরিবংশ' নামে পরিচিত। অবশেষে ভাদ্র মাসের একদিন, প্রবল বৃষ্টির রাতে, তাঁদের বিশ্বাস যেন সত্যি হলো। শিবপ্রসাদ নির্দেশ দিলেন যে প্রসব যন্ত্রণা যতই তীব্র হোক, কোনো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সহায়তা নেওয়া যাবে না। অলৌকিক ঘটনাই বলা যায়, দুর্গাপ্রসাদের স্ত্রীর অষ্টম গর্ভে তিনটি সন্তান জন্ম নিল – দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ে।

> "চল্লিশ লক্ষ প্রেতের আশি লক্ষ হাত ধেয়ে যাচ্ছে তাঁর দিকে, আসন টলেছে। শঙ্খ- চক্র-গদা-পদ্মধারী তিনি আসছেন, নেমে আসছেন। কারাগারের লোহার দরজা ওই ঝনঝন শব্দে খুলে গেল। তীক্ষ্ণ চিৎকার করে মাকে ঘর্মসিক্ত করে আমি সড়াক করে অবতীর্ণ হলুম। কারিয়াপিরেত বা। রোমশ, কুৎসিত, লোলচর্ম বাঁদর-বাচ্চা এক।"[১]

'ধাত্রী বললেন- মেয়ে হয়েচে গো ডাক্তারবাবু। বাপরে, কী কালো কুচ্ছিৎ মেয়ে গো! সে সময়ে ধাত্রীরা একটু স্পষ্টবক্তাই হতেন'।[২]

'পিসিমা শাঁখ নিয়ে রেডি ছিলেন। থতমত খেয়ে গেলেন। পণ্ডিত কালিকামোহন একবার গোঁত্তা খেয়ে আবার পড়তে শুরু করলেন। বহু শ্রাদ্ধবাড়িতে তুমুল হট্টগোল, মন্ত্রোচ্চারণ ও কীর্তনের মধ্য দিয়েও একমনে গীতা পাঠ, উপনিষদ পাঠ তাঁর অভ্যেস আছে। ঠিক আড়াই মিনিটের মাথায় আবার আমি হড়কে এলুম। ধাত্রী বললেন, 'যমক গো কর্তা, এবার ব্যাটাছেলে এয়েচে। কী সোন্দর।' এবার আমি ফর্সা টুকটুকে হয়েছি, ঠিক আমার মায়ের মতো। দুরন্ত দমে শাঁখ বাজতে লাগল'।[৩]

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন অষ্টম গর্ভ প্রসঙ্গে বলেছেন,

> কোণ সুখে কংশ তোর মুখে উঠে হাস। নাহি জাণ এবে তোঁ আপণার নাশ।।
> যে হৈবেক দৈবকীর গর্ভ অষ্টম। অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম।। [১।৪]
> 'তাহাক আষ্টম গর্ব্ভজাণী দৈবকীর। আবেক্ষণ দিল লোক কংশ মহাবীর ।। [৭]
> সুপুরুষ গর্ব্ভধরল আনুরূপ। দিনে দিনে বাঢ়ি গেল দৈবকীর রূপ ।। [৮]
> ক্রমে দৈবকীর গর্ব্ভ হৈল দশ মাস। বাসলী শিরে বন্দী গাইল চন্ডীদাস' ।। [৯।৫]

সমাজের একটি অদ্ভুত নিয়ম যেখানে মেয়েরা যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অষ্টম গর্ভ মানে তার আগে সাতটি সন্তান আছে। আর অষ্টম গর্ভ তিনটি সন্তান হয়েছে। তাই মায়ের জন্য বলছেন –

> "বিধ্বস্ত জননী ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিন দিনের নিরবচ্ছিন্ন লড়াইয়ের পর প্রথম সুযোগেই নিবিড় ঘুম এসে তাঁকে অধিকার করেছে। স্বপ্নহীন ঘুম। মৃত্যুপম, কিন্তু মৃত্যু নয়। শরীরের প্রতিটি কোষ ঘুমোচ্ছে। তিনি জানেন না তিনি কে, কোথায়! জানেন না তাঁর সাতটি সন্তান আছে এবং এক দফায় আজ তিনি তিন সন্তানের মোট দশ সন্তানের দশভূজা জননী হয়ে গেলেন। আরও জানলেন না বত্রিশ বছর বয়সে নিরবচ্ছিন্ন সন্তান প্রসবের পর এই আজকের লড়াইয়ে তিনি আর সন্তানধারণের ক্ষমতা হারালেন। এই অকল্পনীয় মুক্তির কথা জানলে হয়তো তিনি আরও আরও আরও ঘুমোতে পারতেন।"[৬]

এটি একটি চমৎকার সাহিত্যিক উদ্ধৃতি, যা সাধারণত মানুষের যন্ত্রণা, জীবনের প্রথম অভিজ্ঞতা এবং মাতৃত্বের বিষয়ে গভীর অনুভূতির সাথে সম্পর্কিত। এখানে, লেখক মাতৃত্বের কষ্ট এবং এক ধরনের আত্মপ্রকাশের অনুভূতি তুলে ধরেছেন, যেখানে এক নতুন জীবন পৃথিবীতে আসছে এবং মা একদিকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্লান্ত হলেও তার অভিজ্ঞতা ও জীবনধারা সম্পর্কে কিছু কিছু উপলব্ধি করতে সক্ষম হচ্ছেন। এই গল্পে এমন এক মর্মান্তিক বাস্তবতা এবং গভীর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা রয়েছে যা পাঠককে গভীরভাবে ভাবতে বাধ্য করে।

উপন্যাসের সূচনাতেই স্বয়ং কৃষ্ণের একটি গভীর কথোপকথন ফুটে ওঠে, যেখানে তিনি পরম শক্তির আধার সুদর্শন চক্র নিয়ে আলোচনা করেন—যে চক্র এক সময় অসুর বিনাশের অন্যতম অস্ত্র ছিল। কিন্তু এই চক্রের এক অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল—এটি শত্রুর বিনাশ না করে কখনো ফিরে আসত না। তাহলে আজ? যুগ যুগ ধরে পৃথিবীতে দুষ্ট, দুর্বৃত্ত, লোভী কূটনীতিবিদদের আনাগোনা কমেনি; বরং তারা আরও শক্তিশালী, আরও সাংঘাতিক রূপে আবির্ভূত হয়েছে। এই বিপুল অনাচারের ভার কি আজ একা কোনো মানব-কৃষ্ণের পক্ষে বইতে সম্ভব? হয়তো সেই কারণেই যুগান্তর ধরে সুদর্শন চক্র আর ফিরে আসেনি। কিন্তু চক্র কি হারিয়ে গেছে? নাকি পৃথিবীর অসংখ্য অসুরের মাঝে তার ধ্বংসাত্মক শক্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে, ঠিক নিউক্লিয়ার বোমার বিভক্ত উগ্রতার মতো? এখানে কৃষ্ণ শুধুই দ্বাপর যুগের এক পুরাণপুরুষ নন, তিনি বিরাট পুরুষ—ঋগ্বেদের সেই অনাদি শক্তি, যাঁর অস্তিত্ব কালের সীমা অতিক্রম করে বর্তমানেও প্রতিধ্বনিত হয়।এমন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে একটাই প্রশ্ন ওঠে আজকের সমাজ কি এতটাই কলুষিত যে, কৃষ্ণের প্রেরিত সুদর্শন চক্রও হারিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে? তাই লেখিকা বলছেন–

> 'এত দুঃশাসন কোথা হইতে আসিল? এত শকুনি'![৭]

বাণী বসুর এই অংশটি মূলত মানবজীবনের জটিলতা, সম্পর্কের গভীরতা এবং অস্তিত্বের দার্শনিক প্রশ্ন নিয়ে লেখা। শৈশবের অভিজ্ঞতা, পারিবারিক সম্পর্ক, এবং পৌরাণিক উপমাগুলো একত্রে মিলে এটি একটি শক্তিশালী সাহিত্যিক টুকরো হয়ে উঠেছে। এটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমষ্টিগত দার্শনিক প্রশ্নগুলোকে যুক্ত করে, যা বাণী বসুর রচনার অনন্য বৈশিষ্ট্য। লেখক অস্তিত্ব এবং ভবিষ্যতের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মানুষ একই সঙ্গে সৃষ্টির (গিরি গোবর্ধন) এবং ধ্বংসের (প্লাবন) শক্তি ধারণ করে। তার মধ্যে এই দ্বন্দ্বই হয়তো তাঁর জীবনের গতি ঠিক করবে।এই লেখার শুরুতেই শৈশবের স্মৃতিগুলো উঠে এসেছে, যা একধরনের অন্তর্গত দ্বন্দ্ব এবং অস্তিত্বের সংকটকে বোঝায়। শিশুর দুধপানের অভিজ্ঞতা থেকে কঠিন খাবারে অভ্যস্ত হওয়া পর্যন্ত ঘটনাগুলো জীবনের পরিবর্তনশীল প্রকৃতিকে তুলে ধরে।

এক পৌরাণিক প্রসঙ্গে লেখিকা বলছেন –

> "অর্জুন যেন শুয়ে আছে শরশয্যায়, পিতামহ তার পিপাসা মেটাচ্ছেন। অর্জুন আর ভূমিকা শুধু উল্টে গেছে।"[৮]

'আসলে আমার অভিভাবকরা জানেনই না আমি যম না যমুনা। গিরি গোবর্ধন ধারণ করব, না প্লাবনে পৃথিবী ভাসিয়ে দেবো। তাঁদের অনন্ত আশা মৃত্যুর সঙ্গে কঠিন লড়াই করে যে বেঁচেছে তার ভবিষ্যৎও অনন্ত'।[৯]

যম না যমুনা: অর্থাৎ, মৃত্যু এবং সৃষ্টির মধ্যে টানাপোড়েন।গিরি গোবর্ধন ধারণ করা না প্লাবনে পৃথিবী ভাসিয়ে দেওয়া: অর্থাৎ, দায়িত্ব পালন করা না ধ্বংস করে দেওয়া—জীবনের এই চিরন্তন দ্বন্দ্ব।

"এই ব্রজ এই গোষ্ঠ এই বৃন্দাবন
এই চুমা এহি কোরে হে নন্দ নন্দন
এই খেলা এই ধুলা গোকুল ব্যাপিয়া
ভুলিও না বাপা কভু দিও না ভুলায়্যা।"[১০]

এই অংশটি একটি কবিতার অতি সূক্ষ্ম এবং আবেগময় বিবরণ, যা বিশেষভাবে মায়ের স্নেহ, সন্তানের প্রতি ভালোবাসা এবং মধুর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। এটি হিন্দু ধর্মীয় সংস্কৃতি এবং শ্রীকৃষ্ণের মা, যশোদার প্রতি একটি বিশেষ অর্ঘ্য।

একটি প্রৌঢ় গলার মধ্যে তরুণীর আকুলতা তুলে ধরছেন, যা জীবনাচরণের বিভিন্ন দিকের সমান্তরালে চলে। এই অনুভূতি মায়ের দুধের গন্ধ, সন্তানদের প্রতি স্নেহের গভীরতা, এবং তাদের শৈশবকালীন মুহূর্তগুলোকে মনে করিয়ে দেয়। যখন 'যশোমতী' নামে মা যশোদার কথা বলা হয়, তখন এটি শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রের সাথে এক অভূতপূর্ব সংযোগ স্থাপন করে। এই অংশটি বিভিন্ন অনুভূতির প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়— মায়ের স্নেহ, সন্তানদের জন্য অনুভূত গভীর ভালোবাসা, এবং চিরকালীন সম্পর্কের স্মৃতি। এছাড়াও, এখানে গোপাল ও ব্রজের স্থানীয় পরিপ্রেক্ষিত, যেমন গোকুল, বৃন্দাবন, যশোমতী মায়ের অঞ্চল, এবং নন্দ নন্দন উল্লেখ করা হয়েছে, যা ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে একটি গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে।

> "আকাশে হালকা মেঘের মতো ভেসে থাকে একে দুই, দুয়ে এক, দুই-কোরে-দুই- কাঁদে-বিচ্ছেদ-ভাবিয়া চিরবিরহী অস্তিত্ব এক। পাশাপাশি হাসাহাসি, তবু বুক হু হু, তবু ভুবন ধু-ধু। বারোমেসে বিচ্ছেদ-কোকিল সেই ভুবন জুড়ে ডাকতে থাকে।"[১১]

রবীন্দ্রনাথ লেখেন-

> "কিন্তু কেবল অতীত বর্তমান নহে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতল-স্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি সে আপনার মানসসরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে; সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমি-বা কোথায় আর তুমিই-বা কোথায়! মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে! অনন্তের কেন্দ্রবর্তী সেই প্রিয়তম অবিনশ্বর মানুষটির সাক্ষাৎ কে লাভ করিবে! আজ কেবল ভাষায়-ভাবে আভাসে-ইঙ্গিতে ভুল-ভ্রান্তিতে আলো-আঁধারে দেহে-মনে জন্ম-মৃত্যুর দ্রুততর স্রোতোবেগের মধ্যে তাহার একটুখানি বাতাস পাওয়া যায় মাত্র। যদি তোমার কাছ হইতে একটা দক্ষিণের হাওয়া আমার কাছে আসিয়া পৌঁছে তবে সেই আমার বহুভাগ্য; তাহার অধিক এই বিরহলোকে কেহই আশা করিতে পারে না।"[১২]

'এই চিরবিরহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈষ্ণব কবি গাহিয়াছেন 'দু'ই-কোলে দু'হু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'।
চণ্ডীদাস লেখেন -'দুহু কোরে দুহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভাবিয়া'।[১৩]

এই অংশটি বাণী বসুর উপন্যাসের একটি গভীর, আত্ম-অন্বেষী এবং মনস্তাত্ত্বিক দিক তুলে ধরে। এখানে একটি মেলানো অনুভূতি ও দ্বন্দ্বের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, যেখানে 'থাকা-না-থাকার হিসেব', 'কান্না-হাসির, বিচ্ছেদ-ভাবিয়া, চিরবিরহী অস্তিত্ব' ইত্যাদি শব্দগুলি মানুষের মনোজগতের দ্বন্দ্ব ও জটিলতা, একাকীত্ব এবং আত্মবিশ্লেষণকে তুলে ধরে। 'কান্না-হাসির, মা-দিদিমার বখরা বাঁটাবাঁটি', এই অংশটি সম্পর্কের টানাপোড়েন এবং পরিবারে থাকা নানা রকম অনুভূতির দোলাচলকে ইঙ্গিত করছে। 'ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুত-ব্যোম বাষ্পীভূত হতে থাকে' অংশে, এটি প্রকৃতির উপাদানসমূহের সাথে মিলিয়ে মানব জীবনের এক পরিসীমা, যা চিরস্থায়ীভাবে পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চিত।

এই বর্ণনা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব ও বৈচিত্র্যময়তাকে প্রতিফলিত করে—একদিকে বিচ্ছেদ এবং একাকীত্বের দুঃখ, অন্যদিকে সম্পর্কের মধ্যে হাসির মিশ্রণ এবং পৃথিবীজুড়ে চলমান জীবনের বাচন। 'বিচ্ছেদ-কোকিল' শব্দটি জীবনের নিষ্ক্রিয়তা এবং পরিত্যাগের অনুভূতি প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে, যখন 'বুক হু হু' ও 'ভুবন ধু-ধু'

শব্দগুলি অন্তরের গভীর ক্ষোভ এবং প্রহসনের প্রতি ইঙ্গিত করছে। মোটকথা, এই অংশটি বাণী বসুর উপন্যাসে মানুষের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, জীবনের বিরহ ও সম্পর্কের সূক্ষ্ম দোলাচলগুলোর একটি শক্তিশালী চিত্র তুলে ধরে।

> "তোমরা কেউ খোকাকে দেখচো না। কী যে সুন্দর দেয়ালা করে। আপন খেয়ালে থাকে। ওই কেল্টি মেয়েটির দিকে তোমাদের সবার মন।''কা-লো, জগতের আ-লো।' ঠাকুর্দা বলে লোকটা বলে। বাবা বলে লোকটা আমায় তুলে নিয়ে শূন্যে ছুঁড়ে দেয়। লুফে নেয়। আবার ছোঁড়ে আবার লোফে। প্রথমটা আমি ভয়ে কাঠ হয়ে যাই, তারপর খেলাটা বুঝতে পারি। বুকের ভেতরটা একটু গুরগুর করতেই থাকে বটে, কিন্তু কাঁদি না। বাবা বলে- 'কী জানো তো সেজ মা, মেয়ে হয়ে জন্মেছে, তার ওপর তোমার মতো কেল্টি, কেড়েকুড়ে না নিলে তো পাবে না, তাই এমন নেই-আঁকুড়ে। তোমার মতো 'হলেও হল, না হলেও হল' ফিলসফি তো আর সবার জন্যে নয়!"[১৪]

লেখাটি বাণী বসুর সাহিত্যধারার একটি নিখুঁত উদাহরণ।এটি গ্রামীণ/শহরতলির পাড়ার মানুষের জীবন, সম্পর্কের প্রকৃতি এবং শিশুদের কল্পনার দুনিয়াকে উপস্থাপন করে। লেখক মানুষের বহুরূপী স্বভাবকে ফুটিয়ে তুলেছেন—যে চরিত্র একদিকে ভয়ঙ্কর, অন্যদিকে মানবিক এবং স্নেহময়। শিশুমন এবং প্রাপ্তবয়স্কের জগৎ, কল্পনা ও বাস্তবতার এই মিশ্রণ লেখার প্রধান শক্তি।

> "পিসিমা-ঠাকুমার এই মতের মিল ও সাময়িক সখিত্বের সম্ভাবনায় বাজখাঁই ভিখারিণী পাড়ায় ঢুকলেইআমরা পুলকিত হয়ে উঠতুম।"[১৫]
>
> "এরাই আমাদের ধেনুকাসুর, শকটাসুর, অঘাসুর, বকাসুর.... কোনও না কোনওভাবে হয় ছদ্মবেশ ভেদ করে, নয় মজা পেয়ে, নয় রোমাঞ্চিত হয়ে, অর্থাৎ ভয় না পেয়ে আমরা এদের জয় করেছিলুম। তবে ভয় যে একেবারে কাউকেই পেতুম না তা নয়। পেতুম একজনকে। সে হল হীরেমোতি।"[১৬]

শিল্প ও স্বাধীনতা: শিল্পীর কাজ কখনো চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। সঙ্গীত, নৃত্য, বা যে কোনো শিল্প স্বাধীনতাই সঠিক রূপ পায়।

পুনর্জন্ম ও শাশ্বততা: মিত্রাবসুর মতো প্রতিভার পুনর্জন্মের মাধ্যমে লেখক দেখিয়েছেন, প্রকৃত প্রতিভা কোনো পরিস্থিতিতেই নিঃশেষ হয় না।

ভাষা ও কল্পনা: ভাষা নিয়ে লেখকের কৌতুক এবং কল্পনা দেখায়, সাহিত্যের মাধ্যমে ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, বরং শিল্পেরও অংশ।

'এখন পুরন্দর ইন্দ্র রাজার তো কোনও অভ্যেসটাই ভালো না! বর সেজে পরের বউয়ের কাছে যান। পিতৃহত্যা করেন, নিরপরাধ ত্রিশিরা মুনিকে কিছুতেই তপস্যাচ্যুত করতে না পেরে তাঁকে বজ্রাঘাতে নিষ্ঠুরভাবে বধ করেন, সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব চুরি করে কপিলমুনির আশ্রমে নুকিয়ে রেখে আসেন ফলে সগর রাজার ষাট হাজার ছেলে (প্রজার) কপিল মুনিকে চোর ঠাওরায় এবং তাঁর অভিশাপে ভস্মীভূত হয়ে যায়। লম্পট, পিতৃঘাতক, নিরপরাধ-হন্তা, চোর এই দেবতাটি সভায় বসে উর্বশীর মতো মহানাচিয়েকে লাস্যনৃত্য করতে বলেন, যখন হয়তো উর্বশীর তাণ্ডব নাচতে ইচ্ছে হচ্ছে, বিশ্বাবসুকে মলহার গাইতে বলেন, যখন হয়তো তাঁর সাহানা গাইতে ইচ্ছে হচ্ছে। আর মিত্রাবসুর তো কথা-ই নেই। তাই মিত্রাবসু অন্যমনা হয়ে তাল ভঙ্গ করলেন। দাদাভাই বিশ্বাবসুর মাথা নিচু, উর্বশীর চোখে জল, ইন্দ্রের হাজার চোখে হাজার আগুন।-'যাও, নারী হয়ে পৃথিবীতে সঙ্গীত সাধনা করো গে যাও।' ব্যাস, মিত্রাবসু ডিগবাজি খেতে খেতে নামছেন। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মা দু হাত মেলে, কোল পেতে রয়েছেন, দেবহূতি-মায়ের কপালেই শিকে ছিড়ল। মিত্রাবসু বুজবুজদিদি হয়ে জন্ম নিলেন।'[১৭]

লেখিকা যুক্ত করেছেন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পর-

> "ওর নায়ক ধৃতরাষ্ট্র - গান্ধারী কুন্তি বিদুর এদের সঙ্গ এবং যা চাইছিলেন সেই রাজত্ব, অতুল ঐশ্বর্য ভাইয়েদের আনুগত্য,সহযোগিতা প্রজাদের সন্তোষ একসঙ্গে পাননি।"[১৮]

বাণী বসুর সৃষ্ট জটিল এবং দার্শনিক কথোপকথনের একটি চমৎকার উদাহরণ। এখানে চরিত্রদের মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার বিবর্তন, পৌরাণিক কাহিনির রূপক ব্যাখ্যা, এবং 'অবতার' ধারণার প্রশ্নাতীত মূল্যায়ন করা হয়েছে। বরুণ এবং দাদাভাইয়ের কথোপকথনে লেখকের দার্শনিক ও বুদ্ধিদীপ্ত মনন প্রকাশ ঘটে।

> "পরশুরাম সব রাজাদের মেরে শেষ করেছিলেন? বাঃ। এটা কি ভাল কাজ নাকি? উনিই তো বাবার কথায় মাকে মেরে ফেলেছিলেন। উনিই তো কর্ণকে রথ বসে যাবার শাপ দিলেন শুধু শুধু।-রাজারা হয়তো অত্যাচারী হয়ে গিয়েছিলেন। -আর কর্ণ? কর্ণ ওঁর ঘুম যাতে না ভাঙে তাই বজ্রকীটের দংশন সহ্য করলেন আর উনি শাপ দিলেন। রামও তো সীতা বিসর্জন দিয়েছিলেন। ধ্বংস করা আর শাপ দেওয়া ছাড়া এঁরা কি কিছু জানেন না?"[১৯]

১. নৈতিকতার দ্বিধা: অবতাররা যা করেছেন, তা কি সময়ের প্রেক্ষাপটে ন্যায্য ছিল, নাকি মানবতার জন্য আদর্শ নয়?

2. অন্তর্নিহিত ঈশ্বর: লেখক বোঝাতে চান, ঈশ্বর বাইরে নয়, বরং মানুষের ভেতরেই বিরাজমান।

3. বিবর্তন ও সভ্যতা: অবতারদের গল্প আসলে মানবজাতির বিবর্তনের এক প্রতীকী রূপ, যা প্রকৃতিকে বুঝতে সাহায্য করে।

বাণী বসুর লেখনীতে বাস্তুভিটাহারা মানুষের যন্ত্রণা এবং তাদের সংকটপূর্ণ জীবনের বাস্তব চিত্র ফুটিয়ে তুলেছে। তিনি রাজনৈতিক বিভাজন এবং সমাজের প্রান্তিক মানুষের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি গভীর সহানুভূতির সঙ্গে আলোকপাত করেছেন। বাণী বসু এই লেখায় ব্যক্তিগত যন্ত্রণার সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে বুনে দিয়েছেন। তিনি কেবল দেশভাগের ভয়াবহতা দেখাননি, বরং শিশুদের সরল চোখ দিয়ে তা অনুভব করিয়েছেন। এই অংশটি পাঠককে ভাবতে বাধ্য করে:

1. দেশভাগের মানবিক মাশুল।

2. রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের সার্থকতা।

3. বিচ্ছিন্ন মানুষের পুনর্বাসন ও তাদের ভবিষ্যৎ।

গোটা উপন্যাসটি তৃতীয় সন্তানের জবানিতে লেখা। সে শারীরিকভাবে দুর্বল ও জন্মরুগ্ন হওয়ায় তার লালন-পালন দিদিমার তত্ত্বাবধানে হয়। এই তিন সন্তানের শৈশব থেকে কৈশোরে পৌঁছানোর সময়কালই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দেশত্যাগ, মন্বন্তর, লিগের শাসন, আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান, দাঙ্গা, দেশভাগ- এসব ঘটনাবলী শিশুদের চোখ দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। তারা বড়দের আলোচনার ভিত্তিতে এসব ঘটনা নিজেদের রূপকথার জগতের সঙ্গে মিলিয়ে এক কল্পরাজ্য গড়ে তোলে। আবার লেখিকা লেখেন –

> "তিন জোড়া অপটু হাত বুঝি এই পৃথিবী এই সভ্যতার উপকরণগুলোর বিন্যাস অদলবদল করে দিয়েই গড়ে ফেলতে চাইছে এক চতুর্থ পৃথিবী।"[২০]

উপন্যাসটি তিনটি স্কন্ধে বিভক্ত, এবং প্রথম পর্বের বিভিন্ন অধ্যায়ের নামকরণ হয়েছে কৃষ্ণের বাল্যলীলা অনুসারে। এটি পাঠকদের জন্য আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। সব মিলিয়ে বাণী বসুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির মধ্যে এটি একটি।

তথ্যসূত্র:

১. বসু, বাণী, অষ্টম গর্ভ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৯
২.ঐ, পৃষ্ঠা ৯
৩.ঐ, পৃষ্ঠা ৯
৪. চন্ডীদাসবড়ু, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জন্ম খন্ড
৫. চন্ডীদাসবড়ু, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, জন্মখন্ড
৬. বসু, বাণী, অষ্টম গর্ভ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৯
৭. ঐ, পৃষ্ঠা ৪
৮. ঐ, পৃষ্ঠা ২৫
৯. ঐ, পৃষ্ঠা ৩০
১০. ঐ, পৃষ্ঠা ৩৭
১১. ঐ, পৃষ্ঠা ৪৪
১২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, প্রাচীন সাহিত্য, পৃষ্ঠা ১৬
১৩. চণ্ডীদাস, বৈষ্ণব পদাবলী,
১৪. বসু, বাণী, অষ্টম গর্ভ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ৩৯
১৫. ঐ, পৃষ্ঠা ৮৮
১৬. ঐ,পৃষ্ঠা ৮৮
১৭. ঐ,পৃষ্ঠা ৯৪
১৮. ঐ,পৃষ্ঠা ১৬২
১৯. ঐ,পৃষ্ঠা ২৯৭
২০. ঐ,পৃষ্ঠা ৩১৮

ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1040-1045
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.102

যাদুগোড়ার রঙ্কিনী দেবীর ইতিহাস: আদিবাসী দেবীর ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্মাণ

রুনা শ্যামল, *গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.03.2025; Accepted: 22.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The famous temple of Goddess Rankini is situated on the foothill of the Tuila hill in Jadugora of Rohinibeda block in Singhbhum district of Jharkhand. The origin of this goddess of is narrated in the story titled 'Rankini Devi's Kharga' by Bibhutibhushan Bandyopadhyay. The origin of Rankini Devi of Jadugora is very amazing. Once upon a time, Rankini was a terrifying Goddess. A number of folktales about this her are still prevalent in the surrounding villages of Jadugoda. The regional kingdom of Dhalbhumgarh is connected with this Goddess. Rankini is regarded as the tutelary deity. With the expansion of the Brahmanical culture in this region, Goddess Rankini has now been transformed into 'Kali', a very popular deity of Hinduism. However, tribal people of Jharkhand and South Western Bengal consider Rankini as their own indigenous deity. For instance, Rankini is revered by the Bhumijs of this region. Moreover, the temple of Rankini is considered one of the sacred shrines of the tribal groups located in eastern India. During the time of worship of Rankini, the presence of a tribal priest or laya is necessary. The article will explore the origin of Goddess Rankini and also analyse the process of incorporation of this tribal Goddess in the fold of Brahmanical culture.

Keywords: Rankini Devi, Religion, Indigenous, Culture, Jharkhand

যাদুগোড়ার টুইলা পাহাড়ের পাদদেশস্থিত কাপড়গাদী ঘাটের রঙ্কিণী মন্দির বিষয়ক আলোচনার সূত্রপাতের আগে রঙ্কিণী দেবীর উৎপত্তির ইতিহাস বিশ্লেষণ একান্ত জরুরী। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা ও তৎসংলগ্ন ঝাড়খণ্ড অঞ্চলে রঙ্কিণী অত্যন্ত জনপ্রিয় এক দেবীসত্তা। রঙ্কিণী দেবী মূলত হিন্দু দেবী কালীর এক রূপ হিসেবে পরিচিতি অর্জন করেছেন। হিন্দু দেবমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হলেও রঙ্কিণী দেবীর উল্লেখ প্রথম সারির কোনও হিন্দু শাস্ত্রে নেই। এমনকি বাংলা অঞ্চলে রচিত পুরাণ ও উপপুরাণেও দেবী রঙ্কিণীর উল্লেখ পাওয়া যায় না। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে রঙ্কিণী দেবীকে কেন্দ্র করে অসংখ্য মিথ বা প্রত্নকথার প্রচলন রয়েছে। এগুলির অধিকাংশ নেহাতই কাল্পনিক। ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে রঙ্কিণী দেবীর মাহাত্ম্য বিচার্য বিষয় না হলেও এসকল প্রত্নকথাগুলি কিন্তু আদৌ গুরুত্বহীন নয়। রঙ্কিণী দেবীর প্রাচীন সত্তা ও ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু দেবীতে তাঁর রূপান্তরের প্রক্রিয়া অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি প্রত্নকথার বিশ্লেষণ যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক। বাংলা সাহিত্যে রঙ্কিণী দেবীর সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটদের জন্য লেখা একমাত্র গল্পগ্রন্থ 'তালনবমী'র 'রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ' শীর্ষক এক বিখ্যাত অলৌকিক কাহিনিতে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘাটশিলায় তাঁর জীবনের বেশকিছু কাল অতিবাহিত করেছিলেন। এসময় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে রঙ্কিণী দেবী সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন লোককথাগুলি সম্পর্কে তিনি অবগত হয়েছিলেন। লোকমুখে প্রচলিত গল্পগুলির ওপর ভিত্তি করে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রঙ্কিণী দেবীর বিষয়ে এই বিখ্যাত গল্পটি রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন। 'রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ' নামাঙ্কিত গল্পটিতে বর্ণিত হয়েছে যে চেরো গ্রামের এক মাইনর স্কুলে শিক্ষকতাকালে লেখক গ্রাম সংলগ্ন পাহাড়ে রঙ্কিণী দেবীর এক প্রাচীন জরাজীর্ণ মন্দিরের সন্ধান পেয়েছিলেন। তবে শত প্রচেষ্টার পরও তিনি এই দেবী সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কারণ গ্রামবাসীরা এই দেবীকে অত্যন্ত ভয়

পেতেন ও তাই রঙ্কিণীর বিষয়ে তাঁরা বার্তালাপে আগ্রহী ছিলেন না। এরপর চেরো গ্রামের অধিবাসী চন্দ্র পাণ্ডার থেকে লেখক রঙ্কিণী দেবীর বিষয়ে সবিস্তারে জানতে পেরেছিলেন।

> "মানভূম জেলায় আগে অসভ্য বুনো জাত বাস করত। তাঁদেরই দেবতা উনি। ইদানীং হিন্দুরা এসে যখন বাস করলে, উনি হিন্দুদেরও ঠাকুর হয়ে গেলেন। তখন তাঁদের মধ্যে কেউ মন্দির করে দিলে। কিন্তু রঙ্কিণী দেবী হিন্দু দেব-দেবীর মতো নয়, অসভ্য বন্য জাতির ঠাকুর- আগে ওই মন্দিরে নরবলি হ'ত- ষাট বছর আগেও রঙ্কিণী মন্দিরে নরবলি হয়েছে।"[১]

চন্দ্র পাণ্ডা লোকমুখে রঙ্কিণী দেবীর সম্পর্কে যতখানি তথ্য পেয়েছিলেন তা লেখককে জানিয়েছিলেন-

> "আমি যখন প্রথমে এদেশে আসি, সে আজ চল্লিশ বছর আগের কথা-তখন প্রাচীন লোকেদের মুখে একথা শুনেছিলাম।"[২]

লোকমুখে প্রচারিত কাহিনি বা প্রত্নকথার ওপর ভিত্তি করে রঙ্কিণী দেবীর উৎপত্তির যে বিবরণ রয়েছে, তাতে 'মানভূম জেলার অসভ্য বুনো জাত' –এসকল শব্দগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রঙ্কিণী দেবী সংক্রান্ত কাহিনীতে উল্লিখিত মানভূমের 'চেরো' নামক স্থানটি কাল্পনিক হলেও পূর্বতন মানভূম তথা অধুনা পুরুলিয়ার জনজীবনে রঙ্কিণী দেবী সর্বজনবিদিত এক দেবীসত্তা। গল্পে উল্লিখিত বুনো অসভ্য জাতি নিঃসন্দেহে বর্তমান পুরুলিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি। তাঁরাই এই অঞ্চলের আদিম জনসমষ্টি। এসকল আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে ভূমিজ, সাঁওতাল, হো, মুন্ডা, মাহালী, ওঁরাও, কোড়া ও বিরহড় অন্যতম। হিন্দু সংস্কৃতির সম্প্রসারণের পূর্বে পুরুলিয়ায় এক সমৃদ্ধ জৈন সভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। পুরুলিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে অবহেলায় অনাদরে পড়ে থাকা জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তিগুলি তার প্রমাণ বহন করে। সর্বোপরি এই অঞ্চলে সরাক নামক এক জৈন ধর্মালম্বী গোষ্ঠীর বাস এখনও পর্যন্ত বিদ্যমান। কথিত আছে যে সর্বশেষ বা চব্বিশতম তীর্থঙ্কর মহাবীর একদা ধর্ম প্রচারকার্যে বজ্রভূমিতে এসেছিলেন। তবে বজ্রভূমির অভিজ্ঞতা মহাবীরের জন্য সুখকর হয়নি। তাঁর উদ্দেশ্যে বজ্রভূমির অসভ্য অধিবাসীরা কটু বাক্য প্রয়োগ, তীর নিক্ষেপণ ও কুকুর লেলিয়ে দেওয়ার মতো হীন কাজ করেছিলেন।[৩] মানভূম তথা পুরুলিয়ার প্রাচীন নাম ছিল বজ্রভূমি। অতএব এই অঞ্চলের আদিবাসী সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের বিষয়ে তেমন কোনও সংশয় নেই। ডাল্টন ভূমিজ জনগোষ্ঠীকে মানভূমের অন্যতম আদিম অধিবাসী হিসেবে গণ্য করেছেন। যদিও এল এস ও ম্যালি মনে করেন যে ভূমিজ ও সাঁওতালরা মানভূমের আদিমতম জনসমষ্টি। তবে ভূমিজ সম্প্রদায়ের সাথে রঙ্কিণী দেবীর সবিশেষ সংযোগ পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী মন্দিরের পূজারীদের মধ্যে ভূমিজ পুরোহিতরা হলেন অন্যতম। এমনকি যাদুগোড়ার এই রঙ্কিণী দেবীর সাথে পুরুলিয়ার সংযোগ রয়েছে।

যাদুগোড়ার রঙ্কিণী মন্দিরের ইতিহাস নির্ণয়ন আদৌ সহজসাধ্য নয়। কারণ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গালুডির মহুলিয়া ও বড়বিল এবং ঘাটশিলায় আরও তিনটি রঙ্কিণী মন্দিরের অবস্থান রয়েছে। যাদুগোড়ার থেকে গালুডির মন্দির দুটির দূরত্ব প্রায় ১২ কিমি। অন্যদিকে মহুলিয়া ও বড়বিলের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ৩ কিমি। আবার যাদুগোড়া ও ঘাটশিলার রঙ্কিণী মন্দিরের মধ্যে দূরত্ব প্রায় ২৩ কিমি। মন্দিরগুলির মধ্যে যে কোনটি প্রাচীনতম তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। মহুলিয়ার মন্দিরের প্রবেশদ্বারে উৎকীর্ণ বিবরণে এটিকে রঙ্কিণী দেবীর প্রাচীন মন্দির হিসেবে দাবী করা হয়েছে। আবার ঘাটশিলা থানার একদম পাশেই অবস্থিত রঙ্কিণী মন্দিরের নির্মাণকার্যে ধলভূমগড়ের ধবল রাজপরিবারের নাম শোনা যায়। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল যে যাদুগোড়া, মহুলিয়া, বড়বিল ও ঘাটশিলার এই চারটি রঙ্কিণী মন্দিরের একে অপরের সাথে সংযোগ রয়েছে। কথিত আছে মহুলিয়ার মন্দিরটিও ধলভূমগড়ের রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। যদিও নরবলির বিষয়কে কেন্দ্র করে সমস্যা উদ্ভূত হওয়ায় ধবল রাজবংশের উদ্যোগে মন্দিরটি ঘাটশিলায় স্থানান্তরিত হয়। আবার যাদুগোড়ার মন্দির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ধবল রাজাদের অবদানের কথা লোকমুখে প্রচারিত আছে। তবে কোন রাজার আমলে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল সে বিষয়ে ইতিহাসে বিশদে কোনরূপ তথ্য নেই। এক্ষেত্রে জনপ্রিয় মতটি হল যে ধবলরাজ জগন্নাথ যাদুগোড়া, মহুলিয়া, ও ঘাটশিলার রঙ্কিণী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে যাদুগোড়া সংলগ্ন এলাকায় সর্বমোট যে চারটি মন্দির রয়েছে প্রতিটি মন্দিরের কাঠামো সাম্প্রতিককালে নির্মিত হয়েছে। তাই মন্দিরের গঠনগত বৈশিষ্ট্য নিরীক্ষণের মাধ্যমে প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের বিন্দুমাত্র উপায় নেই। এমতাবস্থায় মিথ বা প্রত্নকথাগুলিতে রঙ্কিণী দেবীর যে উল্লেখ রয়েছে সেগুলির বিশ্লেষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে সমর্থ হবে। রঙ্কিণী দেবীর বন্দনায় বিবৃত হয়েছে-

> "পুরুলিয়া থেকে এলে কাপড়গাদী ঘাটে। কাপড়গাদী ঘাট থেকে গেলে ঠাকুরান পর্বতে।। ওখান থেকে এলে মা তুমি মহুলিয়াতে। রয়ে গেলে ধলভূমে ভক্তের পূজা নিতে।।"[৪]

পংক্তিটিতে উল্লিখিত ঠাকুরান পাহাড়ের অপর নাম হল রঙ্কিণী ডুংরি যা বড়বিলে অবস্থিত। রঙ্কিণী দেবীর এই মাহাত্ম্য নিঃসন্দেহে অনেক পরবর্তীকালের রচনা কিন্তু এখানে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে দেবীর আগমন পুরুলিয়া থেকে প্রথমে যাদুগোড়ার কাপড়গাদী ঘাটে হয়েছিল। ডাল্টন তাঁর গ্রন্থে পুরুলিয়া থেকে দেবীর ধলভূমগড়ে আগমনের কাহিনী বিবৃত করেছেন। কথিত আছে যে ধলভূমগড়ের রাজপরিবার এক ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় পাঞ্চেতের রঙ্কিণী মন্দির থেকে দেবীমূর্তি চুরি করে নিয়ে এসে নিজের রাজ্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৫] এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য যে রঙ্কিণী দেবীর কোনরূপ মূর্তি সাধারণত প্রচলিত নেই। দেবী অপরিশীলিত প্রস্তরখণ্ডের মাধ্যমে পূজিতা হন। একমাত্র ঘাটশিলা থানার পাশে অবস্থিত রঙ্কিণী মন্দিরে দেবীর মূর্তি রয়েছে এবং তাঁকে কালীর আরেক রূপ হিসেবে গণ্য করা হয়। যদিও পুরুলিয়ার কোন অঞ্চল থেকে দেবীমূর্তি সংগৃহীত হয়েছিল তা নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। একটি প্রচলিত মত হল যে পুরুলিয়ার পাঞ্চেতের মন্দির নয় বরং পাড়ার মন্দির থেকে ধবল রাজারা রঙ্কিণী মূর্তিটি নিয়ে এসেছিলেন। তবে ধবল রাজপরিবার কর্তৃক রঙ্কিণী মূর্তিটি বর্তমানে কোন মন্দিরে অধিষ্ঠিত রয়েছে সে সম্পর্কে সঠিক কোনরূপ তথ্য নেই। স্থানীয় অধিবাসীদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেন যে ঘাটশিলা থানার পার্শ্বে অবস্থিত মন্দিরে রঙ্কিণী দেবীর এই মূর্তিটিই সম্ভবত ধবল রাজারা পুরুলিয়া থেকে নিয়ে এসেছিলেন। মূর্তিটি সম্ভবত প্রথমে গালুডির মহুলিয়াতে অবস্থিত রঙ্কিণী মন্দিরের রাখা হয়েছিল ও পরে তা ঘাটশিলার মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়। প্রচলিত লোককথা অনুসারে গালুডির মহুলিয়ায় রঙ্কিণী দেবীর বর্তমান মন্দিরটি প্রায় তিনশো বছরের অধিক সময় ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় ছিল। পরবর্তীকালে ঝাড়গ্রামের শিলদা নিবাসী বিনয় দাস এই মন্দিরের সংস্কার ও পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

মহুলিয়ার রঙ্কিণী মন্দিরের বিষয়ে প্রচলিত লোককথা অনুযায়ী-

> "প্রাচীনকালে পুরুলিয়ার পাড়া গ্রামে দেবী রঙ্কিণীর আবির্ভাব হয়েছিল। তখন পাড়া গ্রামের সন্নিকটে অবস্থিত একটি পাহাড়ে জঙ্গলের মধ্যে দেবী রঙ্কিণী বনদুর্গা রূপে বিরাজমান ছিলেন। প্রথম থেকেই রঙ্কিণী দেবী নরমাংসভোজী ছিলেন। দেবীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য গ্রাম থেকে নিয়মিত প্রচুর খাবার ও একজন মানুষ পাঠানো হত। একদিন গ্রামের এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ দম্পতির গোয়ালা বা বাগালকে রঙ্কিণী দেবীর নিকট প্রেরণের পালা আসে। ব্রাহ্মণ তাঁর পুত্রসম বাগালকে হারানোর চিন্তায় শোকে জর্জরিত হয়ে পড়েছিলেন। এমতাবস্থায় বাগাল রঙ্কিণী দেবীর রক্তপিপাসু স্বভাবকে চিরতরে উৎপাটিত করার উদ্দেশ্যে এক বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। সেইমতো বাগাল কিছু পরিমাণ লোহার ছোলা প্রস্তুত করে দেবীর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। এরপর বাগাল দেবীকে প্রস্তাব দেয় যে দেবী ও তাঁর মধ্যে ছোলা খাওয়ার একটি প্রতিযোগিতা হবে। প্রতিযোগিতায় যে পরাজিত হবে তাঁকে বলি দেওয়া হবে। বাগালের প্রস্তাবে দেবী রঙ্কিণী তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে যান। তবে বাগালের দেওয়া লোহার ছোলা দেবী কোনভাবেই দাঁতে কাটতে সমর্থ হননি। অন্যদিকে বাগাল সুকৌশলে আসল ছোলা খেয়ে প্রতিযোগিতায় সহজেই জয়লাভ করেছিল। এরপর বাগাল একটি বটি নিয়ে দেবী রঙ্কিণীকে বলি দিতে উদ্যত হলে দেবী পালাতে আরম্ভ করেন। বাগালের তাড়ায় দেবী প্রথমে ধলভূমগড় ও তারপর যাদুগোড়ার কাপড়গাদী ঘাটে আশ্রয় নেন। কাপড়গাদী ঘাটে টুইলা পাহাড়ের নীচে একটি ঝর্ণা ছিল যা আজও বিদ্যমান। দেবী যখন টুইলা পাহাড়ে উপনীত হন তখন সেখানে এক ধোপা জামাকাপড় কাঁচার কাজে মগ্ন ছিলেন। বাগালেয় ভয়ে দেবী জড়ো করে রাখা কাপড়ের স্তূপের পেছনে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ধোপার কাপড়ের স্তূপের আড়ালে থাকায় দেবী শেষপর্যন্ত বাগালের হাত থেকে নিস্তার পান। ধোপার প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত দেবী তাঁকে ধলভূমগড়ের রাজত্ব প্রদান করেন। অন্যদিকে ধোপার কাপড়ের স্তূপ দেবীর আশীর্বাদে পাষাণগাদীতে পরিণত হয়ে যায়।"[৬]

পরবর্তীকালে যাদুগোড়ার এই স্থানটি কাপড়গাদী ঘাট নামে পরিচিতি অর্জন করে। কথিত আছে যে ধলভূমগড় রাজবংশের প্রথম শাসক রাজচন্দ্র ধবলদেব পূর্বজীবনে একজন ধোপা ছিলেন। দেবীর আশীর্বাদে পরবর্তীকালে তিনি ধলভূমগড় রাজ্যের শাসক রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যাদুগোড়ার কাপড়গাদী ঘাট থেকে দেবী ধোপার সাথে গালুডির ঠাকুরান ডুংরীতে উপস্থিত হন ও সেখানে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করেন। এরপর দেবী মহুলিয়ায় উপস্থিত হন। ধবল রাজাদের উদ্যোগে মহুলিয়ায় রঙ্কিণী দেবীর উদ্দেশ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে মহুলিয়ার মন্দিরটি ঘাটশিলায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। সুতরাং যাদুগোড়া, মহুলিয়া, বড়বিল ও ঘাটশিলা এই চারটি জায়গায় অবস্থিত রঙ্কিণী মন্দিরগুলির মধ্যে এক আন্তঃসংযোগ রয়েছে। যদিও জনপ্রিয়তার নিরিখে যাদুগোড়ার কাপড়গাদী ঘাটের রঙ্কিণী মন্দির সবচেয়ে জনপ্রিয়।

যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর কাহিনীতে পুরুলিয়ার পাঞ্চেত অথবা পাড়া থেকে এক ব্রাহ্মণের অনুপ্রেরণায় দেবীমূর্তি চুরি করে নিয়ে আসার কথা উল্লেখিত হয়েছে। ধলভূমগড়ের ধবল রাজবংশ যারা একদা রঙ্কিণী মূর্তি চুরি করেছিলেন, তাঁরা বংশকৌলীন্যের নিরিখে আদৌ ক্ষত্রিয় বর্ণভূক্ত ছিলেন না। বরং এই রাজবংশের উৎস নিহিত রয়েছে ভূমিজ আদিবাসীদের মধ্যে। ডাল্টনের অনুমান রঙ্কিণী দেবীর কাহিনীতে যে ধোপার উল্লেখ রয়েছে যিনি পরবর্তীকালে ধবল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তিনি আদতে মানভূম তথা পুরুলিয়ার ভূমিজ জনগোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত।[৭] দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা সহ সমগ্র ছোটনাগপুরে ভূমিজদের বৃহৎ অংশের ওপর হিন্দু ধর্মের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। রিসলের গ্রন্থেও ভূমিজদের মধ্যে হিন্দু ধর্মের গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে বক্তব্য রয়েছে। এমনকি হিন্দু ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষত্রিয় রাজবংশ হিসেবে ভূমিজ রাজাদের শাসনকার্য পরিচালনার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। পুরুলিয়ার বেগুনকোদরের রাজাদের বংশাবলীতে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে যে ভূমিজ জাতিভূক্ত সামন্ততান্ত্রিক গোষ্ঠী থেকে তাঁরা নিজেদের ক্ষত্রিয়ত্বে উন্নীত করেছিলেন।[৮] বেগুনকোদরের রাজবংশ বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিশেষভাবে আস্থাশীল ছিল। রঙ্কিণী আদতে উচ্চকোটির কোনও হিন্দু দেবী নন বরং আদিতে তিনি ছিলেন আদিবাসী এক দেবীসত্তা। ভূমিজ জাতিভূক্ত ধবল রাজারা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও নিজেদের প্রাচীন উপাস্য দেবীকে কখনই পরিত্যাগ করেননি। তাই দেবী রঙ্কিণী ধবল রাজবংশের কূলদেবীর মর্যাদা অর্জন করেছিলেন। সুতরাং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ' শীর্ষক গল্পে রঙ্কিণীকে যে বুনো অসভ্য জাতির দেবী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে তাতে বিন্দুমাত্র ভুল নেই। কারণ রঙ্কিণী আদ্যপান্ত এক আদিবাসী দেবী। ব্রাহ্মণ্যবাদী বর্ণবাদের মেকি অহংবোধের দরুন রঙ্কিণী দেবীর উপাসকগোষ্ঠীকে বুনো ও অসভ্য হিসেবে বিশেষায়িত করা হয়েছে। সর্বোপরি রঙ্কিণীর ন্যায় এক আদিবাসী দেবী সত্তাকে হিন্দু ধর্মে জায়গা করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর মূর্তিরূপের অবতারণা করা হয়েছে। আসলে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু ধর্মে দেব-দেবীর মূর্তি ব্যতীত নিরাকার তথা অপরিশীলিত রূপের তেমন গ্রহণযোগ্যতা নেই। তাছাড়া কাহিনীতে বর্ণিত হয়েছে যে রঙ্কিণী দেবীর মূর্তি পাঞ্চেত থেকে এক ব্রাহ্মণের প্ররোচনায় ধবল রাজারা চুরি করেছিলেন। কাহিনীতে এক ব্রাহ্মণের প্রসঙ্গ উপস্থাপনের মাধ্যমে কার্যত শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়ায় আদিবাসী দেবী রঙ্কিণীকে হিন্দু ধর্মের পরিমণ্ডলে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার প্রবণতা প্রতিফলিত হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আদিবাসী দেব-দেবীর প্রকৃতি পরিবর্তনের মাধ্যমে তাঁকে ব্রাহ্মণ্যবাদী দেবসত্তা হিসেবে উপস্থাপনের অসংখ্য নজীর রয়েছে। অসমের খাসি জনগোষ্ঠীর দেবী এভাবেই জনপ্রিয় হিন্দু দেবী কামাখ্যায় রূপান্তরিত হয়েছেন। রঙ্কিণীর কাহিনিতে দেবীর আদিবাসী সত্তা মুছে ফেলার জন্যই একজন ব্রাহ্মণের উপস্থিতি আবশ্যক ছিল। এই একই কারণেই আবার রঙ্কিণী দেবীর মূর্তিরূপের কল্পনা করা হয়েছিল। গালুডির মহুলিয়াতে অবস্থিত মন্দিরে প্রথমে দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ও পরে তা ঘাটশিলার থানার পার্শ্বে অবস্থিত মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। জঙ্গলমহল সহ ছোটনাগপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব মতাদর্শের বিশেষ প্রভাব রয়েছে। এই অঞ্চলের বৈষ্ণব ভাবধারার সাথে সম্পৃক্ত কাহিনীতেও রঙ্কিণী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। চৈতন্যত্তোর সময়কালে প্রভু শ্যামানন্দের নেতৃত্বে মেদিনীপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে বৈষ্ণব ভাবাদর্শ সম্প্রসারণের মহান কার্যকলাপ সম্পন্ন হয়েছিল। কলাইকুণ্ডার নিকটস্থ ধারেন্দা গ্রামে শ্যামানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মেদিনীপুরের অন্তর্গত গোপীবল্লভপুরের রোহিণী রাজবংশের শাসক রসিকানন্দ ছিলেন প্রভু শ্যামানন্দের অন্যতম এক শিষ্য। শ্যামানন্দের অনুপ্রেরণায় রসিকানন্দ স্বীয় রাজ্যে বৈষ্ণব ভাবধারার প্রচারকার্যে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শ্যামানন্দের একটি জীবনীমূলক গ্রন্থে রঙ্কিণী দেবীর উল্লেখ আছে। সংশ্লিষ্ট গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে-

> "একদা শ্যামানন্দ তাঁর শিষ্য রসিকানন্দের সাথে ধলভূমগড় রাজ্যে গমন করেছিলেন। সেখানকার রাজা রাজপ্রাসাদে তাঁদের থাকার সুবন্দোবস্ত করে দেন। একদিন গভীর রাত্রে নরমাংস ভক্ষণের উদ্দেশ্যে দেবী রঙ্কিণী রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন। যদিও তৎক্ষণাৎ রঙ্কিণী দেবী শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দকে চিনতে পারেন। দেবী তখন তাঁদের পাদপদ্মে ভূমিষ্ঠ হয়ে বারবার প্রণাম করতে শুরু করেন। এরপর দেবী রঙ্কিণী রাজা নবীন কিশোর ধলের সামনে আবির্ভূত হয়ে শ্যামানন্দ প্রভুর চরণে আশ্রয়গ্রহণের নির্দেশ দেন। তাঁর নির্দেশ পালিত না হলে তিনি রাজার পুরো পরিবারকে হত্যা করার হুঁশিয়ারি প্রদান করেছিলেন।"[৯]

যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে শ্যামানন্দ রাজা নবীন কিশোরকে দীক্ষাদানে রাজী হননি। এমতাবস্থায় রঙ্কিণী দেবী স্বয়ং শ্যামানন্দের নিকটে উপস্থিত হয়ে দীক্ষাদানের জন্য কাতর অনুরোধ করেন ও শেষপর্যন্ত ধবল রাজ বৈষ্ণব আদর্শে দীক্ষিত হন। এরপর রঙ্কিণী দেবী আজীবনের জন্য ধলভূমগড় পরিত্যাগ করে শ্যমান্দের সাথে গোপীবল্লবপুরে এসে হাজির হন ও সেখানে দেবীর উদ্দেশ্যে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দেওয়া হয়। এই কাহিনীটি নিতান্তই কাল্পনিক। আসলে রঙ্কিণী দেবীর মাহাত্ম্য দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় এতখানি জনপ্রিয় ছিল যে তা উপেক্ষা করা সম্ভবপর নয়। বৈষ্ণব সাধকের পদতলে রঙ্কিণী দেবীর

আশ্রয় গ্রহণের এরূপ কাহিনীর মাধ্যমে কার্যত বৈষ্ণব মতাদর্শের উৎকর্ষ প্রতীয়মান হয়। রঙ্কিণীর ন্যায় এক শক্তিশালী উগ্র দেবীকে বৈষ্ণব ধর্ম যে কত সহজেই বশীভূত করতে সক্ষম হয়েছে তা এই কাহিনীর অন্যতম উপজীব্য বিষয়। এভাবে সাধক শ্যামানন্দের জীবন বৃত্তান্তে রঙ্কিণী দেবীর চিত্রায়নে বৈষ্ণব ভাবধারার চূড়ান্ত অহমিকার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। রঙ্কিণী একজন দেবী হয়েও বৈষ্ণব সাধকের প্রতি শেষপর্যন্ত আত্মসমর্পণে কতখানি উদগ্রীব ছিলেন তার মাধ্যমে আদিবাসী ধর্মজীবনের বিরুদ্ধে বৈষ্ণব ভাবধারার বিজয় ঘোষিত হয়েছে। তবে শত প্রচেষ্টার পরও রঙ্কিণী দেবীর ক্ষেত্রে তাঁর আদিবাসী পরিচয় কিন্তু চিরতরে বিলীন হয়ে যায়নি বরং এই দেবীর প্রাচীন পরিচয় তথা উৎস আজও প্রকট রূপে প্রতীয়মান।

যাদুগোড়ায় অবস্থিত রঙ্কিণী দেবীর মন্দিরটি আজও দেবীর প্রাচীন সত্তার এক অনন্য পরিচয় বহন করে চলেছে। মহুলিয়া ও বড়বিল এবং ঘাটশিলার মন্দিরের রঙ্কিণী দেবী হিন্দু ধর্মের প্রভাবে স্বীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ হারিয়ে ফেললেও যাদুগোড়ায় তা হয়নি। ১৯৬৪ সাল নাগাদ যাদুগোড়ায় টুইলা পাহাড়ের সন্নিকটে দ্রাবিড় শৈলীর আদলে নির্মিত মন্দিরে রঙ্কিণী দেবীর কোনরূপ মূর্তি নেই। এক বিশালাকার অপরিশীলিত প্রস্তরখণ্ড রূপে রঙ্কিণী দেবী যাদুগোড়ার মন্দিরে বিরাজমান। সর্বোপরি এই মন্দিরে কোনরূপ হিন্দু ব্রাহ্মণ পূজারী নেই। একমাত্র ভূমিজ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কেউ পৌরহিত্যের অধিকার পান। বর্তমানে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী মন্দিরের প্রধান পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করছেন অনিল সিং এবং তিনি জাতিতে একজন ভূমিজ। মন্দিরের সহকারী পূজারী পদে রয়েছেন ভূমিজ গোষ্ঠীভূক্ত সন্তোষ সিং। ভূমিজদের কাছে রঙ্কিণী দেবী অত্যন্ত জাগ্রত হিসেবে মর্যাদা অর্জন করেছেন। তবে রঙ্কিণী শুধুমাত্র ভূমিজদের দেবী নন, বরং ছোটনাগপুরের সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় এক সত্তা। ছোটনাগপুর অঞ্চলের বৃহত্তম আদিবাসী সম্প্রদায় সাঁওতালদের মধ্যেও রঙ্কিণী দেবীর যথেষ্ট সমাদর রয়েছে। বিজয়া দশমীর পরেরদিন ঝাড়গ্রাম জেলার শিলদার ওড়গোন্দাতে ভৈরব থানে সাঁওতালদের পাটাবিন্ধা মেলা বা পরব উদযাপিত হয়। ওড়গোন্দার ভৈরব দেবতা সাঁওতালদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়। তাঁরা আজও বিশ্বাস করেন যে পাটাবিন্ধা পরবের শেষদিনে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবী পাতালপথের মাধ্যমে শিলদায় ভৈরব দেবতার সাথে মিলিত হতে আসেন। এসময় নাকি প্রচণ্ড শব্দে সমগ্র এলাকা কেঁপে ওঠে। তখন ভৈরবকে শান্ত করার জন্য শাঁখ বাজানো হয় ও জল ঢালা হয়। বিনয় ঘোষ শিলদার ভৈরব থানের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন-

> "ভৈরব যেখানে আছেন, সেখানে ভৈরবীও থাকবেন। শিলদার প্রতাপশালী ভৈরবের ভৈরবী কোথায়? শিলদায় নয়। ভৈরব থাকেন শিলদায়, আর ভৈরবী থাকেন ধলভূমগড়ে। ভৈরবীর নাম রঙ্কিণী।"[১০]

তবে ধলভূমগড় বা ঘাটশিলায় সর্বমোট চারটি রঙ্কিণী দেবীর মন্দির রয়েছে। যদিও সাঁওতালরা বিশ্বাস করেন যে একমাত্র যাদুগোড়ার রঙ্কিণী মন্দিরের সাথেই শিলদার ভৈরব থানের পাতালপথে যোগাযোগ রয়েছে ও প্রতিবছর এই পথ ধরেই রঙ্কিণী দেবী ভৈরবের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক ভৈরব থান রয়েছে। এগুলির অধিকাংশই হল আদতে আদিবাসী দেবতা মারং বুরুর উপাসনাস্থল। মারং বুরু হলেন পাহাড়ের দেবতা। যদিও বর্তমানে মারাং বুরু ভৈরব আর শিবের সাথে কার্যত একাত্ম হয়ে গেছেন। শিলদার ভৈরব থানটিও হল আসলে মারাং বুরুর পূজাস্থল। সুতরাং মারাং বুরুর সাথে রঙ্কিণী দেবীর এহেন সংযোগ তাঁর প্রাচীন উপজাতীয় সত্তার অন্যতম এক পরিচায়ক। প্রাচীন ধলভূমগড়ে কেন এতখানি সন্নিকটে পরপর চারটি রঙ্কিণী মন্দির গড়ে উঠেছিল তা বলা সম্ভবপর নয়। তবে এগুলির মধ্যে একমাত্র যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর মধ্যেই উপজাতীয় সত্তা অটুট রয়েছে। বাকি তিনটি মন্দিরে রঙ্কিণী দেবী বর্তমানে হিন্দু ব্রাহ্মণদের প্রভাবাধীন। শিলদার নিকটে অবস্থিত চিল্কিগড়ের জামবনীতে রঙ্কিণী দেবীর একটি মন্দির রয়েছে। যদিও চিল্কিগড়ের বিখ্যাত কনকদুর্গার আড়ালে তাঁর মাহাত্ম্য আজ চাপা পড়ে গেছে।

হিন্দু দেবীসত্তায় পরিবর্তিত হলেও রঙ্কিণীর আদিবাসী তথা উপজাতীয় অতীত হারিয়ে যায়নি। ঘাটশিলার রঙ্কিণী মন্দিরে আজও উৎসবের সময় কাঁড়া বা মহিষ বলি দেওয়া হয়। ঘাটশিলার এই মন্দিরটি ধবল রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল। ধবলদের উৎস যেহেতু নিহিত রয়েছে ভূমিজ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে ও রঙ্কিণী তাঁদের কূলদেবী সেহেতু ঘাটশিলার মন্দিরে বলি প্রথা প্রচলিত রয়েছে। যদিও এই মন্দিরের বর্তমান পূজারী একজন বাঙালী ব্রাহ্মণ। অন্যদিকে মহুলিয়া ও বড়বিলের মন্দিরে এখন আর বলি হয় না। তবে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবী বাকি সমস্ত রঙ্কিণী মন্দিরের থেকে একেবারেই আলাদা। দক্ষিণ পশ্চিম বাংলা ও ছোটনাগপুর মালভূমির আদিবাসীদের মধ্যে একমাত্র যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীরই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। কালীপূজার সময় সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আদিবাসীরা শুধুমাত্র যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর দর্শনেই যান। যদিও বছরের অন্যান্য সময় নিয়মিতভাবে তাঁরা যাদুগোড়ার রঙ্কিণী মন্দির দর্শনে আসেন। সমস্ত আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কাছেই যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর থান তথা মন্দির পবিত্র রূপে বিবেচিত হয়। তাঁরা দেবীর কাছে মানত করেন

ও মন্দির চত্বরে দেবীর উদ্দেশ্যে পাঁঠা, পায়রা ও মোরগ বলি দেন। প্রায় প্রতিদিনই রঙ্কিণী দেবীর এই মন্দিরে বলি অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু সমাজের তরফে মহুলিয়া ও ঘাটশিলায় অবস্থিত রঙ্কিণী দেবীর মন্দিরদ্বয়কে ধলভূমগড়ে রঙ্কিণী দেবীর আদি পীঠস্থান হিসেবে প্রচার করা হলেও জনপ্রিয়তার নিরিখে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর মন্দিরের সমকক্ষ কোনটিই হয়ে উঠতে পারেনি। আসলে যাদুগোড়ার দেবী রঙ্কিণী আদিবাসী ভূমিজ জনগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে থাকার বিষয়টি হিন্দু সমাজের তেমন মনঃপূত হয়নি। সেকারণেই সম্ভবত যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর বিকল্প হিসেবে মহুলিয়া, বড়বিল ও ঘাটশিলায় রঙ্কিণী দেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই তিন মন্দিরে দেবী রঙ্কিণী কালীর এক অন্যতম রূপ হিসেবে পূজিত হন। সর্বোপরি যাদুগোড়ার দেবী রঙ্কিণীই সম্ভবত সবচেয়ে প্রাচীন। কারণ রঙ্কিণী দেবী সম্বন্ধে প্রচলিত সমস্ত কাহিনীতে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এমনকি যাদুগোড়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবস্থিত বাকি তিনটি রঙ্কিণী মন্দিরের কাহিনীর সাথেও যাদুগোড়ার রঙ্কিণী সম্পৃক্ত রয়েছেন। রঙ্কিণীদেবীকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ধর্মবিশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করা হলেও যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর মাহাত্ম্য এড়িয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়নি। আসলে যাদুগোড়ার রঙ্কিণী দেবীর মাহাত্ম্য স্বীকৃত না হলে অন্যান্য স্থানের রঙ্কিণী দেবীকে বৈধতা প্রদান করা সম্ভবপর হত না। এমনকি যাদুগোড়ায় রঙ্কিণী দেবীর থানে হিন্দু শৈলীতে মন্দির নির্মিত হলেও দেবীর আদিবাসী অতীতকে বিনষ্ট করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ব্রাহ্মণ্যবাদ দেবী রঙ্কিণীকে গ্রাস করার প্রচেষ্টা যে সর্বতোভাবে করেছিল তার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। শ্যামানন্দের কাহিনীতে দেবীকে বৈষ্ণব সাধকের কাছে করুণা ভিক্ষা করতে দেখা গেছে। সুকৌশলে দেবী রঙ্কিণীর নামে নেতিবাচক ধারণা প্রচার করা হয়েছে। রঙ্কিণী দেবীকে রক্তখেকো দেবী হিসেবে চিত্রায়নের নিন্দনীয় প্রচেষ্টাও হয়েছে। ভারতবর্ষে যদিও নরবলির ধারণা বহু প্রাচীন। তবে পূর্ব ভারতের ওড়িশার খোন্দ আদিবাসী ব্যতীত অপর কোনও জনগোষ্ঠীর মধ্যে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল না। সুতরাং রঙ্কিণী দেবীর সাথে নরবলি প্রথার সম্পৃক্তকরণ যে এক ব্রাহ্মণ্যবাদী অপপ্রচার তা আর বুঝতে অসুবিধা হয় না। তাই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ' শীর্ষক গল্পের সমাপ্তিতে উল্লেখিত হয়েছে-

> "তিনি অমঙ্গলের পূর্বাভাস দিয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেন মাত্র। মূর্খ জনসাধারণ তাঁহাকেই অমঙ্গলের কারণ ভাবিয়া ভুল বোঝে।"[১১]

আসলে প্রবল প্রতাপশালী ব্রাহ্মণ্যবাদ সর্বশক্তি প্রয়োগ করেও রঙ্কিণী দেবীর উৎপত্তির ইতিহাস মুছে ফেলতে সক্ষম হয়নি। এমনকি ধলভূমগড়ের ধবল রাজবংশ তাঁদের পূর্বেকার আদিবাসী পরিচয় পরিত্যাগ করে হিন্দু ক্ষত্রিয়ের পর্যায়ভুক্ত হলেও রঙ্কিণী দেবীকে তাঁরা কখনই পরিত্যাগ করেননি। তাই রঙ্কিণী ধবল রাজাদের কূলদেবী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। যদিও দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে আদিবাসী দেবীসত্তা থেকে বিবর্তিত হয়ে বর্তমানে হিন্দু দেবী কালীর অন্যতম রূপ হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত রঙ্কিণী দেবী একমাত্র যাদুগোড়া ব্যতীত সর্বক্ষেত্রে আজ পুরোদস্তুর এক হিন্দু দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন।

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, *রঙ্কিণী দেবীর খড়্গ*, গজেন্দ্রকুমার মিত্র (সম্পা.), বিভূতি রচনাবলী, নবম খণ্ড, চতুর্থ মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৌষ ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ, পৃ. ২২৪।

২। তদেব, পৃ. ২২৪।

৩। ডাল্টন, এডওয়ার্ড টুইট, *ডেসক্রিপটিভ এথনোলজি অফ বেঙ্গল*, প্রথম মুদ্রণ, অফিস অফ দ্য সুপারিন্টেনডেন্ট অফ গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং, কলকাতা, ১৮৭২, পৃ. ১৭৪।

৪। দে, সুনীল কুমার, *কাপড়গাদী ঘাটের মা রঙ্কিণী*, প্রথম মুদ্রণ, ঝাড়খণ্ড সাহিত্য সংস্কৃতি পরিষদ, পূর্ব সিংভূম, ২০২২, পৃ. ৩৮।

৫। ডাল্টন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

৬। দে, সুনীল কুমার, প্রাগুক্ত, ১০২-১০৩।

৭। ডাল্টন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬।

৮। মাহাতো ,পশুপতি প্রসাদ, *জঙ্গলমহল ও ঝাড়খণ্ডী লোকদর্শন*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পূর্বালোক পাবলিকেশন, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ৫১-৫২।

৯। নন্দ ও দেব শ্রী কৃষ্ণগোপাল গোস্বামী প্রভূপাদ, *প্রভূ শ্রী শ্রী শ্যামানন্দ*, প্রথম মুদ্রণ, প্রভূ শ্যামানন্দ প্রেম সংস্থান, বৃন্দাবন, ২০০৪, পৃ. ৪১-৪৪।

১০। ঘোষ, বিনয়, *পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি*, প্রথম মুদ্রণ, পুস্তক প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৫০, পৃ. ৩৬১।

১১। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1046-1051
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.103

ভারতীয় সাহিত্যে নদীমাতৃক পুরাণ ও আধুনিক বয়ান

ড. সমরেশ মন্ডল, *স্বাধীন গবেষক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstract

I have primarily focused on river-centric Bengali novels in this article. While the subject falls under Indian literature, I have incorporated the context of Bangladeshi novels not merely to reinforce my argument but to illustrate how people's perspectives evolve over time. My discussion spans work such as Manik Bandopadhyay's Padma Nadir Majhi, Debesh Roy's Tistaparer Brittant, Samaresh Basu's Ganga, Humayun Kabir's Nadi o Nari, and Advaita Mallavarman's Titas Ekti Nadir Naam. Through these novels, I have explored how river-centric narratives emerge from folk beliefs and myths, gradually transitioning toward new interpretations and evolving ideologies. This article aims to analyse that transformation, emphasising the dynamic interplay between tradition and changing perspectives.

***Keywords**: Myth–Puran, Believe, Tradition, Narrative technique, Folk-culture.*

প্রাচীনকালে রচিত সাহিত্য থেকে শুরু করে এ সময়কালের সাহিত্যেও নদী অপরিহার্য বিষয়। গীত, কবিতা, উপন্যাসসহ সাহিত্যের সব শাখাতেই নদী যুক্ত হয়েছে কখনো প্রধান ভূমিকায়, কখনো বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে । এটি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিদেশি সাহিত্যেও নদী গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ । মানুষের জীবনযাপন, সভ্যতার বিকাশ ও ঐশ্বর্যনির্মাণ, ইতিহাস, আন্দোলন-সংগ্রাম-সবকিছুতেই নদী দৃঢ়তর ভূমিকা পালন করে । মানুষের জীবনে নদী কখনো বন্ধু, কখনো ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ ও ধ্বংসকারী । নদীকে এড়িয়ে মানুষের জীবন গড়া ও সভ্যতার ঐশ্বর্য নির্মাণ অকল্পনীয়। নদীভিত্তিক আঞ্চলিক বিভিন্ন উপন্যাসে এ সত্য নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । নদী ও মানুষ একে-অপরের সম্পূরক। উপন্যাসে এ সত্যতা ধরা পড়েছে বিভিন্ন রূপে । কোনো বাঙালি উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু নদীকে স্পর্শ করেননি এমন দৃষ্টান্ত বিরল । যদিও সাহিত্যের প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে নদী একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে আছে। সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখাতে তার গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি বা ভূমিকা স্পষ্ট ।

নদীবিহীন জীবন যেমন বাঙালির কাছে অকল্পনীয়, সাহিত্যেও নদীর ভূমিকা যেন একই সত্য ধারণ করে । ‘চর্যাপদ’, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য’, ‘মহাভারত’, ‘মনসামঙ্গল কাব্য’, ‘চণ্ডীমণ্ডল কাব্য’, ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’, ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’, ‘ব্রজাঙ্গনা’, ‘চতুর্দশপদী’ কবিতা প্রভৃতি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সব সাহিত্যে নদী এসেছে নানাভাবে, বিচিত্র রূপে । পরবর্তীতে উপন্যাসের যাত্রা শুরু হলে সেখানে নদী এসেছে অপরিহার্যতার অংশ হিসেবে। কখনো নদীকে ঘিরেই উপন্যাস নির্মিত হয়েছে । আবার নদীকে ঘিরে পুরো উপন্যাস নির্মিত না হলেও উপন্যাস বা উপন্যাসের জীবনের প্রয়োজনে নদী এক প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছে । হিন্দু ধর্মে নদী থেকে শুরু করে পর্বত, গাছ, পশু, বিদ্যুৎ, বাতাসকে সম্মান জানানো হয় । এর অর্থ হিন্দুধর্মে প্রকৃতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় । তালিকায় আসে নদীও। নদীর প্রকৃতিক গুরুত্ব অপরিহার্য । ভারতীয় সংস্কৃতিতে, নদীকে দেবী হিসেবে পূজা করা হয় । যেমন, আমরা

গঙ্গা থেকে সরস্বতী প্রত্যেক নদীকেই দেবীরূপে পূজা করি । তাই গবেষণা পত্র আলোচনায় পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৫৬), গঙ্গা (১৯৫৭) এবং তিস্তাপারের বৃত্তান্ত (১৯৮৮) এই চারটি উপন্যাস রয়েছে। এই উপন্যাসগুলি নদীকেন্দ্রিক বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের । প্রথম তিনটি উপন্যাস মোটামুটিভাবেই সময়ের পরিসর একই থাকায় ফলে এবং তিস্তাপারের বৃত্তান্ত উপন্যাস সময়ের তারতম্য একটু বেশি থাকার ফলে উপন্যাসগুলিকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করতে সুবিধা হয়েছে , সেজন্য এই উপন্যাসগুলিকে নির্বাচিত করেছি।

মানব সভ্যতার আদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটি নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তাই সিন্ধুনদের অববাহিকায় সিন্ধুসভ্যতা, নীলনদের অববাহিকায় প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর আববাহিকায় গড়ে উঠেছে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। মানুষ সেখানে ঘর বেঁধেছে, চাষ করেছে, করেছে সংসার জীবন। বিভিন্ন নদ নদী ঘেরা বাংলার সামাজ সংস্কৃতিতে তাই নদীকেন্দ্রিকতার গুরুত্ব অনেক বেশি। বাঙালির কাব্যে, গানে, গল্পগাথায় সাহিত্য জীবনের ওঠা নামার নিত্য পরিবর্তনের মধ্যে নদীর জীবনকথা নানাভাবে জড়িয়ে রয়েছে। 'নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস' এই কথাটির মধ্যেই স্পষ্ট যে এই শ্রেণির উপন্যাসের মূল কেন্দ্রচারিণী শক্তি হল নদী। তাই মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, দারিদ্র্য-সংগ্রাম, যন্ত্রণা সবই এখানে নদীকে ঘিরে আবর্তিত। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে প্রধানত দাঁড়িয়ে আছে বৃত্তিজীবী শ্রেণির জীবনচিত্র একটা বিশেষ অঞ্চলের ভূগোল, বিশ্বাস, আচার-আচরণ মেখে এই শ্রেণির উপন্যাস গড়ে উঠলেও নিছক আঞ্চলিক বর্ণলেপ দিয়ে বিচার করা সঙ্গত নয়। নদীকেন্দ্রিক যে সমস্ত ধীবর সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য-সংগ্রাম যন্ত্রণা শোষণ নির্যাতনের ছবি এসব উপন্যাসে আছে তা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নদীকেন্দ্রিক যে সমস্ত বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল নদীকে তারা অতীতে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই নদীকেন্দ্রিক এই বিশ্বাস বিবর্তিত হয় তার প্রধান কারণ হল সমাজ ও অর্থনীতির পালাবদল। মানুষের জীবন ও জীবিকার সহায়ক ভূমিকা হিসেবে নদী একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। ফলত নদী সম্পর্কিত পুরানো ধ্যানধারণা লক্ষ করা যায়। এই বিবর্তন একরৈখিক নয়, বিভিন্ন নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন মিথের বহুরৈখিক রূপান্তর লক্ষ করা যায়। তা আসলে ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের স্থানিক পটভূমির উপর বিন্যস্ত। নদীকেন্দ্রিক যে সমস্ত মানুষের জীবনযাত্রা তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম রসদই হল নদী। উপার্জনের মাধ্যমে তারা বেঁচে থাকতো । সেইজন্য নদীকে তারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো। তখনই তারা সমষ্টিগত জীবনযাপন করতো। নদী তাদের একমাত্র রক্ষাকর্তা এই বিশ্বাসের ভাঙন ধরে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। তাদের বিশ্বাসটাই মিথে পরিণত হয়েছে। নদী যেমন এককুল ভাঙে আর এককুল গড়ে ঠিক তেমনিভাবে মিথের ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। মিথ অতীত থেকেই চলে আসছে, ইতিহাসের মতো মিথও কখনো নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না।

অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাংলা সাহিত্যে একটি অন্যতম উপন্যাস। উপন্যাসটি চারটি খন্ডে বিভক্ত যেখানে নদীর বর্ননা, বৈচিত্র্য ও মানবজীবনের সম্পৃক্ততা অতি সহজেই চোখে পড়ে। উপন্যাসের শুরুতে লেখক জানান –

"এ নদীর কুলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ আর প্রাণভরা উচ্ছাস।"[১]

তিতাসের তীরে ধীবর সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখ, সাফল্য ব্যর্থতা ভরা জীবনের ইতিহাস রচিত হয়েছে। এই ইতিহাস তাদের যুগ যুগান্তর গাঁথা রয়েছে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে। তিতাসকে নিয়ে তাদের বিশ্বাস, লোককথা, সংস্কৃতি সবই গড়ে উঠেছে। যখনই তাদের মধ্যে তিতাসকে নিয়ে বিশ্বাস জন্মায় তখনই তারা সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করে। তিতাসের জল শুকিয়ে যায় এই কথা তারা কখনো বিশ্বাস করতে পারেনি। এই বিশ্বাস তাদের জীবনে মিথ প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ ও অর্থনীতি পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিশ্বাসের জগতে ভাঙন শুরু হয়। যখনই তাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মায় তখনই তারা সবকিছু করতো যেমন গুরুজনদের মানতো, পূজাপার্বণ উৎসব আনন্দ করতো । এখন তাদের মধ্যে ভাটার টান ধরেছে। মালোরা এখন উল্টোটাই করে যেমন ঘাটে নৌকা ভিড়বার সময় কে আগে ভিড়বে এই নিয়ে মারামারি করে অথচ অতীতে দেখা গেছে সমষ্টিগত জীবনযাপন করতো এখন তারা ব্যক্তি জীবনে চলে আসছে। আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে তারা বুঝতে পারছে এবং সময়ও তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে তিতাসের জলও শুকিয়ে গিয়ে মাঝ বরাবর সরু জলরেখা প্রবাহিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে স্থান ও সময়ের প্রেক্ষাপটে অনুযায়ী। অর্থাৎ সময় কখনো নির্দিষ্ট জায়গায় না থেমে ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। লক্ষণীয় জেলেদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে এই

উপন্যাসের এক একটি আখ্যান। প্রত্যেকে কথা বলার মধ্যে দিয়ে গল্পের কাঠামো তৈরি হয়েছে যেমন আরব্যরজনী, ডেকামেরনে আমরা এটা দেখতে পাই। পুরানো বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসে তারা নতুন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে যেখানে গেলে বেঁচে থাকার অধিকার পায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চলে জেলেদের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, সাফল্য ব্যর্থতা ভরা জীবনের ইতিহাস রচনা করেছেন। এই ইতিহাস যুগ যুগান্তর গাঁথা রয়েছে তাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে। উপন্যাসে মানিক নদীর গুরুত্ব, প্রাধান্য, প্রভাব নিছকই প্রকৃতিগতভাবে দেখেননি, দেখেছেন বাস্তব হিসেবে। উপন্যাসে কুবের, কপিলা, ধনঞ্জয়, হোসেন মিয়া, মালা ইত্যাদি এদের জীবন পদ্মাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। উপন্যাসে গোষ্ঠীজীবন ও ব্যক্তিজীবন বর্ণিত হলেও সমস্ত চরিত্রই নদীলিপ্ত। ধীবরদের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, জন্মমৃত্যু সম্পর্কের টানাপোড়েন এই বিচিত্র বিন্যাসের মধ্যেও এক ধরনের প্রতীতি জন্মেছিল যে পদ্মাই তাদের প্রাণকেন্দ্র। জেলেদের জীবন অতি কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হলেও তাদের ঘরে দেবদেবীর আরাধনা কোনোদিন বন্ধ হয়ে যায় না। কুবের, কপিলা, আনিমুদ্দিন এরাও পদ্মার সন্তান, পদ্মাকে নিয়ে জেলেদের ভালোবাসা জন্মেছে। তাই কুবেরের কথায়–

"দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়...।"[২]

পদ্মার জীবনে নিজের জালনৌকা না থাকায় মাশুল দিতে হয় তাদের। তাই লেখকের কথায় –

"টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুরটা এবারও সে জমা লইতে পারে নাই।
সারাটা বছর তাকে পদ্মার মাছের উপর নির্ভর থাকিতে হইবে...।"[৩]

সেই বিশ্বাস, সেই ভালোবাসা তাদের জীবনে মিথ প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চলে বন্যা প্লাবিত হয়ে জেলেদের ঘরবাড়ি ভেসে যায় তখন তারা আর পদ্মাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদের বিশ্বাসের ভাঙন শুরু হয়। সময় কখনো নির্দিষ্ট জায়গায় থেমে নেই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছুই পরিবর্তিত হতে থাকে। এমনকি তারা গোষ্ঠীজীবন থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তিজীবনে চলে আসছে। প্রত্যেকে নিজের নিজের কথা ভাবছে যেখানে গেলে তারা বেঁচে থাকার অধিকার পায়। আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে তারা বুঝতে পারছে এবং সময় ও তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, পদ্মাও আজ পরিবর্তিত। পদ্মার তীরে যেভাবে মাটির ভাঙন দেখা যায় ঠিক তেমনিভাবে ভাঙন ধরে তাদের সম্পর্কের বন্ধনে। সেই বিশ্বাস, সেই ভালোবাসা পদ্মাতেই বিসর্জন দিয়ে ছুটে যায় অনিবার্য এক নতুন মান অন্বেষণে।

'নদী ও নারী' উপন্যাস পদ্মাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ধীবরদের সুখদুঃখের ইতিহাস রচিত হয়েছে। নদীই ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম রসদ। পদ্মাতে যখন উপার্জন বেশি হয় তখন তাদের মুখে হাসি ফোটে, আনন্দের ছাপ ভাসতে দেখা যায়। সেইজন্য নদীকে তারা মাতৃরূপে দেখেই এসেছে এবং নদীই তাদের একমাত্র রক্ষাকর্তা। যতক্ষণ নদীতে মাছ ধরে ততক্ষণ সংসার চলে। একদিন যদি তারা মাছ ধরতে না যায় সংসার চলে না, এমনকি সংসারে টানাপোড়েনও শুরু হয়ে যায়। তাই যতই ওদের কষ্ট হোক নদীতে মাছ ধরতে যাবেই, এছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই। সেইজন্য নদীকে নিয়ে তাদের একধরণের বিশ্বাস জন্মায় বিশ্বাসটাই মিথে পরিণত হয়েছে। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ঢেউ উপছে পড়ে তাদের ঘরবাড়ি ভেসে যায়। পদ্মাতে মাছ ধরতে গিয়ে মালেকের বাবা আর ফিরে আসে না এবং নৌকাও অতল তলে তলিয়ে যায়। তখনই তাদের বিশ্বাসের ভাঙন শুরু হয়। আধুনিককালে তারা বুঝতে পারছে এবং সময়ও তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাও পরিবর্তনের রূপে সজ্জিত হচ্ছে। সেইজন্য ধীবররা অন্য বিশ্বাসের সন্ধানে মগ্ন হচ্ছে। তারা সংঘবদ্ধজীবন থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তিজীবনে প্রতোকে নিজের নিজের কথা ভাবছে, তারা বঝতে পারছে নদী যেমন রক্ষক তেমনিভাবে ভক্ষকও। উপন্যাস নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে এক একটা আখ্যান।

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' বাংলা সাহিত্যে একটি অন্যতম উপন্যাস। তিস্তানদীর তীরবর্তী দরিদর্য্ বাসিন্দাদের সুখদুঃখের কাহিনি রচনা করেছেন লেখক। ধীবরদের জীবনে সুখের থেকে দুঃখটাই অন্যতম মাত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধীবররা প্রতিকুল পরিবেশের মধ্যে বাস করে জীবিকা নির্বাহ করেই বেঁচে থাকছে। যতদিন তারা নদীর উপর নির্ভর করে থাকতো ততদিন তারা নদীকে মাতৃরূপেই দেখত। এরই ফলে নদীকে নিয়ে

ভালোবাসা ও বিশ্বাস জন্মেছে। কিন্তু এই ভালোবাসা, বিশ্বাস কখনো স্থায়ী নয়, সময় ও স্থানের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনেও পরিবর্তনের আকার ধারণ করে । এই পরিবর্তন কখনো একরৈখিকভাবে নয় বিভিন্ন নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বহুরৈখিক রূপান্তর লক্ষ করা যায় । নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অসহায় মানুষদের মধ্যে রাজনীতি নেতা গজিয়ে উঠে সুযোগ নিচ্ছে অথচ তাদের দুঃখ যন্ত্রনার কথা কেউ বুঝছে না। তিস্তা নদীর উপর জোর করে ব্যারেজ করে মানুষ নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করছে। আধুনিককালে দাঁড়িয়ে মানুষের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটছে। অতীতে নদীকে যেভাবে দেখা হতো এখন আর নদীকে মানুষ সেইভাবে দেখছে না। স্থান ও সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে।

সমরেশ বসু 'গঙ্গা' উপন্যাসে গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে মাছধরা ধীবরদের জীবনের অনিশ্চয়তার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। মাছমারা ধীবরদের জীবনসংগ্রামের রূঢ় বাস্তবস্তার দিকটি সমরেশ বসুর হাতে আরো ব্যাপক ও গভীর। হিমি, বিলাস, পাঁচু, নিবারণ এদের জীবন নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এদের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, সাফল্য ব্যর্থতা ভরা জীবনের ইতিহাস রচিত হয়েছে গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই। নদীকেন্দ্রিক যে সমস্ত মানুষদের জীবন, তারা নদী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। নদীই বেঁচে থাকার একমাত্র রসদ। লেখক শুরুতেই জানিয়েছেন যে পুরোখৌড়গাছি, ধলতিতা, তেঁতুলিয়া, সারাপুল, ফতুন্নোপুর, ফরিদকাঠি, বীরপুর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জেলে, কৈবর্ত, মালো এমনকি রাজবাংশীরাও মাছ ধরতে ছুটে আসে। কেননা সব মৎসজীবিদের ভাত কাপড় নদীর কাছে বাঁধা। তাই নদীকে তারা দেবীরূপে পূজা করে। নদীকেন্দ্রিক যে সমস্ত মানুষদের জীবন তারা প্রতিবছরই গঙ্গা দেবীকে পূজার্চনা করে । তাই গঙ্গাকে কেন্দ্র করে ভালোবাসা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি সবই গড়ে উঠেছে। সেই বিশ্বাস, ভালোবাসা তাদের জীবনে মিথ প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়েছে । এই বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে । বিলাস যদি 'গঙ্গা' উপন্যাসের মূল শক্তি, তবে তার উপযুক্ত পরিপূরণ হিমি। উপন্যাসে বিলাস-হিমির প্রেমের পটভূমি রচনাতেও গঙ্গা নদী এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । নিবারণের মৃত্যু এই উপন্যাসে একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা । যদিও মূল পর্বে তা ঘটেনি । তবুও নদীকে নিয়ে যাদের বিশ্বাস ছিল তাদের জগতে ভাঙন শুরু হয় । নদীর বুকে মৃত্যু ঘটল একদিন পাঁচুর, বলে গেল হিমির সঙ্গে মেলামেশা তার কোনো আপত্তি নেই। উপন্যাসটি শেষ হয় এইভাবে –

> "ঢেউ লেগেছে রাইমঙ্গলে আর ঝিল্লের মোহনায়। কালীনগঞ্জ থেকে চাল ডাল নুন তেল জোগাড় যন্ত্র হয়েছে। সাঁইদারের অপেক্ষা।
> সাঁইদার কে?
> বিলেস। তেঁতলে বিলেস।
> তেঁতলে বিলেস সমুদ্রে যায়।"[৪]

সময় কখনো নির্দিষ্ট জায়গায় থেকে নেই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত কিছু পরিবর্তিত হতে থাকে। তারাও অন্য বিশ্বাসের সন্ধানে মগ্ন হচ্ছে যেখানে গেলে তারা বেঁচে থাকার আশ্রয় পায়।

'তিতাস একটি নদীর নাম', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'গঙ্গা' এবং 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' এই চারটি উপন্যাসের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাভাবনা কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে । তুলনামূলক সাহিত্যে প্রসঙ্গতত্ত্বের (Thematology) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 'নদী' একটা বিষয় অনেক বড় পরিস্থিতিকে বোঝাচ্ছে । 'নদী' বিষয়কে ঠিক রেখে বিভিন্ন লোক স্থান ও সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে। যেমন অতীতে বা পুরাণে নদীকে দেবতা, মাতৃজ্ঞানে পূজা করতো এবং এর জলকেও পবিত্র হিসেবে বিবেচনা করতো। আধুনিককালে বা বর্তমান সময়ে মানুষ নদীর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে বেঁচে থাকছে। অন্যদিকে আর একশ্রেণির মানুষ বিশেষ করে যারা ধনী সম্প্রদায়নি তারা নদীকে সড়কপথ, বাণিজ্যপথ হিসেবে ব্যবহার করছে যেমন গঙ্গা, হুগলি, যমুনা নদী ইত্যাদি। ইতিহাসবিদ্যার (Historiography) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নদীকে অতীতে বা পুরাণে মানুষেরা দেবীরূপে দেখে এসেছে এটা যুগ যুগ ধরে ইসিহাসের প্রেক্ষাপটে তৈরি। সময়ের মতো ইসিহাসও নির্দিষ্ট জায়গায় থেমে না থেকে ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে । নদীকে নিয়ে যে বিশ্বাস মানুষের জন্মেছে সেই বিশ্বাসের পরিবর্তন হতে থাকায় মিথ বিশ্বাসেরও পরিবর্তন ঘটছে। উপন্যাসগুলিতে দেখা যায় যে, প্রত্যেকে কথা বলার মধ্যে দিয়ে আখ্যান কৌশল তৈরী হচ্ছে। কথা বলার মধ্যে দিয়ে গল্পের কাঠামো তৈরি হচ্ছে যেমন আরব্যরজনী, ডেকামেরন

ইত্যাদিতে লক্ষ করা যায়। তুলনামুলক সাহিত্যে বর্গতাত্ত্বিকের (Genology) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসের এক একটা বর্গ। এই বর্গও পরিবর্তনশীল। প্রসঙ্গত ভাবে বাখতিনের সাংলাপিক কল্পনা বা ডায়ালজিক ইমাজিনেশনের কথাই বলা যেতে পারে। মানুষে মানুষে কিভাবে আদান প্রদান হয়, একজন মানুষ বা মানবগোষ্ঠী কীভাবে নিজেদের ভাবনা, বেদনা, আবেগ জানাতে পারে তারই তত্ত্ব এই সংলাপবাদ বা ডায়ালোজিজম । বর্গের গোটা প্রক্রিয়া ইতিহাসের ধারণার সঙ্গে মিল রয়েছে । তাহলে দেখা যায় যে, ইসিহাসবিদ্যা, বর্গতত্ত্ব ও প্রসঙ্গতত্ত্ব ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে স্থান ও সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী। প্রসঙ্গতভাবে বাখতনের পলিফোনি তত্ত্বের কথা বলা যেতে পারে। পলি অর্থাৎ বহু, ফোনি শব্দের অর্থ ধুনি বা স্বর অর্থাৎ বহুস্বরসঙ্গতিমূলক শিল্প। উপন্যাসগুলিতে দেখা যায় যে, প্রতিটি চরিত্রই বহু স্বাধীন এবং অমিশ্রিত কণ্ঠস্বরের সমাহার ঘটে এবং প্রতিটি কণ্ঠস্বরই উপন্যাসের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। বহুস্বরসঙ্গতিমূলক উপন্যাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সংলাপ বা কথোপকথন। এ প্রসঙ্গে বাখতিনের কার্নিভালাইজেশন ধারনার কথা বলা যায়। কার্নিভাল হল এমন এক উৎসব যা পবিত্র-অপবিত্র, বিশিষ্ট-তুচ্ছ জ্ঞানী মুর্খ সবাই একত্রিত, ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত করে গড়ে তোলে জনসাধারণের যৌথ ক্রিয়াকলাপ। জীবনের সুতীব্র প্রকাশই হল কার্নিভালের জীবন। অর্থাৎ উপন্যাসে জনসাধারণের মধ্যে সবরকমের দূরত্ব লুপ্ত হয়ে যায়, তাদের মধ্যে স্বাধীন, অবাধ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কার্নিভালের জগৎ তাই মুক্ত জগৎ যেখানে কোনো রাষ্ট্র, সমাজ বা ধর্ম তাকে ভয় এবং সেই সূত্রে মানুষকেও দমন করে না রাখে, এখানে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেদের ভাবনা, বেদনা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির কথা জানাচ্ছে। প্রসঙ্গত দেরিদার "Structure, Sign and Play" গ্রন্থই বলা যেতে পারে। তিনি বলবার চেষ্টা করেছেন যে, সেস্যুরের ক্ষেত্রে যে স্ট্রাকচার আছে সেটাকে যদি ভাঙি তাহলে হবে ডিকনস্ট্রাকশন অর্থাৎ যারা কেন্দ্রে ছিল তারা প্রান্তে চলে আসবে আর যারা প্রান্তে ছিল, কেন্দ্রে চলে আসবে। যেহেতু Signified নির্দিষ্ট নয়। কেন্দ্র ও প্রান্তের ঘটনা অনবরত ঘটতেই থাকবে, এটা শেষহীন এর কোনো শেষ নেই। দেরিদা বলবার চেষ্টা করেছেন, আসলে এটা একটা খেলা। অতএব ফাইনাল বা নির্দিষ্ট বলে কিছুই হয় না। সুতরাং দেখা যায় যে নদীকে অতীতে বা পুরাণে যেভাবে দেখে আসত কিংবা এর জলকে হিসেবে বিবেচনা করতো। এটা কখনো স্থিতিশীল নয় বা শেষ কথা নয়। আধুনিক বা বর্তমানে স্থান ও সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিংবা যুগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাভাবনা ক্রমশ পরিবর্তন ঘটছে। তাহলে বলতে পারি, পৃথিবীতে কোনো কিছুই নির্দিষ্ট নয়। তাই নদীকে আমরা দুভাবে দেখি --

১। নদী যে অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেখানে ঢেউ উপছে পড়ছে।

২। নদীর মাধ্যমে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেই বেঁচে থাকছে।

তাছাড়া নদী প্রধান সড়কপথ- যোগাযোগের সেতুবন্ধন। সুতরাং সব মিলিয়ে নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন আমরা দেখেছি মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে। মানুষের মধ্যে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবন পরিলক্ষিত হয়। জনজীবনের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ইত্যাদি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল স্থান ও সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী। আবার ইংরেজি সাহিত্যে J. M. Synge 'Riders to the Sea' নাটকে সমুদ্র উপকূলে আরানদ্বীপ বাসীদের সমুদ্র নির্ভরতা। নদী একই সঙ্গে উপার্জন হলেও কখনো কখনো তার অভিশাপও রয়েছে যেমন তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, Riders to the Sea নাটকে দেখা যায় বাড়ির পুরুষেরা সমুদ্রে গিয়ে তারা আর ফিরলো না, তারা বুঝতে পারছে জলপথ তাদের যেমন রক্ষক ঠিক তেমনিভাবে ভক্ষকও। নদীর উপকূলবাসীদের কাছে মাতৃসত্ত্বা অপরিবর্তিত সেটা আজও রয়েছে।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নদীর বিষয়টি নানাভাবেই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণে নদী প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানুষের জীবনযাপন, সভ্যতা, ইতিহাস, আন্দোলন-সংগ্রাম-সবকিছুতেই নদী দৃঢ়তর ভূমিকা পালন করে। মানুষের জীবনে নদী কখনো বন্ধু, কখনো ভয়ংকর প্রতিপক্ষ ও ধ্বংসকারী। আবার কখনো নদী দেবীরূপে পূজিত হন । নদীকে এড়িয়ে মানুষের জীবন গড়া ও সভ্যতার ঐশ্বর্য নির্মাণ অকল্পনীয়। নদীভিত্তিক আঞ্চলিক বিভিন্ন উপন্যাসে এ সত্য নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। শিল্পে প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাঠ যাচাই করা যায়। নদী-বিষয়ী ঔপন্যাসিকরা কেমন রচনাকার, তার স্বাতন্ত্র্য কি, বিষয় নির্বাচনে তার যৌক্তিকতার ইঙ্গিত কোন ধরনের এ প্রশ্নগুলোতে সরল ভাষ্যে হয়তো যে কোনও লেখককেই চিনে নেওয়া যায়। কিন্তু লেখক বিশেষত এখানকার আলোচ্য বিষয়ক

উপস্থাপনে দেবদেবীরূপে , চর-নদী-অঞ্চল জীবনাগ্রহজ্জতার নির্মাণ-প্রক্রিয়া, সংহার মূর্তির শৈলী ভাষা-শিল্প হওয়ার প্রক্রিয়ায় পদ্ধতির ব্যবহার কিংবা আবহ রচনার সৃষ্টি-কৌশলে সামগ্রিকভাকে প্রয়োজনীয় দিকসঞ্চারী-যা উপরিউক্ত আলোচনায় উঠে এসেছে।

তথ্য সূত্র

১. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, *তিতাস একটি নদীর নাম: উপন্যাসেরও*, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪০৭, মুদ্রণ। পৃ: ৫১
২. ঘোষ, শুভঙ্কর, *শতবর্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* , মুখাবয়ব সংকলন গ্রন্থমালা, ২০১২, মুদ্রণ, পৃঃ ১৮৬
৩. তদেব, পৃ: ১৯১
৪. বসু, সমরেশ, *গঙ্গা* , কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ২০১১, মুদ্রণ। পৃঃ ৫০

সহায়ক গ্রন্থ

১. কবীর, হুমায়ুন, *নদী ও নারী* , কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ২০০৯, মুদ্রণ।
২. দাসগুপ্ত, রাহুল, *উপন্যাসের মহাবিশ্ব* , কলকাতা: দিশা সাহিত্য, ২০১০, মুদ্রণ।
৩. রায়, দেবেশ, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* , কলকাতা: দেজ পাবলিসিং, ২০০৯, মুদ্রণ।
৪. Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. *Dialogic Imagination*. United States: Universe of Texas Press. 1981, Print.
৫. Derrida , Jacques. *Structure, Sign and Play* . Paris : Oxford University Press. 1966, Print.

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1052-1059
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.104

উনিশ শতকের কলকাতার শহুরে বাবুদের গণিকাযাপন: যৌনতার নানা রূপ

ড. দোয়েল দে, *সহকারী অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, রাজা রামমোহন রায় মহাবিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.03.2025; Accepted: 22.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In 19thcentury Bengal, 'babu culture', characterized by the newly educated and wealthy Bengali elite, saw a rise in the association of drinking and visiting brothels, with prostitution becoming a prominent aspect of their social lives. The economic changes brought about by colonial rule, including the decline of traditional industries and the rise of a new landed gentry, contributed to the growth of prostitution in Calcutta (now Kolkata). The newly educated and wealthy Bengali elite, known as "babus," often frequented brothels and engaged in drinking as a form of leisure and social activity. Brothels became spaces where "babus" could indulge in drinking and sexual pleasure, and this became a prominent feature of their culture. There were two classes of prostitutes: professional entertainers and those who were essentially sex slaves, highlighting the social hierarchy of the time. Colonial administration often enjoyedthese types of entertainments in several social festivals. For some "babus," keeping a prostitute was seen as a status symbol, and some even built elaborate houses for them. Thus 19th century Babu culture of Calcutta represented a typical socio moral degradation.

Key Words: *19th century, Calcutta, Babu Culture, Prostitutes, British.*

যৌনতা একটা বিরাট সামাজিক শক্তি। সমাজে তা বরাবরই ধর্মের সুতোয় বাঁধা। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যে এর ভূরিভূরি উদাহরণ আছে। পুরাণ পড়লে বোঝা যায়, বহুগামিতা, বহুকামিতা, সমকামিতা, পশুকামিতা— সবরকম যৌনতার কথাই সেখানে আছে '*গীতা*', '*রামায়ণ*', '*মহাভারত*', বড়ুচণ্ডীদাসের '*শ্রীকৃষ্ণকীর্তন*', ভারতচন্দ্রের'*বিদ্যাসুন্দর*' ইত্যাদিতে এর বহু উদাহরণ আছে। প্রাক-খ্রিস্টীয় যুগ থেকে পনেরো-ষোলো শতক পর্যন্ত লেখা হয়েছে বেশ কিছু গ্রন্থ যার মূল উপজীব্য বিষয় হলো যৌনতা। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, দ্বাদশ শতকে লেখা 'কোক্কের রতিরহস্য', যা সাধারণভাবে 'কোকশাস্ত্র' নামে প্রচলিত। এই বইটি অনুসরণ করে ষোলো শতকে কল্যাণমল্ল লেখেন, 'অনঙ্গরঙ্গ'। কোনও কোনও আলোচক জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে' রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলায় 'কোকশাস্ত্রে'র প্রভাব আবিষ্কার করেছেন। এই কাব্য রাধাকৃষ্ণের আবেগময় রতি কাহিনির এক ধ্রুপদী নিদর্শন। সতেরো শতকে লেখা দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রাণী' (১৬৫৯) কাব্যেও রয়েছে নারী-পুরুষের রতিমিলনের উন্মুক্ত বর্ণনা। সহজযানী বৌদ্ধ ধর্মেও সিদ্ধাচার্যরা দেহকেই সাধনার মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বে নর-নারীর শরীর এবং দেহমিলনের মধ্য দিয়ে পরমার্থ লাভের ধারণাটি দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মতে, সম্ভোগের অভিজ্ঞতা বিনা প্রকৃত 'রসিক' হওয়া যায় না। 'মিশেলফুকো' এবং তাঁর তিন খণ্ডে লেখা- '*দ্য হিস্ট্রি অফ সেক্সুয়ালিটি*' বইটিকে যৌনতার এক প্রামাণ্য আখ্যান বলা যেতে পারে। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সমাজকে বিশ্লেষণ করে ফুকো

দেখিয়েছেন, পেগান এবং প্রাক-খ্রিস্টীয় যুগে বেশ কিছু যৌন নিয়ন্ত্রণের ধারণা গড়ে উঠলেও, সেগুলি আধুনিক যুগের থেকে আলাদা এক জটিল নৈতিকতার ধারণার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। যৌনসংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ছিল একজন সুপ্রতিষ্ঠিত সামাজিক ব্যক্তির সম্মানিত নাগরিক হয়ে ওঠার অন্যতম শর্ত। ফুকোর মতে, গ্রিকরা মনে করত, খাদ্য ও পানীয়ের প্রতি মানুষের যেমন স্বাভাবিক আসক্তি দেখা যায়, তেমনই যৌনতার প্রতিও মানুষের তীব্র আসক্তি মানবচরিত্রের পশুত্বের দিকটিকেই প্রকট করে।

উনিশ শতকের কলকাতার মূল সংস্কৃতিই ছিল বাবু সংস্কৃতি। বাবুরা বাঙলার বিভিন্ন স্থান থেকে কলকাতায় এসে আমোদ ফুর্তি করতেন, তাদের কয়েকজন মোসাহেবও জুটে যেত।বাবুরা এদের হাতের পুতুল হয়ে সব টাকা খুইয়ে ফেলতেন। তারপর নিজের জমিদারিতে গিয়ে খাজনা আদায় করে আবার কলকাতার পথ ধরতেন। কেউ কেউ আবার ব্যবসা বাণিজ্য করে কলকাতায় স্থায়ী আবাস গড়েছিলেন। বাবু সংস্কৃতি যে কলকাতায় বিপুল বিস্তারী প্রভাব ফেলেছিল সে কথা বলা চলে নিঃসন্দেহে।

মূলত পাশ্চাত্য শিক্ষার আনুকূল্যে উনিশ শতক বাঙালি সমাজের সার্বিক উত্থানের কাল হয়ে উঠেছিল। অবশ্য এর পাশাপাশি সমাজ-অভ্যন্তরে অনাচারের একটি চোরা-স্রোতও বহমান ছিল। ভুঁইফোঁড় নব্যধনী এবং সেই সঙ্গে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশের মধ্যেও চারিত্রিক ভ্রষ্টাচার দেখা দেয়। এমনকি সমাজের নেতৃস্থানীয় খ্যাতিমান ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউও এই নৈতিক স্খলন থেকে মুক্ত ছিলেন না। সুরাপান, বেশ্যাসক্তি ও রক্ষিতা-পোষণ সেকালে এক ধরনের সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে গণিকাচর্চা গৌরব ও মর্যাদার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো।

উনিশ শতকের কলকাতার বাবু সংস্কৃতি

কলকাতার বাবু সংস্কৃতির মূলে ছিল মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় রাজধানী স্থানান্তর আর তারও পরে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন।বস্তুতঃ ১৭৫৭ সালে সিরাজের বিরুদ্ধে পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশরা বাংলার শাসন ক্ষমতা লাভ করে। ইংরেজরা ক্ষমতা লাভ করেই তাঁদের প্রণীতশাসনব্যবস্থা ও ভূমিব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এর ফলে বাংলার গ্রাম্যসমাজের প্রচলিত কাঠামোটা ভেঙে পড়ল। অস্তিত্ব রক্ষায় গ্রামের মানুষজন একে একে গ্রাম ছেড়ে শহর কলকাতার আসতে শুরু করলে কলকাতা শহর হয়ে উঠল এই সব ছিন্নমূল মানুষের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল।

সপ্তদশ শতকের শেষদিকে ইংরেজদের দ্বারা কলকাতা নগরী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাতারাতি কলকাতার গুরুত্ব রাজধানী মুর্শিদাবাদকে ছাড়িয়ে গেল। বস্তুতঃ, কলকাতা শহরে প্রথমে যে ইংরেজরা এসেছিল, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ ছিল অস্তগামী মধ্যযুগের উচ্ছিষ্টতুল্য প্রতিনিধি। নতুন শিক্ষা বা নতুন সভ্যতার অগ্রদূত তাঁরা ছিল না। তাঁরা দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হত, হিন্দুদের পুজোপার্বণে অংশগ্রহণ করত, তৎসহ হিন্দুদের মতোই তুকতাকে বিশ্বাস করত। উচ্ছিষ্টতুল্য প্রতিনিধিদের পিছন পিছন চুল পরিচর্যাকর, বাজিকর ইংরেজরাও এসেছিল। বাংলার জমিদারদের মতো খানাপিনা ও জীবন-যাপন করাটাকেই তখন ইংরেজরা আভিজাত্য মনে করত।

এই প্রকৃতির ইংরেজদের স্পর্শ পেয়ে আবির্ভাব হল এক নব্য ধনী সম্প্রদায়ের। এই নব্য ধনী সম্প্রদায়ই 'বাবু সম্প্রদায়' নাম পরিচিত হলেন। এঁরাই রাজা, মহারাজা উপাধি নিয়ে জুড়ি গাড়ি, প্রাসাদোপমবাড়ি, মোসাহেব আর দাসদাসীদের নিয়ে কলকাতা শহরে জাঁকিয়ে বসেন। কলকাতার এই 'বাবু'দের সামাজিক মান-মর্যাদার মাপকাঠি ছিল টাকা। সেই টাকার প্রাপ্তি ঘটেছে ইংরেজদের লুণ্ঠনসহযোগী রূপে। এইভাবেই তারা সারাবাংলার রক্ত শোষণ করে কলকাতায় গড়ে তুলেছিল প্রাচুর্যের পাহাড়। এদের পরিচয় ছিল ইংরেজদের দেওয়ান, বেনিয়ান, মুৎসুদ্দি, সরকার, কেরানী প্রভৃতি শত নামেইংরেজরা তাদের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলতো 'Black Zamindar'।

হঠাৎ গজিয়ে ওঠা এই ধনিক এবং নতুন জমিদাররাই কলকাতার বসবাস করে 'বাবু' সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়ে ওঠেন। গণিকাবিলাস সহ বিভিন্ন আমোদপ্রমোদই এই বাবুকুলের একমাত্র আরাধ্য ছিল। নানারকম পুজো উপলক্ষে বা কোনোরকম উপলক্ষ ছাড়াই নাচ, গান, যাত্রা, থিয়েটার, বুলবুলির লড়াই, হাফ-আখড়াই, কবিগানেরআয়োজনে এই বাবুরা থাকত সদাব্যস্ত। কার আয়োজন সব থেকে জমকালো হল, তা নিয়ে রীতিমতো অলিখিত প্রতিযোগিতা চলত। জলের মতো অর্থ ব্যয় হত। ইংরেজরা নিমন্ত্রিত হত। ইংরেজরা বাবুদের তারিফ করত।

প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ধনী ও জমিদারদের উপাধি দিত। এই উপাধির লোভে নব্য ধনীরা উৎসবের আয়োজনে বহুগুণ বৃদ্ধি করত।

বাবু হতে গেলে কুকুরের বিয়েতে লাখ টাকা খরচ করা, চার ঘোড়ারগাড়ি চড়ে ভেঁপু বাজিয়ে স্নান করতে যাওয়া, দু-একটি রাঁড় রাখা, রক্ষিতাদের দালানকোঠা করে দেওয়া, পায়রা ওড়ানো, বিদ্যাসুন্দরের আসর বসানো, শনিবারের রাতে বাই-বেশ্যা নিয়ে আসর বসানো ইত্যাদি করতে হয়। বহু বাবু পাল্লা দিয়ে লোক দেখানো এসব করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন। মোট কথা—বাবু শুধু ভোগ করতে চান না, খ্যাতি চান, সকলের সঙ্গে টাকা ওড়ানোর প্রতিযোগিতা করে সবার উপরে থাকতে চান। কলকাতার বিখ্যাত আট বাবু ছিলেন এর মধ্যে অগ্রগণ্য। কলকাতার আট বাবুর মধ্যে ছিলেন নীলমণি হালদার, রামতনু দত্ত, গোকুলচন্দ্র মিত্র, রাজা রাজকৃষ্ণ, কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষ ছাতু সিংহ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর, রাজা সুখময় রায় এবং চোরাবাগান মিত্র বংশের এক বাবু—এঁরাই ছিলেন আট বাবু। পরবর্তীকালে নামডাক সম্পন্ন আরও বাবু এসেছিলেন, কিন্তু উপরে উল্লিখিত আটবাবুই হলেন কলকাতার প্রথম বাবু। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন-

> "যিনি উৎসবার্থদুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতী পূজা করিবেন, এবং পাঁঠার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন, তিনিই বাবু।"[১]

ডক্টর অসিতকুমারবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—'বাবুর উপাখ্যান' বা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গ আখ্যানগুলি অর্ধশিক্ষিত ধনী সন্তানদের কুৎসিত আমোদ প্রমোদের কথা সাধুভাষায় বলা হলেও উদ্দেশ্যটি তত সাধু ছিল না। বাইরের দিক থেকে এসব নকশায় রঙ্গকৌতুক, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও গল্পের আমেজ থাকলেও ভিতরে ছিল 'পর্নো' (porno), কেচ্ছা-কেলেংকারি। সমাজের কুরীতি দেখি যে সভ্য ভব্য মানসিকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই ভবানীচরণ ও অন্যান্য নকশাকারেরা কলম ধরেছিলেন।

বাবুদের গণিকাযাপন

এই বাবুদের অন্যতম এক নেশা ছিল গণিকালয় গমন। বস্তুতঃ তাদের একটি রাতও রক্ষিতা ছাড়া রঙিন হতো না। উনিশ শতকের কলকাতার বাবুদের সামাজিক পদ মর্যাদা অনেকাংশেই নির্ভর করতো তাদের রক্ষিতা পোষার উপর। সমকালীন কলকাতার একজনও এমন বাবু ছিলেন না যাদের এক বা একাধিক রক্ষিতা থাকতো না। ফলে তারা এক বল্গাহীন যৌন জীবন যাপন করতো। এক কথায় নারী এবং সুরা এ দুটিই ছিল তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ভুলে গেলে চলবে না কলকাতার বাবু সংস্কৃতির মূল উপাদান ছিল- বাঈজি বা গণিকাকে নিজের করায়ত্ত্ব করে নেওয়া। তবে যাকে তাকে নয়, সবচেয়ে খ্যাতিমান বাঈজিকে অন্য কারো কাছ থেকে তুলে আনার মধ্যে ছিল সেরা বাবু হওয়ার পথ। হঠাৎ কোনো বাইজী বা গণিকার প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়লে তাঁকে 'বাঁধা মেয়েমানুষ' হিসাবে রাখার জন্যে বাবুদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। এই গণিকাচর্চাই ছিল বাবু কালচারের অঙ্গ। কালীপ্রসন্নের লেখা থেকে জানা যায়, রাজরাজড়ারা রাতে নিজ বিবাহিত স্ত্রীর মুখ দেখতেন না। প্রতিরাতই তাদের কাটতো কোনো না কোনো গণিকার গৃহে। শুধু তাই নয় তৎকালে বিদেশে স্ত্রী-পরিবার সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রথা না-থাকায় প্রায় সকল আমলা-আইনজীবী ও মোক্তারদের এক একটি উপপত্নীর দরকার হত। অতএব এই 'উপপত্নী'র যোগান যাতে নিরবচ্ছিন্ন হতে পারে, সেই কারণে তাঁদের বাসস্থানের সন্নিহিত স্থানে স্থানে গণিকালয় প্রতিষ্ঠা পেতে থাকল। সেজন্যই উত্তর কলকাতার প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত শহরবাসীদের বসতি কেন্দ্রের আশেপাশেই শহরের বিখ্যাত গণিকালয় প্রতিষ্ঠিত হতে দেখা যায়। বাবুদের মেয়ে মানুষ নিয়ে আমোদ করার জন্য যেমন, তেমন সাধারণের জন্যও শহরে গড়ে উঠেছিল নতুন তীর্থক্ষেত্র, গণিকালয়। সুতরাং এমন পাড়া ছিল না যেখানে অন্তত দশঘর গণিকা নেই। শহরে তখন যত্রতত্র এদের বসবাস। গৃহস্থের বাড়ির পাশে, সদর রাস্তার উপর, যেখানে ইচ্ছা গণিকারা বাস করত। এমনকি জোড়াসাঁকোর মূল ব্রাহ্মসমাজটি গণিকালয়ের মাঝখানেই। হুতোম প্যাঁচার নকশার মন্তব্যে কলকাতা শহর তখন 'বেশ্যাশহর' হয়ে পড়েছে। প্রতিবছর গণিকার সংখ্যা ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। গণিকারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গি আর গালিগালাজ করত। সাধারণ পথিকরাও তাদের হাত থেকে নিস্তার পেত না। কখনো দেখা গেল এক গণিকা রসিকবাবুকে দেখে পানের পিক ফেলতে গিয়ে তা অফিস ফেরত এক কেরানিরমাথায়পড়ল। কিন্তু কেরানিটিভয়ে কিছু না-বলে মানসম্মান নিয়ে চলে গেল।

কলকাতায় গণিকাদের পসরা এতটাই বাড়বাড়ন্ত হয়ে উঠেছিল যে দেখা যায়, গৃহস্থের বাড়ির পাশে বেশ্যা, ছেলেদের পাঠশালার পাশে বেশ্যা, চিকিৎসক কবিরাজ বাসস্থানের পাশে বেশ্যা, এমনকি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের আষ্টেপৃষ্ঠে বেশ্যা। 'সমাচার চন্দ্রিকা' পত্রিকার খবরে জানা যায়-

> "গণিকারা প্রত্যহ সন্ধ্যা হতে রাত দশটা পর্যন্ত রাজপথে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের মধ্যে যে-সব কুভাষা বা কদর্যালাপ করত, তাতে সাধারণ পথিকরা বিব্রত হতেন। স্বভাবতই পথিকদের দেখলে গণিকারা আমন্ত্রণ জানাত, পথিকদের নানা ভাবেউৎপাত করত, এমনি পথিকদের উদ্দেশে নানারকম কুকথাও বলত।"[২]

কলকাতার পুলিশ ধনীদের আশ্রিত প্রমোদপল্লী এলাকায় হস্তক্ষেপ করতে সাহস পেত না। স্থানীয় বর্ধিষ্ণু সাধারণ মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের নীতিবোধ ও রুচিবোধ গণিকাদের এই প্রকাশ্য ইতরামিতে ক্ষুণ্ণ হত এবং তাঁরা কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন করত। কিন্তু তাতে ফল কিছুই পাওয়া যেত না। স্বয়ং দ্বারকানাথ ঠাকুর কলকাতার একটি এলাকাতেই ৪৩টি গণিকালয়ের মালিক ছিলেন। বিত্তশালী বাবুদের প্রশ্রয়েই এইসব গণিকাপল্লী গজিয়ে উঠেছিল। অতএব প্রশাসনের সাধ্য ছিল না এহেন কালচারের বিরুদ্ধে কোনো কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার। এইসব বাবুদের আদর্শ ছিল মূলত ইংরেজ রাজকর্মচারীরা। শ্রীপান্থ লিখেছেন—

> "সতীদাহ কলকাতায় তখন প্রায় প্রতিদিনের ঘটনা। সারা ব্ল্যাক টাউন চিতার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, অন্ধকার। সেই অন্ধকারে চলছে বাবুবিলাস, গুরু-প্রসাদী কৌলীন্য রক্ষা। সতীর আর্তনাদে, বিধবার কান্না আর বারবনিতার কাতর আহ্বানে অষ্টাদশ শতকের কলকাতা প্রেতপুরী। পা যেন লজ্জায় জড়িয়ে আসে সেদিকে বাড়াতে।"[৩]

সন্ধ্যা হলেই নগর কলকাতাকে নাগর-কলকাতা বলে মনে হত। 'তত্ত্ববেধিনী' পত্রিকায় বলা হয়েছে,

> "সন্ধ্যার পর নগর মধ্যে পাপের মহোৎসব উপস্থিত। কোন স্থানে বহু ব্যক্তি দলবদ্ধ হইয়া গণিকার গৃহে প্রবেশ করিতেছে, ...কোন কোন বেশ্যার আলয় হইতে মাদকোন্মত্ত সমূহ লম্পটের উল্লাস কোলাহল ধ্বনিত হইতেছে, কুত্রাপি গণিকার অধিকার জন্য বিমোহিত পুরুষেরা বিবাদ কলহ সংগ্রামে প্রাণপণে প্রবৃত্ত হইতেছে।"[৪]

গণিকালয় যে শুধু সাহেব আর বাবুদের জন্য গড়ে উঠেছিল ব্যাপারটা এমন নয়। চোর-ডাকাত, বদমাস এবং ইতরজনরাও এসব গণিকাদের কাছে যৌনক্ষুধা মেটাতে যেত। তাই বলে সব গণিকালয় একরকম ছিল না। মানুষভেদে, শ্রেণিভেদে নানা ধরনের গণিকালয় গড়ে উঠেছিল সেসময়। সন্দেহ নেই এই গণিকালয়গুলো কলকাতা শহরের এক বৈচিত্র্য ছিল এবং বিভিন্ন গণিকালয়ে বিভিন্ন ধরনের রঙ্গ চলত। মধ্য রাতে শহরের রাস্তায় সজ্জিতভাবে বহু গণিকাকে খদ্দেরের হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত। ভদ্রলোক বাবুরা তখন নিজেদের ঘরের স্ত্রী-কন্যাদের পর্দানসীন করে ফেলেছিলেন, আর নিজেরা ইয়ার-বন্ধুদের নিয়ে বাগান বাড়িতে বসে সেরা গণিকাদের হাট বসাতেন। বাবুরা তখন তিন 'ম'-তে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিলেন—মদ, মাংস ও মেয়েমানুষ। গণিকাচর্চা সেকালের অনেক বিত্তবান বাঙালির কালচারে পরিণত হয়েছিল।

বাঈজী কালচার এবং সেকালের কলকাতার 'বাবু' সম্প্রদায়

উনিশ শতকের কলকাতা বল্গাহীন যৌনাচারের অপর একটি ডেকে হলো বাঈজী সংস্কৃতি। নাচে গানে পটু গণিকাদের একটা সম্মানীয় নাম ছিল—বাঈজী। সাধারণ গণিকাদের থেকে এদের কদর এবং মূল্য বরাবরই একটু বেশি হতো। কারণ যৌন সুখের পাশাপাশি এরা নাচ গানেও এদের বাবুদের আমোদ প্রমোদ দিতো। ওই সুন্দরী বাঈজীদের বাবু ও জমিদারেরা ভাড়া করে আনতেন। নাচ, গান, বাজনা আর খাওয়া দাওয়ার সঙ্গে আরও কুৎসিত আমোদ প্রমোদের উৎসব চলতো ঢালাও ভাবে। এই ছিল কলকাতার নাগরিক জীবনের একমাত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়। 'আত্মীয়সভা' ও 'ধর্মসভা'র গোষ্ঠীভুক্ত রাজা রামমোহনের বাড়িতে, প্রিন্স দ্বারকানাথের বাগান বাড়িতে, রাজা রাধাকান্ত দেবের গৃহে, মহারাজ সুখময় রায়ের বাড়িতে, রাজা গোপীমোহন দেবের বাড়িতে, বেনিয়ান বারাণসী ঘোষের বাড়িতে এসব জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান নিয়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা চলত। নিকী ছিলেন সেকালের এক নামকরা বাঈজী। নিকী ছাড়াও আশরুন, ফৈয়াজবক্স, বেগমজান, হিঙ্গুল, নান্নিজান, সুপনজান, জিন্নাত প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত বাঈজীদের নিয়ে এসে নাচগানের ব্যবস্থা করা হত। এই সমস্ত বাঈজীরা তখন শোভা বাজার, চোরাবাগান, বটতলা, মাণিকতলা

এককথায় সারা কলকাতা মাতিয়ে রেখেছিল। নিকীবাঈজীকে নিয়ে সেকালের কলকাতার বাবুরা নিজেদের মধ্যে নির্লজ্জভাবে দরকষাকষি করতেন। ফলে নিকীর বাজারদর হয়েছিল আকাশ ছোঁয়া। শেষ পর্যন্ত নিকী বাঈজীকে কলকাতার এক ধনী ব্যক্তি মাসিক এক হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়ে রক্ষিতা রূপে গ্রহণ করে সমাজে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন।[৫] অর্থাৎ সেই সময়ে বাবুদের সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠিও ছিল গণিকা বা বাঈজীরা যাপন।

এইভাবে বাবুদের দরকষাকষির ফলে বহু বাঈজী তাঁদের রক্ষিতা হয়ে থাকতে বাধ্য হতো। বাবুরা সারারাত বাঈজী নিয়ে পড়ে থাকতেন বাগানবাড়িতে। বসতবাড়ির চাইতে বাগানবাড়ি আর পত্নীর চাইতে উপপত্নী ছিল বাবুদের কাছে বেশি প্রিয়। অনেক সময় উপপত্নীর গর্ভে বাবুদের ঔরসজাত সন্তানও জন্ম নিতো। তবে সেসব সন্তান সামাজিক বা আইনী স্বীকৃতি পেতো না। যে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বাঈজীদের আনার জন্য পাল্কী পাঠিয়ে দেওয়া হত। সঙ্গে যেত পাইক ও বরকন্দাজ। পাল্কীটাকে বেহারারা নাটমন্দিরের সামনে এনে নামাত।

> "রাজা সাহেব এগিয়ে আসতেন খুশী উজ্জ্বল দুটো কামাতুর চোখ নিয়ে। মোসাহেবের দল অপরিসীম কৌতুহল নিয়ে পাল্কীর রুদ্ধ দুয়ারের দিকে তাকাতেন। তারপর দরজা দুটো খুলে যেত। নর্তকী নামত, পরনে মসলিনের পেটিকোট ও ওড়না ও সমস্ত দেহ অলঙ্কারে মোড়া, ঠোঁটে উজ্জ্বল হাসি ঠিকরে পড়ত। রাজা সাহেব এগিয়ে আসতেন, বলতেন, এস বিবিজান।"[৬]

দুর্গাপুজো ছিল বাবুদের সবচেয়ে জমকালো উৎসব। সাহেবরাও এই উৎসবে যোগদান করার জন্য সবসময়ই আমন্ত্রিত হতেন।

> "They all observed the Doorgah festival and given their guests an excellent meal (?), for they feasted upon wines and liquors of all kinds, and had enough of eatables."[৭]

দুর্গাপুজোয় দু'হাতে পয়সা খরচ করে জাঁকজমক আমোদ প্রমোদের প্রতিযোগিতায় নামতেন সেকালের নাম করা ধনীরা। কে কত বড় বাঈজি আনতে পারে, আলোর রোশনাই দেখাতে পারে, মদের বন্যা বওয়াতে পারে, দেশি ও বিদেশি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের বাড়ি আনতে পারে তার প্রতিযোগিতায় টেক্কা দেওয়াই ছিল এদের একমাত্র লক্ষ্য। এমনি ঝুটো সম্মান জ্ঞানের জন্য অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবারকে সর্বস্বান্ত হতে হয়েছিল।[৮]

দুর্গাপুজোর এই প্রতিযোগিতা প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী জানিয়েছেন,

> "যে ধনী পূজার সময় প্রতিমা সাজাইতে যত অধিক ব্যয় করিতেন এবং যত অধিক পরিমাণে ইংরাজের খানা দিতে পারিতেন, সমাজ মধ্যে তাঁহার তত প্রশংসা হইত। ধনী গৃহস্থগণ প্রকাশ্যভাবে বারবিলাসিনীগণের সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে লজ্জাবোধ করিতেন না।...নিজ ভবনে বাঈজী দিগকে অভ্যর্থনা করিয়া আনা ও তাহাদের নাচ দেওয়া ধনীদের একটা প্রধান গৌরবের বিষয় ছিল। কোন্ ধনী কোন্ প্রসিদ্ধ বাঈজীর জন্য কত সহস্র টাকা ব্যয় করিয়াছেন সেই সংবাদ শহরের ভদ্রলোকদিগের বৈঠকে বৈঠকে ঘুরিত এবং কেহই তাহাকে তত দোষাবহ জ্ঞান করিত না। এমনকি বিদেশিনী ও যবনী কুলটাদিগের সহিত সংসৃষ্ট হওয়া দেশীয় সমাজে প্রাধান্য লাভের একটা উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিল।"[৯]

বস্তুতঃ নবাবী-আমল শেষ হলেও নবাবী সংস্কৃতির অবলুপ্তি তখনও ঘটেনি। অষ্টাদশ শতকের নবাবী-সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে। ঊনিশ শতকের বাবু সংস্কৃতিতে

> "দেওয়ানি ও বেনিয়ানির অপরিমিত অর্থে বিলাসিতার স্রোত বয়ে গিয়েছে তখন কলকাতার পথে। সাহেবদের বাড়িতে যেমন, তাদের কৃপাশিত বাঙ্গালী রাজা-মহারাজাদের বাড়ীতেও তেমনি ভোজে চলেছে, বাইজী-নাচ চলেছে।"[১০]

মহারাজ সুখময়রায়ের বাড়ির ১৭৯২ সালের দুর্গাপূজা আর বাঈজী নাচের বিবরণ 'ক্যালকাটা ক্রনিকল'-এ প্রকাশিত হয়,

> "The only novelty that rendered the entertainment different from those of lost year, was the introduction or rather the attempt to introduce some English tunes among the Hindusthani Music."[১১]

রাজেন্দ্র মল্লিকের কান-ফোঁড়া উপলক্ষে যে জাঁকজমকপূর্ণ উৎসবানুষ্ঠান হয়েছিল, তার বিবরণ ১৮২৩-র ১৫ মার্চ 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল,

> "...চারিদিকে সুবর্ণ খচিত ফুলের মালা ও ফুলে সুসজ্জিত, সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যে যেন স্বর্গের নন্দনকানন বলিয়া ভ্রম হয়। নর্তকী গায়িকার সংখ্যা অধিক না হইলেও যে দুইজন নাচিতেছিল তাহারা অলৌকিক সৌন্দর্য্যশালিনী। নিকীর গান ও রূপের বর্ণনা তাহার সঙ্গিনীর সঙ্গে মানাইয়াছিল। গোলাপের সহিত পদ্মের বর্ণ যেন মিশ্রিত হইয়া অনুপম কপোলে উজ্জ্বলাভা বিকীর্ণ করিতেছে, চক্ষু হইতে আনন্দ উৎস বিচ্ছুরিত হইতেছে, অন্যটিকে ইউরোপের বিনপক্ষীর মত সুন্দর মনে হয়, তাহারা যেন কন্দর্পের শর লইয়া ক্রীড়া কন্দুক করিতেছিল।...সুনির্বাচিত সম্মিলনীতে সুমিষ্ট সুরা লেহ্যপেয় শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের সহিত নৃত্যাদিতে যথারীতি আদর আপ্যায়নে আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ পরিতুষ্ট, কিছুরই ত্রুটি ছিল না।"[১২]

এদের উৎসবানন্দের জলসায় দেশীয় ধনিক ও কোম্পানির সাহেব কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করতেন। এদের বল্গাহীন আমোদ প্রমোদের একটি সংযত ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন ফ্যানি পার্ক। তিনি সে সময়ে কলকাতায় এসেছিলেন এবং একজন ধনিক বাঙ্গালী বাবুর বাড়ী'র উৎসবে উপস্থিত হয়েছিলেন। তার বিবরণে জানা যায়,

> "...পাশের একটি বড় ঘরে নানারকমের উপাদানে উপাদেয় সব খাদ্য দ্রব্য প্রচুর পরিমাণে সাজানো ছিল। সবই বাবুর ইউরোপীয় অতিথিদের জন্য বিদেশী পরিবেশক 'মেসার্স গাণ্টার অ্যাণ্ড হুপার' সরবরাহ করেছিলেন। খাদ্যের সঙ্গে বরফ ও মদ্যও ছিল প্রচুর। মণ্ডপের অন্যদিকে বড় একটি হলঘরে সুন্দরী সব পশ্চিমা বাঈজীদের নাচগান হচ্ছিল এবং ইউরোপীয় ও এদেশী ভদ্রলোকেরা সোফায় হেলান দিয়ে চেয়ারে বসে সুরা সহযোগে সেই দৃশ্য উপভোগ করছিলেন।"[১৩]

এক বাঈনাচের খবর বেরিয়েছিল 'এশিয়াটিকজার্নাল'-এ। এতে লেখা হয়েছিল,

> "We had an opportunity on Monday evening of discovering in which particular house, the attraction of any novelty may be found, but from a cursory view, we fear that the chief singer Nikkee and Ashroon, who are engaged by Neel MunneeMullick and Raja Ramchunder, are still without rivals in melody and grace. A woman named Zeenut who belongs to Banaras, performs at the house of BuderNathBaboo, in Jorasanko. Report speaks highly of a young damsel, named Fyz Boksh, who performs at the house of Goroo Parsad Bhos."[১৪]

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্বে, এইসব রাজা-রাজড়ারা আর ছিলেন না কিন্তু ঐসব বাঈজী নর্তকী ও তাদের বংশধরেরা তখনও কলকাতায় আসর জমিয়ে বসে ছিলেন। দুর্গাচরণ রায়ের *দেবগণের মর্তে আগমন* (১৮৮৯) গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, তখনকার দিনের 'বাঈওয়ালির মধ্যে ইলাহিজান...বিখ্যাত'। সঙ্গে সঙ্গে যোগ করা হচ্ছে—

> "খেমটাওয়ালিদের মধ্যে হরিদাসী ও কামিনী বিখ্যাত।"[১৫]

পৃথকীকরণের চেষ্টাটা লক্ষণীয়। পুজোয় এবং বিবাহ উপলক্ষে, গ্রামাঞ্চলে জমিদার ও ধনীগৃহে এ শতাব্দীর শুরুতেও এঁদের বায়না দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। যদিও ব্রাহ্ম সমাজের নেতারা খেমটার সঙ্গে সঙ্গে বাঈ নাচেরও বিরোধিতা করতেন, ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালির অধিকাংশের কাছেই বাঈজী নাচ তার বনেদি, রাজদরবার-সম্পর্কিত উৎসের জন্য পার পেয়ে গিয়েছিল। 'বঙ্গদর্শন' ও 'মধ্যস্থ'-র মতো নব্য শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের মুখপত্রের চোখে বাঈজী নাচ শুধু রুচিসম্মত বলেই বিবেচিত হয়নি, 'পৌরাণিক গাম্ভীর্যের পরিচায়ক' বলেও সম্মানিত হয়েছে।

গওহরজান ছিলেন সেই সময়ের আর এক নামকরা বাঈজী। তার জন্ম ১৮৭৩ সালে। গওহরের আসল নাম এঞ্জেলিনা, বাবার নাম রবার্ট উইলিয়াম, ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। কাশীতে ছিল তাঁর বাসস্থান। মায়ের নাম ভিক্টোরিয়া হেমিংস। ভিক্টোরিয়া ছিলেন অসাধারণ রূপসী। স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হলে সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। নতুন তার নাম হয়মালকাজান। এসময় সে মেয়ের নামও পাল্টে দিল—এঞ্জেলিনা হল গওহরজান, সংক্ষেপে গহর। বস্তুতঃ মুজরোয় নেশার ঘোরলাগিয়ে দেবার মন্ত্র মালকাজানের হাতের মুঠোয় ছিল। এবং সেই বিদ্যা গোপন রাখেননি আদরের মেয়ে

গহরজানের কাছে। বিদ্যেধরীদের ছলাকলায় সবটুকু বিদ্যে উজাড় করে শিখিয়ে ছিলেন মেয়েকে। এর জোরেই গহর বয়সকালে খ্যাতির শীর্ষে পৌঁছেছিলেন। হিন্দুস্থানের সেরা বাঈজীরা ছিল তার প্রতিযোগী। মায়েরা রঙ রূপটুকুর সঙ্গে পেয়েছিলেন নিষ্পাপ মুখশ্রী। অদ্ভুত লাবণ্যময়ী ছিলেন গহরজান। নাচগান শিখতে কোনদিন পরিশ্রমের পরোয়া করেননি। জীবনে যখন যেখানে ভাল গুরুর সন্ধান পেয়েছিলেন, উঠে পড়ে লেগে অল্পদিনেই শিক্ষা শেষ করেছিলেন। পরে যখন জীবিত অবস্থাতেই প্রায় কিংবদন্তীর মত অবস্থা তার, সে সময়ও শেখার বিরাম ছিল না। গওহরজানকে বলা হত 'Indian Nightingale'। তার দক্ষিণা ছিল ১৫০০ টাকা। জানা যায়, ১৯০২ সালে পাটনায় একটা বিয়ে বাড়ির আসরে গওহরজান একখানা স্বরচিত গজল গেয়ে সবাইকে মোহিত করে দিয়েছিল। ১৯২৯ সালে গওহর মারা যায়। গওহরের সংক্ষিপ্ত জীবনী ছাপা হয় ১৯৩০ সালের ১৮ জানুয়ারি 'স্টেটসম্যান' পত্রিকায়। এতে লেখা হয়েছিল,

> "A loss has been sustained by the death in Mysore of Madame Gauhar Jan, where she was Court singer and dansense to H. H. the Maharaja of Mysore."[১৬]

এই কাগজে আরও লেখা হয়,

> "Her fame as a songstress earned her the title of 'Indian Nightingle' and when gramophone records were first made of Indian songs, she was the first to be approched."[১৭]

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, উনিশ শতকের বিকাশমান শহর কলকাতায় নানা ধরণের মানুষ এসে ভিড় জমিয়েছিল। সুযোগসন্ধানী যারা, তারা দেওয়ানী বা মুৎসুদ্দিগিরি কর্ম করে বেশ দু'পয়সাও করে নিল। নিয়ে অভিজাত পংক্তিভুক্ত হবার জন্য গ্রামে-গঞ্জে জমিদারি কিনল এবং শহরে এসে সেই জমিদারির লাভের বখরা নিয়ে তারা একদিন হঠাৎ কাড়িকাড়ি টাকার মালিক হয়ে উঠল। সমাজে তারা 'বাবু' নামে স্বীকৃতিও পেল। এই শ্রেণিভুক্ত সবাই কিন্তু টাকার পেছনে ছুটেননি, অনেকে অবসর সময়ে সমকালীন সমাজধর্ম ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনাও করছিলেন, এবং তাদের এই চিন্তা-ভাবনার মধ্য দিয়েই উনিশ শতকের সূচনায় কলকাতায় এক নব জাগরণের সূত্রপাত হয়। অদৃষ্টবাদে বিশ্বাসী বাঙালির জীবনে এই নবজাগরণ যে কিছু পরিমাণে যুক্তিবাদ নিয়ে এল, তাতে এ যুগের মানুষদের একটা অংশ ('নববাবু'রা) হয়ে উঠল অনেকটা ইহমুখী। একান্ত অদৃষ্ট নির্ভরতা ছিল যার স্বভাবধর্ম, এই সময় থেকে সে নিজের অদৃষ্ট নিজেই তৈরি করতে চাইল, সহায়ক হল সমকালের পরিবেশ। নবকৃষ্ণ, গঙ্গা গোবিন্দ, গোবিন্দরাম, গোপীমোহন, রামদুলালরা হঠাৎ যেন ধনকুবেরের সেই ধন হাতে পেলেন। এই ইহমুখিনতাই হঠাৎ-বড়োলোকদের প্রাণিত করেছিল প্রমোদে গা ভাসিয়ে দিতে। ভোগেই জীবনের সার্থকতা—এই মন্ত্রে বিশ্বাসী হওয়ায় বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে (যেমন দুর্গোৎসব), বিবাহ, অন্নপ্রাশন ইত্যাদি উপলক্ষে তাদের এই ভোগবাদী জীবনের চিত্রটা ফুটে উঠত। কলকাতার এই 'নববাবু'দের ভোগবাদী তথা উশৃঙ্খল জীবনের অন্যতম প্রতীক হয়ে উঠেছিল সেকালের গণিকা তথা বাঈজীরা। উনিশ শতকের কলকাতার বাবুদের এই গণিকা যাপন ছিল তাদের বিলাস বৈভবের পৌরুষ আস্ফালন, কিন্তু একথাও অনস্বীকার্য যে, সমকালীন কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশকে যথেচ্ছভাবে কলুষিত করে তুলেছিল বাবুদের এই গণিকা প্রীতি। বাঈজীদের নাচ গানের দ্যুতির আড়ালে বাবুদের যথেচ্ছ যৌনাচার ও লাম্পট্যের কথা সমকালীন কলকাতার আকাশে বাতাসে কান পাতলেই শোনা যেত, যা শুধু সমকালেই নয় বর্তমান কালের অন্যতম এক আলোচ্য বিষয়। যৌনতার সেকাল ও একালের ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে কলকাতার বাবুদের গণিকা যাপনের ইতিবৃত্ত এক অন্যতম আলোচিত বিষয়।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, লোকরহস্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৮৭৪, পৃ. ২১-২৩
২. ঘোষ, বিনয় (১৯৭৮), *সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ২য় খণ্ড, প্যাপিরাস, কলকাতা, , পৃ. ৭৩
৩. শ্রীপান্থ, শ্রীপান্থের কলকাতা, ত্রিবেনী প্রকাশন প্রা. লি. ১৯৬১, পৃ. ২১৩
৪. *তত্ত্ববেধিনী পত্রিকা*, ১ শ্রাবণ ১৭৬৮ শকাব্দ, ১৮৪৬ খ্রীঃ, ৩৬ সংখ্যা।
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা*, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা, পৃ. ১২১

৬. সুর, অতুল (১৯৮৩), *কলকাতার চালচিত্র*, কলকাতা, পৃ. ১৯৩।
৭. *The India Gazette*, 22 October 1831
৮. জোয়ারদারবিধানাথ (২০১১), *অন্য কলকাতা*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃ. ৯৯-১০১।
৯. শাস্ত্রী,ক শিবনাথ (১৯৫৭), *আত্মচরিত*, কলকাতা, , পৃ. ৫৫-৫৬।
১০. ঘোষ, বিনয় (১৯৮৪), *বিদ্যাসাগর ও বাঙালি সমাজ*, ওরিয়েন্টলংম্যান, কলকাতা,পৃ. ২৫
১১. *ক্যালকাটাক্রনিকল*,২৫ সেপ্টেম্বর ১৭৯২।
১২. মল্লি:্ প্রমথনাথ (১৯৩৫), *কলকাতার কথা*, মধ্যকাণ্ড, কলকাতা, পৃ. ১৪৩-৪৪
১৩. ParkesFanny (1850), *Wanderings of a Pilgrim, in search of the picturesque, during twenty-four years in the East; with revelations of life in the zenana*, London; ঘোষ বিনয় (১৯৬১), *সুতানুটি সমাচার*, কলকাতা, পৃ. ৩৪২
১৪. *এশিয়াটিকজার্নাল*, আগস্ট ১৮১৬, পৃ. ২০৫-২০৬
১৫. রায়, দুর্গাচরণ, দেবগনের মর্তে আগমন, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৮৮৯, পৃ. ২৫৫-২৫৬
১৬. The Statesman, 1930, 18th January
১৭. *Ibid.*

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1060-1070
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.105

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পদক্ষেপ হিসাবে আদিবাসী মহিলা উন্নয়ন প্রচেষ্টা

শুভেন্দু বোস, *সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, ইস্ট ক্যালকাটা গার্লস কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত*

Received: 20.03.2025; Send for Revised: 21.03.2025; Revised Received: 23.03.2025; Accepted: 28.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Tribal communities are very deprived sections of society. They have remained largely excluded from various segments of development. More than 370 million people, roughly 3% of the world's population, belong to tribal communities spread across over 70 countries. Unfortunately, these marginalised groups continue to face systemic exclusion, often experiencing violations of their rights. Poor communication and inadequate policy implementation hinder developmental efforts, directly impacting tribal livelihoods, including their occupations, social standing, financial stability, and access to education. In the modern era, tribal communities remain neglected across multiple aspects of society, such as healthcare, education, and employment. Tribal women are among the most deprived sections. Several social and cultural barriers, including lack of resources, superstitions, and deeply ingrained traditional beliefs, further obstruct their development. To address these issues, the United Nations has adopted 17 Sustainable Development Goals (SDGs) for 2030, aiming to ensure equal opportunities for education and social inclusion for tribal women while fostering their overall development. Governments and non-governmental organizations worldwide are continuously striving to secure the recognition, respect, and preservation of tribal culture, heritage, customs, language, and identity. In India, the government is committed to tribal development specially for women, implementing various policies and initiatives to eradicate poverty, promote linguistic and educational rights, and ensure social dignity for tribal women in alignment with the sustainable development agenda. This study aims to analyse the developmental programs undertaken by both government and non-government sectors to foster tribal development and social inclusion.

***Key words**: Tribal, deprived, development, barriers, traditional, equal opportunities, agenda, social inclusion.*

১৯৯৪ সালে থেকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন করা শুরু করে। আর এরপর থেকেই প্রতিবছর ৯ আগস্ট দিনটি আদিবাসী দিবস হিসাবে পালন হয়ে আসছে। এই দিন বিশ্বের কোটি কোটি আদিবাসী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিশ্বজুড়ে এই দিনটিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে উদযাপন করা হয়। আদিবাসী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম স্বীকৃতির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে অঙ্গীকার করেছিল তা এদিন তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এই বিশেষ দিনে।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মত জনসংখ্যা বিশ্ব জনসংখ্যার ৫ শতাংশেরও কম; বিশ্বের দরিদ্রতম জনসংখ্যার ১৫ শতাংশই আদিবাসী। বিশ্বব্যাপী ৩৭কোটির বেশি আদিবাসী জনগণ কমবেশি সাত হাজার ভাষায় কথা বলে এবং পাঁচ

হাজারেরও বেশি বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। সমাজের এইসব প্রান্তিক জনসমষ্ঠী বিশ্বের বহু জায়গায় আরও বেশি প্রান্তিক হয়ে পড়েছে, তাদের অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, রীতিনীতি, ভাষা ও অস্তিত্বের মতো বিষয়গুলোর স্বীকৃত, সম্মানিত ও উৎকর্ষসাধন নিশ্চিত করতে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো এখনো সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অপ্রতুলতা ও সুযোগের স্বল্পতা, ভাষাগত-সামাজিক বাধা, সম্পদের অপ্রতুলতা, কুসংস্কারকমূলক ও অন্ধবিশ্বাসগত আচরণ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নয়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এইসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে আদিবাসীদের সামাজিক অধিকার ও স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ সালের এজেন্ডা ও টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা (sustainable development goals) গ্রহণ করেছে। এই ২০৩০ এজেন্ডা আদিবাসী সম্প্রদায়সহ সব নাগরিকের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সুযোগ এনে দেয়। এই ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূল উদ্দেশ্য হলো কাউকে পেছনে না ফেলে এগিয়ে চলা, যা আদিবাসীদের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টেকসই উন্নয়নের বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রায় আদিবাসীদের বিষয়গুলো উঠে এসেছে। তার মধ্যে হলো একটি লক্ষ্যমাত্রা ৪, যেটিতে আদিবাসী শিশুদের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। একইভাবে, আরও কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রায় আদিবাসীদের জীবনের কিছু নির্দিষ্ট বিশেষ বিষয়, যেমন ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদন থেকে আয় ও সমষ্টিগত ভূমি অধিকার ইত্যাদি তুলে ধরে। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৮.৬% বা আনুমানিক ১০.৪ কোটি লোকের জন্য তফসিলি উপজাতি (এসটি)। ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ৭৩০টিরও বেশি তফসিলি উপজাতিকে অবহিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৯৭% গ্রামীণ এলাকায় বাস করে, যখন ১০% শহরে বাস করে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে আমাদের সরকার আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষাসংক্রান্ত উন্নয়নের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে দারিদ্র্যতা মোচনে এবং তাদেরকে ভাষা ও শিক্ষার অধিকার প্রদানে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আদিবাসীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আদিবাসীদের সম্পদ, স্বাস্থ্য, কৃষি ও খাদ্য ভোগ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অনুযায়ী আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়গুলোর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের সংস্থা ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এককভাবে কাজ করে চলেছে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান:

পুরুষশাসিত এই সমাজে একটি শিশু জন্মলাভের পর থেকেই লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। জন্মের পর থেকেই শিশুটির বেড়ে ওঠার প্রতিটি পদচিহ্নে চাপিয়ে দেওয়া হয় সমাজের নানা রকম লিঙ্গভিত্তিক আইনকানুন আর তার হাতে-পায়ে সুকৌশলে পরিয়ে দেওয়া হয় লিঙ্গবৈষম্যের কঠিন শেকল। প্রকৃতির সঙ্গে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা শিশুটি একদিন বড় হয়ে কঠিন যে সত্যটি আবিষ্কার করে, সেটি হলো সে একজন নারী। নারী হয়ে জন্ম নেওয়ার কারণেই তাকে সবসময় চালচলনে, আচরণে, হাসি-ঠাট্টায়, চিন্তায়-মননে কঠিন নিয়মকানুনের শেকলে তাকে চলতে হয়েছে। ইচ্ছে করলেই সে পুরুষের মতো আঙিনার বাইরে যেতে পারবে না, গলা ছেড়ে পুরুষের মতো কথা বলতে পারবে না, পুরুষের মতো জেদি হতে পারবে না। তার পোশাক ভিন্ন, খেলনা ভিন্ন, ঘুমানোর জায়গাও ভিন্ন। হ্যাঁ, এ ভিন্নতার জন্য দায়ী তার লিঙ্গ। কারণ সে নারী। শিশুটি যখন নারী হয়ে ওঠে, তখন সে আর পুরুষের মতো চলাফেরা করতে পারবে না, ঘরের ভেতরেই যতটা সম্ভব তার স্থান নির্ধারিত হয়ে যায়। সন্তান উৎপাদন এবং লালন-পালন, স্বামীর জন্য সেজেগুজে অপেক্ষায় থাকা, ঘরকন্যা-রান্নাবাটি সব উপকরণই নারী-অঙ্গের সঙ্গে অবশ্যকরণীয় করে জুড়ে দেওয়া হয়। যেকোনো উপায়ে নারীকে পণ্য করা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি খুব সাধারণ মনোবৃত্তি। ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের কারণে শিল্পের বিপ্লব হয়েছিল বটে কিন্তু এই বিপ্লব সাধন করতে গিয়ে নারীদেরকেও পণ্যতুল্য করা হয়েছিল।

বর্তমান এই সভ্য যুগেও নারী মানেই 'অবলা' বা নারী মানেই 'দুর্বল'- 'পুরুষেদের থেকে ভিন্ন' এই প্রবৃত্তির প্রতিফলন আমরা সবসময় দেখি। এই শিক্ষিত সমাজে নারীরা হরহামেশাই নানাভাবে পুরুষ কর্তৃক নির্যাতনের শিকার

হচ্ছেন। পত্রিকার পাতা খুললে দেখতে পাই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঠানো আমাদের নারী শ্রমিকেরা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে, সম্ভ্রম হারিয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। তারপর এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় মুখরোচক খবর প্রকাশিত হয়, ট্রল হয়, সোশ্যাল মিডিয়াতে নানা কেচ্ছা-কাহিনিরও জন্ম হয়। তারপর সেই নারীটি ধীরে ধীরে ইতিহাসের পাতায় বন্দী হয়ে পড়েন। তার নাম আর কেউ মনে রাখে না। এই তো আমাদের নারীদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা!

সমাজ উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা :

সমাজে শুধুমাত্র নারী হয়ে জন্ম নেওয়ার জন্যই নারীদের বিভিন্ন নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। আদিকাল থেকেই চলে আসা এইসব নির্যাতনের কারণে নারীরা তার খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ, রাজনীতি এবং কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণসহ সকল বিষয়ে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন নারীকে বয়স ভেদে, সম্পর্কের ভিন্নতায়, স্থানের তারতম্যতায় নানামুখি নির্যাতনের শিকার হতে হয়। নিরক্ষর, শিক্ষিত, ধনী, গরীব, গ্রামীণ, শহুরে, শিশু কিংবা বৃদ্ধ নির্বিশেষে নারীরা নির্যাতনের শিকার। সময় পরিবর্তন হলেও পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র দ্বারা সৃষ্ট নানা বিধি-নিষেধ নারী জাতিকে যুগ যুগ ধরে পরাধীন করে রেখেছে । নারীদের প্রতিক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার করে চলেছে। আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। এ অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের বাইরে রেখে দেশের উন্নয়ন কখনও সম্ভব নয়। সমাজের সার্বিক উন্নয়ন করতে নারীদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারীর কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বিশেষ করে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা-এমডিজি'র লক্ষ্যার্জনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিওগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারীর আয়-উর্পাজন দেশের উন্নয়নে অবদান রাখেছে বিশেষ করে ক্ষুদ্র নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন দেশের উন্নয়নের অংশীদার। নারীর প্রতি নির্যাতন-বৈষম্য কমিয়ে আনতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন প্রয়োজন। দেশের উন্নয়নে নারীর অবদানকে আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী বৈষম্য, বঞ্চনা-অন্যায্যতার শিকার নারী সমাজের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশের মাইলফলক আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ঘোষণা এসেছিল ১৯১০ সালে কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারীদের সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক নারীনেত্রী ক্লারা জেটকিনের প্রস্তাবে। ১৯১১ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে এ দিবসটি প্রথম পালিত হয়। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের ঘোষণার মধ্য দিয়ে সরকারি-বেসরকারি সব পর্যায়ে সব সদস্য রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে আসছে। এ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নারীরা একে অপরের কাছাকাছি এসেছে। একে অপরের দাবিতে একাত্ম হয়ে নারী অধিকারের পক্ষে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছে।

অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। নারীর স্বার্থে অনেক নীতি, আইন, ব্যবস্থা চালু হয়েছে। নারী সমাজ দেশে দেশে তার অবস্থানের উন্নয়ন ঘটিয়েছে; কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, এ দিবস পালনের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। কেননা, প্রকৃত অর্থে নারীরা এখন পর্যন্ত বৈষম্য, বঞ্চনা, অধিকারহীনতার শিকার হয়ে দিন কাটাচ্ছে। যে দর্শন, যে দৃষ্টিভঙ্গি, পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা নারীকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করে না, মর্যাদা দেয় না, মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয় না, সেখানে এখন পর্যন্ত কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

বর্তমানে নারী হিসাবে যেমন প্রায় সব নারীই বৈষম্যের শিকার। কিন্তু বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক নারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ বৈষম্য আরও বেশি প্রকট। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সামগ্রিক বৈশ্বিক উন্নয়নের সূচকে। তাই সামগ্রিক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মূল ধারার উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

আদিবাসী ধারণা:

'আদিবাসী' বলতে কাদের বোঝায় এখনও পর্যন্ত সে বিতর্ক অমীমাংসিত রয়ে গেছে । 'আদিবাসী' শব্দটির প্রকৃত সংজ্ঞা ও তাদের জাতীয় পরিচয় ও অধিকার নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে এবং সেটা অদ্যাবধি জারি আছে। একটি রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে বসবাসকারী একদল জনগোষ্ঠী যারা সাংস্কৃতিকভাবে সংখ্যালঘু, যাদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে, যা জনতাত্ত্বিক সংখ্যাগুরুদের সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র এবং যাদের একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার আছে এবং যারা রাষ্ট্রের কাঠামোয় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক তারাই আদিবাসী হিসাবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। এসব বিচার-বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই অনুমেয় যে ভারতে বসবাসকারী সাঁওতাল, গারো, মুন্ডা, ওরাং, মণিপুরি, হাজং, পাত্র, জৈন্তা, খাসিয়া, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খেয়াং, খুমি, লুসাই, পাংখোয়া প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী আদিবাসী হওয়ার দাবি রাখে। নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা নিয়ে প্রান্তিক অবস্থানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে যদি বিশ্বব্যাপী 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ তপশিলী উপজাতিভুক্ত। সংখ্যার নিরিখে যা ১০ কোটির বেশি। ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২ নম্বর অনুচ্ছেদে ৭৩০টিরও বেশি তপশিলী উপজাতি গোষ্ঠীকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। আদিবাসী সমাজগুলি তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারত ও ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তারা ছড়িয়ে রয়েছে।

আদিবাসী হলো একটি দেশের নাগরিক, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত তাদেরও এই দেশের জল-হাওয়া সমানভাবে স্পর্শ করে। এইসব নৃ-গোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ধর্ম, ভাষা, ও সংস্কৃতি। রয়েছে নিজস্ব আচার অনুষ্ঠানও। ঐতিহাসিক কাল থেকেই তারা এদেশে বসবাস করছে। এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে তারা আমাদের সংস্কৃতিকে করছে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পরিপুষ্ট। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, তারা যেন নিজভূমে পরবাসী। সাংবিধানিকভাবে এসকল জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি তাই কোনোভাবেই উপেক্ষার নয়। লিখিত বর্ণমালা না থাকা সত্ত্বেও নিসর্গকেন্দ্রিক জীবনে তাদের প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে উৎসব, পার্বণ, নৃত্য, গীতিনাট্য, গীতিকা, পালা ইত্যাদির মতো নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্যের বিপুল সম্ভার। যা তাদের একটি জাতির সমতুল্য হবার যোগ্য করে তোলে নিঃসন্দেহে।

আদিবাসী নারী পরিচিতি:

যখন সভ্য সমাজ গঠন হয়নি, বা আজকের মতো দেশ, প্রদেশ, মহাদেশ তৈরি হয়নি তখন থেকে ঘরে বাইরে জল জঙ্গলকে ঘিরে এক ধরনের সামাজিক -আর্থিক কর্মকাণ্ড গড়ে তুলেছিলেন যে সম্প্রদায় তারাই হলো আদিবাসী। আজ সেই আদিবাসী সম্প্রদায় বিশেষ করে তাদের মহিলাদের আজ বিপন্নতার শেষ নেই। বন জঙ্গল পাহাড়ের অর্থনীতিকে নিজস্ব জীবিকার অর্থনীতিতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছিল আদিবাসী নারীদের নিজস্ব স্বর, সংস্কৃতি ও আর্থিক শৃঙ্খলা। একটা সময়ে পশ্চিমবঙ্গ বা বিহার বা ওড়িশা নামের কোনও প্রদেশ বলে যখন কিছু ছিল না, তখন থেকেই পাহাড় ও বনাঞ্চলকে কেন্দ্র করে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছেন। এ সহজ কথা নয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একাধিক অন্যায় চাপের মুখে দাঁড়িয়ে সবাক ও স্বনির্ভর হতে চেয়েছে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি। সে লড়াই শেষ হয়নি।

ভারতে আদিবাসী নারীর অবস্থা:

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৫০টি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে। আদিবাসীরা রাজ্যের জনসংখ্যার প্রায় ৭%। আদিবাসী মহিলারা আদিবাসী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ধারাবাহিক লড়াই আন্দোলনের মধ্য খাদ্য, শিক্ষা ,স্বাস্থ্য, বাসস্থানের অধিকারের পাশাপাশি বন-জঙ্গল, প্রাকৃতিক পরিবেশ সকলেরই প্রয়োজন। কিন্তু বনকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় মহিলাদের। ঘর-সংসার চালনোর জন্য কিছু জিনিস যেমন জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করেন, তেমনি তাঁদের পুষ্টি, তাঁদের সুরক্ষাও জঙ্গল থেকেই সংগ্রহ করে থাকেন। আদিবাসী মহিলাদের জঙ্গলে ঢোকার উপরে, কাঠ সংগ্রহ, পাতা তোলায় বাধা-নিষেধ আছে। অথচ আমাদের জীবন-জীবিকা তো জঙ্গলের উপরেই নির্ভরশীল। আদিবাসী

মহিলাদের অবস্থা উন্নত করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া, আদিবাসী মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করা, আদিবাসী নারীদের অর্জিত অধিকার ফিরিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য কেন্দ্রে ও রাজ্যে সমদরদী সরকার প্রয়োজন।

আদিবাসী সাঁওতাল নারী অধিকার বিঘ্নিত:

পৃথিবীর সহজ-সরল এবং সাহসী মানব সম্প্রদায়ের একটি হলো আদিবাসী সম্প্রদায়। সমাজের মূলস্রোত থেকেই অনেক পিছিয়ে থাকা এই জনগোষ্ঠীদের মহিলাদের অবস্থা খুব সঙ্গীন। আমাদের বৃহত্তর সমাজে নারীর যে চিত্র আমরা পাই, আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের নারীরাও সেই একইরকম বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। যারা প্রজন্ম-প্রজন্মান্তর ধরে কর্মঠ, শক্তিশালী, উদ্দাম; সেই সাঁওতাল নারীরা আজও কত অসহায়! আমাদের দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তুলনায় আদিবাসী সাঁওতালরা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ ও দুর্বল। আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজের সম্পদ, উৎপাদনের মাধ্যম, নারীর শ্রম ইত্যাদির ওপর পুরুষের কর্তৃত্বের বৈধতা স্বীকার করে। এ ধরনের সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক অধস্তনতা ও কর্তৃত্ব, নির্ভরশীলতা ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়। সমাজপতিরা যেহেতু পুরুষ, তাই সমাজের পদে পদে নিত্যনতুন ব্যবস্থাপনায় তারা নারীকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। পিতৃতান্ত্রিক এ সমাজে শুধু পুরুষ নয়, সামাজিকায়ন প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সর্বক্ষেত্রে নারীকে অধস্তন ও পুরুষকে প্রাধান্য বিস্তারকারী হিসেবে দেখতে চায়। শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নিপীড়ন, উচ্ছেদ আতঙ্ক প্রভৃতি চরমভাবে লঙ্ঘন করেছে আদিবাসী সাঁওতাল নারীর মানবাধিকার। আবার সাঁওতালদের সমাজে মেয়েরা ব্যাপক মাত্রায় বাল্যবিয়েরও শিকার হয়। সাঁওতালদের অধিকার আদায়ে শিক্ষিত-সচেতন করার পাশাপাশি আইনি সহায়তা দেওয়াও খুব জরুরি। আরো জরুরি হচ্ছে সাঁওতালদের যেসব প্রথাগত আইন বা নিয়ম রয়েছে সেগুলোর সংস্কার করা। সাঁওতালদের মানবাধিকার রক্ষায় প্রথাগত আইন কল্যাণকর অংশটুকু রেখে বাকিটুকু যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সাঁওতালসহ বিভিন্ন আদিবাসী নারীর সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকার, পারিবারিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সরকার যদি সঠিকভাবে পালন করে, তবেই তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে।

বিপদগ্রস্থ ভারতবর্ষে আদিবাসীদের অর্জিত আধিকার:

জল, জমি, বন, পাহাড়, পশু, পাখি প্রভিতি প্রাকৃতিক বিষয়গুলো আদিবাসীদের জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের সাথে হাজার হাজার বছর ধরে জড়িয়ে। আর ঠিক এই কারণেই এই সম্পদগুলি রক্ষা করা আদিবাসীরা তাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করে। বনাঞ্চলে খনন ও খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের নামে শুরু করেছে ব্যাপক হারে বৃক্ষনিধন। শুধুমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফার স্বার্থে সরকারের এই অগণতান্ত্রিক নীতির কারণে হাজার হাজার আদিবাসী মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আদিবাসী মানুষের উপর সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানিক অত্যাচার।

বনাধিকার আইন ২০০৬-এর আইন অনুযায়ী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল যে জঙ্গলের জমি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার আগে সেখানকার অধিবাসীদের মতামত এবং সম্মতি নিতে হত সরকারকে। কিন্তু বনাধিকার আইন-২০০৬কে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি মারফত ফরেস্ট কনজারভেশন রুল-২০২২ জারি করেছে। ২০২২ এর নতুন নিয়মে এসবের আর প্রয়োজন নেই। প্রকল্পের বিস্তারিত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার সাথে সাথেই অনুমোদন দিয়ে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। বেসরকারি মালিকের হাতে জমি তুলে দেওয়ার পর জঙ্গলের অধিবাসীদের সম্মতি নেওয়া ও পুনর্বাসনের বিষয়ে আলোচনার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি জাতির একটি নিজস্ব ভাষা আছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন জনজাতির-সাঁওতাল, কোল, হৌ, ওঁরাও, মুণ্ডাদের ভাষা আলাদা ও সংস্কৃতি আলাদা। ভাষার নামও আলাদা আলাদা। যেমন সাঁওতালদের ভাষা সাঁওতালি, মুণ্ডাদের ভাষা মুণ্ডারি ইত্যাদি। সুদীর্ঘকাল ধরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের ভাষার সরকারি স্বীকৃতি ও সংবিধানের অষ্টম তফসিলে তা অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আন্দোলন করে আসছে। বিরসা মুণ্ডাকে নিয়ে বিরাট হৈচৈ চলছে। অথচ তিনি যে জনজাতি গোষ্ঠীর অর্ন্তগত, সেই মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা মুণ্ডারিকে আজও কেন্দ্রীয় সরকার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়নি। কিছু ভাষাকে আমাদের রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকার দ্বারা সরকারি

ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এরপরও এইসব ভাষা শিক্ষার উপযোগী কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে সরকারি উদাসীনতা লক্ষণীয়। প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আছে বিস্তর। স্কুলছুটের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে- মধ্যপ্রদেশ, আসাম, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার রক্ষায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ লড়াই করে চলছে। একদিকে দেশের সরকার ও বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী, অন্যদিকে সাধারণ আদিবাসী সম্প্রদায়। শিল্পায়নের নামে, উন্নয়নের নামে জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে বহুজাতিক কর্পোরেটের হাতে। বাস্তুহারা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ আদিবাসী পরিবার।

বর্তমানে এই স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে আদিবাসীরা তাদের অর্জিত যে আধিকারগুলো হারাচ্ছে সেগুলো নিম্নরূপ-

১। বৈষম্য - আদিবাসী মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের অনেক বাধা রয়েছে।

২। জমি অধিগ্রহণের সমস্যা - আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহনের সমস্যা এখনও সমাধান হয়নি।

৩। সচেতনতার অভাব - আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলত আদিবাসী নারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে, তাদের সচেতন করার জন্য সরকারের কোনও সদিচ্ছারও অভাব রয়েছে।

৪। দারিদ্র - আদিবাসী মহিলারা এখনও দারিদ্র্যের স্বীকার, সমবায় প্রকল্প গুলির মাধ্যমে মহিলাদের স্বাবলম্বী করার কোন প্রয়াস বর্তমান সরকারের নেই।

৫। অনিয়মিত আয় - তাদের আয়ের উৎস অনিয়মিত এবং অনিশ্চিত।

৬। কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব - আদিবাসী মহিলাদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ কম।

৭। শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব - শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে অনেক আদিবাসী মহিলা কাজ পান না, তাদের শিক্ষিত করার ও বিভিন্ন কাজে ট্রেনিং দিয়ে কাজে উপযুক্ত করার কোন পরিকল্পনা নেই।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলাদের বঞ্চিত ও অত্যাচারিত হওয়ার আরও কিছু উদাহরণ :

- ডাইনি প্রথা- আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনেক স্থানে ডাইনি প্রথার কুসংস্কার এখনও বিদ্যমান। এর ফলে অনেক আদিবাসী মহিলা নির্যাতের স্বীকার হন।
- মাসিক স্বাব এর ক্ষেত্রে কুসংস্কার- মাসিক স্বাবকে অপবিত্র মনে করে আদিবাসী মহিলাদের এই সময়ে ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হয় না।
- বিধবার পূর্ণ বিবাহের নিষেধ- কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ে বিধবা মহিলাদের পূর্নবিবাহে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

কুসংস্কার দূর করার জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নেওয়া হয়েছিল যেমন:

- সচেতনতা বৃদ্ধি- আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার চালানো।
- শিক্ষার প্রসার- আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- আইনি সহায়তা- কুসংস্কারের কারনে মহিলারা নির্যাতিত, তাই এদের আইনি সহায়তা প্রদান করা।

বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি):

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেন্ডা' গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে '২০৩০ এজেন্ডা' এমন একটি কর্ম-পরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে; সকল

ধরনের বৈষম্যের অবসান ও অসমতা হ্রাসের গুরু দায়িত্ব পালন করাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে। আর এসব কর্মকান্ডের মূলমন্ত্র হবে "কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No one will be left behind)" নীতি অনুসরণ।

এসডিজির ১৭টি অভীষ্ট এবং এর ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা যা ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য বিশ্বের প্রায় সকল দেশ একমত হয়েছে জাতিসংঘের এক সাধারণ সভায়। আমাদের সরকার প্রধানও সে সভায় ছিলেন এবং এগুলি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন।

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন (SDG):

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে বিভিন্ন প্রান্তের নারীরা যার মধ্যে আছে গ্রামীণ নারী, কৃষক, আদিবাসী নারী, নানাভাবে প্রকৃতিকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। প্রকৃতির কাছাকাছি তাদের অবস্থান, প্রকৃতির ভালো-মন্দ তারা অনুভব করেন।

সময়ের বিবর্তনে আজকের নারী আন্দোলন শুধু নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অধিকার আদায়ের আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নারী আন্দোলন আজ অনেক বেশি ব্যাপকতা লাভ করেছে। নারী আন্দোলন আজ সার্বজনীন মানবাধিকার আন্দোলনের সমার্থক। যেখানে যুক্ত হয়েছে বিশ্বের সব প্রান্তের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, যার মধ্যে রয়েছে আদিবাসী, দলিত, হরিজন, অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, জাতিগত সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী, ভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষ-উন্নয়ন পরিকল্পনার বাইরে যাদের অবস্থান। আজকের নারী আন্দোলন শুধু নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে না। নারী আন্দোলন আজ সামগ্রিক, টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপকার এবং চালিকাশক্তি। আজকের নারী আন্দোলন সমান অংশীদারত্বের ভিত্তিতে সব মানুষের জন্য আগামী দিনের একটি স্থায়িত্বশীল বাসযোগ্য বিশ্ব গড়ার আন্দোলন। যে আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব সম্প্রদায়, গ্রহণ করেছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা।

বিগত দিনগুলোর মতো যদি এবারও আমরা শুধু মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাসে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকি, তাহলে এ পরিকল্পনা পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হবে না। নারী এবং সব মানুষ যদি মানবাধিকার এবং মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী না হই, প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করি, যার মধ্যে পড়ে নারীর সম্পদ-সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার, সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ, প্রতিনিধিত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিশ্চয়তা। তাহলে নারীরা পিছিয়েই থাকবে। লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরি।

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন নারীর চোখে বিশ্ব দেখার যে আহ্বান জানিয়েছিল, সেখান থেকে নারী আন্দোলন ক্রমেই তা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করেছে।

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় টেকসই উন্নয়ন (SDG) অভীষ্ট ৫ এর (জেন্ডার সমতা) লক্ষ্যমাত্রা:

নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত।

এসডিজি ৫ হলো 'জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন। 'কাউকে পিছিয়ে না দেওয়ার' অঙ্গীকারের মাধ্যমে দেশগুলি প্রথমে সবচেয়ে পিছনে থাকা লোকদের জন্য দ্রুত অগ্রগতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। এসডিজি ৫-এর লক্ষ্য নারী ও মেয়েদের সমান অধিকার, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য বা কোনো সহিংসতা সহ বৈষম্য ছাড়াই মুক্তভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ প্রদান করা। এটি লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সমস্ত নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য।

৫.১ সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো

৫.২ পাচার, যৌন হয়রানি ও অন্যসব ধরনের শোষণ-বঞ্চনা সহ ঘরে বাইরে সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সহিংসতার অবসান

৫.৩ শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী যৌনাঙ্গচ্ছেদের মতো সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রার অবসান

৫.৪ সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক পরিচর্যাকার্য ও গৃহস্থালি কাজের মর্যাদা ও স্বীকৃতিদান এবং বাসা ও পরিবারের অভ্যন্তরে জাতীয়ভাবে যুক্তিযুক্ত অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্বপালনকে উৎসাহিত করা

৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা

৫.৬ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন ও বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং এদের পর্যালোচনামূলক সম্মেলনসমূহের ফলাফল-দলিলের আলোকে স্বীকৃত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

৫.৭ বিদ্যমান জাতীয় আইনকানুনের আলোকে, অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদন।

৫.৮ নারীদের ক্ষমতায়নে সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।

৫.৯ সকল পর্যায়ে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং নারী পুরুষ সমতা আনয়নে যথাযথ নীতিমালা ও প্রয়োগযোগ্য আইনি বিধান প্রণয়ন ও শক্তিশালী করা।

টেকসই উন্নয়ন (SDG) অভীষ্ট ৫ এর (জেন্ডার সমতা) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সুপারিশমালা:

১. আদিবাসী নারীর সকল মানবাধিকার নিশ্চিত করা।
২. ২০০৬ বনাধিকার আইন আমাদের অধিকার, সেটা যেন প্রতিষ্ঠা হয়।
৩. আদিবাসী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা বন্ধে দ্রুত ও কার্যকর হস্তক্ষেপ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিরাপত্তা জোরদার করা।
৪. আদিবাসী নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা এবং সহিংসতার শিকার আদিবাসী নারী ও শিশুদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা প্রদান করা।
৫. এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও নারী উন্নয়ন নীতিমালায় আদিবাসী নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং সকল ধরনের নীতিমালা গ্রহণের পূর্বে আদিবাসী নারী নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ করা।
৬. নারীদের সকল ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে একটি বিশেষ সেল গঠন করা।
৭. আদিবাসী নারীদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং আদিবাসী মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু কমানোর লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৮. ভূমি ও সম্পত্তির উপর আদিবাসী নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং বন, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করা।
৯. শিক্ষা কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের জন্য কোটা নিশ্চিত করা এবং আদিবাসী বিধবা ও বয়স্ক ভাতা নিশ্চিত করা।
১০. জাতীয় সংসদে অঞ্চলভিত্তিক এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আদিবাসী নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
১১. জল-জমি-জঙ্গল রক্ষা করতে হবে। জঙ্গল সবার জন্য রক্ষা করা।

আদিবাসী নারীদের উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারি কর্মসূচি:

কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প –

১. প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় বিকাশ মিশন (PMJVM): এই প্রকল্পটি আদিবাসীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য পূর্ববর্তী দুটি প্রকল্প, অর্থাৎ, 'ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) এবং MFP-এর জন্য মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বনজ পণ্য (MFP) বিপণনের প্রক্রিয়া।
২. উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উপজাতীয় পণ্যের প্রচারের জন্য বিপণন ও সরবরাহ উন্নয়ন (PTP-NER)

৩. জাতীয় / রাজ্য তফসিলি উপজাতি অর্থ ও উন্নয়ন কর্পোরেশন (NSTFDC/STFDC) -কে ইক্যুইটি সহায়তা।

৪. তফসিলি উপজাতিদের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তহবিল (VCF-STs)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি প্রকল্প|:

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এই দপ্তর থেকে তপশিলী জাতি, আদিবাসী অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পুরুষ ও মহিলা যাদের বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে (দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী) তাদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
নিম্নলিখিত প্রকল্প গুলির মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয়:

এসিপি (SCP) মধ্য মেয়াদি ঋণ

মেয়াদি ঋণ (Term Loan)
লোগো ব্যবসায়ী যোজনা (LVY)
মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা (MSY)
বিশেষ সহায়তা প্রকল্প (TSP)
শিক্ষা ঋণ (Education Loan)

প্রচলিত কিছু প্রকল্পের উদাহরণ: গাভী, হাঁস, মুরগি, ছাগল ইত্যাদি পালন, পরিবহনের নিমিত্ত গাড়ি ক্রয়, ছোট মাপের উৎপাদনমুখী উদ্যোগ, ঔষধের দোকান, মুদিখানা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ট্রাক্টর পাওয়ার টিলার, বিভিন্ন প্রকারের মেরামতের দোকান, ইন্টারনেট ধাবা, স্টুডিও, ডাটা প্রসেসিং সেন্টার, গ্রাফিক্স এর দোকান, সোনা রুপার গহনার ব্যবসা, কৃষি ও সহায়ক প্রকল্প, পান বিড়ির দোকান, ক্ষুদ্রসেচ, ভ্যান রিক্সা, সবজি ব্যবসা বড়ি/পাপড়/আচার তৈরি, গুঁড়ো মসলা, জুতা/চামড়ার দ্রব্য তৈরি/ব্যবসা, সেলুন ইত্যাদি।

এছাড়াও তপশিলি জাতি আদিবাসী অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং সাফাই কর্মী পরিবারের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই, বিউটিশিয়ান, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং, মোবাইল রিপেয়ারিং ইত্যাদি এ ধরনের প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে।

উপসংহার: সমাজের সার্বিক নারী সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। আদিবাসী মহিলারা তুলনায় আরও বেশি অত্যাচারিত ও অবহেলিত। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাদের সর্বদা করে রাখা হয়েছে অবদমিত। তাই এইসব নিপিড়িন, বৈষম্য দূর করে নারী উন্নয়ন শুনিশ্চিত করতে জাতীয় উন্নয়ন হল অন্যতম পূর্বশর্ত। বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে sustainable development goals (নারী উন্নয়নে টেকসই উন্নয়ন) গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনায় সার্বিকভাবে বিশ্বের সব নারী সহ আদিবাসী নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, সেবা ও অন্যান্য খাতে বর্দ্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য দূর করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, স্ব-কর্মসংস্থান ও ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা, জেন্ডার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নারীর জন্য সহায়ক সুবিধা সম্প্রসারণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনের সময়সীমা ২০৩০ সালের মধ্যে নির্ধারিত ১৭ দফা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রায় সকল ফোরামের সাথে সাথে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এই লক্ষ পূরণে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক স্তরে আদিবাসী নারী ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা চলছে।

'নারী-পুরুষের সমতাই হবে টেকসই আগামীর নিশ্চয়তা'। এ আগামী শুধু নারীর নয়, সমগ্র মানবসমাজের, এ বিশ্বের। সুতরাং এই আন্দোলনে সবাইকে যুক্ত হতে হবে, যুক্ত করতে হবে। নারী আন্দোলন অনুভব করছে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণের মধ্যে দিয়েই বিশ্বে শুধু নারীর উন্নয়ন নয়, নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত নয়, এ বিশ্বের টেকসই উন্নয়ন এবং সার্বজনীন মানবাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব এবং যার কোনো বিকল্প নেই।

আজকে যদি নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা না করা যায়, উন্নয়ন ধারার সঙ্গে যদি লিঙ্গ সমতা নারীর মানবাধিকারের ধারণায় সম্পৃক্ত করা না যায়, তাহলে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের অঙ্গীকার ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে না। সব ক্ষেত্রে নারীদের মূলত আদিবাসীদের মত পিছিয়ে পড়া নারীদের সমান অংশগ্রহণ এবং অংশীদারত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে নিজেদের এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করা, টেকসই করা সম্ভব । এই লেখনীর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এই সচেতনতা গড়ে তলায় হোক আজকের দিনের প্রতিশ্রুতি।

তথ্যসূত্র:

১. বিশ্ব ব্যাঙ্ক, সাউথ এশিয়া ভ্যাকসিনেটস, সাউথ এশিয়া ইকোনমিক ফোকাস (মার্চ), ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ওয়াশিংটন, ডি সি, ২০২১।

২. গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স: ওয়ান ডেকেড টু জিরো হাঙ্গার: লিঙ্কিং হেলথ অ্যান্ড সাসটেনেবল ফুড সিস্টেমস।

৩. মেটারনাল অ্যান্ড চাইল্ড ডায়েটস অ্যাট দ্য হার্ট অফ ইমপ্রুভিং নিউট্রিশন।

৪. এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ইউ এন-উইমেন, জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড দ্য সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গালোস ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক: বেসলাইন অ্যান্ড পাথওয়েজ ফর ট্রান্সফর্মেটিভ চেঞ্জ বাই ২০৩০, ব্যাঙ্কক: এ ডি বি অ্যান্ড ইউ এন উইমেন, ২০১৮।

৫. জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড দ্য সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গালোস ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক: বেসলাইন অ্যান্ড পাথওয়েজ ফর ট্রান্সফর্মেটিভ চেঞ্জ বাই ২০৩০।

৬. ইউনিসেফ (এন, ডি), উইমেনস নিউট্রিশন।

৭. গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স: ওয়ান ডেকেড টু জিরো হাঙ্গার: লিঙ্কিং হেলথ অ্যান্ড সাসটেনেবল ফুড সিস্টেমস।

৮. এন রাও, দি অ্যাচিভমেন্ট অফ ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন সিকিওরিটি ইন সাউথ এশিয়া ইন ডিপলি জেন্ডারড, নেচার ফুড ওয়ান (২০২০): ২০৬-২০৯।

৯. কে লাহিড়ি-দত্ত, এক্সপিরিয়েন্সিং, কোপিং উইথ চেঞ্জ: উইমেন-হেডেড ফার্মিং হাউসহোল্ডস ইন দি ইস্টার্ন গ্যাঞ্জেটিক প্লেনস, ক্যানবেরা: অস্ট্রেলিয়ান কাউন্সিল ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (২০১৪)

১০. টি কে অধিকারী, ডু উইমেন ওয়ার্ক অ্যান্ড মেন ডিসাইড? জেন্ডার ডাইমেনস অব ক্যাশ ক্রপিং ইন দ্য মিডল হিলস, বার্গন: ডিপার্টমেন্ট অব জিয়োগ্রাফি, ইউনিভার্সিটি অব নরওয়ে (২০১৩) ।

১১. বি আগরওয়াল, জেন্ডার অ্যান্ড কম্যান্ড ওভার প্রপার্টি: আ ক্রিটিক্যাল গ্যাপ ইন ইকোনমিক অ্যানালিসিস অ্যান্ড পলিসি ইন সাউথ এশিয়া, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ২২, নম্বর ১০ (১৯৯৪): ১৪৫৫১৪৭৮।

১২. জয়দীপ হার্দিকর, মাইগ্রেশন, এগ্রিকালচার অ্যান্ড উইমেন।

১৩. ভাবনা কে সি এবং ডিগবি রেস, উইমেনস অ্যাপ্রোচ টু ফার্মিং ইন দ্য কনটেক্সট অব ফেমিনাইজেশন অফ এগ্রিকালচার।

১৪. এ এন জি ও সি এবং ল্যান্ড ওয়াচ এশিয়া, উইমেনস ল্যান্ড রাইটস ইন এশিয়া, ইস্যু ব্রিফ (২০১১)

১৫. পি চৌধুরী, আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইমেনস ল্যান্ড রাইটস: জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন ইন ওনারশিপ, ল্যান্ড রিফর্মস ইন ইন্ডিয়া (প্রেম চৌধুরী) ১৩, নিউ দিল্লি: সাজ পাবলিকেশনস ইন্ডিয়া (২০১৭) ।

১৬. মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মারস ওয়েলফেয়ার, ভারত সরকার (জি ও আই), পার্টিসিপেশন। অফ উইমেন ফার্মারস ইন এগ্রিকালচার সেক্টর, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1071-1079
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.106

নাটোর জেলায় শিক্ষাক্ষেত্রে জমিদারদের ভূমিকা: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা

মোঃ তৈয়বুর রহমান, *পিএইচডি ফেলো, ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ স্টাডিজ (আইবিএস), রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী, বাংলাদেশ*

Received: 19.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstract

Natore is a district in the northern part of Bangladesh. Many royal landlords lived here. After the establishment of zamindari, a new trend was created in the education and social activities of this area. In addition to revenue collection, examples of educational activities of the landlords are found. Although revenue collection was their main job, some zamindars of Natore established several educational institutions. An observation of some renowned educational institutions in Natore shows the image of land grants and support of the zamindars. The main objective of this article is to analyze the role of the zamindars of Natore district in the field of education. An attempt has been made to collect information through various books, journals, reports, references and interviews. While analyzing the role of the zamindars in the field of education, this article gives an idea about the education system in contemporary times. This article attempts to provide details of the educational institutions established with the help of the major landlords of Natore district.

Key words: *education, students, teachers, landlords and scholarships.*

নাটোরে রাজা জমিদারদের বসবাস হওয়ায় জেলাটির শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতির চিত্র পাওয়া যায়। সরকারের সহযোগিতার পাশাপাশি জমিদার ও স্থানীয় বিত্তশালী ব্যক্তিবর্গ শিক্ষার অগ্রগতিতে এগিয়ে আসেন। নাটোর ছিল সে সময় রাজশাহী জেলার সদর দপ্তর। নাটোর শহরটি নারোদ নদের তীরে অবস্থিত। নারোদ নদসহ আশপাশের কিছু নদী শুকিয়ে গেলে নাটোর শহরে ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয় এবং বসবাসের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৮২৫ সালে স্বাস্থ্যগত কারণে সদরদপ্তর নাটোর থেকে রাজশাহীর রামপুর বোয়ালিয়াতে স্থানান্তার করা হয়।[১] তৎকালীন সময়ে রাজশাহীর বুয়ালিয়া গ্রাম হলেও ব্যবসার জন্য ছিল গুরুত্বপূর্ণ বন্দর। নাটোর শহরের বিস্তৃতির সাথে জমিদারদের অবদান জড়িয়ে আছে। নাটোরে জমিদারদের অবস্থানকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। তৎকালীন সময়ে জমিদার বংশ বা জমিদাররা যে এলাকায় বসবাস করতো সে এলাকাগুলো মূলত এগিয়ে যেতে থাকে নাটোর জেলার পুরনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় এগুলো জমিদারদের সময়ে স্থাপিত এবং সেগুলো স্থাপনে তাঁদের ভূমিকা রয়েছে। ১৮৩৬ সালে ভারত উপমহাদেশে ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা চালু হয়। বাংলার বিভিন্ন স্থানে ইংরেজি বিদ্যালয় স্থাপিত হতে থাকে। নাটোরে জমিদারদের সহায়তায় ইংরেজি ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। এ সকল বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করে নাটোর ও আশপাশের শিক্ষার্থীরা সচেতন শ্রেণি গঠনে ভূমিকা রাখতে থাকে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো স্থাপনে

জমিদারদের সহায়তার চিত্র পাওয়া যায়। তবে জমিদাররা চাইলে শিক্ষাক্ষেত্রে তারা আরও অবদান রাখতে পারতেন, কেননা সে সক্ষমতা তাঁদের ছিল। তারপরেও আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে তাঁদের উদ্যোগ ও সহায়তা নাটোর অঞ্চলে শিক্ষার অগ্রগতিতে ভূমিকা রাখে। রাজস্ব আদায় করে তারা অনেক অর্থের অপচয় ও বিলাসী জীবন যাপন করেছেন। উদ্বৃত্ত রাজস্ব দিয়ে বেশ কিছু জমিদার প্রজাদের কল্যাণে কাজ করেন এবং শিক্ষাবিকাশে ভূমিকা রাখেন। নাটোর শহর সৃষ্টি ও বিকাশের সাথে জমিদারদের ইতিহাস জড়িয়ে আছে। জমিদারদের সময়ে স্থাপিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো টিকে আছে ও শিক্ষাকার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। মহারাণী ভবানীর সময়কাল থেকেই নাটোরে শিক্ষাবিস্তারে রাজপরিবারের সদস্যদের ভূমিকার চিত্র পাওয়া যায়। রাণী ভবানী নারী শিক্ষাকেও উৎসাহিত করতেন এবং তিনি রাজকুমারীদের বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা প্রদান করার ব্যবস্থা করেন।[২] রাজশাহী ও নাটোরে বহু জায়গায় তাঁর অর্থে টোল ও চতুষ্পাঠী শিক্ষা পরিচালিত হতো। নাটোরের অন্যান্য জমিদারগণও নাটোরে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থাপন করে শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখেন। নাটোরে শিক্ষার উন্নয়ন ও নগরায়ণে জেলার জমিদারদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

নাটোর বাংলা বিদ্যালয় (১৮৪৬)

নাটোর বাংলা বিদ্যালয়টি ১৮৪৬ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় নাটোর রাজের ছোট তরফের রাজা আনন্দনাথের ভূমিকা স্মরণীয়। বর্তমান পুরনো আদালত ভবনের কাছে বিদ্যালয়ের জন্য ভবন তৈরি করা হয় এবং ২৫ জন ছাত্র নিয়ে বিদ্যালয়টি চালু করা হয়। এ কর্মে তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্র ও নাটোর রাজ আনন্দনাথ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বিদ্যালয়টির জন্য দু'জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয় তাঁদের মধ্যে একজন হিসাব ও অংক শিক্ষা প্রদান করতেন ও অপরজন ব্যাকরণ শেখাতেন। মদনমোহন বাচস্পতি ব্যাকরণ শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন।[৩] কিন্তু শুরুতে কিশোরীচাঁদ মিত্র ও রাজা আনন্দনাথের সাথে মতের অমিল দেখা দেয়। কিশোরিচাঁদ মিত্র ও রাজা প্রসন্ননাথের ইচ্ছা ছিল বিদ্যালয়টিতে ইংরেজি শিক্ষা চালু করা। কিন্তু রাজা আনন্দনাথ গোঁড়া হিন্দু হওয়ায় তিনি বাংলা মাধ্যমে বিদ্যালয়টি চালু করেন। তার সাথে স্থানীয় লোকেরাও সমর্থন দেয়। যার ফলে নাটোরে সর্বপ্রথম এই নাটোর বাংলা বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়। ১৮৪৯ সালের দিকে বিদ্যালয়টি শিক্ষার্থীর অভাবে বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষার্থীর সংখ্যা শূন্যের কোটায় নেমে আসে। রাজা আনন্দনাথ এ বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। পরবর্তীকালে এ বিদ্যালয়ের একই স্থানে নাটোর স্কুল নামে বাংলা ভাষা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয় এবং সেটিও পরবর্তীকালে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ হাইস্কুলের সাথে একীভূত করা হয়। বর্তমানে নাটোর বাংলা বিদ্যালয় নামে নাটোরে এ বিদ্যালয়ের কোন অস্তিত্ব নেই তবুও তৎকালীন সময়ে এমন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্যোগ নাটোরের জনসাধারণের মাঝে নতুন আশার সঞ্চার করেছিল।

দিঘাপতিয়া পিএন হাই স্কুল (১৮৫২)

নাটোরে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে অন্যতম হল দিঘাপতিয়া পি এন হাই স্কুল। ১৮৫২ সালে দিঘাপতিয়া পিএন হাই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রসন্ননাথ দিঘাপতিয়া চতুর্থ জমিদার ছিলেন। তিনি প্রথমে একটি মধ্যম পর্যায়ের ইংরেজি স্কুল করার মনস্থির করেন। রাজা আনন্দনাথ যেমন বাংলা বিদ্যালয় স্থাপনের পক্ষে ছিলেন তেমনি প্রসন্ননাথ নাটোরে একটি ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় ছিলেন। তাই রাজা প্রসন্ননাথের প্রচেষ্টায় দিঘাপতিয়া রাজবাড়ির আধা কি.মি পূর্ব দিকে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করা হয়। এটি প্রথম দিকে 'প্রসন্ননাথ একাডেমি' নামে পরিচিত ছিল। ১৮৫২ সালে ২৪ জানুয়ারি এটি উদ্বোধন করা হয় এবং নাটোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীচাঁদ মিত্রকে দেশি বিদেশি বহু গুণীজনের উপস্থিতিতে সভাপতি নির্বাচিত হয়।[৪] নাটোরে ইংরেজি শিক্ষা সূচনাকারী প্রথম স্কুল হলো দিঘাপতিয়া পিএন স্কুল। নাটোর বগুড়া মহাসড়কের উত্তর দিকে ৫.৭৯ একর জায়গা নিয়ে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত। রাজা প্রসন্ননাথ বিদ্যালয়টি যেন অর্থাভাবে বন্ধ না হয়ে যায় সেজন্য ১০৮৪০০ টাকা (এক লক্ষ আট হাজার চারশত টাকা) দিয়ে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার কোলকাতা শাখায় একটি পিএন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন। উদ্দেশ্য ছিল এর মুনাফা হতে আয় দিয়ে নাটোর পিএন স্কুল, রাজশাহীর বোয়ালিয়া চিকিৎসালয় ও নাটোর পুরনো দাতব্য হাসপাতালটি পরিচালনা করা। ১৮৯১ সাল হতে ১৮৯৫ সাল পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে মোট ৩৮ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেয় তার মধ্যে ৬ জন প্রথম বিভাগ, ২০ জন দ্বিতীয় বিভাগ ও ৫ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়।[৫] বিদ্যালয়টি

পরিচালনার জন্য যাবতীয় ব্যয় দিয়ে যা কম পড়তো তার সব অর্থ দিঘাপতিয়া স্টেট হতে দেওয়া হতো। তৎকালীন সরকার বিদ্যালয়টিতে মাসিক ৫০ টাকা প্রদান করতেন কিন্তু দিঘাপতিয়া রাজা সে সাহায্য নেওয়া অবমাননা মনে করতেন। স্কুলের নথিপত্র হতে প্রাপ্ত ১৮৯৫ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ছাত্র বেতন নিম্নের ছক-১ এ দেখানো হল।[৬]

শ্রেণি	মাসিক বেতন
দশম শ্রেণি	১.৫০ টাকা
নবম শ্রেণি	১.৫০ টাকা
অষ্টম শ্রেণি	১.০০ টাকা
সপ্তম শ্রেণি	১.০০ টাকা
ষষ্ঠ শ্রেণি	১.০০ টাকা
তৃতীয় হতে পঞ্চম শ্রেণি	০.৭৫ টাকা

ছক ১: ১৮৯৫ থেকে ১৯০০ খি. পর্যন্ত দিঘাপতিয়া পিএন হাই স্কুলের ছাত্রবেতন বিদ্যালয়টিতে ১৮৯৫ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত যে সকল প্রধান শিক্ষক দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের নামের তালিকা নিম্নে ছক-২ এ উল্লেখ করা হলো।[৭]

ক্রমিক নং	নাম	কার্যকাল
১	বাবু রুদ্রচন্দ মল্লিক	১৮৯৫-১৯০৩
২	যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি	১৯০৪-১৯০৮
৩	নীল মাধব ফণী	১৯০৯-১৯১৮
৪	গোপেন্দ্র কৃষ্ণ সিংহ	১৯১৯-১৯২১
৫	দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৯২২-১৯৪৯
৬	বিজয় গোবিন্দ চোংদার	১৯৪৯
৭	দক্ষিণারঞ্জণ চক্রবর্তী	১৯৫০
৮	কুলদা কান্তি চক্রবর্তী	১৯৫০
৯	মোঃ শহিদুল মিঞা	১৯৬০-১৯৬৭
১০	মোঃ কাশেম আলী	১৯৬৭-১৯৬৮
১১	নুর মোহাম্মদ মণ্ডল	১৯৬৯-১৯৯১

ছক ২: ১৮৯৫ হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকবৃন্দের তালিকা

মহারাজা প্রসন্ননাথ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময় যে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করেন তা ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তা বন্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে ফান্ডের অর্থ প্রাপ্তির চেষ্টা করে তা পাওয়া সম্ভব হয়নি।[৮] রাজা প্রসন্ননাথ বিদ্যালয়টিতে একটি পাঠাগার স্থাপন করেন। সে সময় পাঠাগারে প্রায় ১৪৭০টি বই ছিল। আসবাবপত্র অনেকগুলো রাজা নিজে প্রদান করেন। এই পাঠাগারে রাজা বাহাদুর অনেকগুলো মূল্যবান বই শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জন্য দান করেছেন। এই পাঠাগারে ইংরেজি সাহিত্য, বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, উর্দু সাহিত্য, ফারসি সাহিত্য, অর্থনীতি, বিজ্ঞান, প্রভৃতি গ্রন্থ ছিল। রাজার তৈরি মূল্যবান কাঠের আলমারিতে এগুলো সংরক্ষণ করা হয়। ইংরেজি সাহিত্যের চারটি বই স্বর্ণ খচিত মলাটে আবৃত ছিল। যা একখানা এখনো উত্তরা গণভবনে প্রদর্শনের জন্য সংরক্ষিত আছে। রাজা প্রসন্ননাথের এ পাঠাগারে পারস্যের বিখ্যাত কবি ফেরদৌসের রচিত শাহনামা এবং শেখ সাদীর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘গুলিস্থা বোস্তা’ সংরক্ষিত ছিল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় এই পাঠাগারের মূল্যবান গ্রন্থ পাক হানাদার বাহিনী নিয়ে যায় এবং অনেকগুলো মূল্যবান জিনিস নষ্ট করে ফেলে। ভিক্টোরিয়া এটলাস নামে তৎকালীন সময়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাপ এই পাঠাগারে সংরক্ষিত ছিল যা বর্তমানে দিঘাপতিয়া উত্তরা গণভবনের জাদুঘরে প্রদর্শন করা হচ্ছে।[৯] এখনও এই পাঠাগারে ‘এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা’ গ্রন্থের সবগুলো

খন্ড সংরক্ষিত আছে। তবে এর পাতাগুলো খুব দুর্বল ও তা পড়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে আছে। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর রাজা প্রসন্ননাথ একটি কাঁসার তৈরি ঘণ্টা প্রদান করেন যেটি দিয়ে এখনো বিদ্যালয়ে ঘণ্টা বাজানো হয়। এটি প্রায় ১৭৩ বছরের পুরনো। এই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ পরিদর্শন করেছেন যাদের মধ্যে বাংলার গভর্নর ছোটলাট জর্জ ল্যানস লেট হেয়ার (ক্ষুদিরামের ফাঁসির আদেশ দাতা) যিনি ১৯০৮ সালে বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন। এ ছাড়াও বাংলার গভর্নর টমাস ডেভিড ব্যারন কারমাইকেল, জন লামলি ডান্ডাসসহ অনেকে এই বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেন ও তাদের মতামত লিখে পরিদর্শন বইয়ে স্বাক্ষর করেন। বিখ্যাত এই ব্যক্তিদের পরিদর্শনের স্বাক্ষর বিদ্যালয়টির পরিদর্শন বইতে সংরক্ষিত আছে। বিদ্যালয়টিতে নাটোরের তথা পার্শ্ববর্তী এলাকার অনেক গুণী ব্যক্তিবর্গ অধ্যয়ন করে অত্র এলাকার সুনাম বৃদ্ধি করেছেন। এই বিদ্যালয়টি বর্তমান সময়েও শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে।

মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ হাই স্কুল (১৮৮৪)

নাটোরে স্বনামধন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ হাই স্কুল। শহরের উত্তর প্রান্তে নাটোর রাজ ছোট তরফের বাগানবাড়ির পশ্চিমে দিঘাপতিয়া সড়কের পাশে এ স্কুলের অবস্থান। এ বিদ্যালয়টির পশ্চিমে পুরনো মজাদীঘি ও বড় তরফের রাজবাড়ির অর্ধাংশ, উত্তরে ডোমপাড়া এবং দক্ষিণে বঙ্গোজল অবস্থিত। ১৮৪৯ সালে নাটোর বাংলা বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায় এবং একই স্থানে নাটোরের সাধারণ জনগণের উদ্যোগে ১৮৫৫ সালে একটি বাংলা ভাষা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। 'নাটোর স্কুল' নামে এই বাংলা ভাষা বিদ্যালয়টি ছিল কাছারি মাঠের উত্তর প্রান্তে যেখানে রাজা আনন্দনাথ বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন।[১০] ১৮৫৭ সালে বিদ্যালয়টি সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। ১৮৫৯ সালে বিবরণ অনুযায়ী বিদ্যালয়টির মোট ছাত্র সংখা ছিল ৮৩ জন, এদের মধ্যে ৬৭ জন ছিল হিন্দু ও ১৬ জন ছিল মুসলমান। বেতন ছিল দু আনা। ১৮৫৯ সালে সরকারি সাহায্য মঞ্জুর করা হয় ২৫৬ টাকা ৪ আনা, চাঁদা বাবদ সংগৃহীত হয় ২৪৯ টাকা ৮ আনা এবং মাইনে ও জরিমানা থেকে আয় হয় ৭৭ টাকা ১০ আনা। বাৎসরিক আয় ও হিসাব থেকে উদ্বৃত্ত হয় ৪১ টাকা ১ আনা ৬ পয়সা।[১১] পরবর্তীকালে বিদ্যালয়টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন রাজা চন্দ্রনাথ। তিনি বিদ্যালয়টিতে প্রচুর অর্থ সহায়তা দেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি নর্মাল স্কুল। ১৮৬১ সালের পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যখন নির্দেশ দেয় প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর ইংরেজিতে লিখতে হবে তখন থেকে বিদ্যালয়টিতে ইংরেজি প্রবর্তন করা হয়।[১২] ১৮৬২ সালে নাটোরের খান চৌধুরী পরিবারের মোহাম্মদ আলী খানের বড় ছেলে খান বাহাদুর রশিদ খান অ্যাংলো পারশিয়ান স্কুল নামে একটি স্কুল স্থাপন করেন। পুরাতন নাটোর স্কুলের পাশেই ছিল এটি। ১৮৮৪ সালে নাটোর স্কুল ও অ্যাংলো পারশিয়ান স্কুল একত্র করে 'নাটোর মিউনিসিপাল হাই স্কুল' নাম দেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই নামে স্বীকৃতি দেয়।[১৩] পরবর্তীকালে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয়টি ভালোভাবে চললেও আর্থিক সংকটে পড়ে বিদ্যালয়টি বন্ধ হওয়ার পথে যায়। স্কুলটি টিকিয়ে রাখার জন্য মহারাজা জগদিন্দ্রনাথের কাছে নাটোর মিউনিসিটিপালের তৎকালীন চেয়ারম্যান মহিম চন্দ্র রায় (এল এম এস) সহায়তা চান। মহারাজের কাছে নাটোরবাসীর অভিমত সংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। জগদিন্দ্রনাথ স্কুলটির দায়িত্ব নিতে সম্মত হন। মালিকানা হস্তান্তর ও নিষ্কর ভূমি ব্যবহারের সরকারি অনুমোদন পাওয়ার পর ১৮৯৬ সালে রেজিস্ট্রিকৃত দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ বিদ্যালয়টির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দি নাটোর মহারাজা'জ হাই স্কুল নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নবায়ন দেয়।[১৪] দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাজা জগদিন্দ্রনাথ প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র দিয়ে সাজান। ১৯০১ সালে ভিক্টোরিয়া বোর্ডিং হাউস নামে একটি ছাত্রাবাস চালু করা হয়। অনেক অর্থ ব্যয় করে স্কুল ভবনের দক্ষিণে কাছারি মাঠ ভরাট করা হয়। গরীব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য বার্ষিক পুরস্কার ও বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৬ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত ১৪ বছরে বিদ্যালয়ের জন্য ১৭,৬৮১ টাকা, ছাত্রাবাসের জন্য ৫,৪৮৮ টাকা, বৃত্তির জন্য ২,৩৮৭ টাকা এবং প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের জন্য পুরস্কার ও দশম শ্রেণির জন্য স্মারক বৃত্তির ব্যবস্থা করা হয়। এভাবে ১৪ বছরে ২৬ হাজার টাকা খরচ করেন।[১৫] বিদ্যালয়ে ৯ সদস্য বিশিষ্ট ম্যানেজিং কমিটি গঠন করা হলে মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ সভাপতি হন। মহিমচন্দ্র রায় ছিলেন সম্পাদক, চৌধুরি পরিবারের মৌলভী আবদুর রহিম খান ছিলেন সহ সম্পাদক এবং প্রধান শিক্ষক দুর্গান্দ স্যানাল ছিলেন সদস্য। সরকার ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর বিদ্যালয়টি সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। কিন্তু সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা ছিল না। এ অবস্থায় মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ

রাজবাড়ির নিকট (বর্তমান জায়গা) নিজ জমিতে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু শহরের দক্ষিণপ্রান্ত থেকে এটি দূরে স্থাপন করলে ছাত্ররা অসুবিধায় পড়বে বলে অনেকে বিরোধিতা করেন। বিদ্যালয়টি এ অবস্থায় অনুমোদন বাতিল হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। সরকার রাজবাড়ির নিকট বিদ্যালয় সরানোর মত দেন নতুন ভবনের নকশা ও পরিকল্পনার জন্য জনশিক্ষা পরিচালক ও মহারাজের অনুমোদনের পর কলকাতার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মিলার এন্ড কোং ৩৩,০০০ টাকা চুক্তিতে নির্মাণ কাজে হাত দেন।[১৬] মহারাজা নিজ খরচে স্কুল ভবন, ছাত্রাবাস নির্মাণ, খেলার মাঠ, প্রয়োজনীয় ছাউনি, পায়খানা, প্রস্রাব খানা, কুয়া তৈরি করেন। চতুরটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা হয়। বিদ্যালয় ভবন, ছাত্রাবাস, সীমানা প্রাচীর, প্রধান শিক্ষকের বাসভবন, বৃত্তি প্রদান, বার্ষিক ৩৫০০ টাকার অনুদান, খেলার মাঠ ছাড়াও বিদ্যালয় স্থানান্তর ও উপযোগী করতে জগদিন্দ্রনাথ আরো ৫০-৬০ হাজার টাকা খরচ করেন।[১৭] পরবর্তীকালে বিদ্যালয়টি ক্রমান্বয়ে এগিয়ে যায়। নাটোর জেলার দ্বিতীয় প্রাচীন বিদ্যালয় হল মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ হাইস্কুল। এ প্রতিষ্ঠানটি স্থাপনের ফলে অত্র এলাকার সাধারণ জনগোষ্ঠী শিক্ষার আলোয় আলোকিত হতে থাকে

খাজুরা উচ্চ বিদ্যালয় (১৮৬৪)

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ও জমিদারদের পুরনো গ্রাম খাজুরা যা বর্তমানে একটি ইউনিয়নের মর্যাদাপ্রাপ্ত। নাটোর জেলা সদর হতে ১৫ কি.মি. উত্তর দিকে আত্রাই নদীর ধারে এ গ্রামটি অবস্থিত। ভাদুরী বংশের বসবাস ছিল এ গ্রামে। রাণী ভবানীর সময় ভাদুরী বংশের পূর্বপুরুষ খাজাঞ্চি ছিলেন এবং ভাদুরী বংশ থেকেই খাঁ উপাধির সৃষ্টি হয়। খাঁ উপাধি রানী ভবানীর দেওয়া। রানী ভবানীর কন্যা তারা সুন্দরী বিয়ে এ গ্রামের শ্রীরঘুনাথ লাহিড়ীর সাথে হয়েছিল। গ্রামটিতে বেশ ধুমধামে প্রতি বছর কালীপূজা, দুর্গাপূজা ও মেলা বসে।[১৮] মধ্য মানের একটি ইংরেজি স্কুল এ খাঁ পরিবারের জমিদারদের মাধ্যমে স্থাপিত হয়। জমিদার সম্মানদের লেখাপড়ার জন্য ১৮৬৪ সালে এ বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে সাধারণ ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়টিতে পড়াশুনা করার সুযোগ পায়। জমিদার বাড়িতে থেকে অনেকে পড়াশুনা করতো। প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বিদ্যালয়টি আটচালা খড়ে পাঠদান করা হতো এবং এখানে পূজা মণ্ডপ ছিল বলে জানা যায়। বিদ্যালয়টি ১৯৬৮ সালে হাই স্কুলে উন্নীত হয় এবং ১৯৭০ সালে প্রথমবার মেট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এটি নাটোরের অন্যতম পুরনো বিদ্যালয়। অত্র এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে বিদ্যালয়টি ভূমিকা রাখছে এবং বিদ্যালয়টি এলাকার মানুষ গর্ব করে।

চৌগ্রাম উচ্চবিদ্যালয় (১৯১৩)

চৌগ্রাম নাটোর জেলার সিংড়া থানার একটি বিখ্যাত গ্রাম। মহারাজা রামকান্ত জনককুলের পিতা চৌগ্রাম রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তার বংশজাত রোহিনীকান্ত রায় জমিদার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। চৌগ্রাম সিংড়া হতে উত্তর দিকে অবস্থিত। এই জমিদার বাড়িটি তিন দিক (পূর্ব, উত্তর ও পশ্চিম) দিয়ে পুকুর দ্বারা বেষ্টিত। রোহিনীকান্তের পরবর্তী প্রজন্ম রমণীকান্ত চৌগ্রামে এ জমিদার বাড়ির সন্নিকটে চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯১০ সালে এটির ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হয় এবং ১৯১৩ সালে পাঠদানের স্বীকৃতি ও বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীগণ অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়টি প্রধান ফটকে তাই প্রতিষ্ঠাকাল ১৯১৩ সাল লেখা রয়েছে।[১৯] প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে বিদ্যালয়টিতে ৪ চালা বিশিষ্ট খাড়া টিনের ঘর ছিল। এর চারপাশ মাটির দেওয়াল দ্বারা নির্মিত। এই ঘরটিতে ১০টি কক্ষ ও চারদিকেই বারান্দা দ্বারা ঘেরা। বিদ্যালয়টিতে লক্ষ্য করলে দেখা যায় এর কোন জানালা নেই, তবে দরজা আছে। মাটির দেয়ালের ঘরটি এখনো বিদ্যমান এবং এখানে শিক্ষাকার্যক্রম চলছে। বিদ্যালয়টিতে এখন যেখানে এবতেদায়ী মাদ্রাসা রয়েছে সেখানে মাটির ঘরের একটি হিন্দু বোর্ডিং ছিল। বিদ্যালয়টির মোট জমির পরিমাণ ৩.৭৫ একর এবং এ জমিটি জমিদারদের দান করা। চৌগ্রাম বিদ্যালয়ের পাশেই একটি মাজার রয়েছে। হযরত শাহ সুফি সৈয়দ সুরাফ উদ্দীন ইয়েমেনী (রহঃ) এর মাজারের জায়গা রাজা দান করেন। মাজারের জন্য জায়গা দেওয়া এ জমিদারের একটি ব্যতিক্রম দৃষ্টান্ত ।[২০] প্রতি বছর শেষে রাজা একদিন করে প্রজাদের খাওয়ানোর আয়োজন করতেন বলে জনশ্রুতি রয়েছে। চৌগ্রাম জমিদারদের অত্যাচারের কথা তেমন শোনা যায় না তবে তাদের কর্মচারীরা অনেক সময় খাজনা আদায়ে জবরদস্তি করত। তবে জমিদাররা অনেক সময় খাজনা মাফ করতেন। পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ের কিছু জমি বেহাত হয়। রমণীকান্ত কলকাতার ল্যান্সটাউন রোডে জমি ক্রয় করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং সেখানে তার বাসা থেকে অনেকে

শিক্ষাক্ষেত্রে সহায়তা পেতেন।।[২১] তিনি নদীয়া জেলার খালিশপুর, বরিশাল জেলার সাহাবাজপুর নামে জমিদারি ক্রয় করেন। কলকাতার শহরের উপকণ্ঠে তিনি বহু খামার ক্রয় করেন। চৌগ্রাম বিদ্যলয় থেকে অনেক গুণী শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করে দেশে ও দেশের বাইরে গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্য ছিলেন ডাঃ মওলা বকস, মাদার বখস (রাজশাহী বিশবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে অন্যতম), মোঃ রহমতুল্লাহ (সাবেক চেয়াম্যান রাজউক), মোঃ হানিফ তালুকদার (সাবেক চেয়ারম্যান আনবিক শক্তি কমিশন), মোঃ রমজান আলী (শিক্ষক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), মোঃ আব্দুল জব্বার, মোঃ ফয়েজ উদ্দিন, মোঃ রবিউল ইসলাম, এম কে বাশার, মোঃ ফজলার রহমান, ডাঃ মোঃ জাহিদুল ইসলাম, মোঃ খরশেদুল ইসলাম, মোঃ হাফিজুর রহমান প্রমুখ।[২২] এমন বহু গুণী শিক্ষার্থী এ বিদ্যালয় থেকে শিক্ষালাভ করে অত্র এলাকার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। বিদ্যালয়টিতে বর্তমানে ৫০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। ২০ জন শিক্ষক কর্মরত আছেন। এছাড়া এ বিদ্যালয়টিতে স্কাউট, রেড ক্রিসেন্ট এর কার্যক্রম চালু আছে। জমিদার বাড়ির মাঝ বরাবর পাকা রাস্তা করা হয়েছে। পাশেই একটি ঈদ মাঠ রয়েছে। জমিদার বাড়ির জায়গায় ফায়ার সার্ভিস অফিস, ইউনিয়ন ভূমি অফিস স্থাপন করা হয়েছে।

জোয়ারি হাই স্কুল (১৮৭২)

নাটোর জেলার বড়াইগ্রাম উপজেলার জোয়ারি গ্রামে বিখ্যাত বিশি পরিবারের বসবাস ছিল। বিশি বংশের অনেকে শিক্ষা ও সাহিত্য চর্চায় ভূমিকা রাখেন। জোয়ারি বংশের কেশব বিশি মহাশয়ের প্রচেষ্টায় জোয়ারিতে একটি এম ই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৩] জমিদার পরিবারের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্য বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়। পরবর্তীকালে বর্তমান জোয়ারি বাজার সংলগ্ন স্থানে জমিদারদের ছেলেমেয়ে ও আশপাশের শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার জন্য পাঠশালাটি স্থানান্তর করা হয়। ১৮৭২ সালে কেশব বিশি এ মধ্যমানের ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেন।[২৪] বিশি পরিবারের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিই বর্তমানে জোয়ারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও উচ্চ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি এ এলাকার শিক্ষার উন্নয়নে ভূমিকা রেখে চলেছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ১৯৪৫ সালে প্রথমবারের মত প্রবেশিকা পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পায়। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ বিদ্যালয়টির উন্নতির জন্য অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সিরাজ উদ্দিন সরকার, ইয়াকুব আলি, মৌলভী আজিজুর রহমান, ডাঃ প্রমোদনাথ হালদার, মৌলভী জামাল উদ্দিন, হাজী রিয়াজ উদ্দিন মন্ডল, রজনীকান্ত হালদার প্রমুখ। বিদ্যালয়টির মোট আয়তন ৪ একর।[২৫] বর্তমানে জোয়ারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জোয়ারি উচ্চ বিদ্যালয় দুটি পাশাপাশি অবস্থান করছে।

ধরাইল উচ্চবিদ্যালয় (১৩২৩ বাং)

ধরাইল জমিদার বংশের আদি পুরুষ বৈশ্য সাহা জাতীয় হাড়োরাম সাহা নাটোর মহকুমার চাপিলা হতে এসে আত্রাই ও নারোদ নদের সঙ্গম স্থলে ধরাইল গ্রামে প্রায় ২০০ বছর পূর্বে বসতি স্থাপন করেন। ধরাইলে তারা নতুন জমি ক্রয় করে জমিদারি ও পত্তনী সম্পত্তির অধিকারী হন। নাটোর শহর হতে ১০ মাইল পূর্বে নারদ নদের তীরে ধরাইল জমিদার বাড়ি অবস্থিত। এ বংশের শেষ পুরুষ ছিলেন বিনোদবিহারী চৌধুরী। এই বিনোদ বাবুর বাড়িতেই ধরাইল হাই স্কুল স্থাপন করা হয়। বিদ্যালয়টির বর্তমানে প্রাইমারি স্কুলের বারান্দায় একটি শাল কাঠের উপর ১৩২৩ বঙ্গাব্দ খোদাই করা আছে এবং তা থেকে ধারণা করা হয় বিদ্যালয়টি উক্ত সময়ে প্রতিষ্ঠিত। তা ছাড়াও উক্ত কাঠের উপর শ্রী গোবিন্দদাস চৌধুরী, শ্রী হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিনোদবিহারী চৌধুরী, শ্রী যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী নাম খোদাই করা আছে। ধরাইল জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলটি প্রথমে মাইনর স্কুল এবং পরবর্তীতে এটি হাইস্কুলে উন্নীত হয়।[২৬] ধরাইল নাটোর সদরের দিঘাপতিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত। ধরাইল জমিদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন শ্রী গোবিন্দদাস চৌধুরী, হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বিনোদ বিহারী চৌধুরী, যোগেন্দ্রনাথ চৌধুরী প্রমুখ। তাঁরা সকলে ধরাইল জমিদার পরিবারের সদস্য ছিলেন এবং তাঁদের সহায়তায় বিদ্যালয়টি পরিচালিত হতো। বিদ্যালয়টির জমি ব্যয়ভার জমিদারি স্টেট হতে নির্বাহ করা হতো। জমিদার বাড়ির অনেক ভবন ধ্বংস প্রায় এবং কিছু অংশ ভেঙ্গে নতুন ভবন করা হয়েছে। ধরাইল জমিদার পরিবারের সদস্যগণ কর্তৃক স্থাপিত বিদ্যালয়টি এই অঞ্চলের শিক্ষার উন্নয়নে অবদান রাখছে

কলম হাই স্কুল (১৯২৪)

নাটোর জেলার সিংড়া থানার কলম একটি বিখ্যাত গ্রাম। চলন বিলের একপ্রান্তে গ্রামটি অবস্থিত। কলম গ্রাম শুধু রাজশাহীতেই নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও অবিভক্ত বাংলার অন্যান্য স্থানেও এ গ্রামটি সুপরিচিত। শিক্ষাদীক্ষায় এই গ্রামটি বেশ এগিয়ে ছিল। কলম হাই স্কুলটি ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পেছনে কলমের জমিদার পরিবারের অবদান রয়েছে। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় জমিদার হেরম্বনাথ ভট্টাচার্য নিঃস্বার্থ অবদান রাখেন। তিনি অর্থ সংগ্রহ, গৃহ নির্মাণ, বিদেশি শিড়াক নিয়োগ, বহুসংখ্যক ছাত্রের ব্যয়ভার বহন করেন। বিদ্যালয়টি স্থাপনে আরও যারা অবদান রেখেছেন তাদের মধ্যে বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষক শৈলেশ্বর চক্রবর্তী, জমিদার মনীন্দ্র চক্রবর্তী ও পাশের হরিণা গ্রামের সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য কাব্যব্যাকরণতীর্থ।[২৭] বিদ্যালয়ের শুরু থেকে তারা বছরের পর বছর বিনা বেতন বা নামে মাত্র বেতনে শিক্ষকতা করতেন এবং সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য অনেক ছাত্রকে নিজ গৃহে রাখতেন। বিদ্যালয়টির মোট আয়তন ২.৫ একর এবং এটি জমিদারদের দান করা জমি। স্কুলের পুরনো যে ভবনটি বর্তমানে অবস্থান করছে তা জমিদারদের সময়ে নির্মাণ করা হয়েছে বলে জানা যায়। বিদ্যালয়টি বর্তমানে সুনামের সাথে টিকে আছে এবং এলাকা বাসী পুরনো এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি নিয়ে গর্ব করেন ।

চামারি ভূপেন্দ্রনাথ উচ্চবিদ্যালয়

সিংড়া থানার চামারি একটি গ্রাম বর্তমানে ইউনিয়ন। এটি চামারিতে বাগচী পরিবার নামে একটি জমিদার পরিবারের ইতিহাস পাওয়া যায়। চামরি বি এন স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন রমেন্দ্র নাথ বাগচী। তার পিতার নাম ছিল ভূপেন্দ্র নাথ। পিতার নামানুসারে তিনি চামারিতে একটি মাইনর স্কুল স্থাপন করেন। রমেন্দ্র নাথ বাগচী চামারি বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তার শেষ জীবন কাটে কলকাতায়।[২৮] স্কুলের মোট জমি ২.০৩ একর। এর অধিকাংশ জমিদার ও স্থানীয় জনগণের দান করা। এ স্কুল প্রতিষ্ঠায় সাদাত হোসেন নামে এক ব্যক্তির ভূমিকার কথা পাওয়া যায়। তিনি জমিদারের গোমস্তা ছিলেন।

দয়ারামপুর কে বি কে হাই স্কুল (১৯২৮)

দয়ারামপুর নাটোরের একটি ইতিহাস সমৃদ্ধ গ্রাম। নাটোর জেলা সদর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় কুড়ি কি.মি. দূরে বড়াল নদীর তীরবর্তী দয়ারামপুর নামক জায়গাটি অবস্থিত। এ গ্রামটি দিঘাপতিয়া জমিদারের প্রতিষ্ঠাতা দেওয়ান দয়ারামের নামানুসারে করা হয় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায়। এখানে বিখ্যাত দিঘাপতিয়া জমিদারদের একাংশের বসবাস ছিলো। ১৯২৮ সালে কে বি কে (কুমার বসা কুমার রায়) এর নামানুসারে একটি মধ্যমানের স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।[২৯] এ স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন কুমার শরৎ কুমার রায়। দয়ারামপুর রাজবাড়ি সংলগ্ন এ স্কুলটি স্থাপন করা হয়। জমিদারি স্টেট হতে স্কুল নির্মাণের যাবতীয় ব্যয় সংকুলান করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর শরৎকুমারের পুত্রগণ পশ্চিম বাংলায় চলে যায় এবং বিদ্যালয়টি নানা সমস্যায় পড়ে। পরবর্তীকালে এলাকার জনগণ বিদ্যালয়টিতে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয়। ১৯৬২ সালে বিদ্যালয়টি মাধ্যমিক স্কুলের মর্যাদা পায়। ১৯৬৯ সালে বিদ্যালয়টি হাই স্কুলে উন্নীত হয় এবং ১৯৭২ সালে প্রথমবারের মত শিক্ষার্থীরা মেট্রিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। ১৯৬৮ সালে থেকে ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দয়ারামপুর রাজবাড়ির রাণীমহলে বিদ্যালয়টির পাঠদান করা হয়। ১৯৮৩ সালে বিদ্যালয়টি কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্টের অধীনে আসে। ১৯৯৮ সালে বিদ্যালয়টির পূর্বনাম পরিবর্তন করে 'কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল' নামকরণ করা হয়। বর্তমানে স্কুলটি সুনামের সাথে টিকে আছে। জমিদার পরিবারের সদস্য শরৎ কুমার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয় হতে প্রতিবছর কৃতি শিক্ষার্থীরা বের হচ্ছে এবং দেশ ও জাতি গঠনে ভূমিকা রাখছে। দয়ারামপুর রাজবাড়িটি বর্তমানে কাদিরাবাদ ক্যান্টনমেন্টের আওতায় রয়েছে।

নাটোরে আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার ক্ষেত্রে জেলার জমিদারদের ভূমিকা রয়েছে। কোন কোন জমিদার রাজস্ব আদায়ে কড়াকড়ি ও প্রজাপীড়ন করলেও বেশ কিছু জমিদার নাটোরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মহারাণী ভবানী, প্রসন্ননাথ রায়, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়, কুমার শরৎ কুমার রায়, চন্দ্রনাথ রায়, এরশাদ আলী খান চৌধুরী, প্রমথনাথ বিশী প্রমুখ জমিদার শিক্ষাক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীকালে মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও সমাজ সচেতন ব্যক্তিবর্গ নাটোরের শিক্ষাব্যবস্থাকে বেগবান করেন। বহু গুণী ব্যক্তিত্ব, সমাজ সংস্কারক, রাজনীতিবিদ এ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষালাভ করেছেন এবং এলাকার সুনাম বৃদ্ধি করেছেন।

জমিদারদের সহায়তায় স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহ নাটোরের হাতহাস ও ঐতিহ্যের ধারায় সম্পৃক্ত। জমিদাররা ছিল সমাজের উঁচু শ্রেণির মানুষ। তারা চাইলে হয়তো আরও অবদান রাখতে পারতেন কিন্তু তারা সেটা করেননি। তারপরও নাটোর অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার ধারা তাদের মাধ্যমেই শুরু হয়। জমিদারদের কলকাতামুখী টান ছিল এবং বছরের অধিকাংশ সময় জমিদাররা কলকাতায় অবস্থান করতেন। জমিদারদের রাজস্ব আদায়ে কড়াকড়ি ও বিলাসী জীবনের চিত্র পেলেও নাটোর জেলার শিক্ষাবিস্তারে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। নাটোরের বেশ কিছু জমিদাররা নিজস্ব উদ্যোগে নাটোরসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে ভূমিকা রাখে। এ কারণে নাটোর মফস্বল শহর হলে তৎকালীন সময়ে এটি ছিল একটি সুপরিচিত নগরী। জমিদার পরিবারের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় স্থাপিত এখনো অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সুনামের সাথে টিকে আছে এবং শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে।

তথ্য সূত্র

১. Mitra, K.C., *The Rajas of Rajshahi*, Calcutta Review, Vol.56 (Calcutta: W.H. Corry and Company, 1873), P. 24
২. মৈত্রেয়, অক্ষয় কুমার, রাণী ভবানী (কলকাতা: বঙ্গবাণী প্রিন্টার্স, ১৯৬০), পৃ. ৮৫।
৩. রায়, বিমল প্রসাদ, লাহিড়ী প্রতুলপতি ও বিশি নির্মলচন্দ্র, নাটোরের কথা ও কাহিনী (কলিকাতা: নাটোর মহকুমা সম্মিলনী, ১৯৮১), পৃ. ৫২।
৪. রায়, বিমল প্রসাদ, প্রতুলপতি ও বিশি নির্মলচন্দ্র, নাটোরের কথা ও কাহিনী, পৃ. ৫৬।
৫. মণ্ডল, নুর মোহাম্মদ, দিঘাপতিয়া পি এন হাইস্কুলের ইতিবৃত্ত (নাটোর: আহমেদ প্রিন্টিং প্রেস, ১৯৬৯), পৃ. ৮
৬. তদেব।
৭. তদেব, পৃ. ২১।
৮. উদ্দিন, মোঃ আলিম, সাক্ষাৎকার, প্রধান শিক্ষক, নাটোর পিএন উচ্চ বিদ্যালয়, জানুয়ারি ২৯, ২০২৪ খ্রি.।
৯. তদেব।
১০. পাল, সমর, নাটোরের ইতিহাস (ঢাকা: গতিধারা প্রকাশ, ২০০৭), পৃ. ১৬২।
১১. রায়, বিমল প্রসাদ, নাটোরের কথা ও কাহিনী, পৃ. ৫৪।
১২. তদেব।
১৩. পাল, সমর, নাটোরের ইতিহাস, পৃ. ১৬৩।
১৪. তদেব, পৃ. ১৬৫।
১৫. তদেব।
১৬. তদেব, পৃ. ১৬৬।
১৭. তদেব, পৃ. ১৬৮
১৮. রায়, বিমল প্রসাদ, প্রতুলপতি ও বিশি নির্মলচন্দ্র, নাটোরের কথা ও কাহিনী, পৃ. ১২৮।
১৯. মির্জা, মোঃ রফিকুল ইসলাম, সাক্ষাৎকার, প্রধান শিক্ষক, চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, তারিখ মে ৫, ২০২৪ খ্রি.
২০. সাক্ষাৎকার, মোঃ আব্দুল আহাদ, পিতা মোঃ দীনু প্রামাণিক, গ্রামঃ চৌগ্রাম, ডাকঘর চৌগ্রাম, উপজেলাঃ সিংড়া, জেলা নাটোর, বয়সঃ ৮৮ বছর, মে ৫, ২০২৪। তিনি চৌগ্রাম জমিদার বংশের শেষ রাজাকে দেখেছেন এবং সৈয়দ সুরাফ উদ্দিন ইয়েমেনী (রহঃ) এর মাজারের খাদেম হিসেবে ২০০৫ সাল থেকে ২০২৩ খ্রি. পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন।
২১. রায়, বিমল প্রসাদ, প্রতুলপতি ও বিশি নির্মলচন্দ্র, নাটোরের কথা ও কাহিনী, পৃ. ১৭৭।
২২. শতবর্ষ ও পুণর্মিলনী অনুষ্ঠান-২০১৬, চৌগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, পৃ. ৭।
২৩. রায়, বিমল প্রসাদ, প্রতুলপতি ও বিশি নির্মলচন্দ্র, নাটোরের কথা ও কাহিনী, পৃ. ১৩২।
২৪. তদেব।
২৫. ইসলাম, মোঃ সাইফুল, সাক্ষাৎকার, সিনিয়র সহকারী শিক্ষক, জোয়ারি উচ্চ বিদ্যালয়, তার বাবা অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। মে ৭, ২০২৪।

২৬. রায়, বিমল প্রসাদ, প্রতুলপতি ও বিশি নির্মলচন্দ্র, নাটোরের কথা ও কাহিনী পৃ. ১৩৩।

২৭. তদেব, পৃ. ১৪৯।

২৮. তদেব, পৃ. ১৩৭।

২৯. রহমান, মো. মাহবুবর, বরেন্দ্র ভূমির রাজা-জমিদার, মুহঃ মমতাজুর রহমান সম্পা, বরেন্দ্র অঞ্চলের ইতিহাস, রাজশাহী বিভাগঃ ইতিহাস-ঐতিহ্য (রাজশাহী: বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, ১৯৯৮), পৃ. ৭৪৩।

ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1080-1085
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.107

শামসুর রাহমান : বাতাসে বারুদ গন্ধ, বন্দি শিবির থেকে

ড. পীযূষ পোদ্দার, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 03.03.2025; Accepted: 24.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Shamsur Rahaman, a dedicated poet in his life, wanted to understand the contemporary and the time in the socio-political context. Many of his poems have emerged from politics and mass struggle. Surroundings are the sounds of rural decay, the weariness of life, isolation, failure and corruption. He saw that during the liberation war, everyone wanted to run away and live, Unna's mother running like a forest deer with a newborn baby on her chest. During the liberation war, the determination to wrest freedom from the ruler was declared in the poem 'Bandi Shibir'. The strong voice of the poet against all inequality has been raised in this poem. Poet wrote dreams of liberation and freedom from our daily life.

***Key Words**:* War, Politics, Struggle, Isolation, Equality, Freedom.

সত্য প্রকাশ ও আত্মানুসন্ধানকেই লেখকের প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শামসুর রাহমান। আত্মস্মৃতিমূলক রচনা 'কালের ধুলোয় লেখা'র পূর্বলেখ অংশে এই আত্মানুসন্ধান ও সত্যপ্রকাশকে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন তিনি। সত্যপ্রকাশ অর্থে শামসুর যুগ-কালের বাস্তবকেই বড় করে তুলে ধরেছিলেন। শিল্পের নন্দনবীক্ষার চেয়েও সাধারণের দিনযাপনের ব্যথাচিত্র তাঁর কাছে অগ্রাধিকার পেয়েছিল—

> "জীবনের যেখানে কিছু রঙ লেগেছে শুধু তাই বর্ণনা করেছ, অতিরিক্ত রঙ চাপানো থেকে বিরত থেকেছি। বড়ো মাপের লেখকদের কাছ থেকে শিখেছি, সত্য প্রকাশ এবং আত্মানুসন্ধানই হল লেখকের প্রধান কর্তব্য।"[১]

তবে নজরুল ইসলামের মত শামসুর বিদ্রোহী নন, ভেঙেচুরে সব গুড়িয়ে দিতেও চান নি। বিনম্র শ্রমে তিনি কেবল দেশকালের মানুষের যাপন কথাকে তুলে ধরতে চেয়েছেন।

শামসুর রাহমানের লিখন শৈলীর মধ্যে এক ধরনের সহজতা ছিল যার দ্বারা পাঠক দ্রুতই প্রভাবিত হতেন। অসাধারণ কোনো চিত্র নয়, শহরের পথচারী, ভিক্ষুক, গাছ, বিভিন্ন দোকান, রাস্তার কুকুর, গ্রামের মাঝি, কাক সব নিয়ে গড়ে ওঠে শামসুরের কবিতা মহলের খিলান গম্বুজ। সাতচল্লিশের দেশভাগের পর ঢাকাকে কেন্দ্র করে যে শিল্প সাহিত্য চর্চা চলছিল তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবি হাসান হাফিজুর রহমান, ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলি, আহসান হাবিব প্রমুখ। এইসব কবিদের বেশিরভাগের প্রতিষ্ঠা চল্লিশের দশকে। আহসান হাবিবের 'রাত্রিশেষ' 'ছায়া-হরিণ', 'সারা দুপুর', 'মেঘ বলে চৈত্রে যাবো' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে আধুনিক চিন্তনের অনুরণন আছে। সৈয়দ আলি আহসানের 'অনেক আকাশ', 'একক সন্ধ্যায় বসন্ত', 'সহসা সচকিত', উচ্চারণ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে নিসর্গের দ্যোতনা আছে। তাঁর কবিতাগুলিতে শব্দের উপর গুরুত্ব আরোপ বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবে মনে রাখতে হবে কবিতায়

আধুনিক চিন্তাভাবনার প্রয়োগ বিশেষভাবে ঘটেনি এই কবিদের কাব্যে। পাঁচ ও ছয়ের দশকে নতুন যুগের কথা, মানুষের যাপন-সংকটের কথা যে কবিরা তুলে ধরতে চাইলেন, তাঁদের মধ্যে শামসুর রাহমান অন্যতম প্রধান কবি।

শামসুর রাহমানের কবিতা রচনার সূচনাকালে বাংলাদেশের ইতিহাসে এক ক্রান্তিকাল। এক বন্ধ্যা সময়ে দাঁড়িয়ে চারপাশের মিথ্যার বেসাতি দেখতে দেখতে কবি অনুভব করেছেন সকলের 'মানস মৃত্যু ঘটে গেছে' তাই এখন অপেক্ষা শুধু 'দ্বিতীয় মৃত্যুর'। এক জটিল নিগূঢ় আলোড়নে আবর্তিত হতে হতেই বাংলার মানুষের স্বপ্ন, কামনা, ব্যথা-বেদনা, অধরা মাধুরীর বিচিত্র সুর নিয়ে তাঁর কাব্য রচনা। দেশভাগ, ভাষা আন্দোলন, স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে তাঁর এক একটি কবিতা পঙ্‌ক্তি যেন দেশের জল-বাতাসের মতই গায়ে লেগে থাকে। বাংলার মাটি খাঁটি বলে মনে হয় না আর। বাংলার ভাটিয়ালি, জারি, সারি, বিচিত্র সজল শোভা হারিয়ে শহুরে নাগরিক সভ্যতার মেকি কেতায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে বাংলার শ্যামলিম গ্রামগুলি।

> "যা কিছু মানুষের প্রিয়-অপ্রিয়, যা কিছু জড়িত মানব-নিয়তির সঙ্গে, সে সব কিছু আকর্ষণ করে শামসুর রাহমানকে, স্নিগ্ধ উপত্যকার প্রাচীন উদ্যান থেকে সূর্যোদয়ের ঝলমলে টিলায় কবি শুনতে পান চাবুকের তুখোড় শব্দ, কোনো নারীর আর্তনাদ, একটি মোরগের দীপ্ত ভঙ্গিমা।"[২]

বাংলাদেশের কবিতা চর্চায় প্রেমের নানাবিধ প্রকরণ অনেক ক্ষেত্রেই স্বদেশপ্রেমে আশ্রয় চেয়েছে। কবি শামসুর রাহমান যৌবনের দার্ঢ্যে, প্রেমিকের বিহ্বলতায় এবং তীব্র প্রতিবাদে স্বদেশকে আত্মীভূত করে নিয়েছেন। পাখি-পল্লবে-রূপে-রসে সাজানো আদি অকৃত্রিম বাংলার উপর যখন নেমে আসে শাসকের নির্মম কুঠার তখন কবি শামসুর মুক্তি কামনায় বিস্ফোরণোন্মুখ। পৃথিবীর রক্তাক্ত প্রতিবেদন রচিত হয় তার কাব্য পঙ্‌ক্তিমালায়। 'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থের পূর্বেই প্রকাশিত হয় 'নিজভূমে' (১৯৭০) কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের 'বর্ণমালা আমার দুঃখিনী বর্ণমালা', 'ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯', 'আসাদের শার্ট' প্রভৃতি কবিতায় বিপন্ন বর্তমানকে তুলে ধরেন। কবির হৃদয়ে চর্যাপদের হরিণী নিত্য আসা-যাওয়া করতে চাইলেও এক ধ্বস্ত সময়ের সূচীমুখ যন্ত্রণায়, যুদ্ধের আগুনে, মারীর তাণ্ডবে, প্রবল বর্ষায়, সন্ত্রাস রাঙানো সকাল সন্ধ্যায় ঘাতকেরা প্রবলভাবেই হানা দেয় কবির মনোলোকে। আর এই সূত্রে গড়ে ওঠে প্রতিবাদের ও প্রতিরোধের সব আখরমালা, আসাদের শার্ট গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত করবীর মতো উড়তে থাকে বাতাসে। আমাদের সব কাপুরুষতা, ভীরুতাকে দলিত করে ভীষণ পরিবর্তিত চারপাশে প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে ওঠে।

'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে কলকাতার 'অরুণা প্রকাশনী' থেকে। স্বাধীন বাংলা আর সাধারণ মানুষের স্বপ্ন কবির কাছে সমার্থক মনে হয়। প্রবল স্বপ্নময়তায় কবি প্রবেশ করেন দেশের রক্তাক্ত মানচিত্রে। একাত্তরের ভয়াবহ দিনগুলিতে শহর-স্বদেশ-সাধ-আহ্লাদ বন্দী হয়ে যায়। শত্রুর আক্রমণে তিনি ভীত হয়ে উঠলেও, পলায়ন মনোবৃত্তি তাঁর নেই। মনের মত শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন না কবি, পারেন না মনের মত কবিতা লিখতে, শাসকেরা সব অধিকার হরণ করে। কিন্তু হৃদয়ের ভিতরে স্বাধীনতার জন্য যে কলতান ওঠে কোন রক্তচক্ষু শাসকই তাকে দমিত করতে পারেনা। কবি দেখতে থাকেন বস্তির দুরন্ত ছেলেটার হাতের মুঠোয় 'স্বাধীনতা' নামক শব্দটি জ্বলজ্বল করতে থাকে। চাঁদ, ফুল, পাখি ছেড়ে বিস্ফোরক সব আখরমালায় কবিতা রচনা করেন, হৃদয়ের গভীরতলে স্বাধীনতার জন্য বেজে ওঠে সপ্তসুর। স্বাধীনতার অমোঘ ইচ্ছাকে সমকালীন জনগণের জীবন সংকটের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে বলেন, 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা / তোমাকে পাওয়ার জন্যে / আর কতবার ভাসতে হবে রক্তগঙ্গায় / আর কতবার দেখতে হবে খাণ্ডবদাহন।' চারপাশের খাণ্ডবদাহনে পুড়তে থাকে সাকিনা বিবি, সগীর আলি, কেষ্ট দাস, মতলব মিয়া; কবি জানেন এইসব দামাল দুর্দম মানুষের বলিদানের বিনিময়ে স্বাধীনতা অবশ্যই অর্জিত হবে, নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে স্বাধীন হবে বাংলাদেশ।

'বন্দী শিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থে কবিতার সংখ্যা সতেরোটি। প্রথম কবিতা কাব্যের নাম কবিতা 'বন্দি শিবির থেকে।' পৃথিবীর প্রতিকূলতা কবিকে কাঙ্ক্ষিত শব্দচয়নে বাধা দেয়। চাঁদ, ফুল, পাখি প্রভৃতি কাব্যিক শব্দ নিয়ে শাসকের কোনো মাথা ব্যথা নেই। তবে জনগণকে উদ্দীপিত করবার কিংবা প্রতিবাদ জানাবার শব্দগুলি উচ্চারণ করবার অধিকার হরণ করেছে শাসকেরা। আর তাই কবির দেহ-মন জুড়ে অতৃপ্তি, অবসাদ। 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে

কবি বার বার উচ্চারণ করতে চান, প্রত্যেক বাড়িতে, প্রতিটি রাস্তায়, শহরের অলিতে-গলিতে রঙিন সাইন বোর্ডে কবি লিখে দিতে চান প্রিয়তম বর্ণমালা স্বাধীনতা। বন্দুকের নল শাসন করতে চায়, কেড়ে নিতে চায় কথা বলবার অধিকার। শাসন যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে শাসকেরা এক ভয়ের রাজত্ব কায়েম করতে চায়, কবিকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায় অমর অক্ষর, প্রিয় বাচন স্বাধীনতা থেকে। তবে পৃথিবীর কোনো শাসকই চিরকাল মানুষের ইচ্ছাকে অবদমিত করে রাখতে পারেনি, কবির স্বপ্নে বাংলাদেশের প্রতি অণু-পরমাণুতে স্বাধীনতার উজ্জ্বল উপস্থিতি। বন্দি শিবিরের অবরুদ্ধ গুমোট থেকে কবি যেন মুক্তির বাতাস নিয়ে আসেন, শোষণ যন্ত্র বিকল হয়ে পড়ে—

‘অথচ জানে না ওরা কেউ
গাছের পাতায়, ফুটপাতে পাখির পালকে কিংবা নারীর দু’চোখে
পথের ধুলায়
বস্তির দুরন্ত ছেলেটার
হাতের মুঠোয়
সর্বদাই দেখি জ্বলে স্বাধীনতা নামক শব্দ।’ (কবিতা সংগ্রহ, শামসুর রাহমান)

সময়ের গনগনে আঁচে চারপাশ যখন ঝলসে যেতে থাকে, সত্যের বলাৎকার আর নিরপরাধের রক্তে ভিজে যায় মাটি, তখন কবিকে উচ্চকণ্ঠ হতেই হয়, কবি আর্তনাদে দশদিক ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে চান। রাস্তাঘাটে সকলকে প্রচ্ছন্ন ঘাতক মনে হয়। এমন হন্তারক সময়ে সাধারণ মানুষ নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। সন্ত্রাসতাড়িত দিন-রাত্রি থেকে মুক্তি খুঁজতে গিয়ে অনেকেই নিশ্চিন্ত আশ্রয় খোঁজে, কেউ বা দেশ ছেড়ে চলে যেতে চায় অন্য কোথাও। কবি শামসুর বাজেয়াপ্ত দিনরাত্রি সঙ্গী করে যন্ত্রণা বিদ্ধ দেশবাসীর সঙ্গে দেশেই থাকতে চান। মৃত্যুর প্রতীক্ষাকে নিয়তি বলে মানা সাধারণ মানুষের চোখে স্ফুলিঙ্গ দেখতে চান, দেখতে চান প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে। কিন্তু কবির পরিপার্শ্ব জুড়ে কেবলই কুণ্ঠাহীন খুনী, ভ্রাতৃঘাতক, দালাল, মিরজাফর আর মোহম্মদী বেগদের ভিড়। অবাক বিস্ময়ে কবি দেখতে থাকেন মানুষ মারার বোমা-বারুদের সঙ্গে আসতে থাকে গুঁড়ো দুধ। এমন প্রহসন ও প্রহেলিকায় কূটনীতির কালো জোব্বা ও রক্তে লাল হয়ে ওঠে, বুটের তলায় পিষ্ট হয় দেশ, বেয়নেটে বিদ্ধ হয় মানবিক গুণাবলী। কৃষক মজুরদের উদ্দেশ্য করে কবি বলেন—

‘দুনিয়ার সব শৃঙ্খলিত কৃষক মজুর শোনো
সর্বহারা নিধনের জন্যে অবিরাম
আসছে বারুদ বোমা স্বৈরাচারী শাসকের হাতে,
কখনো-বা বলিহারি যাই, গুঁড়া দুধ।
খাসা কূটনীতি,
চিনা ও মার্কিন কালোয়াতি।’ (কবিতা সংগ্রহ, শামসুর রাহমান)

এই জান্তব রসিকতাকেও কেউ কেউ নিয়তি নির্ধারিত মেনে সুখে নিদ্রা দেবার চেষ্টা করেন।

দেশবাসীর জীবনে অকাল সন্ধ্যা নেমে আসায় কবি শামসুরের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। ঘরদালান, রাস্তাঘাটময় কেবলই মৃতের ঘ্রাণ, নিরাপত্তা নেই কোথাও। তরুণী কন্যার হাত ধরে পিতা ঘরের চেয়ে বেশি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজতে থাকেন। এই মৃত্যুপুরীতে পিতা মাতা আত্মজ ও আত্মজাকে নক্ষত্রবীথির আড়ালে রক্তকণিকার গহীনে লুকিয়ে রাখতে চান, কেননা প্রতিটি মুহূর্ত সর্বনাশের অপেক্ষায় সন্ত্রস্ত। মৃতের নগরী বলে মনে হয় চারপাশকে। সান্ধ্য আইনে নিথর আঁধার ঘরে বিপন্ন বিস্ময়ে সকলেই অবাক, আর সমস্ত শান্তি খান খান করে দিয়ে লুকানো অস্ত্রের খোঁজে শাসক শক্তি সব তছনছ করে দিয়ে যায়।

শামসুর রাহমান অস্ত্রে বিশ্বাসী নন। ব্যক্তিগত যাপনে তিনি মৃদু স্বভাবের, ছায়াময় আশ্রয়ে অস্তসূর্যের অস্তরাগে তিনি উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন, ছোরা, ভোজালি, সড়কি, বল্লম, বন্দুক তার পৃথিবী নয়। গোলাপ আর চন্দনের ব্রতকথা তার স্বভাবজাত। অথচ দেশকাল আক্রান্ত হলে, তিনি মানুষের পাশে দাঁড়ান সর্বতোভাবে। দেশ বা জাতির পতন

উত্থানের তিনি বাঙময় সঙ্গী। আক্রান্ত দেশকালে কবি নিজেই হয়ে ওঠেন নিজের অস্ত্র। তিনি দেখতে থাকেন শাসকের অহংকার আমাদের প্রিয় সব কিছু কেড়ে নেয়, ধ্বংস করে—

> ‘আমাদের প্রিয় যা কিছু সবই তো ওরা
> হত্যা করে একে একে। শহিদ মিনার
> অপবিত্র করে, ভাঙে মর্টারের ঘায়ে,
> ফারুকের সমাধিস্থ লাশ খুঁড়ে তোলে
> দারুন আক্রোসে।’ (কবিতা সংগ্রহ, শামসুর রাহমান)

হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালো না বাসলেও কবি বুঝেছিলেন এই যন্ত্রণাদগ্ধ জীবনে তাঁর কোনো নিভৃত জীবন দেবতা নেই। তিনি প্রবেশ করলেন দেশের অন্তরে, দেশও যেন সমানভাবে সাড়া দিয়ে প্রবেশ করল তাঁর অন্তরে। ধূসর শহর, অন্ধকার পল্লী, শস্য-শ্যামল গ্রামের শ্রী নিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে কবির কাছে স্বাধীনতা হয়ে ওঠে রবি ঠাকুরের ‘অজর কবিতা, অবিনাশী গান।’ ‘কবিতাভাবনা’ নামক প্রবন্ধে শামসুর রাহমান জানিয়েছেন—

> “... অনেকে বলেন রাজনীতি কবিতার বিষয় হতে পারে না। আমি সেটা মানি না। কেননা রাজনীতি তো প্রতিনিয়ত আমার জীবনকে স্পর্শ করছে। শুধু আমাকে নয়, আমার বংশধর, ভবিষ্যৎ প্রজন্ম এমনকী সব শ্রেণির মানুষকে স্পর্শ করছে।... একজন কবি বা শিল্পীর দু ধরনের দায়বদ্ধতা আছে, এক তার শিল্পের প্রতি এবং সমাজের প্রতি। আমি কবিতার কাছে দায়বদ্ধ, আমি শিল্পের কাছে দায়বদ্ধ। আমার এই দায়বদ্ধতা থেকেই আমি লিখি।”[৩]

এই দায়বদ্ধতা থেকেই কবি উদ্যত অস্ত্রের সামনে প্রতিরোধ হিসাবে ব্যবহার করতে চান গ্রাম বাংলার আবহমান কালের জীবন যাপন, সাধারণ মানুষের স্বাধীন ভাবে বেঁচে থাকার অদম্য ইচ্ছাকে। ফসল ভর্তি মাঠে দাঁড়িয়ে থাকা কৃষক, কিংবা পিতার জায়নামাজের উদার সুর, গৃহিনীর খোলা কালো চুল বা খুকীর তুলতুলে গাল সব মিলে মিশে বাংলাদেশের আবহমানকালের একটি উজ্জ্বল আর্থসামাজিক ইতিহাসকে তুলে ধরা হয়েছে। ইতিহাসকে ধ্বংস করে যে শক্তি বাংলার চিরন্তন সৌন্দর্যকে, স্বপ্নকে প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে, জনসাধারণকে পদানত করে রাখে কবি ‘বন্দি শিবির থেকে’ কাব্যের কবিতাগুলির মধ্যে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন, বলেছেন যে কোন মূল্যেই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করব। কবির চোখের সামনে দৈনিক দিনযাপনের চেনা দৃশ্যাবলি লুপ্ত হয়ে যায়। নিজেদের জ্ঞাতে কিংবা অজ্ঞাতে আমরা ক্রমাগত বদলে যেতে থাকি। অনেক ধ্বংসস্তূপের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কবি শামসুর রাহমান সমকালীনতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। আমাদের বসতির দেওয়ালগুলি এক একে ভেঙে পড়ে। কোনোদিকে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। আসলে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে এক করাল বেলায় কবি প্রত্যক্ষ করলেন সাধারণ মানুষ চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। রক্তাক্ত বাস্তব প্রত্যক্ষ করে কবি গ্রন্থ পাঠে মনোনিবেশ করতে পারেন না। পথ ঘাট জনবিরল, হত্যাময় শহরে বিদেশীদেরই সংখ্যাধিক্য। এমন কালবেলায় কবির কাছে জ্ঞানার্জনকে বড়ো অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

বিষণ্ণ বিধ্বস্ত কবি শামসুর রাহমান ক্লান্ত মনে ঘুণ ধরার কথা বললেও আমরা জানি তিনি তীব্র প্রতিবাদে ফিরে আসবেন, দু’চোখে স্বপ্ন নিয়ে বলবেন স্বাধীনতার কথা। পাড়ায়-পাড়ায়, মহল্লায়-মহল্লায় যে মানুষগুলি রোদে পুড়ে, জলে ভিজে, অসম্ভব প্রিয়তায় স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে, তাদের স্বপ্ন মিথ্যা হবার নয়। ভৌগোলিক মানচিত্রে বাংলাদেশের যে ছবি, তার আপামর জনসাধারণ এক বুক আশা নিয়ে পথ চেয়ে বসে আছে। দিনযাপনে প্রতিমুহূর্তে সব খোয়ানোর ভয় সকলকে গ্রাস করে, পিতা-মাতা তার আত্মজ ও আত্মজাকে নক্ষত্রবীথির অন্তরালে কিংবা রক্তকণিকার অন্তরালে লুকিয়ে রাখতে চান। ঘরে-বাইরে শত্রু, মান-সম্মান, প্রাণ-মন সবই অত্যাচারে বিধ্বস্ত হয়। এমন চারপাশে সাধারণ মানুষ ভালো থাকতে পারে না, তারা একটাই স্বপ্ন দেখে, কবির কলমে তা উচ্চারিত হয় স্বাধীনতা নামে। স্বাধীনতা যেন বাংলাদেশের জনমানসের এক জাগ্রত স্বপ্ন। সব কিছুর বিনিময়ে, যে কোন মূল্যে স্বাধীনতাকে আসতেই হবে বাংলাদেশে, কবি জানাচ্ছেন-

'পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে জ্বলন্ত
ঘোষণার ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তুলে,
নতুন নিশান উড়িয়ে, দামামা বাজিয়ে দিগ্বিদিক
এই বাংলায়
তোমাকে আসতেই হবে, হে স্বাধীনতা।'
(তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা)

শত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত জনমানসের করুণ ছবি কবি শামসুরকে ব্যথিত, বিষণ্ণ করে তোলে। সত্তর-একাত্তরের বাংলার জনমানসের ভাবনা চিন্তা, ব্যথা বেদনাগুলি কবিতায় বেদনাতুর হয়ে প্রকাশিত হয়। 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতায় কবি বাংলার উজ্জ্বল-মধুর চিত্র রচনা করেন। গভীর প্রিয়তর উপলব্ধিতে স্বাধীনতা মিলে যায় মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিকে, রোদেলা দুপুরে দস্যি গ্রাম্য মেয়ের পুকুরে অবাধ সাঁতারে, উঠানে ছড়ানো মায়ের শুভ্র শাড়ির কাঁপনে, বোনের মেহেদি রঞ্জিত হাতের পাতায়, বাগানের ঘরে, কোকিলের গানে, শান্ত বটের ঝিলিমিলিতে। শুভ্র অনুভব কোমল দ্যুতিতে কবি যেন সমগ্র বাংলাদেশকে প্রকাশ করতে চাইলেন এই কবিতার মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতার সুখে মজুরের দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী মেতে ওঠে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।

স্বাধীনতার পূর্বেকার বাংলাদেশে ভয়ংকর ত্রাস জাগানো পরিবেশে কবির মনে হয় ঢাকা শহরে বন্দী সব কবি এবং কবিতারা যেন বেরিয়ে পড়েছে স্বদেশের পথে পল্লীতে। এক দীঘল কালো কাকের অন্ধকার ডানা ঢেকে দিচ্ছে গ্রামবাংলাকে। মনুষ্য পদচিহ্ন বর্জিত গ্রাম্য পথ, রাখাল নেই, আলপথ খাঁ খাঁ, যেন ভয়ংকর এক মারণ ব্যাধির কবলে পড়ে উজাড় হয়ে গেছে গাঁয়ের পর গাঁ। 'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যের 'কাক' কবিতায় কবি জানাচ্ছেন সেই ভাষ্য—

'গ্রাম্যপথে পদচিহ্ন নেই। গোঠে গরু
নেই কোনো, রাখাল উধাও, রুক্ষ সরু
আল খাঁ-খাঁ, পথপার্শ্বে বৃক্ষেরা নির্বাক
নগ্ন রৌদ্র চতুর্দিকে, স্পন্দমান কাক, শুধু কাক।'
(কাক/ বন্দি শিবির থেকে)

চার পঙক্তির কবিতার মর্মে কবি সাধারণ মানুষের জীবনের ভয়াবহতা প্রকাশ করলেন। শাসকের নির্মম আঘাতে গ্রাম বাংলার পথঘাট জনবিরল হয়ে পড়ে, এক মহামারীর রূপকে কবি 'কাক' শব্দটি ব্যবহার করেন। হুমায়ুন আজাদ 'শামসুর রাহমান: নিঃসঙ্গ শেরপা' গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক ভাবে বলেছেন নগ্ন রৌদ্র ঝলসাচ্ছে, আর তার মধ্যে উৎফুল্ল কাকেরা ছিঁড়ে খাচ্ছে বাঙালির নয়, বাংলার মাংস-মজ্জা-নাড়ি। জনবসতিপূর্ণ বাংলার বসতিশূন্য হয়ে যাচ্ছে; অনেকে নিহত হয়েছে, পালিয়েছে কেউ। কবি শামসুর এই দমবন্ধ পরিবেশ থেকে পালিয়ে বাঁচতে চান না। এক ঘাতক পৃথিবীর আওতায় এসে যাবার পর সকলকেই যেন প্রচ্ছন্ন ঘাতক বলে মনে হয়। চেনা রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন হেঁটে যাবার স্বাভাবিক অধিকারকেও স্বপ্ন মনে হয়। অসম্ভব রসিকতায় স্বৈরাচারী শাসক আনতে থাকে মানুষ খুন করবার বারুদ বোমা আবার জীবনদায়ী গুঁড়ো দুধ। বেয়নেটে বিদ্ধ হয়ে বয়ে যায় রক্তস্রোত, বুটের তলায় পিষ্ট হয় মানবিক সব অধিকার। খানখান হয়ে ভেঙে পড়া বাংলার এমন প্রাত্যহিকীতে কবির হৃদয়ে ফুঁড়ে যায় এক নাঙা তলোয়ার। ভ্রাতৃঘাতী, মাতৃঘাতী শাসকের সঙ্গে কেউ কেউ 'দোস্তি' জমায় 'নিবিড় মস্তিতে'। এমন খুনে সময়ে পলায়ন শ্রেয়তর হলেও কবি শামসুর অন্য কোথাও যেতে অস্বীকার করেন। বাজেয়াপ্ত দিনরাত্রি নিয়ে যেসব মানুষেরা যন্ত্রণাবিদ্ধ মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকে কিংবা তিলে তিলে ক্ষয়ে যায়, ধ্বসে যায় জীবন থেকে, কবি তাদের শরিক হয়ে থাকতে চান।

সত্তর একাত্তরের সন্ত্রস্ত দিনগুলিতে সমগ্র বাংলাদেশই এক বন্দি শিবির হয়ে উঠেছে। কবি অভিজ্ঞতায় দেখেছেন আমাদের প্রিয়তম যা কিছু সবই ধ্বংস করে, হত্যা করে পশ্চিমী সেনা। 'মধুস্মৃতি', 'আন্তিগোনে', 'শমীবৃক্ষ' প্রভৃতি কবিতায় কবি জানিয়েছেন শাসকের মারণাস্ত্র যতই ভয়ংকর হোক তা কখনো ললাট থেকে নক্ষত্র খসাতে পারে না। ভাড়াটে গুণ্ডারা ভয় দেখাতে পারে, ঝলসিত নাঙা তলোয়ার হিংস্রতায় তীব্র হয়ে উঠতে পারে,

রক্তস্নাত বাংলায় মিরজাফরেরা মুচকি হাসলেও হৃদয়ে স্বাধীন বাংলাদেশকে ধারণ করে প্রতিটি বাঙালি প্রতিবাদে বিস্ফোরক হয়ে উঠবে। 'শমীবৃক্ষ' কবিতায় কবি প্রতিবাদী বাংলার প্রতিরোধী চিত্র অঙ্কন করেন।

'লুকানো অস্ত্রের লোভে ওরা বারবার
দেয় হানা মহল্লায় মহল্লায়, খোঁজে
শস্ত্রপাণি যত্রতত্র শমীবৃক্ষ
বাংলাদেশের হৃদয়ে হৃদয়ে
ঝলকিত। চোখগুলো গ্রেনেডের চেয়ে
বিস্ফোরক বেশী আর শূন্য কোটি হাত
যতটা বিপজ্জনক, ক্রুর মারণাস্ত্র নয় তত।'
(শমীবৃক্ষ/ বন্দি শিবির থেকে)

শমীবৃক্ষ এই মানুষদের জন্যই কবি স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন, মৃত নগরীর গাছগাছালির পাতার আড়াল থেকে যে চোখে জ্বলে ওঠে, তা আশা দেয়, স্বাধীনতার কথা বলে, এ চোখ স্বজনের, সুজনের। শহরের, গ্রামের চেনা দৃশ্যাবলী লুপ্ত হয়ে এক রক্ত রঙের ক্যানভাসে অত্যাচারের দলিল চিহ্নিত হয়ে যায়। নাগরিক বা মানবিক অধিকার দাবী করতে পারেনা কেউ।

এই সময়ের অভিজ্ঞতায় কবি সাধারণ মানুষের প্রতিভূ হয়ে ওঠেন। অধিকারহীন পথ হাঁটার গ্লানি কবিকে পীড়িত করে, ঘাড় নীচু করা তো শাসকদের সকল নির্দেশ মেনে নেওয়া, কবি খেদের সঙ্গে বলেন- '... এই মাথার ওপর/ আততায়ী শাসক সবার / আছে পাকাপোক্ত অধিকার। কেবল আমারই নেই।'

ঘাতকের পাকাপোক্ত অধিকার, দেশের উপর দিয়ে বয়ে চলা অমানবিক স্বৈরাচার কবিকে নিজভূমে পরবাসী করে দেয়। দেশের মধ্যেই তিনি যেন এক বিষণ্ণ উদ্বাস্তু। আশেপাশে কেউ নেই। তবু সেই সংকটকালে বুকের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্নকে কবি লালন করেছেন; স্বপ্ন দেখেছেন ভালোবাসার মানুষ নিশ্চিন্তে নিঃশঙ্কভাবে পুকুর ঘাটে ঘড়া ভাসাতে পারবে, পিতা দাওয়ায় বসে হুঁকো টানবে, ভীষণ ভয় ধরানো বদলে যাওয়া চারপাশে আবার এক বদল ঘটবে। বন্দি শিবির হয়ে যাওয়া বাংলাদেশে গুপ্ত ঘাতক আর অনুসরণ করবে না অহরহ। সব ঘাতককে সরে দাঁড়াতে বললেন কবি, তিনি আর লাশ চান না, শিউলিফোটা সকাল চান, ভবিষ্যত প্রজন্মকে গোলাপে ভরিয়ে দিতে চান। বাতাসে বারুদ গন্ধ থাকা সত্ত্বেও 'বন্দি শিবির থেকে' কাব্যটি হয়ে ওঠে, একাত্তরের বাংলাদেশের অন্তর-বাহির, উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় আতুর।

তথ্যসূত্র:

১। রাহমান, শামসুর, কালের ধুলোয় লেখা, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০০৪, পৃ. ৫
২। খান, অন্বেষা, ওপার বাংলার কবিতার নির্মাণ শিল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা,২০২৩, পৃ.৫৩
৩। সামন্ত, সুবল (সম্পা), এবং মুশায়েরা, কলকাতা, শারদীয় ২০০৮, পৃ.২১
৪। আজাদ, হুমায়ুন, নিঃসঙ্গ শেরপা, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা- ২০০৪, পৃ.৩৩

Guidelines for Submission to Atmadeep:

The Atmadeep is dedicated to publishing original works, including research papers, book reviews, article reviews, and abstracts of theses. Submission to this journal implies that the work has not been previously published elsewhere and is not under consideration for publication elsewhere.

Comprehensive Submission Guidance:

- Authors, researchers, and writers interested in submitting their papers are encouraged to do so online.
- Submissions should be in Bengali and formatted in Avro Keyboard, using Bensen and font size 14.
- The journal accepts submissions exclusively in the Bengali language.

Details to include:

- Title: Should be concise and informative.
- Authors' Names: Include names followed by designation, postal address (including email ID and phone number).
- Abstract: Abstracts should be in English and should not exceed 250 words.
- Bibliography: আচার্য, দেবেশ কুমার, ব্যবহারিক বাংলা ও সাহিত্য গবেষণার পদ্ধতি বিজ্ঞান, ইউনাটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা- ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১৯-২০।
- Email: editor@atmadeep.in

Plagiarism:

Authors are urged to avoid plagiarism. Any detected instances of plagiarism will be the sole responsibility of the authors.

Review Process

- All the manuscript will be preliminary examined by the Editor-in-Chief and then forwarded to the Reviewers & other Editors of the Journal.
- The papers shall only be published after recommendation of the Reviewers & Associate Editors.
- Information regarding the selection or rejection of articles/papers will be only through Email.
- The journal shall publish the article/papers only after completion of the formalities mentioned in selection letter.
- The journal will also not take the responsibility of returning the rejected articles.

At every stage preceding publication, the editors of the journal shall have the right to make corrections (if needed) in articles/papers to suit the requirement of the journal.

N.B.: Papers will be accepted only when accompanied with abstract (to be written in English only). Submission of papers without abstract (in English) or mere submission of an abstract without the paper would lead to non-acceptance of the same.

Publication Ethics

Publication ethics are the principles and guidelines that govern the conduct of authors, reviewers, editors, and publishers in scholarly publishing. Ensuring ethical practices is crucial for maintaining the integrity and credibility of academic research. Here are some key aspects of publication ethics of our journal:

- **Authorship:** All authors should have made significant contributions to the research and agree to be listed as authors. Misrepresentation of authorship, such as ghost authorship or gift authorship, should be avoided.
- **Originality and Plagiarism:** Authors should ensure that their work is original and properly cited. Plagiarism, including self-plagiarism, is unethical and undermines the integrity of scholarly publishing.
- **Data Integrity:** Authors are responsible for the accuracy and integrity of their research data. Fabrication, falsification, and manipulation of data are serious ethical violations.
- **Conflict of Interest:** Authors should disclose any potential conflicts of interest that could influence their research or its interpretation. These may include financial interests, affiliations, or personal relationships that could bias the work.
- **Peer Review:** Peer review plays a critical role in ensuring the quality and validity of published research. Reviewers should conduct their evaluations objectively and provide constructive feedback.
- **Editorial Independence:** Editors should make decisions based on the merits of the research and without influence from commercial interests, personal biases, or other undue pressures.
- **Publication Ethics Policies:** Journals should have clear and accessible policies on publication ethics, including instructions for authors, ethical guidelines for reviewers and editors, and procedures for handling ethical issues or misconduct.
- **Responsibility of Publishers:** Publishers have a responsibility to support and enforce ethical standards in scholarly publishing. This includes providing resources for editors and reviewers, promoting transparency, and addressing allegations of misconduct.

Publication Charge

The authors should note that there is no submission fee; however, there is a reasonable publication fee for each accepted article to meet the cost of manuscript handling, typesetting, office cum admin expenses, web-hosting charges, up-loading charges, internet expenses, website update and maintenance, electronic archiving and other recurring expenses. The publication fee is obligatory for publication.

- **Indian Authors:** The publication fee for single author per accepted paper is Rs. 1000.00 and Rs. 1200.00 for multiple authors.
- **Foreign Authors:** The publication fee of the accepted paper is $25 for single authored paper and $30 for multiple authored papers
- **Print copy:** Print Copy of the issue can be supplied on payment of Rs. 600.00 per copy. Annual subscription for the print copy is Rs. 3000.00 per Volume (inclusive of postal charges within India) Single print copy can be supplied outside India on payment of 25$ (inclusive international shipping charge) per copy.

ATMADEEP
Volume-I, issue-IV, March 2025

পশ্চিমবঙ্গের সামসি কলেজের ইংরেজি ও বাংলা বিভাগের উদ্যোগে এবং উত্তরসূরি, শ্রীভূমি, আসামের সহযোগিতায়, ৮ ও ৯ এপ্রিল, ২০২৫ ইংরেজিতে একটি দ্বি-দিবসীয় আন্তর্জাতিক আলোচনাচক্রের আয়োজন করা হয়। আলোচনাচক্রের উদ্বোধক ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। প্রথম দিন নির্ধারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক দীপক কুমার রায়, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক রজত কিশোর দে, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক সাধন কুমার সাহা, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সমীপেন্দ্র ব্যানার্জি। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন সামসি কলেজের অধ্যক্ষ ড. সলিল মুখার্জি এবং প্রাসঙ্গিক বক্তব্য উপস্থাপন করেন সেখ মোফাজ্জল হোসেন, গভর্নিং বডির সভাপতি মোঃ রিয়াজুল করিম বক্সী এবং করিমগঞ্জ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য। সেমিনারের মূল বক্তব্য (Keynote) উপস্থাপন করেন আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য। দুদিনের আলোচনাচক্রের বিষয় ছিল 'সাহিত্য সৃষ্টির দিগন্ত: তত্ত্ব ও প্রয়োগের সংলাপ'। বাংলাদেশ থেকে অনলাইনে বক্তব্য উপস্থাপন করেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রাজীব মণ্ডল। দ্বিতীয় দিনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. অমিত ভট্টাচার্য। এছাড়াও অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব ও নির্ধারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অচিন্ত্য কুমার ব্যানার্জি, অধ্যাপক সবুজ সরকার, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পিনাকী রায়, পাটলিপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক অমর পাল এবং হরিরামপুর ডিএজি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আব্দুল ওয়াহাব। আন্তর্জাতিক এই সেমিনারের যুগ্ম আহ্বায়ক হিসেবে ছিলেন সামসি কলেজের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক তাপস কুমার বর্মন, বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোফাজ্জল হোসেন এবং আসামের করিমগঞ্জ কলেজের অধ্যাপক ও উত্তরসূরির সম্পাদক ড. বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্য।

UTTARSURI
প্রকাশক
উত্তরসূরি, শ্রীভূমি, আসাম

ISSN24541508